তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঊনবিংশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

১৮৩৮ শক

কলিকাতা

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড

সাল ১৩২৩। খৃঃ ১৯১৭। সম্বৎ ১৯৭৩। কলিগতাব্দ ৫০১৬।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

ঊনবিংশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ।

১৮৩৮ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৭।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

জন্ম—রাধানগর, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ, ২২শে মে।]   [মৃত্যু—বৃষ্টল, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ, ২৭শে সেপ্টেম্বর।

উনবিংশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৭।

৮৭৩ সংখ্যা ১৮৩৮ শক,

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

নববর্ষের নমস্কার।

আজ অবধি নূতন এক বৎসরের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে এবং পুরাতন বৎসর অতীত ইতিহাসের মধ্যে নিজের স্থান অধিকার করিতে চলিল। আমাদের জীবনে এইরূপ বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে এবং বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, তাই এই ঘটনার গুরুত্ব আমরা খুব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি না। অদ্যকার এই বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখে, পৃথিবীর নবজীবনের সূত্রপাতরূপ এই মহান ঘটনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আসুন আমরা সকলে মিলিতভাবে যোড়করে ও অবনতমস্তকে সর্ব্বাগ্রে ভগবানের চরণে প্রণিপাত করি। আমাদের অন্তরে যাহা কিছু ছোটখাটো সংসারের ভাব আছে, যাহা কিছু হিংসা দ্বেষ আছে, যাহা কিছু মান অভিমান আছে, আসুন, আমরা সে সকলই আজ তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া হৃদয়কে লঘুভার করিয়া ফেলি। আজ অবধি আমরা সমুদয় বিশ্বজগতকে আমাদের মিত্রপদে বরণ করিলাম—আমরা সকলকেই নমস্কার করিতেছি। আসুন, আজ আমরা আমাদের আপনাপন পরিবারের গুরুজন এবং আমাদের দেশের গুরুজন, সকলকে নমস্কার করিয়া শুভকার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হই। পৃথিবীর যেখানে যত বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ কর্ম্মকুশল ও ধর্ম্মশীল মহাত্মা আছেন, আজ আমরা তাঁহাদের সকলকে নমস্কার করিতেছি। পৃথিবীর যেখানে যত জ্ঞান ও ধর্ম্মে অগ্রসর সাধু মহাত্মা ঋষিমুনি ছিলেন, আজ আমরা তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে নমস্কার করিতেছি। ভবিষ্যতেও যে সকল মহাপুরুষ উদিত হইয়া জগতের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা তাঁহাদিগকেও আজ নমস্কার করিতেছি। যাঁহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে আমরা আমাদের শত্রু বলিয়া মনে করিতাম, আজ অন্তরের গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দিব্য আলোকে দেখিতেছি যে তাঁহারাও আমাদের প্রকৃত বন্ধু—আজ তাঁহাদিগকেও আমরা বন্ধুর সস্নেহ আলিঙ্গন প্রদান করিতেছি এবং তাঁহাদের নিকট অন্তরের সহিত ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আজ আমাদের হৃদয় প্রেমে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই আজ আমরা অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালকেই প্রেমের সূত্রে বাঁধিয়া এক অখণ্ড আনন্দরসে অভিষিক্ত করিতে চাহিতেছি। আজ এই প্রেমের আলিঙ্গনে আমাদের পরস্পরের হৃদয় হইতে স্থানের ব্যবধান, কালের ব্যবধান, সম্পদের ব্যবধান, বিপদের ব্যবধান, সকল প্রকার ব্যবধানই অন্তর্হিত হইয়া যাক—আসুন আমরা সকলে আনন্দের গাঢ় বন্ধনে প্রীতির চিরনূতন আলিঙ্গনে দৃঢ়সম্বন্ধ হই এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রেম ও আনন্দের আকারে আমাদের মস্তকে নিত্য বর্ষিত হউক।

উন্নতির পথে।

উন্নতির পথে—কথাটী শুনিলেই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! উন্নতির পথে—কথাটী কি মহান আশাপ্রদ! এই বিশ্বজগত কবে সৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে জানি না। কিন্তু এই বিশ্বচরাচর মহাব্যোমের ভিতর দিয়া ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে কেবলই যে উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহা কি কম আশ্চর্য্য সম্বাদ? এই সুগভীর আকাশের গভীর নীরবতা ভেদ করিয়া বিশ্বজগতের উন্নতির সঙ্গীত যে দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, ইহা কি অল্প আশার কথা? চারিদিকেই দেখিতেছি, শুনিতে পাইতেছি, বিশ্বজগতের উন্নতির বাণী যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়েছে। যে উন্নতির শেষ নাই, যে উন্নতির বিরাম নাই, সেই চির উন্নতির পথে বিশ্বজগত আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এত বড় আনন্দের কথা আশার কথা শুনিয়া কে আর পিছাইয়া থাকিতে চাহে? ছুটিয়া আইস, অগ্রসর হও, কেহই আর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। যত কিছু রোগ শোকের কথা, যত কিছু দুঃখদারিদ্র্যের কথা, যত কিছু বিপদ ও মৃত্যুর কথা, সে সকলই ভুলিয়া যাও, সে সকলই পশ্চাতে পড়িয়া থাক। আমরা আজ উন্নতির সাগরে, আনন্দের সাগরে, জীবনের সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িব, সম্মুখে অগ্রসর হইব—তাহাতেই আমাদের শান্তি, তাহাতেই আমাদের আনন্দ।

জগতের উন্নতি যেমন সুখসম্পদের ভিতর দিয়া, জীবনের ভিতর দিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তেমনি বিপদ আপদের ভিতর দিয়া, মৃত্যুর ভিতর দিয়াও তাহা ফুটিয়া উঠে। কিন্তু সুখসম্পদের মধ্যে জীবনের মধ্যে যে উন্নতি পরিস্ফুট হয়, সেটা আমাদের সহজবোধ্য হয়, সেটাকে উন্নতি হইতেছে বলিয়া আমরা সহজে ধরিতে পারি; আর, দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে, বিপদ আপদের মধ্যে, এমন কি, মৃত্যুর মধ্যেও যে উন্নতি ফুটিয়া উঠে, সে উন্নতিটুকুকে আমরা সহজে ধরিতে পারি না, বিশেষ একটু প্রণিধানপূর্ব্বক অবহিত হইয়া আলোচনা না করিলে সেটুকু সহজে আমাদের ধারণার আয়ত্ত হইতে চাহে না। জগতে যখন শান্তি বিরাজিত থাকে, নিরাপদে জ্ঞানধর্ম্মের চর্চ্চা হইতে থাকে, ব্যবসায়বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে, ব্যবসায়বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের ন্যায় যুদ্ধ যখন জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা বিরাট মৃত্যুর বিকটকরাল অন্ধকার ছায়াতে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, তখন যেন আমাদের ধারণাতেই আসে না যে, সেই অন্ধকারের ভিতরেও উন্নতির জ্যোতি বর্ত্তমান আছে, সেই মৃত্যুর প্রলয়ের মধ্যেও উন্নতির অমৃত শক্তি নিত্য ক্রীড়া করিতেছে। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয় বুঝিবা এই মৃত্যুর কঠোর আঘাতে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি রুদ্ধ হইয়া গেল, অশান্তির ঘূর্ণাবায়ুর প্রবল বেগে উন্নতির জ্বলন্ত প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু এ কথাটী কোনক্রমেই ঠিক নহে যে মৃত্যুর ঘন অন্ধকারেও উন্নতির জ্যোতি চিরনিমগ্ন থাকিবে। বরঞ্চ ইহাই সত্য যে মৃত্যুর শত দুর্ভেদ্য অন্ধকারও ভেদ করিয়া উন্নতির জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ সংসারে অমৃত আনয়ন করিবে, জীবন প্রদান করিবে।

ভয়াবহ মৃত্যুর মধ্যেও উন্নতির আনন্দবাণী যে কিরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইতেছি। জগতের ইতিহাসে এত বড় মৃত্যু কেহ কোনকালে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। এই মৃত্যু স্বীয় বিচিত্র পদক্ষেপে সমগ্র জগতকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি দেখিয়া সন্দেহ আতঙ্ক হৃদয়কে অভিভূত করিতে চাহে বটে—সহসা মনে হয় বটে যে এই পৃথিবী কোথায় চলিয়াছে—উন্নতির পথে, না অবনতির পথে? অমৃতের পথে অথবা মৃত্যুর পথে?—হৃদয় হইতে সন্দেহ দূর করিয়া দাও, আতঙ্ক দূর করিয়া দাও। যাঁহার আদেশে এই বিশ্বজগত সৃষ্টির আদি অবধি উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাঁহারই আদেশে তাঁহার ব্রহ্মচক্রের একটা ক্ষুদ্র কণা এই পৃথিবী আজও উন্নতির পথে অবিশ্রান্ত চলিয়াছে এবং চিরকালই চলিতে থাকিবে। সেই আনন্দময় বিশ্বাধিপতি আমাদিগকে মাভৈ রবে নিয়তই অভয় দিতেছেন এবং আমাদের অন্তরের অন্ধকার শত

খণ্ডে বিধ্বস্ত করিয়া কোটী আলোকের প্রদীপ জ্বালিয়া নিত্যই বলিয়া দিতেছেন যে এই পৃথিবীও তাঁহারই রাজ্য, সুতরাং ইহাও উন্নতির পথে না চলিয়া থাকিতেই পারে না। এই বিরাট মৃত্যুর মধ্যেও, মহাসমরের লক্ষ লক্ষ নরহত্যার মধ্যেও, শত সহস্র রমণীর সতীত্বনাশের মধ্যেও, শত সহস্র অত্যাচার অনাচারের মধ্যেও আমরা সেই উন্নতির অনাহত আনন্দবাণী সুস্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি—আনন্দময়ের আনন্দলীলার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি।

বর্ত্তমান মহাসমরে উন্নতির পরিচয়ের কথা বলিলে প্রথমেই তো ইউরোপে মদ্যপান রহিত হইবার কথা আমাদের সম্মুখে বৃহদাকারে প্রতিভাত হয়। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর, অনেক পরীক্ষার পর আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে মদ্যপানের অপকারিতা এত দৃঢ়রূপে উপলব্ধ হইয়াছিল যে এদেশে মদ্যপানের কারণে জাতিচ্যুতির প্রথা পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল, মদ্যবিক্রেতা অতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইত এবং পথের যে ধারে মদ্যের দোকান থাকিবে, তাহার বিপরীত ধার দিয়া পথিকদিগের চলিবার অনুশাসন প্রচলিত হইয়াছিল। এদেশেই বহুকাল যাবৎ মদ্যমদেয়-মপেয়মগ্রাহ্যং—মদ্য কাহাকেও দিবে না মদ্য নিজেও পান করিবে না এবং মদ্য কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিবে না—এক কথায়, মদ্য স্পর্শ করিবে না, মদ্যের সহিত কোনই সম্বন্ধ রাখিবে না, এই সুমঙ্গল সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এদেশ হইতে প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিকাংশ স্থানেই এই সত্য ক্রমে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও সভ্যতার সোপানে উদীয়মান ইউরোপ অঞ্চলে বলিতে গেলে এই সত্য মোটেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বরঞ্চ, ইউরোপে মদ্যপান সভ্যতাভব্যতার বীরত্বের সৌজন্যের একটী অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। বলা বাহুল্য যে সুরাবিষ তাহার নিজের কার্য্য করিতে বিরত থাকে নাই—সুরাবিষের প্রভাবে ইউরোপের ধর্ম্ম, নীতি, সুখ-সৌভাগ্য, সভ্যতাভব্যতা, স্বাস্থ্য ও রীতি সকলই অত্যন্ত বিকৃত, অন্তঃসারশূন্য ও বিষময় হইয়া উঠিতেছিল।

কয়েকজন মনস্বী ব্যক্তি মদ্যের অপকারিতা বুঝিয়া ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইউরোপের জনসাধারণ এতই সুরাভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে সেই কয়েকজনের পক্ষে মদ্যের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করা অসাধ্য ছিল। এমন কি, আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রুষ-জাপানীয় যুদ্ধে রুষীয় প্রজাদিগের সুরাপ্রিয়তাই রুষিয়ার পরাজয়ের অন্যতর প্রধান কারণ বলিয়া প্রায় একবাক্যে স্বীকৃত হইলেও ইউরোপের সভ্য সমাজ হইতে সুরারাক্ষসীকে নির্ব্বাসিত করিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই। কিন্তু যখন সেই দারুণ আঘাতেও পাশ্চত্য ভূখণ্ডে মদ্যের অস্পৃশ্যত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল না, তখন ভগবান কঠোরতর আঘাতের দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমগ্র ইউরোপব্যাপী জগতবিক্ষোভক মহাসমরের এক ঘূর্ণাবায়ু প্রেরণ করিলেন। রুষজাপানীয় যুদ্ধ হইয়াছিল রুষিয়া ও জাপানের আপনাপন রাজ্য ও প্রতাপের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার জন্য, কিন্তু বর্ত্তমান মহাসমর হইতেছে—ইউরোপের বিভিন্ন জাতির আত্মরক্ষার জন্য—এই যুদ্ধে আপনাপন অস্তিত্ব কিসে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহাই ভাবিয়া ইউরোপের বিভিন্ন জাতি অত্যন্ত ব্যাকুল ও কাতর হইয়া পড়িয়াছে। এই মহাসমরের মহামৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইউরোপ এখন বুঝিয়াছে যে মদ্যপান রহিত না করিলে আত্মরক্ষার উপায় নাই এবং তাই আজ অন্তত মিত্রসঙ্ঘীয় জাতিগণের মধ্যে মদ্যপান বলিতে গেলে একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। সুরাবিষের প্রভাবে ইউরোপীয়গণ সর্ব্বতোভাবে জীবন্মৃত্যু ভোগ করিতেছিল। আজ তাহারা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে সেই অগ্নিস্রোতের জ্বালামুখগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং ইহার ফলে যে তাহাদের কি মহান উপকার হইয়াছে, তাহার সামান্য পরিচয় মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। এই মহাসমর ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে মদ্যের ন্যায় ভীষণ গুপ্তশত্রুর নিধনসাধন হইত কি না সন্দেহ।

মদ্যপান রহিতকরণের ন্যায় চিকিৎসাসম্বন্ধীয় নানাবিধ গুরুতর তত্ত্ব সকলের আবিষ্কারেও মহাসমরের প্রলয়ের ভিতর মহোন্নতির বীজ নিহিত

দেখিতে পাই। যুদ্ধক্ষেত্রেই আহতগণের দুঃখ ক্লেশ দূর করিবার জন্য তাহাদের আর্ত্তনাদ নিবারিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্নের ফলে চিকিৎসকগণ নিত্যই কত যে নূতন সত্য সকল আবিষ্কার করিতেছেন, জনসাধারণের কয়জন তাহা গণনা করিয়া রাখিয়াছে? চৌম্বকের দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরস্থ গুলি নিষ্কাষণ, বীজচিকিৎসা দ্বারা টাইফস রোগনিবারণ প্রভৃতি বিষয় সংবাদ-পত্রে বারম্বার পড়িতে পড়িতে এবং চিকিৎসক-দিগের নিকট সেই সকল বিষয় শুনিতে শুনিতে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে সেই সকল সত্য আবিষ্কারের গুরুত্ব আমরা সম্যক উপ-লব্ধি করিতে পারি না।

একমাত্র মদ্যপান রহিত করণেই ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও প্রজাবর্গ, সকলেরই মনের কত দৃঢ়তা, কত স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নিরূপণ করা বড় সহজ নহে। তাহার উপর, চিকিৎসা বিষয়ক এবং অন্যান্য নানা বিষয়ক বহুবিধ তত্ত্ব আবিষ্কারে এই মহাপ্রলয়ের ভিতর দিয়াও ইউ-রোপীয়গণের যে কতদিক হইতে মানসিক উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহা কে ইয়ত্তা করিবে? নিজে-দের আত্মরক্ষা করিতে গিয়া ইউরোপীয় জাতি সমূহকে যে কতপ্রকার জ্ঞানের সাধনা করিতে হইতেছে তাহা দুই চারি কথায় বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।

এই মহাসমরের অগ্নিকুণ্ড হইতে দুএকটী সমাজ সম্বন্ধীয় গুরুতর সত্যও উত্থিত হইয়া জগতের দ্বারে আঘাত দিতেছে। এতদিন ব্যক্ত আকারে হউক বা অব্যক্ত আকারে হউক, সমাজনেতাগণের কার্য্য-রীতি অনেকটা একতন্ত্র ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে তাঁহারা নিজেরা সমাজের পক্ষে যাহা ভাল মনে করিবেন তাহা করিয়া গেলেই হইল, সমাজভুক্ত জনসাধারণ আপাতত তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারুক আর নাই পারুক। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে সমাজের মঙ্গল কার্য্যে সমাজনেতাগণের কেবল একা একা অগ্রসর হই-লেই চলিবে না, সমগ্র সমাজকে সঙ্গে টানিয়া লইয়া চলিতে হইবে। তাহা না করিলেই প্রয়োজনের সময়ে নেতাগণ ও সমাজের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আসিয়া সমাজধ্বংসের কারণ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে আমরা এই সত্য পাইতেছি যে সকল কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইতে ইচ্ছা করিলে সমাজের মধ্যে অন্যোন্যসাহায্য চাই-ই চাই-ই।

কেবল নেতাগণ ও জনসাধারণের মধ্যেই যে অন্যোন্য-সাহায্য আবশ্যক তাহা নহে। সমাজের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে সমাজের এক অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও অপর অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীজাতি, এই উভয়ের মধ্যেও আন্তরিক অন্যোন্যসাহায্যের ভাব না থাকিলে সমাজ কখনই প্রকৃত উন্নতির পথে চলিতে পারে না। এতদিন পুরুষদিগের সহিত সমসূত্রে স্ত্রীজাতির সহচরী হইবার, সর্ব্ববিষয়ে বন্ধু হইবার অধিকার বিষয়ক দাবীর কথা কেবল কাগজ পত্রে প্রবন্ধাদি-তেই নিবদ্ধ থাকিত। স্ত্রীজাতিকে পুরুষদিগের সহিত সমসূত্রে শিক্ষাদান ও অন্যান্য অধিকার প্রদান বিষয়ে কেহ কেহ বা উপযোগিতা স্বীকার করিতেন, কেহ কেহ বা করিতেন না। কিন্তু বর্ত্ত-মান মহাসমরের বিরাট মৃত্যুর ছায়ার নিম্নে দাঁড়াইয়া আজ পুরুষদিগকে বাধ্য হইয়া স্ত্রীজাতিকে সখিত্বের অধিকার দিতে হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও তাঁহাদের উপর সন্ন্যস্ত কর্ম্মসকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আপনাদিগকে পুরুষদিগের সহিত সমসূত্রী অধিকার পাইবার উপযুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। স্ত্রী-লোকেরা নির্ভীক হৃদয়ে রক্তবজ্র সমিতির (Red Cross Society) কার্য্যভার গ্রহণ করাতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রেরও নানা কার্য্যে আপনাদিগকে অযাচিত ভাবে নিযুক্ত করাতে অন্যক্ষেত্রের কথা দূরে থাক, তাহারা আর যুদ্ধক্ষেত্রেরও অনুপযুক্ত বলিয়া বিবে-চিত হইতে পারে না। জগতের উন্নতির সহায়-স্বরূপ এই একটী অমূল্য সত্য জ্বলন্ত আকারে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদিগের সহিত সমসূত্রী শিক্ষা প্রভৃতি ন্যায্য অধিকার সমূহ হইতে আর বঞ্চিত রাখা চলিতে পারে না। কথায় কথায় আর স্ত্রীজাতিকে পশ্চাতে রাখিয়া পুরুষদিগের অগ্রসর হইলে চলিবে না। মানবজাতির অর্দ্ধাঙ্গকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত রাখিলে, তাহাদের ন্যায্য অধি-কারসমূহ হইতে বঞ্চিত রাখিলে বিনাশ যে অবশ্য-ম্ভাবী, বর্ত্তমান মহাসমর তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য

দিতেছে। * এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যদি স্ত্রীজাতির কোন কথা বলিবার অধিকার থাকিত, স্ত্রীজাতি যদি ইহার ফলাফল আলোচনা করিবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিত, তাহা হইলে আজ সমগ্র জগতকে মৃত্যুর রক্তমাখা করাল ছায়ার নিম্নে সশঙ্কে দিবানিশি বাস করিতে হইত না।

এই মহাসমরের মৃত্যুপ্রদ অগ্নিবায়ু জগতকে নীতির পথে যে কতদূর উন্নত করিয়া দিয়াছে তাহা কি কেহ স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? জর্ম্মান-প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতিসমূহ রাজনীতির কূটমন্ত্রে অভ্যস্ত হইয়া বাহিরে নীতির মুখোস পরিয়া অন্তরে যে ঘোর দুর্নীতি পোষণ করিতেছিল, সেই দুর্নীতির নিকটে, সভামধ্যে বিভিন্ন জাতিসমূহের প্রতিনিধি-গণের সম্মুখে স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রও "ছিন্নপত্র" বলিয়া গৃহীত হইল এবং সেই দুর্নীতিরই কারণে বর্ত্ত-মান মহাসমরের মহামৃত্যু জগতে সুদীর্ঘ পদক্ষেপে বিচরণ করিতেছে। পাশ্চাত্য জাতিগণের কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় যে এতদিন তাহারা ভাবিত যে বাহিরে সত্যপ্রিয়তা ন্যায়পরতা প্রভৃতি সুনীতির প্রচলিত মন্ত্র সকল আওড়াইয়া অন্তরে ঠিক তাহার বিপরীত দুর্নীতি পোষণ করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না, বরঞ্চ তাহা বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। কিন্তু বর্ত্তমান মহাসমর অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়াছে যে এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভুল। এখন তাহারা বুঝিয়াছে যে যেমন বাহিরেও নীতির জয় ঘোষণা করিতে হইবে, অন্তরেও সেইরূপ সত্য সত্য সুনী-তিকে পোষণ করিতে হইবে—তাহারা বুঝিয়াছে যে জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে চাহিলে সত্য-সত্যই ন্যায়প্রিয় সত্যপ্রিয় হইতে হইবে, ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে।

মহাসমরের মৃত্যুময় অগ্ন্যুৎপাতের ভিতর দিয়া ভগবান যে উন্নতি জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা যদি নৈতিক উন্নতি অথবা অন্য কোন খণ্ড খণ্ড উন্নতিতে পর্য্যবসিত হইত, তবে সে উন্নতিকে আমরা প্রকৃত উন্নতি বলিয়াই স্বীকার করিতাম না। প্রকৃত উন্নতি হইতে গেলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া চাই এবং সেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দৃঢ়তম ভিত্তি ও পরিণতি হইতেছে ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরই "সত্ত্ব-স্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ" ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তাঁহাকে ধর্ম্ম ও সুনীতি সমূহের মূল বলিয়া না জানিলে তাহা-দের ভিত্তিই রহিল না। তাহা হইলে স্বার্থপরতাই ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়। আজ আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া একশ্রেণীর নিয়মকে সুনীতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, কাল যদি তাঁহাতে আমার বাসনা পূর্ণ না হয় তাহা হইলে সেই সকল সুনীতিকে "ছিন্ন পত্রের" সামিল করিব। ধর্ম্ম ও নীতি এপ্রকার শ্লথমূল হইলে কোন প্রকার উন্নতিই স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারে না। সুখের বিষয় যে মহাসমরের অগ্নিধারার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বা-ঙ্গীন উন্নতির বীজ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জগতের এবং বিশেষভাবে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের আধ্যা-ত্মিকতার প্রসারে, ধ্যানের অবসর অন্বেষণে আমরা তাহার স্পষ্টতম পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। "প্রেম সূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ত-তলং"—হৃদয়ে যদি ক্ষণকালের জন্যও প্রেমসূর্য্য প্রকাশ পান, তবে সকলই হস্তগত। আজ জগত মৃত্যুর অগ্নিবাণে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া সেই প্রেম-সূর্য্যকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র জগত হইতে প্রাণের এক আকুল ধ্বনি উঠিয়াছে—প্রভো সংহর সংহর রোষং—হে প্রলয়ঙ্কর প্রভু, তোমার ক্রোধ সম্বরণ কর, আমরা তোমার ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেলাম। জগত জুড়িয়া আজ ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রতি এক মর্ম্মভেদী অভিশাপ উঠিয়াছে—ধিক বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং। সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র আমাদের এই ভারত-ভূমিতে বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের বোধ হয় এই প্রকার মহাসমরের চিতাগ্নি হইতেই ঐ মহাসত্য অভিশাপ উঠিয়াছিল, এবং আজ বহুকাল পরে জগতের আর এক প্রান্ত হইতে সেই একই মহাসত্য অভিশাপ উত্থিত হইয়া সমস্ত জগতের সায় পাইতেছে।

পাশ্চত্য ভূখণ্ড হইতে আজ শান্তির জন্য এবং শান্তির মূল ভগবানকে পাইবার জন্য প্রাণের এক গভীর ব্যাকুলতা উঠিয়াছে। সমরলিপ্ত জাতিগণের প্রত্যেকেই বলিতেছে যে 'ভগবান আমার সহায়

---

* পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের কয়েকজন মহিলাকে প্রকৃত শিক্ষিত দেখিয়া আমরা যেন ভ্রান্ত সংস্কারে না পড়ি যে তথাকার অধিকাংশ মহিলাই সুশিক্ষিতা।

হউন, তাহা হইলেই এই যুদ্ধ থামিয়া যাইবে, ধরাতলে শান্তিবারি বর্ষিত হইবে'। যাহারা অন্যায় করিয়াছে, তাহারাও ভগবানের বৃথা নাম লইতেছে, আবার যাঁহারা ন্যায়পথের পথিক, তাঁহারাও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বরের অখণ্ড সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। এই ব্রহ্মধনকে ধরিয়াই একসময়ে ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল, আজ পাশ্চত্য জগত সেই ব্রহ্মধনকে ধরিয়া নবতর রূপে উন্নতির শিখরদেশ অধিকার করিতে উদ্যত। এতদিন পাশ্চাত্য জাতিগণ ধনমদে বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া সমস্ত ধরাতলকে তাঁহাদের সুখসৌভাগ্যবৃদ্ধির ন্যায্য ইন্ধন বলিয়া বিবেচনা করিত। কিন্তু আজ তাঁহারা ধর্ম্মকে জগতের প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র বুঝিয়া ন্যায়ের গৌরব সত্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছে। এই যুদ্ধের অবসানে যদি তাঁহারা পুনরায় ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া ধনমদে মত্ত হয়, ন্যায়ের ও সত্যের গৌরব রক্ষা না করে, তবে ইহা সত্য বলিতেছি যে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে, কিন্তু সেই একবিংশতি বারের পরেও ঐ মহাসত্য—ধিকবলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং—স্বীয় মহিমান্বিত মস্তক উত্তোলিত করিবেই করিবে। আর, তাহারা যদি এই যুদ্ধের অবসানে ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখে, তবে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি তাহাদের হস্তগত, সকল বিদ্যাই তাহাদের আয়ত্ত হইবে, কারণ ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে জীবনের ভিতর দিয়া যে উন্নতি লাভ হয় তাহা আমাদের সহজবোধ্য, কিন্তু মৃত্যুর ভিতর দিয়াও যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আসে তাহা সহজে উপলব্ধ হয় না বলিয়া সেই বিষয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিলাম। এখন বোধ হয় আমরা কতকটা বুঝিতে পারিব যে জীবন ও মৃত্যু উভয়ের ভিতর দিয়া কি ঈশ্বরিক স্পন্দনবেগে জগত উন্নতির পথে চলিয়াছে। মহাসমরের অগ্নিঝলক আমাদের দেশকেও যে স্পর্শ করিয়াছে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আমাদেরও আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আমরা যদি রক্ষা পাইতে চাহি, তবে পূর্ব্বপুরুষ ঋষিমুনিগণের কেবলমাত্র নাম স্মরণে কোনই ফল হইবে না, আমাদিগকেও জগতের উন্নতির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, সর্ব্ববিষয়ে আমাদিগকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ অপেক্ষা অনেক অগ্রে চলিতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতিগণ মদ্য পরিত্যাগ করিয়াছে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য আমাদিগকে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র দেশের মঙ্গল অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে হইবে। কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ, এই মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া পুত্রদিগের সহিত সমসূত্রে কন্যাদিগকেও শিক্ষাদান করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে ন্যায়ের সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি, ধর্ম্মধনের উপর আমাদের আদিমতম অধিকার অব্যাহত রাখিবার জন্য ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বার্থপরতা, জাত্যভিমান, বৃথা অহঙ্কার এসকলই ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের চরণে অবনতমস্তক হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। এই ভাবে জীবনকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিলেই না আমরা পাশ্চাত্যদিগকে বলের সহিত পারিব যে 'ধর্ম্মবিষয়ে তোমরা যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছ সে সকলই ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র। ধর্ম্মবিষয়ে যদি কিছু প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে চাও, তবে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ভারতে গিয়া ভারতের আচার্য্যদিগের মুখে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর, তবেই তোমরা প্রকৃত উন্নতির পথে চলিতে পারিবে।' আমরা যদি আপনাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত না করি, নিজেরা যদি সর্ব্ববিষয়ে অসিদ্ধ থাকি, তবে পাশ্চাত্যদিগকে কিপ্রকারে প্রকৃত শিক্ষাদান করিব? আমাদিগকে এরূপ প্রস্তুত হইতে হইবে যে পাশ্চাত্যগণ শিক্ষার্থী হইয়া আসিলে আমাদিগকে যেন অসিদ্ধ দেখিতে না পায়।

এই উন্নতির পথে আপনাকে পরিচালিত করিতেই বা আমরা পশ্চাৎপদ হইব কেন? উন্নতির পথে চলাতেই তো মানবের সুখ ও আনন্দ। ইহা তো পরীক্ষিত সত্য। ইহা তো আমরা প্রতিদিনের পরীক্ষাতেই প্রাপ্ত হই যে, যতই আমরা আমাদের হৃদ-

য়কে ঐ আকাশের ন্যায় বিস্ফারিত করিয়া দিই ততই আমরা সুখ পাই, যতই আমরা আমাদের প্রাণকে সম্প্রসারিত করিয়া দিই ততই আমাদের আনন্দ হয়। কিন্তু যতক্ষণ না আমাদের প্রাণমনকে সেই আনন্দময়ের সঙ্গে সমতান করিয়া লইতে পারি ততক্ষণ আমাদের আনন্দ কিছুতেই সম্পূর্ণতা লাভ করে না। সেই আনন্দময়ের আহ্বানে আমরা যতটুকু তাঁহার দিকে অগ্রসর হই, সেইটুকুই আমাদের প্রকৃত উন্নতি। আমাদের উন্নতিসাধনে আনন্দলাভের কারণ এই যে আমরা সেই উন্নতিমূলক আনন্দের ভিতর দিয়া সেই আনন্দময়েরই দর্শন পাই। তাই আনন্দস্বরূপের দর্শনলাভের ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে উন্নতির পথে চলিতেই হইবে। আমাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে আমরা জীবনের এক মুহূর্ত্তও অবহেলায় নষ্ট করিব না। সমস্ত জীবন তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিব, তাহা হইলে উন্নতির জন্য আর ভাবিতে হইবে না; পুরাতন আচার্য্যগণ যে সত্য বাক্য বলিয়া গিয়াছেন যে আমরা ঈশ্বরের দিকে একপদ অগ্রসর হইলে ঈশ্বর সহস্রপদ অগ্রসর হইয়া আমাদিগের উন্নতি বিধান করেন, তখন তাহাই জীবনে প্রত্যক্ষ করিব।

সর্ব্বমঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বর আমাদিগের সহায় হইয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া চলুন এবং জগতের বক্ষে শান্তির সুশীতল বারি বর্ষণ করুন।

মাতৃপ্রেমের অভিব্যক্তি।

(রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যারত্ন এম, এ,)

সাধারণত ভালবাসা শব্দে যাহা বুঝায় তাহার দুর্জ্জয় শক্তির বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই শক্তির বিষয় অল্পাধিক পরিমাণে অবগত না আছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

কোন চিন্তাশীল লেখক ভালবাসাকে এক মহাযজ্ঞ বলিয়াছেন। যজ্ঞের প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে পতঙ্গগণ আত্মবিসর্জ্জন করে কিনা জানি না, কিন্তু এই ভালবাসারূপ মহাযজ্ঞে যে কত অগণিত নরনারী তাহাদিগের জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই শক্তির দুর্জ্জয় প্রতাপে ধরাবক্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে রক্তস্রোতে অনুরঞ্জিত হইয়া আসিতেছে। আবার এই ভালবাসার স্নিগ্ধমাধুর্য্যে যে কত দগ্ধ হৃদয় শান্তিপূর্ণ হইয়াছে, তাহারই বা ইয়ত্তা কে করিবে? একদিকে ইহা প্রজ্বলিত বহ্নি অপেক্ষাও সহস্রগুণে প্রখর, অপর দিকে চন্দ্রমার সহস্র কিরণরশ্মিকেও পরাভূত করিয়া ইহার মাধুরী হৃদয়ে অমৃতধারা প্রবাহিত করে।

এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রিত ভালবাসা স্বরূপত কি? অতি প্রাচীন কাল অবধিই জগতের জ্ঞানী মনীষী ও প্রেমিকগণ ইহার তত্ত্বনিরূপণের প্রয়াসী হইয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইহাকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যে ভাবে নায়ক নায়িকার মধ্যে ইহার বিকাশ তাহাকেই প্রেম নামে অভিহিত করিয়াছেন—আর সমুদয় আসক্তি মাত্র। প্লেটো ভালবাসাকে একটা অতৃপ্ত বাসনা বলিয়াছেন—শারীরিক সান্নিধ্য কিম্বা অপর কোন উপায়েই ইহার তৃপ্তি নাই, অথচ কিসে যে তৃপ্তি হইবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। প্লেটো ডিয়টিমা নামক কোন সিদ্ধ রমণীর মুখ দিয়া ভালবাসার যে দুর্নিবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণন করিয়াছেন, কি প্রাচীন কি আধুনিক ভালবাসার কোন আদর্শই ইহা অপেক্ষা উচ্চস্থান লাভ করিবার অধিকারী নহে। *

কিন্তু এই সকল আদর্শেরই লক্ষ্য এক দিকে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রক্তমাংসসংস্পৃষ্ট জীবদেহের যে আকর্ষণ তাহাকে মোহঘটিত আসক্তি আখ্যা প্রদান

---

* Their soul is manifestly desiring something else, and what it is she cannot tell, only she darkly prophesies thereof and guesses it from afar. But if Hephaestus with his forging fire were to stand beside that pair and say 'Is this what ye desire—to be wholly one? to be together by night and day? for I am ready to melt you together, and to make you grow in one, so that from two ye shall become one only and in this life shall be undivided, and dying shall die together, and in the underworld shall be single soul'—there is no lover who will not eagerly accept the offer, and acknowledge it as the expression of the unknown yarning and the fulfilment of the ancient need.

Jowett's translation.

করিয়া ভালবাসাকে অহেতুকী ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিলেও, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর আকর্ষণের ভিতর দিয়া যে ইহার স্ফুরণ হইয়াছে, সকল মতই এই কথা সমর্থন করিতেছে। দেখা যাক, বৈজ্ঞানিক বিধি এই মতের অনুমোদন করিতেছে কি না।

সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে জীবনপ্রবাহ দুই প্রকার সংগ্রামের ভিতর দিয়া চলিতেছে—এক সংগ্রাম আত্মরক্ষার নিমিত্ত, অপর সংগ্রাম অন্যের জীবনরক্ষার নিমিত্ত। একের জয় নিজের প্রাধান্য স্থাপন দ্বারা, অপরের জয় আত্মবিসর্জ্জন দ্বারা। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই পরস্পরবিরোধী এই দুই মহাশক্তির কার্য্য চলিয়া আসিতেছে এবং জীবনরূপ গ্রন্থ এই দুইটী বিভিন্ন বর্ণযুক্ত সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। মানব যে সকল শক্তির অধিকারী হইয়া প্রাণীজগতে নিজের একচ্ছত্র রাজত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাদিগের মূলভিত্তি আত্মরক্ষার্থ যে সমর তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এত সব সম্পদের অধিকারী হইলেও সে পশুরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পশুমাত্র। সে কেবল তখনই মনুষ্যনামের অধিকার লাভ করিবে যখন অন্যের জীবনরক্ষার্থ সংগ্রামেচ্ছা তাহার চরিত্রে প্রাধান্য সংস্থাপন করিবে। এই নিজ হইতে অন্যে গমন জগতের ইতিবৃত্তে একটী বিশেষ ঘটনা। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল ভালবাসা।

সৃষ্টির প্রাচীনত্বের সহিত তুলনায় এই ভালবাসার অভিব্যক্তি মাত্র সে দিনের ব্যাপার হইলেও বিস্ময়ের বিষয় এই যে জীবসৃষ্টির প্রারম্ভেই ইহার অনুসূচনা হইয়াছে। যদি একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত জীবাণুকে অনুকূল অবস্থার মধ্যে সংস্থাপন করা যায়, দেখা যাইবে যে অনতিবিলম্বে ইহা দুই প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। আত্মরক্ষার্থ যে সংগ্রাম, তাহার বশীভূত হইয়া ঐ জীবাণু বাহির হইতে খাদ্য আকর্ষণ করিতেছে এবং দ্বিতীয় বিধির অনুশাসনে স্বীয় দেহের কিয়দংশ স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিতেছে। পরিশেষে কতকগুলি অবস্থার মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া উহা অপর একটী জীবাণুর আকারে প্রকাশ পাইতেছে।

জীবসৃষ্টির প্রারম্ভ অবধিই এই গ্রহণ ও প্রদান উভয়বিধ কার্য্য অপ্রতিহতভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহা কোনরূপ আকস্মিক ঘটনাসম্ভূত নহে, ইহা জীবলোকের স্বভাবগত ধর্ম্ম। এই উভয়বিধ কার্য্যকে সহজ ভাষায় পোষণকার্য্য nutrition ও reproduction জননকার্য্য বলা যাইতে পারে। স্থাবর জঙ্গমাত্মক উভয়বিধ প্রাণীরাজ্যের মধ্যেই এই দুই উপায় দ্বারা জীবনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—আহার গ্রহণ দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে জীবন ধারণ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, এবং সন্তান উৎপত্তি দ্বারা জীবন প্রবাহ রক্ষা পায়। এই দুই বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনার্থ বিভিন্ন উপায়ে এই দুই শক্তির কার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। একের গতি নিজের দিকে—ইহা অন্তর্মুখী এবং ইহার দৃষ্টি বর্ত্তমানে নিবদ্ধ। অপরটী বহির্মুখী—ইহার দৃষ্টি ভবিষ্যতের উপর। অন্য কথায় বলিতে গেলে, একটী নিজেকে লইয়া ব্যস্ত, অপরটী আত্মবিস্মৃত হইয়া কেবল অন্যের হিতকামনাতেই নিমগ্ন।

স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা এই পরস্পরবিরোধী ভাবদ্বয়ের উপরেই নৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। আমরা এস্থলে দেখিতে পাইতেছি যে জীবজগতের সৃষ্টি অবধিই কি প্রকারে এই পরস্পরবিরোধী শক্তিদ্বয় পরস্পরের সহিত জড়িত রহিয়াছে। কি উদ্ভিদরাজ্যে কি জঙ্গম জীবরাজ্যে, উভয়বিধ রাজ্যের মধ্যেই বংশরক্ষার্থ যে সকল আশ্চর্য্য উপায় ও কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে, উত্তরকালে তাহারই উপর দাঁড়াইয়া মনোবৃত্তি সকল বিকাশ লাভ করিয়া মানবকে পশুরাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক এত উচ্চ পদবীলাভের অধিকারী করিয়াছে। এই যে বংশরক্ষার্থ সংগ্রাম, ইহা আত্মরক্ষার্থ সংগ্রাম অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বরঞ্চ, যে সকল উপায় অবলম্বনে বংশ রক্ষা নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা ভাবিলে চিত্ত বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হয়।

উদাহরণ স্বরূপে একটী বৃক্ষের বিষয় আলোচনা করা যাক। শারীরতত্ত্ববিদের (Physiologist) চক্ষে ইহা একটী সামান্য বৃক্ষরূপে অনুভূত হইবে না। তাঁহার নিকট ইহা উপরোক্ত উভয়বিধ কার্য্য সম্পাদনোপযোগী অসংখ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট একটী যন্ত্রবিশেষ। ইহার শাখাপ্রশাখা শিখরপত্র ইত্যাদি মুখ ধমনী ফুসফুস প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ইহাকে এই ভীষণ জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার উপযোগী করিতেছে। কিন্তু এই যন্ত্রনিচয় হইতে

সম্পূর্ণ বিভিন্ন আর একটী যন্ত্র বৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে যাহার কার্য্যের সহিত উপরোক্ত যন্ত্রসমূহের কার্য্যের কোনপ্রকার সম্পর্ক নাই—ইহা উপরোক্ত যন্ত্র-সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই যন্ত্র হইতেছে বৃক্ষের পুষ্প।

একটু অনুধাবন পূর্ব্বক এই পুষ্পের জীবন পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে এই পুষ্পের যাহা কিছু সম্পদ, সকলই পরহিতার্থে। বৃক্ষের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল বৃক্ষের জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর ব্যস্ত, কিন্তু পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই মৃত্যুর আলিঙ্গনে আত্মজীবনকে বিসর্জ্জন দিতেছে। বৃক্ষ জীবন্ত—ইহার পত্র সমুদয় সতেজ ও সবুজ, কিন্তু ঊষার আলোকস্পর্শে পুষ্পের জীবন প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে ইহার মুখে মৃত্যুর কালিমাছায়া নিপতিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে জীবনের অনন্তপ্রবাহ ছুটিয়াছে, ইহার মধ্যে এই মৃত্যুর অভিনয়! প্রকৃতির একি নিষ্ঠুর ব্যবহার!

সৃষ্টির অভিব্যক্তি সৌন্দর্য্যে। সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-বিকাশ এই কুসুমের রচনায়। তবে কেন প্রকৃতি একদিনের জন্যও তাহার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিকে নিজের সৌন্দর্য্যভোগের অধিকারী করিল না? কেন সৃষ্টির এই অসামঞ্জস্য? ইহার মধ্যে কি কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে?

মৃত্যুর অঙ্গুলিস্পর্শে ঐ যে পুষ্পদলটী শুষ্ক ও বিলীন হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, উহাকে উত্তোলন করিয়া দেখি যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ইহার অন্তরালে অভিনীত হইতেছে। অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের সহিত ক্ষুদ্র কোটরের মধ্যে বীজসকল সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। জননী ইহাদের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজের জীবনকে আহুতি প্রদান করিয়াছেন। যে খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া পুষ্প সংসারে অবস্থিতি করিতে পারিত সেই খাদ্যভাণ্ডার অতি সংগোপনে ও অত্যধিক যত্নসহকারে পুষ্প ভবিষ্যদ্বংশীয়-দিগের নিমিত্ত রক্ষা করিয়া গিয়াছে, যাহাতে সন্তানগণ সঞ্জীবনী শক্তিসংস্পর্শে জাগিয়া উঠিবামাত্রই ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্য নিজের মুখের সম্মুখে ঐ খাদ্যসম্ভার সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পায়। বৃক্ষজীবনে যে সকল আশ্চর্য্য কৌশলের সমবায়ে এই পুষ্প ফল ও বীজ সকল সৃষ্ট হইতেছে সে সকলই পরের জীবনরক্ষার্থ সংগ্রামের ফল।

ঐ যে তোমার সম্মুখস্থ কুসুমরাশি, যাহার সৌন্দর্য্য বাগানকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে এবং যাহার সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত, ইহা কত নীরব প্রাণকেই না কবিত্বের ঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে! তুমি বলিবে, তোমারই চিত্ত বিনোদনার্থ ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা তোমারই সম্ভোগের সামগ্রী। সত্য বটে, ইহার অন্তরস্থ সঞ্চিত মধু তুমিই পান করিতেছ এবং ইহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তোমার অন্তরে কবিত্বের এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নিকট গমন কর, তিনি বলিবেন যে তোমার জন্য পুষ্পকে এরূপ পরিচ্ছদে পরিবেষ্টিত ও এরূপ সৌরভে অনুপ্রাণিত করা হয় নাই, এবং তোমার জন্য ইহার অন্তরে মধুভাণ্ডার সংস্থাপিত হয় নাই। তুমি যে সকল ভোগ করিতেছ, সেগুলি কেবল পুষ্পসৃষ্টির অবান্তর ফল মাত্র। সত্য বটে পুষ্প প্রেমের সৃষ্টি, ইহার প্রতি পত্র প্রেমের সঙ্গীতে মুখ-রিত, ইহার সৌরভ প্রেমেরই আহ্বান এবং ইহার অভ্যন্তরস্থ ভাণ্ড যে অমৃতরসে পূর্ণ রহিয়াছে তাহা প্রেমেরই মদিরা। পতঙ্গদিগকে আকর্ষণকরিবার জন্য প্রকৃতি অত্যাশ্চার্য্য কৌশলসহকারে এই সৌন্দর্য্য সৌরভ প্রভৃতির ফাঁদ পাতিয়াছে, এ সকলই স্রষ্টার সৃষ্টির বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন কল্পে "টোপ" (bait) স্বরূপ।

ভ্রমরকে প্রমুগ্ধ করিবার জন্যই পুষ্পে মধু সঞ্চিত রহিয়াছে। এই মধু আহরণ করিতে গিয়া ভ্রমর তাহার পাদদেশকে পুষ্পপরাগে অনুরঞ্জিত করিতেছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ জানেন যে সাধারণতঃ একই বৃক্ষে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। পুষ্প চলচ্ছক্তিরহিত। এই কীটপতঙ্গকে মধুলোভে আকৃষ্ট করিয়া একের পরাগরেণু অপরের গর্ভকোষে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয়। এই উপায়ে গর্ভাধারে বীজের সৃষ্টি ও তাহা হইতে ভাবী বংশের উৎপত্তি ও বংশরক্ষাকার্য্য সাধিত হয়। অনেকস্থলে এরূপও দেখা গিয়া থাকে যে একবৃক্ষে পুংজাতীয় পুষ্প ও অন্য বৃক্ষে স্ত্রীজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, আবার কখনো বা একই বৃন্তে উভয়জাতীয় পুষ্প বিকশিত হয়। যে স্থলে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগরাশির সঞ্চালন কীটপতঙ্গাদির সাহায্যসাপেক্ষ, তথায় পুষ্পকে এইরূপ সৌরভ

ও সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় বটে যে, যে সকল পুষ্প রজনীতে প্রস্ফুটিত হয় তাহারা প্রায় সকলই শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট। এই ব্যাপারের মধ্যেও কি প্রকৃতির গূঢ় রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না? পুষ্পগণ শুভ্রবসন পরিধান করিবার কারণে অনায়াসেই নিশাচর কীট-পতঙ্গাদির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। আবার এমন অসংখ্য কুসুম রহিয়াছে যাহারা পরিচ্ছদের কাঙ্গাল, কিন্তু তাহাদের অন্তস্থল অতুল সৌরভের ভাণ্ডার। উদ্দেশ্য এই যে সুগন্ধে আকৃষ্ট কীট ইহাদের সন্ধান লইবে। পুষ্প মধু দ্বারা কীট-রাজ্যের পরিচর্য্যা করিতেছে, পক্ষান্তরে কীটগণ পুষ্পের ভবিষ্যৎ বংশরক্ষার উপায় বিধান করিতেছে। জীবতত্ত্ববিদের নিকট পুষ্প আর সামান্য পুষ্প নহে, ইহা ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের প্রসবিতা এবং পরের জীবনরক্ষার্থ আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বৃক্ষের বংশরক্ষার জন্যই পুষ্পের জন্ম। এই কার্য্য সম্পন্ন হইবামাত্রই ধূলি হইতে সমুত্থিত পুষ্প আবার ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যায়। আত্মত্যাগই প্রেমের লক্ষণ। এই পুষ্পের জীবনে কি আমরা প্রেমের মৃদুমধুর ধ্বনির আভাস পাইতেছি না?

পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীগণ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। পতঙ্গের ঝিল্লিরব, কোকিলের মধুস্রাবী কণ্ঠধ্বনি এবং চক্রবাকীর হৃদয়স্পর্শী বিরহ-সঙ্গীত, এই সকল মূলত একই অর্থবাচক। পুষ্পো-দগমের পূর্ব্বে বৃক্ষ যেরূপ নবপল্লবে পরিশোভিত হয়, তদ্রূপ কীটপতঙ্গাদি জীবগণও তাহাদের বুলি ফুটিবার পূর্ব্বে নূতন সাজে সজ্জিত হয়। বৃক্ষের ন্যায় এই বেশপরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই সকল জীবজন্তুর মধ্যে নবযৌবনের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতি তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে একদিকে যেরূপ ইহাদিগকে চিত্তাকর্ষক রূপে বিভূষিত করেন, অপর দিকে তেমনি ইহাদিগের কণ্ঠমধ্যে অমিয়ভাণ্ডার সংস্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরকে আসক্তির বন্ধনে সম্বদ্ধ করত অন্তরে আসঙ্গলিপ্সার জ্বলন্ত বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেন। প্রকৃতিরাজ্যের যত স্বাভাবিক সঙ্গীত, সকলের মূলেই এই আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। একটু অনু-ধাবনতার সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, স্ত্রী ও পুংজাতির পরস্পরের মিলন উদ্দেশ্যই প্রকৃতি এই সকল কৌশল বিস্তার করিয়া রাখিয়া-ছেন এবং ইহাই প্রেমের পূর্ব্বরাগ।

প্রকৃত পক্ষেও কি এখানেই ভালবাসার জন্ম? অনেক প্রকার ইতর জন্তুর মধ্যেই মিলনের জন্য বৎ-সরের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় রহিয়াছে। অধি কাংশ স্থলেই মাত্র ঐ নির্দ্দিষ্টকাল স্ত্রী ও পুংজাতীয় জন্তু একত্র বাস করে। ঐ সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আর তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনই সম্পর্ক থাকে না; ভালবাসা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার কোন লক্ষণই ইহাদিগের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের আকর্ষণ দেখা যায় না। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি গতিশীল প্রাণীগণের মধ্যে ইহা বংশরক্ষারই কৌশল।

এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই মিলনের জন্য বৎসরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে কেন? Westermarck তাঁহার রচিত History of Human marriage গ্রন্থে দেখা-ইয়াছেন যে বাদুড়ের মিলনকাল জানুয়ারি ও ফেব্রু-য়ারি মাস, লবণহ্রদের পূর্ব্বদিকস্থ মরুভূমির জঙ্গলী উষ্ট্রের মিলনকাল জানুয়ারির মধ্য হইতে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত, তিব্বত দেশীয় চামরী ও নরওয়ের বল্গাহরিণের সেপ্টেম্বর মাস, নেকড়ে বাঘের ডিসে-ম্বরের শেষ ভাগ হইতে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইত্যাদি। অধিকাংশ পক্ষী ও সরীসৃপের মিলনকাল বসন্ত ঋতু, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

বিভিন্ন প্রকার জন্তুর জন্য দেশবিশেষে এই বিভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট করিবার মধ্যে প্রকৃতির যে এক নিগূঢ় অভিসন্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। Westermarck বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রাণীরই নবপ্রসূত শিশুর জীবন অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা ও আহার্য্য সামগ্রীর সুলভতার উপর নির্ভর করে এবং সেই কারণে প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই মিলনের এরূপ সময়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহাতে নবজাত শিশু সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল সময়ে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। ইহা হইতে কি এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন হইবে না যে সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তুর মধ্যেই বংশরক্ষাই এই স্ত্রীপুরুষের মিল-নের মুখ্য উদ্দেশ্য?

(ক্রমশঃ)

নবযুগ।

বিভাস

(শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ওই শোন বাজে কোথা
সুললিত সুরে
মধুর মুরলীধ্বনি
কোন্ সুরপুরে !
আজি আসিছেন কেবা
দিব্য স্বর্ণরথে,
আলোকের ছটামাঝে
দিগ্বলয় পথে।
যাঁরে দেখি যোড়করে
সুরবালা সবে
সারি সারি গান গাহি
বসে গেল স্তবে।

হৃদয়ের যমুনায়
উঠেছে তরঙ্গ,
চারিদিকে মুখরিত
ভাবের বিহঙ্গ।
প্রলয়ের মহানিশা
অন্ধকার পরে—
নব যুগ ল'য়ে আসে
কে গো চরাচরে ?

এতকালে ঘুচিলরে
প্রলয়ের গোল—
আজি দেখা দিল বুঝি
ফাগুনের দোল।
কিবা সে মাধুরী আভা
যাঁরে দেখি ফুটে
বসন্তের কুসুমেরা—
নব উৎস ছুটে।
হাতে যাঁর বরমাল্য
দেবতা সে কোন্ ?—
সুভগ সুন্দর যিনি
ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।

ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে গ্যয়টের মতামত।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ধৰ্ম্মের তিনটি সোপান।

অনুকূল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে এরূপ সুস্থ শিশুরা তাহাদের সঙ্গে পৃথিবীতে অনেক জিনিস লইয়া আসে। ইহকাল ও পরকালের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক প্রকৃতিদেবী প্রত্যেককেই তাহা প্রদান করিয়াছেন। এইটি পরিপুষ্ট করিয়া তোলাই শিশুর ও গুরুর কর্ত্তব্য কৰ্ম্ম; এবং অনেক সময়েই উহাকে নিজের হাতে ছাড়িয়া দিলে, উহা আরও ভাল করিয়া পরিপুষ্ট হয়। কেবল একটা জিনিস এ সংসারে কেহ সঙ্গে করিয়া আনে না, এবং সেই জিনিসের উপর আর সব জিনিসই নির্ভর করে; সেই জিনিস যাহার দ্বারা এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ প্রত্যেক মনুষ্যই প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠে। এই জিনিসটা—পূজ্যবুদ্ধি বা ভক্তি। ইহার তিনটি প্রকার-ভেদ বা তিনটি সোপান। এই তিনটি ভাব, উহাদের সাংকেতিক ভঙ্গীসমেত, আমরা আমাদিগের ছাত্রদিগের মনে রোপণ করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। প্রথম প্রকার ভেদটি :—যাহা আমাদের উপরে অবস্থিত তাহার প্রতি ভক্তি; ইহার সহিত যে ভঙ্গীটি সংযুক্ত তাহা এই :—বক্ষের উপর দুই বাহু আড়াআড়িভাবে স্থাপন করিয়া আনন্দিত মনে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা। এই ভঙ্গিটি আমাদের ছাত্রদিগকে আমরা শিক্ষা দিয়া থাকি, ইহার দ্বারা, আমরা তাহাদের দিয়া প্রকারান্তরে স্বীকার করাইয়া লইতে চাহি যে, ঊৰ্দ্ধে একজন ঈশ্বর আছেন যিনি পিতামাতার আকারে, শিক্ষকের আকারে, গুরুজনের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় আদর্শটি :—যাহা আমাদের নীচে অবস্থিত তাহার প্রতি ভক্তি। এই আদর্শের সহিত সংযুক্ত ভঙ্গীটি এই—পৃষ্ঠের পশ্চাদ্‌ভাগে দুই হস্ত সম্মিলিত করিয়া প্রসন্নভাবে ও প্রফুল্লচিত্তে ধরণীর দিকে দৃষ্টিপাত করা। কেননা ধরণীই আমাদিগকে জীবিকার উপায় সকল বিধান করেন এবং আমাদের অসংখ্য সুখের আকর; অবশ্য, যদিও তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম দুঃখকষ্টও দিয়া থাকেন। যখন কোন ব্যক্তি নিজের দোষে বা বিনা দোষে

শরীরে আঘাত প্রাপ্ত হয়; কিংবা যখন অন্য কোন ব্যক্তি, ইচ্ছা করিয়াই হউক বা দৈবযোগেই হউক তাহার কোন ক্ষতি করে; যখন কোন অনিষ্টকর পার্থিব শক্তি বা প্রভাব তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে; তখন সেই তরুণ ব্যক্তি এই সকল বিষয় সম্বন্ধে যেন গম্ভীরভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখে। এবং এই কথাটা সে যেন নিশ্চয় করিয়া জানে যে, যতদিন সে বাঁচিবে, এই সকল বিপদ হইতে সে কখনই একেবারে মুক্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু যখনই জানা যাইবে, ইহা হইতে সে নিশ্চিতরূপে একটা শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তখনই আমাদের ছাত্রকে এই মনোভাব হইতে মুক্তিদান করিতে হইবে; তখন তাহাকে মানুষের মত সাহসে বুক বাঁধিয়া সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া তাহাদের সংঘর্ষে আসিতে বলিব। তখন সে সাহস পূর্ব্বক আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইবে, কিন্তু স্বার্থপরের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে না। কেবল সাথীদের সহিত যুঝাযুঝি করিয়াই সেই তরুণ যুবা এই দারুণ সংসারের সম্মুখীন হইতে শিখিবে। আমাদের তৃতীয় ভঙ্গীটির ধরণটি এই:—সোজা খাড়া হইয়া সম্মুখদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আর সে একাকী দাঁড়াইবে না, পরন্তু এক শৃঙ্খলের ন্যায় অন্যের সহিত একসঙ্গে সারিবন্দি হইয়া দাঁড়াইবে।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, এই সংসারের অধিকাংশ লোকের মনের ভাবগতি কেন এত নীচ ধরণে ও নিরানন্দে পূর্ণ। তাহাদের কু-বিচার ও কু-ভাষণ স্বভাবতই ভক্তির অভাব হইতেই প্রসূত হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ মনোভাবের হাতে আত্মসর্পণ করে, সংসারকে সে অবজ্ঞা করিতে শিখে, প্রতিবেশীকে ভালবাসার পরিবর্ত্তে ঘৃণা করিতে শিখে, এমন কি অবশেষে ঈশ্বরের প্রতি উদাসীন হইতেও শিখে; এবং যথোচিত আত্মসম্মানের যে ভাব, সুস্থ আত্ম-প্রতিপাদনের যে ভাব, যাহা ব্যতীত মানুষ পৃথিবীতে সফলতার সহিত কাজ করিতে পারে না—সেই ভাবটি অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যে বিলীন হইয়া যায় * * * আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, এই ভক্তিভাবকে আমরা এই সংসারে আমাদের সঙ্গে করিয়া আনি নাই; ইহা শিক্ষা ও সাধনার ফল।

অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তি ভয়কে এই পৃথিবীতে সঙ্গে করিয়া আনে এবং তাহা স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু ভক্তির ভাব সেরূপ নহে। আদিকাল হইতে আমরা দেখিতে পাই, মহাশক্তিমান প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সমক্ষে,এবং অন্যান্য অজ্ঞাত-কারণ শক্তিসমূহ ও দুর্লক্ষণাক্রান্ত প্রভাবাদির সমক্ষে, নিম্নতম বন্যজাতীয় লোকের মনে ভয়ের উদয় হয়। কিন্তু এই ভয়, ভক্তির ভাব নহে। কোন অজ্ঞাত পুরুষকে কিংবা স্বর্গ নরককে আমরা ভয় করি; যে ব্যক্তি বলিষ্ঠ, সে এই ভাবটিকে অভিভূত করিতে,—অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে; যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, সে উহার নিকট হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। উভয়েই এই ভয়কে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভয় হইতে মুক্ত হইতে চাহে এবং কিয়ৎকালের জন্যও ভয়কে দূরে অপসারিত করিতে পারিলে আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান মনে করে। তখন তাহাদের স্বভাব কতকটা মুক্ত ও স্বাধীন হইয়া পুনর্ব্বার আত্মপ্রতিপাদনের অবকাশ পায়। স্বভাবাধীন মানুষ, তাহার জীবনে শত সহস্রবার এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করে; সে ভয়ের সহিত যুঝাযুঝি করিয়া ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে; আবার তাড়িত হইয়া পুনর্ব্বার ভয়ের মধ্যে গিয়া পড়ে; শেষে, পূর্ব্বে যেখানে ছিল সেইখানেই থাকিয়া যায়।

ভয় করাটা সহজ কিন্তু কষ্টদায়ক; ভক্তি করাটা কঠিন কিন্তু সান্ত্বনাপূর্ণ। মানুষ ভক্তি করিবে বলিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক মন স্থির করে; অথবা আপনা হইতে তাহা করে না। তাহার চিত্ত-প্রকৃতির মধ্যে একটা উচ্চতর বোধশক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক; এই বোধটি কতিপয় দেবানুগৃহীত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে স্বতই পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; আর, এই জন্যই তাঁহারা সকল যুগেই সাধু বলিয়া, সিদ্ধপুরুষ বলিয়া, এমন কি দেবতা বলিয়া গৃহীত হন। সমস্ত সত্যধর্ম্মের ফলবত্তা ও কার্য্যশক্তি ইহার মধ্যেই অধিষ্ঠিত। আর, এই সত্যধর্ম্মগুলির মধ্যে কেবল তিনটি, আরাধনার বস্তু অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

যাহা ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ কোন ধর্ম্মই আমাদের নিকট শ্রদ্ধেয় নহে। উচ্চের প্রতি ভক্তির উপর যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত—অধিকাংশ সাকারবাদী অ-খৃষ্ট ধর্ম্মগুলি তাহার অন্তর্ভূত। তাহারাও

নীচ ধরণের দাসোচিত ভয় হইতে মুক্ত। সমানের প্রতি ভক্তি, যেটি ধর্ম্মের দ্বিতীয় আদর্শ, তাহাকে আমরা ধর্ম্মের তত্বজ্ঞানীর আদর্শ বলিব। কেননা তত্বজ্ঞানী, যাহা উচ্চে অবস্থিত তাহাকে আপনার সমভূমিতে নামাইয়া আনেন এবং যাহা নিম্নে অবস্থিত তাহাকে উপরে তুলিতে চেষ্টা করেন। এবং এই মধ্য পথে অবস্থিত বলিয়াই তিনি মুনি ঋষি নামের যোগ্য হইয়াছেন। অতএব স্বকীয় সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত ও বিশ্বমানবের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ, অবশ্যম্ভাবী ও আগন্তুক সমস্ত পার্থিব পরিবেষ্টনের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধটি যে পরিমাণে তিনি উপলব্ধি করেন সেই পরিমাণে তিনি, জাগতিক হিসাবে, সত্যের মধ্যে অবস্থিতি করেন। কিন্তু এখন যে তৃতীয় আদর্শের কথা বলিতে যাইতেছি তাহা নীচের প্রতি ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাই খৃষ্টধর্ম্ম। কেননা খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যেই এই ভাবটির আধিপত্য সবচেয়ে বেশী। ভক্তি-সোপানের যতটা উচ্চে বিশ্বমানব উঠিতে পারে, ইহা তাহারই উচ্চতম ধাপ। কারণ, মনে করিয়া দেখ, কোন ধর্ম্মের মধ্যে কতটা অসাধারণ নৈতিক শক্তি থাকা আবশ্যক, যাহাতে করিয়া উচ্চতর লোকে যাইবার আশায় ইহসংসারকে দৃষ্টির অন্তরালে নিঃক্ষেপ না করিয়া, দৈন্য দারিদ্র্যকে, অবজ্ঞা অপমানকে, অপযশ তাচ্ছিল্যকে, দুঃখ যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে পর্য্যন্ত দেবোচিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে; এমন কি, পাপ ও অপরাধরূপ বাধাকেও সাধন-পথের উন্নতির উপায়-রূপে রূপান্তরিত করিয়া লইতে পারে। অবশ্য, এই ভাবটির নিদর্শন সকল যুগেই পাওয়া যায়; কিন্তু নিদর্শন ও গম্যস্থান কখনই এক নহে। একবার এই উচ্চতায় উপনীত হইলে বিশ্বমানব আবার কখন নিম্নতর মধ্যে নামিতে পারে না। তাই আমরা এইরূপ বলিতে পারি,—সত্যধর্ম্ম একবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলে আর কখনই তিরোহিত হইতে পারে না; অথবা একবার বিশ্বমানব-মধ্যে দেবতার আকারে আবির্ভূত হইয়া তাহার পর, যেন উহার কোনও অস্তিত্বই ছিল না এই ভাবে আবার প্রস্থান করিতে পারে না।

এই তিন আদর্শ মিলিয়া সত্যধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন এইরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তি এক্ষণে এই তিন আদর্শই অনুসরণ করেন। এই তিন মূর্ত্তিমান আদর্শ হইতে সকল প্রকার ভক্তির পূর্ণতাস্বরূপ আত্মশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। আবার এই আত্মশ্রদ্ধা হইতে উক্ত ভক্তি পুষ্টিলাভ করে। এইরূপে মানুষ, তাহার পক্ষে যতটা সম্ভব, সর্ব্বোচ্চ স্থানে উপনীত হয়, এবং আপনার সম্বন্ধে এইরূপ মনে করিতে পারে, —ঈশ্বর ও প্রকৃতি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার শীর্ষস্থানীয়; এমন কি, মানুষ অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার দ্বারা সাধারণ ভূমিতলে অবনীত না হইয়াও সুপ্রসন্নচিত্তে, এই উচ্চতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে।

এই সব কথা কাহারো নিকট নূতন ঠেকিতে পারে, কিন্তু উহা আসলে খৃষ্টান-চর্চ্চের মতবিশ্বাসের তালিকাভুক্ত। কারণ, প্রথমটি সাকারবাদী সকল জাতিরই আদর্শ। দ্বিতীয়টি খৃষ্টীয় আদর্শ; যাহারা দুঃখকষ্টের সহিত যুঝাযুঝি করিতেছে, এবং যুঝাযুঝি করিয়া জয়লাভ করিতেছে ইহা তাহাদেরই আদর্শ। তৃতীয় আদর্শটি,—যাঁহারা জ্ঞানে ও মঙ্গলভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানে উপনীত হইয়াছেন সেই সিদ্ধ পুরুষদিগের আধ্যাত্মিক যোগের বিষয় মানুষকে শিক্ষা দেয়।

একেশ্বরবাদ—ধর্ম্ম তত্ত্ব।

লোকে বলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বের যুক্তিটা তর্কের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে; হউক তাহা। কিন্তু যাহা বুদ্ধির দ্বারা সপ্রমাণ হয় না, হৃদয় তাহা সাহসপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়। বিদ্যুৎ-বজ্রঝঞ্ঝার মধ্যে সর্ব্বশক্তিমানের নৈকট্য উপলব্ধি করিতে কে আমাদিগকে নিবারণ করিতে পারে? এবং পুষ্পের সৌরভে ও মলয়ানিলের মৃদুগুঞ্জনে,—আমাদের সহিত যাঁহার নিত্য অধ্যাত্ম-যোগ,—সেই পরমপুরুষের প্রেমময় সান্নিধ্য অনুভব করিতে বাধা দেয় কাহার সাধ্য?

আকস্মিক ঘটনা।

মানুষের বৃহৎ কার্য্যাদির অনুষ্ঠানে মানুষ যখন গর্ব্বভরে আপনাকে বড় উচ্চে উঠাইয়া দেয়, ঠিক সেই সময়ে যাহার শক্তি প্রকটিত হইয়া থাকে, লোকে তাহাকে আকস্মিক ঘটনা বলে; ইহা আর

কিছুই নহে,—ঈশ্বর স্বকীয় অপরিজ্ঞেয় উপায়ে স্বীয় সর্ব্বশক্তির দ্বারা আমাদের ক্ষুদ্র ভূলোককে আক্রমণ করেন, এবং আমাদের নিকট যাহা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র বলিয়া প্রতীতি হয় তিনি সেই আগন্তুক ব্যাপারের দ্বারা আমাদের বৃহৎ মৎলব-গুলাকে বিচলিত করিয়া তুলেন এবং উহা তাঁহার নিকট সর্ব্বালিঙ্গনকারী বিরাট শৃঙ্খলের একটা অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বর্ষশেষের প্রার্থনা।

(শ্রীমতী লীলা দেবী)

দেখা দাও দেখা দাও ত্রাণ কর মোরে।
রেখো না রেখো না নাথ তোমা হতে দূরে॥
ওই যে ঘনায়ে আসে নিবিড় তিমির।
কেহ নাহি মোর বন্ধু অরণ্যে গভীর॥
চারিদিকে ঘিরে আছে শত শত অরি।
কোথা তুমি হে দয়াল দীনবন্ধু হরি॥
তুমি বিনা কে ঘুচাবে এ বন্ধন রাশি।
দরশন দাও নাথ—মুক্ত কর আসি॥

হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়।

মিশনরিদিগের ছেলেধরা রোগ।

ভগবান যে সময়ে দেবেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের "ছেলেধরা" রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রথম প্রথম বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রভৃতি পুরুষেরাই মিশনরিদিগের জালে ধরা পড়িতেছিল। কিন্তু ক্রমে মিশনরিগণ তাঁহাদের জাল ফেলিবার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন,—তাঁহারা ক্রমে হিন্দুপরিবারের মহিলাদিগকেও আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যদি আলোচনা ও তর্কবিতর্কের দ্বারা কাহাকেও খৃষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়া স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, তাহাতে আপত্তি করিবার বিশেষ কোনই কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা সাধারণত সে পথ অবলম্বন না করিয়া কোন গতিকে মস্তকে জর্ডন নদীর জল ছিটাইয়া দীক্ষার্থীকে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইবারই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ডফপ্রমুখ খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের জাগ্রত হইয়া উঠিবার ইহাই মুখ্য কারণ ছিল।

সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ব্যতীত হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার আর কেহই ছিলেন না। তদানীন্তন হিন্দুসমাজ এতদূর নির্জীব অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন যে মিশনরিদিগের "ছেলেধরা" রোগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিবার প্রয়োজনই হিন্দুসমাজ অনুভব করিতে পারেন নাই। হিন্দুসমাজ আত্মনির্ভর হারাইয়া নিজের শক্তি ও ক্ষমতার পরিমাণ বুঝিতে পারেন নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী ব্রাহ্মসমাজ দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মিশনরিদিগের প্রতিবাদকার্য্য স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রপ্রমুখ ব্রাহ্মসমাজ মিশনরিদিগের কার্য্যে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডফসাহেব যখন তাঁহার পুস্তকে হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজকে গালি দিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তাহার বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালিত করিয়া তাঁহাকে একপ্রকার নিরস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত করিয়া তাহার ছাত্রদিগের সাহায্যে হিন্দুসমাজকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন এবং বাল্যকালাবধিই যাহাতে হিন্দুবালকদিগের মনে স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্ম্মে আস্থা দৃঢ়প্রোথিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইলেন। দুঃখের বিষয় হিন্দুসমাজ তাহা বুঝিলেন না। এত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও নবোৎসাহে উৎসাহবান দেবেন্দ্রনাথ পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি বেদবেদান্তের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য বেদাধ্যয়নার্থ কাশীধামে ছাত্র প্রেরণ করিলেন, যাহাতে সেই ছাত্রের দ্বারা বেদবেদান্তের মর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচারিত হইতে পারে।

এইরূপ কতক বা প্রত্যক্ষে এবং কতক বা পরোক্ষে, খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সংঘর্ষ চলিতেছিল, ইতিমধ্যে মিশনরিদিগের হিন্দুদিগকে খৃষ্টান করিবার আগ্রহ কিছু বেশীমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। এই সময়ে তাঁহারা হিন্দু অন্ত-

পরিবারের দু একটী বিধবা রমণীকে নানা প্রলোভনের সাহায্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপরিগ্রহে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার ফলে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে একটী ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মিশনরিদিগের কার্য্যস্রোত প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

হিন্দুমহিলার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসে একদিন প্রাতঃকালে দেবেন্দ্রনাথ সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় কার ঠাকুর কোম্পানির হাউসের রাজেন্দ্রনাথ সরকার নামক এক সরকার তাঁহার নিকটে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। রাজেন্দ্রের স্ত্রী এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্ত্রী, দুইজনে একখানি গাড়ীতে চড়িয়া এক নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে উমেশচন্দ্র আসিয়া নিজের স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক গাড়ী হইতে নামাইয়া সস্ত্রীক খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত ডফসাহেবের বাটীতে গমন করে। রাজেন্দ্রের পিতা অনেক চেষ্টা করিয়াও উমেশচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীকে ডফসাহেবের বাটী হইতে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হন নাই। তখন তিনি এই বিষয়ে তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টে নালিস উপস্থিত করেন। সুপ্রীম কোর্টে রাজেন্দ্রের পিতা পরাজিত হন। পরাজিত হইয়া তিনি ডফসাহেবের নিকট অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে তিনি পুনরায় এ বিষয় আদালতে বিচার প্রার্থনা করিবেন এবং সেই বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যেন উমেশচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা না হয়। ডফসাহেব তাঁহার অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাত না করিয়া সস্ত্রীক উমেশচন্দ্রকে যথাসত্বর খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের হস্তে ভারতের খৃষ্টীয় মিশন যে আঘাত পাইয়াছিলেন, সে আঘাতের ব্যথা হইতে আজও উহা মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। এই সূত্রে দেবেন্দ্রনাথ যে সকল কার্য্যের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে একদিকে খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের অপ্রতিহত প্রতাপ খর্ব্ব হইয়া গেল, অপরদিকে তাহা ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্মসভার দুইটী দলের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার একটী সুন্দর উপায় হইয়া উঠিল।

আদিব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল গৃহে দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা।

আমরা আদিব্রাহ্মসমাজের পরলোকগত গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট শুনিয়াছি যে আদিব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল গৃহে মিশনরিদিগের এইরূপ কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ একটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই সভায় প্রায় দুই তিন শত লোক উপস্থিত ছিলেন। সেখানে দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রতিবাদ করিবার জন্য খৃষ্টীয় মিশনরিগণ প্রথমাবধিই সম্মুখস্থ আসনগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিবার পর তাঁহারা নাকি তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস না করিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় আসন পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ।

এই বক্তৃতা ভিন্ন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে এক তেজঃপূর্ণ প্রবন্ধ লিখাইয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু লিখিলেন—"অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না? আর কত কাল আমরা অনুৎসাহনিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এদেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। * * * অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনরিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রিদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়।

খৃষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্রতরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে, আর আমাদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্ত একটীও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন্ কর্ম্ম না সিদ্ধ হয়?” অক্ষয় বাবুর লেখা হইতে আমরা একটী কথা বুঝিতেছি যে সে সময়ে মিশনরিগণ বালকদিগকে কি এক কুহকে বিমুগ্ধ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতেন। তাই তিনি স্বদেশবাসীদিগকে অনুরোধ করিলেন যে “যাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর।” আরও অনুমান হয় যে এই সময়ে হিন্দু ভদ্রলোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য খৃষ্টীয় সমাজ আড়েহাতে লাগিয়াছিল।

ব্রাহ্মসভা ও ধর্ম্মসভার ঐক্যসাধন।

অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পর দেবেন্দ্রনাথ “প্রতিদিন গাড়ী করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, হিন্দু সন্তানদিগের যাহাতে আর পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যাইতে না হয় এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, ওদিকে রাম গোপাল ঘোষ; দেবেন্দ্রনাথ সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন।” সতীদাহ সম্বন্ধে আন্দোলন অবধি ধর্ম্মসভা ও ব্রহ্মসভার মধ্যে যে দলাদলি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, প্রস্তাবিত বিদ্যালয় উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথের প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের দলপতিদিগের নিকটে যাতায়াত করিবার ফলে “ধর্ম্মসভা ও ব্রহ্মসভার যে দলাদলি এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল সকলি ভাঙ্গিয়া গেল।” খৃষ্টানেরা যাহাতে আর দেশের সন্তানগণকে খৃষ্টান করিতে না পারে সকলেই তদ্বিষয়ে একহৃদয় হইয়া যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রকাশ্য সভা ও হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় সংস্থাপন।

দেবেন্দ্রনাথের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে অবশেষে এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতাস্থ সিমুলিয়াতে (সিমলা) ১৭৬৭ শকের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবারে এক প্রকাশ্য সভা আহূত হইয়া তথায় অক্ষয়কুমারের উপরোক্ত প্রবন্ধ পঠিত হইল। বিদ্যালয় সংস্থাপনে দেশের প্রায় সমুদয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছিল। উক্ত সভায় কলিকাতাস্থ ধনী, নির্ধন, মধ্যবর্ত্তী, প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। এই সভায় স্থির হইল যে, হিন্দুহিতার্থী-বিদ্যালয় নামে এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইবেক এবং পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে ছেলেরা যেমন বিনা বেতনে পড়িতে পায়, এই বিদ্যালয়েও তেমনি ছেলেরা বিনা বেতনে পড়িতে পাইবে। এই বিদ্যালয়ের কর্ম্ম সম্পাদন জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব (ছাতু বাবু ও লাটু বাবু), ব্রজনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরত্ন হালদার, বীরনৃসিংহ মল্লিক (বীরু মল্লিক), রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল সিংহ, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কাশীনাথ বসু, হরিমোহন সেন, ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ মিত্র অধ্যক্ষ হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলেন। আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব ভ্রাতৃদ্বয় ধনাধ্যক্ষ হইলেন।

সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পক্ষপাতশূন্য হইয়া এবিষয়ের সুসিদ্ধি জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়াতেই দেবেন্দ্রনাথ সফলকাম হইয়াছিলেন। এই পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য মাসিক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং এককালীন দান ও মাসিক দাতব্য এই উভয় উপায় দ্বারা যাহাতে মাসিক উক্ত সহস্র টাকা আয় হইতে পারে এমন ধন সংগৃহীত হইলেই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করা স্থির হইল। সভার দিনেই

চল্লিশ হাজার টাকা মূলধন এবং চারিশত টাকা মাসিক দাতব্য স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব দশসহস্র টাকা দান এবং পঞ্চাশ টাকা মাসিক দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। রাজা সত্যশরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা এবং রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে এরূপ উৎসাহস্রোত বহিয়াছিল যে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অনেক টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ঐ বৎসরের আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে আমরা লিখিত দেখি—"আমাদিগের আশা অনেক ভাগে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই যে উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সমুদয় প্রয়োজনীয় ধন স্বাক্ষরিত হয় নাই, এনিমিত্ত খিন্ন নহি; এই অর্দ্ধ মাসের মধ্যে যে মূলধন চল্লিশ সহস্র টাকা এবং মাসিক দাতব্য চারি শত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের পরম লাভ। এদেশে একাল পর্য্যন্ত কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে কোন্ সাধারণ বিষয়ে এত শীঘ্র এত ধন স্বাক্ষরিত হইয়াছে? অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত এতদ্রূপ কোন্ সাধারণ বিষয়ে স্বেচ্ছাধীন শতমুদ্রা দান করিয়াছেন?"

আমরা দেখিতেছি যে বর্ত্তমানে ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতি যে অভাব অনুভব করিয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন, বহুপূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ আদিব্রাহ্মসমাজ সেই অভাব অনুভব করিয়া হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় সংস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সেই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতবর ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং পরিদর্শক ছিলেন মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু। বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন হরিমোহন সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুঃখের বিষয়, এই অনুপম উৎসাহের ফলও দৈবদুর্ব্বিপাকে চিরকালের জন্য কালের সাগরে বিলীন হইয়া গেল। বিদ্যালয়ের জন্য সংগৃহীত অর্থ ধনাধ্যক্ষ আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল। দৈবপ্রতিকূলতায় তাঁহারা দেউলিয়া হওয়াতে তাঁহাদের অন্যান্য বিষয়সম্পত্তির সহিত ঐ গচ্ছিত অর্থও নষ্ট হইয়া গেল। ইহার পরেও তাঁহাদের পরিবারের নিকট হইতে কিছুকাল বিদ্যালয় সাহায্য পাইয়া আসিয়াছিল। প্রতিষ্ঠা অবধি এই সাহায্য পাওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যালয় চলিয়া পরিশেষে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ "জাতীয় ধর্ম্মের পরিরক্ষক"।

বিদ্যালয় উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের এই চেষ্টার ফলে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে ছেলেরা ইংরাজী পড়িলেই খৃষ্টান হইয়া যাইবে বলিয়া লোকদিগের যে একটী ধারণা ছিল, এখন অবধি সে ধারণা দূর হইয়া গেল। এখন অবধি "খৃষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল—একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।" মিশনরিগণ নিজেরা এই বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় মিশনরিগণের প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের এই উপদেশ ছিল যে তাঁহারা জনসাধারণকে তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। কিন্তু তাঁহারা সে উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া "ছেলেধরা" রোগগ্রস্ত হইয়া যত অপরিণতবুদ্ধি ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগকে ধরিয়া ধরিয়া খৃষ্টান করিতে এবং হিন্দুসমাজের শান্তি বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন হরিসভাও ছিল না এবং ধর্ম্মসভাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এ অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ যে মিশনরিদের কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কিছুমাত্র দোষ দেওয়া যায় না। বরঞ্চ, তিনি এবিষয়ে জনহিতৈষী ও প্রকৃত হিন্দুসমাজসংস্কারকের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছিলেন বলিতে হয়। রামমোহন রায় ডফসাহেবকে বিদ্যালয় খুলিবার জন্য নিজের বিদ্যালয় হইতে ছাত্র প্রদান করিয়া এবং নিজের বিদ্যালয়ে বাইবেল পড়াইতে দিয়া উপকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ডফসাহেব ব্রাহ্মসমাজের ও হিন্দুসমাজের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া অন্যায় করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যের ফলে দেশের ছেলেদের খৃষ্টান হওয়া বন্ধ হওয়ায় ডফসাহেবের সেই অন্যায় কার্য্যে প্রায়শ্চিত্ত হইল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার এই পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে তদানীন্তন প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজপতি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে "জাতীয় ধর্ম্মের পরিরক্ষক" উপাধিতে বিভূষিত করিয়া তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজেরও গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

উত্থান ও জাগরণ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

(যে সকল ঘটনার ফলে আমরা বুঝিব যে মানবজাতির প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি লাভ হইবার সম্ভাবনা এবং যে সকল ঘটনার মধ্যে আমরা জগতের প্রকৃত জাগরণের লক্ষণ অনুভব করিব, এই প্রকরণে সেই সকল ঘটনা আমাদের মন্তব্যসহ ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিব।)

মানুষের সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনাকে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিলে বুঝিবারও সুবিধা হয় এবং বুঝাইবারও সুবিধা হয়। মানুষের শরীর যদি অসুস্থ থাকে তবে তাহার আর কিছুই ভাল লাগে না। বিজ্ঞানের শত উন্নতি হউক, ধর্ম্মের সহস্র ভাল কথা উপস্থিত হউক, সকলই অসুস্থ শরীরের নিকট ভস্মাহুতির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তাই মানুষ যে সকল ঘটনা অবলম্বনে উন্নতির অভিমুখে দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং মানবসিংহ মোহনিদ্রাকে পদদলিত করিয়া মহাজাগরণকে আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিতেছে, আমরাও সুবিধা হইলে সেই সকল ঘটনাকে ঐ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিব। কিন্তু মানবসমাজের কার্য্য সকল এরূপ জটিল যে সকল সময়ে এভাবে বিভক্ত করিবার সুবিধা না-ও হইতে পারে।

কুষ্ঠচিকিৎসায় চালমুগরা—গত মাসে মানবের শরীরের উন্নতিসাধক যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কুষ্ঠ সম্বন্ধে চালমুগরা তেলের ব্যবহার সম্বন্ধীয় সার লিওনার্ড্ রজার্স মহোদয়ের অনুসন্ধান সমূহকে আমরা সর্ব্বপ্রথম স্থান দিতে চাহি। যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চালমুগরার কোনপ্রকার ব্যবহারবিধির উল্লেখ দেখা যায় না, থাকিলেও স্পষ্টভাবে নাই। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে এবং কবিরাজদিগের মধ্যে সাধারণত চর্ম্মরোগের জন্য চালমুগরার তৈল মালিস করিবার প্রথা বহুদিন যাবৎ প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানে আজ কিছুকাল অবধি কুষ্ঠরোগীকে ঐ তেল মালিস ও যথাপরিমাণে পান করিতে দিয়া উহার উপকারিতা পরীক্ষা করা হইতেছিল। ফলে দেখাও গিয়াছে যে ঐ তেলে কুষ্ঠব্যাধি সম্বন্ধে অনেক সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু তেলের একটী প্রধান দোষ এই যে উহা সেবনে বমনেচ্ছা প্রবল হইয়া রোগীর অনিষ্ট করে, অন্তত উপকারের মাত্রা অনেক কমিয়া যায়। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ সার লিওনার্ড রজার্স সাহেব এই বমনেচ্ছা প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য এই তেল হইতে এমন একটী পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা সেবন করিলে বমনেচ্ছা হইবে না, বরঞ্চ তেল সেবনে যে সময়ে উপকার হয়, এই পদার্থ সেবনে তদপেক্ষা অনেক শীঘ্র উপকার হইবে। এই পদার্থের সাহায্যে তিনি অনেক পরীক্ষা করিতেছেন। আমরা তাঁহার পরীক্ষার ফলের প্রতীক্ষায় রহিলাম। সুবিধা হইলে এই বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। যদি রজার্স সাহেবের পরীক্ষা সফল হয়, তবে তিনি সমস্ত জগতের পূজার পাত্র হইবেন এবং সমস্ত ইংরাজজাতি তাঁহার নামে গৌরবান্বিত হইবে।

চুক্তিবদ্ধ কুলির মুক্তি—বহুকাল যাবৎ ভারতে দাসত্বপ্রথার পরিবর্ত্তে চুক্তিবদ্ধ কুলির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বলিতে গেলে এই প্রথার ফলে অন্তত নির্দ্দিষ্ট কিয়ৎকালের জন্য ভারতীয় কুলিগণ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইত। আসাম অঞ্চলের চা-বাগানে এই সকল চুক্তিবদ্ধ কুলিদিগের উপর যেরূপ নির্য্যাতন ও অত্যাচার হইত, আজ তাহা ইতিহাসের কথা হইলেও স্মরণ করিলেই অন্তর কাঁপিয়া উঠে। অনেক আন্দোলনের ফলে অল্পকাল হইল আসাম সম্বন্ধে এই প্রথার কাঠিন্য কতকটা লঘু করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবহির্ভূত উপনিবেশ সমূহে এই প্রথা অব্যাহতরূপে চলিতেছিল। কিন্তু আজ মহাত্মা লর্ড হার্ডিঞ্জের মহানুভবতার ফলে এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বিশেষ চেষ্টার ফলে চুক্তিবদ্ধ কুলিপ্রথা রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই কার্য্যের দ্বারা একদিকে মানবের স্বাধীনতা বিঘোষিত হইয়াছে, অপরদিকে মানুষ যে চিরকাল মানুষের স্বাধীনতাহরণ অকাতরে সহ্য করিতে পারে না, এই চিরন্তন সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্প বিস্তার—এক সময়ে ভারতবর্ষ শিল্পরাজ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছিল, এ কথা বলিয়া হাহুতাশ করিবার আমাদের আর অবসর নাই। আমরা বড়ই কঠোর পরীক্ষার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা যদি জাতিহিসাবে আত্মরক্ষা

করিতে চাহি, তবে যে উপায়ে হউক আমাদিগের শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিতেই হইবে। কথায় কথায় পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না—আমাদিগকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিক্ষা করিতেই হইবে। অবশ্য আমরা যে পরাধীন জাতি আমাদের উদ্যম প্রভৃতির একটা সীমা আছে তাহাও ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু সেই পরাধীনতার মধ্যেও মহানুভব ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বাণিজ্যাদি বিষয়ক যেটুকু স্বাধীনতা দিয়াছেন, সে স্বাধীনতাটুকু যেন অপব্যবহার না করি। মহাত্মা টাটা আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন, সার রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এই শিক্ষারই জীবন্ত সাক্ষ্য। বলা বাহুল্য যে সকলে টাটা হইতে পারেন না, সকলে সার রাজেন্দ্রনাথও হইতে পারেন না। আমরা পরাধীন জাতি বলিয়াই আজ গবর্ণমেণ্টেও আমাদের জীবন রক্ষার অন্যতর প্রধান উপায় বলিয়া উপলব্ধি করিয়া শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মনোযোগী হইয়াছেন। বিশেষত এই ইউরোপের মহাসমর হাতেকলমে বুঝাইয়া দিয়াছে যে প্রত্যেক দেশের ভিতর হইতে শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি না করিলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই পক্ষে অমঙ্গল। আমাদের কেবল এইটুকু দুঃখ হয় যে ভারতের রাজা ও প্রজা যদি এই কথা পূর্ব্বাবধি বুঝিয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে দেশের বর্ত্তমান অশান্তির অনেক লাঘব হইত নিঃসন্দেহ। আজ অনেক বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভারতবাসীর স্বাধীনজীবিকার কথা সর্ব্বপ্রথম উত্থাপিত করিয়াছিল—আজ তাহা ফলবান হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিতেছি। স্বদেশবাসীগণের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের এমন স্বর্ণসুযোগ যেন পরিত্যাগ না করেন।

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়—ভারতে উন্নতির বাতাস যে কি প্রকার প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই দেখিতে পারিবেন। আজ চারিদিকে যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য অবিচ্ছেদে আন্দোলন চলিতেছে, ইহাই সেই উন্নতি-প্রবাহের একটা অভ্রান্ত নিদর্শন। মানবের অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীজাতি অশিক্ষিত থাকিলে কোন্ জাতি উন্নতির অভিমুখে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বর্ত্তমানে ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কেহই আর স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা অস্বীকার করেন না। এখন মতভেদ কেবল শিক্ষার প্রণালী লইয়া। এই সূত্রে ফারগুসন কালেজের (Prof Karve) প্রফেসার কার্ভে ভারতীয় ললনাগণের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিতেছেন। তিনি সংপ্রতি এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন জাপানে এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় আছে। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরে একই প্রতিযোগী পরীক্ষায় আসিয়া যে দাঁড়াইবে তাহা ঠিক নহে। স্ত্রীজাতির জন্য অপেক্ষাকৃত একটু সহজ পাঠ্যের ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়। ১৯০৪ সালে জাপানে যখন স্ত্রীবিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়, উহার অবস্থা আশাজনক হইবে বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে জাপানে স্ত্রী গ্রাজুয়েটের সংখ্যা এক হাজারের অধিক। এই ভারতবর্ষেও স্ত্রীজাতির উপযোগী শিক্ষাদানের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে শিক্ষয়িত্রী গঠন করিয়া লইতে হইবে। ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত করা বড় সুকঠিন। দেশীয় ভাষাকে ভিত্তি করিয়া এবং ইংরাজি ভাষাকে (Second language) অন্যতর শিক্ষণীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যাইবে, এইরূপ তাঁহার ধারণা। আমরাও এইরূপ একটী মহিলাবিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। তাহা হইলে আশা করি পুরুষদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উচ্ছৃঙ্খল অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষার ফলে রুগ্ন শরীরধারী নারীজাতির সৃষ্টি দেখিবার অবসর থাকিবে না।

কৃত্তিবাসের স্মৃতিমন্দির—গত ২৭ শে চৈত্র বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিবস। ঐ দিবস কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলে গ্রামে বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে মাননীয় জষ্টিস সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কত বাঙ্গালীকে উন্নতির পথে

ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তাহা কে গণনা করিয়া রাখিয়াছে? কোথায় সেক্সপীয়র, কোথায় টেনিসন, ইঁহারা জগৎপূজ্য হইলেও আমরা যদি তাঁহাদিগের পূজা করিতে শিখি, কিন্তু আমাদের দেশের পূজ্য ব্যক্তিদিগকে সম্মান প্রদান করিতে না শিখি, তাহা আমাদিগকে প্রকৃত উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর করিয়া দিবে সন্দেহ। যাঁহাদের বিষয় আমরা মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে বলিতে গেলে শুনিতে শুনিতে বর্দ্ধিত হইয়াছি, যাঁহাদের ভাষা আমাদের রক্তমাংসের অস্থিমজ্জার অণুতে অণুতে অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে শিক্ষা না করিলে আমাদের কিসের উন্নতি, কিসের সভ্যতা, কিসের গৌরব? আত্মসম্মানই প্রতি মানবের জীবন। দেশের পূজ্য ব্যক্তিদিগের প্রতি পূজার্পণই প্রকৃত পক্ষে আমাদের নিজের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন এবং তাহাতেই আমাদের জীবন, তাহাতেই আমাদের উন্নতি। সেই কারণেই কৃত্তিবাসী স্মৃতি-মন্দির সংস্থাপনে আমরা বিশেষ আনন্দিত।

মঙ্গলনির্ঘোষ—আজ কয়েক মাস হইল, "মঙ্গল নির্ঘোষ" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নিষ্ঠাবান মুচি-শ্রেণীভুক্ত একটী বৈষ্ণব একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া গোস্বামীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গোস্বামীদিগের ভিতর এক দলাদলির সৃষ্টি হইল। একদল বলিলেন যে তাঁহারা এপ্রকার শুভকার্য্যে জাতিভেদ স্বীকার করিতে পারেন না, বরঞ্চ চৈতন্য মহাপ্রভুর পদানুসরণ করিয়া সকল শ্রেণীর মানবকেই ধর্ম্মকার্য্যে উপস্থিতি প্রভৃতি দ্বারা উৎসাহ প্রদান করা উচিত। অপরদিকে অতিরক্ষণশীল সম্প্রদায় বলিলেন যে মুচির নিমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়া অথবা মুচির দানগ্রহণ সদাচার নহে। বলা বাহুল্য যে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের অনেকেও নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যখন দলাদলিটা কিছু বেশী পাকিয়া উঠিল, তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে তাঁহারা নিমন্ত্রণের প্রকৃত কারণ অবগত না হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এইরূপ শোনা যায়। একথা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। যাই হৌক, এ পর্য্যন্ত দলাদলির ভাবটা কিছু বেশী প্রবল ছিল বলিয়া আমরা এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই। শুনিতে পাইতেছি যে এখন নাকি অন্তত আংশিক মিটমাট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই অবসরে আমরা এই সম্বন্ধে আমাদের দুএকটী বক্তব্য বলিয়া লই। বিষয়টা লঘুভাবে লইবার নহে। গোস্বামীদিগের মধ্যে এবং বৈষ্ণব সমাজে ইহা অতি গভীর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। যাঁহারা মুচির নিমন্ত্রণে যাওয়া সমর্থন করেন, তাঁহাদিগের সৎসাহসের আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করি। তাঁহারা প্রকৃতই দূরদর্শী এবং প্রকৃতই সময়োচিত ও প্রকৃত বৈষ্ণবের উপযুক্ত ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। সংসারের দিক দিয়া, সমাজের দিক দিয়া সাংসারিক কার্য্যসমূহ দেখিবার একটা সীমা আছে। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম্ম্য কার্য্যগুলি সেই সীমার ভিতর দিয়া দেখিলে চলিবে না—সেগুলি ধর্ম্মের দিক দিয়া ভগবানের দিক দিয়া দেখিতে হইবে। যেমন জন্ম বা মৃত্যু ভগবানের কার্য্য বলিয়া তাহা সাধু অসাধু ধনী দরিদ্র সকলের নিকট নির্ব্বিশেষে সমান ভাবেই উপস্থিত হইবে, সেইরূপ ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কার্য্য সমূহও যাহা কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, শুভদায়ক বলিয়া তাহাতে নির্ব্বিশেষে আমাদের উৎসাহ দান কর্ত্তব্য। ইহাতেই তো জগত উন্নতির অভিমুখে ছুটিবে; ইহার বিপরীতে আমাদের সোনার ভারতভূমির যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহাই চলিতে থাকিবে—আমরা অন্ধকূপেই চিরকাল নিমগ্ন থাকিব। এখন যেন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উন্নত বা জলাচরণীয় শ্রেণীর মধ্যে গোস্বামীদিগকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত অনেক ধনী রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা মুচি প্রভৃতি অনুন্নত শ্রেণীগণের প্রতি হীনদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সাহস করিতেছেন; কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে এমন অবস্থা আসে যে উচ্চশ্রেণীগণ নির্ধন হইয়া পড়িয়াছেন এবং একমাত্র অনুন্নত শ্রেণীই ধনবান হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে কি তাঁহারা মুচিদিগের ধর্ম্মকার্য্যেও অবজ্ঞা প্রদর্শনে সাহস করিতেন? যাই হৌক, দলাদলির মিটমাট হইলেও এই ঘটনার ফলে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ যে সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া অন্তত একপদও উন্নতির পথে ছুটিয়াছেন সে বিষয়ে আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের একটী বিস্তৃত সমাজে আত্মার স্বাধীনতা ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা যে জাগিয়া

উঠিয়াছে, মঙ্গলনির্ঘোষে তাহারই পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি।

সাহিত্য পরিচয়।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ বিরচিত। ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ফাইন আর্ট সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এতদিন পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী যে লিখিত হইয়াছে, ইহাতেই মন্মথ বাবু সমগ্র বঙ্গদেশের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। গ্রন্থখানিতে কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধে অজ্ঞাত জ্ঞাতব্য অনেক কথার সন্নিবেশ থাকিলেও আমরা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না। আমরা আমাদের জ্ঞান-সঞ্চার অবধি "কালী সিংহের" হুতোম প্যাঁচা, কালী সিংহের মহাভারত সম্বন্ধে এতই শুনিয়া আসিয়াছি যে তাঁহার সম্বন্ধে এই-টুকু জানিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলাম না—গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাঁহার বিষয়ে আরও অনেকটা জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। বাঙ্গালা দেশ যতদিন থাকিবে; বঙ্গভাষা যতদিন থাকিবে, কালীপ্রসন্নের নাম ততদিন জীবিত থাকিবে, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। মহাভারতরূপ একটি সংস্কৃত মহাগ্রন্থের বাঙ্গালা ভাষার অনুবাদ—এই সুমহান্ অনুষ্ঠান তো কালী সিংহকে (আমরা তাঁকে প্রচলিত নামে অভিহিত করিলাম বলিয়া আশা করি তাঁহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রন্থকার আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন) অমর করিয়া রাখিবেই, কিন্তু এই বিষয়টা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে তাঁহার এই অনুষ্ঠানের ভিতর কত বড় মহাপুরুষতার (genius) পরিচয় পাওয়া যায়? তিনি একজন প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার নিজের ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল—ইহাই তাঁহার মহত্বের কারণ ও পরিচয়। তাহা না হইলে, তিনি যে অল্প বয়সে পরলোকগত হইয়াছিলেন, সেই অল্প বয়সের মধ্যে এই সুবৃহৎ ও সুকঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসই করিতেন না। সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তক কয়জন লোকে পড়িতেন, তাহাতে আবার মহাভারত—যাহা তদানীন্তন শিক্ষিত মহলে নানাবিধ অশ্লীল উপাখ্যানে পূর্ণ বলিয়া অপাঠ্য শ্রেণীভুক্ত ছিল? তখন মুদ্রাযন্ত্রেরও এত উন্নতি বা সুলভতাও ছিল না। এই অবস্থায় মহাভারতকে সৌন্দর্য্যপূর্ণ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ কার্য্য—জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে ইহার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। মন্মথ বাবু যদি এই একটা বিষয়ই যথোপযুক্তরূপে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহার সে চেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হইত। তার পর, তাঁর "হুতোম প্যাঁচা"। এটীও একটী অপূর্ব্ব পদার্থ। আমরাও এখানি বাল্য-কালেই পড়িয়াছিলাম, পড়িয়া তদানীন্তন সমাজের ভালমন্দ মিশ্রিত চিত্র মনোমধ্যে একটা গড়িয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু সে সময়ের অনেক পণ্ডিত অপণ্ডিত লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সমাজকে অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে অবিচ্ছেদে পদক্ষেপ করা হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছিল। কালীপ্রসন্ন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সেদিন কয়েকটা প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে দেখি যে তিনি একটী পণ্ডিতকে "মাধব সুলোচনা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন। আমাদের অনুমান হয় যে মন্মথ বাবু শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে আরও অনুসন্ধানাদি দ্বারা গ্রন্থখানিকে তাঁহার অভিলষিত মত পূর্ণতা সম্পাদনে সক্ষম হয়েন নাই। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের যে যোগ ছিল সে বিষয়টী বোধ হয় যেন মন্মথ বাবু একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় ইংলণ্ডে পরলোকগমন করিবার পরে এদেশে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ ১১ই মাঘ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিদায় দিবার বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। একটী কথা কিন্তু আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই পুস্তকের এত দাম ভূমিকা আবশ্যকছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহার মূল্য আর একটু কম করিলে বোধ হয় সাধারণের

মধ্যে কালী সিংহের জীবনাখ্যায়িকা প্রচারের সুবিধা হইত।

বর্ণচিত্রণ—শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের শিল্পসাহিত্য পুস্তক বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি আমরা আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি। আমাদিগের বিশ্বাস যে চিত্রবিদ্যায় যাঁহাদের একটুও অনুরাগ আছে, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমরা অবশ্য চিত্রাঙ্কনের শিল্পের দিক দিয়া গ্রন্থের সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা করি না, কিন্তু সাহিত্যের দিক দিয়া দুই চারিটী কথা বলিবার সাহস করিতেছি। গ্রন্থের প্রথমেই মন্মথ বাবু গ্রন্থব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের একটী তালিকা প্রদান করিয়া বড়ই ভাল করিয়াছেন। অবশ্য সকল কথাগুলি আমাদের মতে বেশ সুসঙ্গত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। তিনি ভারতের এই বিদ্যাবিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার বিষয়ে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। একটী অধ্যায়ে ইউরোপে নয়প্রকার চিত্রাঙ্কনরীতির ইতিহাস দিয়াছেন। ইহাতে আমাদের মত অনভিজ্ঞ লোকেরও ইউরোপীয় চিত্রের কলানৈপুণ্য জ্ঞান বিষয়ে বড়ই সহায়তা হইবে। পরিশিষ্টে চিত্রসংরক্ষণবিধি ও চিত্র সাজাইবার রীতি দিয়া জনসাধারণের, বিশেষত চিত্রপ্রিয় ধনী সন্তানদিগের বড়ই উপকার করিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা বলিলাম বটে, কিন্তু আমাদের বক্তব্য শেষ হয় নাই। এই সূত্রে আমরা মন্মথ বাবুর একনিষ্ঠতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, চিত্রকলা শিক্ষা দিবার জন্য দেশীয় লোকের স্বশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে মন্মথ বাবুর ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলই সর্ব্বপ্রথম। তিনি যেরূপ নিষ্ঠার বলে ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তবে কথা এই যে, বর্ত্তমানে যেরূপ জীবনসংগ্রামের কাল আসিয়াছে, তাহাতে চিত্রকলা লইয়া কয়জন জীবন কাটাইতে পারে? আমরা জানি যে মন্মথ বাবু তাঁহার বিদ্যালয়ে খোদাই প্রভৃতি কার্য্য ছাত্রদিগের দ্বারা সম্পাদন করেন, কিন্তু সেই খোদাই কার্য্যও photogravureএর কাছে পরাজয় মানিতে বাধ্য হইয়াছে। বিদ্যালয়কে স্থায়ী করিতে গেলে—স্থায়ী করাই প্রার্থনীয়—উহাকে সময়ের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের মনে হয় যে, যে সকল ছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সংসারক্ষেত্রে স্বাধীন জীবিকা লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা এই বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনার্থ একটী বৃত্তি খুলুন—যাঁহার যাহা বিক্রয় হইবে, তিনি ক্রেতাগণের নিকটে তদুপরি একপয়সা দুইপয়সা করিয়া বৃত্তি ধরিয়া লইবেন। বৎসরের শেষে তাঁহারা সেই বৃত্তিলব্ধ অর্থ গুরুসমীপে নিবেদন করিয়া আসিবেন।

শ্রীসত্যকাম শর্ম্মা।

গয়াকাহিনী। গ্রন্থকার রাঁচী প্রবাসী শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রণেতা। উহার মধ্যে কয়েকখানি ইতি মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও যে তিনি গয়াকাহিনী বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়। পুস্তক খানির কলেবর ৩৪৪ পৃষ্ঠা অধিকার পাইয়াছে। পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন উহার সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। আজ কাল লোকে যুক্তি তর্কের সমাবেশ দেখিতে চায়। ভূমিকার ভিতরে তাহার অভাব দেখিলাম। তাহার পরে গ্রন্থকার গয়াতীর্থ সম্বন্ধে পৌরাণিক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। উহা স্বল্পমতি বালকদিগের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। পৌরাণিক কাহিনীর সহিত ইহাতে গয়ার ঐতিহাসিক বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাতে অনেক সারবান কথার সমাবেশ আছে। উহার পরে গদাধরের স্তব এবং গয়াকৃত্য বিষদভাবে লিখিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধের মন্ত্রাদি এবং কোথায় গিয়া কি ভাবে অন্নদানাদি করিতে হয় তাহারও পরিচয় আনুপূর্ব্বিক প্রদত্ত হইয়াছে। কঠোপনিষদের পরিবর্ত্তে বিরাট পাঠের উৎপত্তি, পরলোকতত্ত্ব ও এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এবং বুদ্ধদেব যে এখানে আসিয়া সিদ্ধিলাভ করেন তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিতে এবং বোধ গয়ার দেবালয়গুলির স্থাননির্দ্দেশ করিতে গ্রন্থকার চেষ্টার

ত্রুটি করেন নাই। বোধগয়ার মন্দির সংস্কার করিতে গিয়া যে প্রাচীন আদর্শ রক্ষিত হয় নাই, তাহা অতুল বাবু সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ স্পুনার সাহেবের মন্তব্য হইতে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরিশেষে আদমসুমারির বিবরণী হইতে গয়ার অধিবাসী সংখ্যা এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তক খানির ভাষা সরল এবং প্রাঞ্জলতা পূর্ণ। ইহা একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। এই পুস্তকে ১৪ খানি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তক খানির ছাপা অতি সুন্দর হইয়াছে। এইরূপ তীর্থপরিচয় যতই বাহির হয়, ততই মঙ্গল। দ্বারবঙ্গের মহারাজা এই পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রকাশের জন্য যুবক লেখক আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। পুস্তকের মূল্য দুই টাকা হইলেও ইহার ভিতরের সামগ্রীর মূল্য যে অনেক গুণ অধিক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

নানা কথা।

(শ্রীজলধর সেন)

পার্শী জাতির শারীরিক অবনতি।

বোম্বাই অঞ্চলের পার্শীগণ কিছুদিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের জাতির মধ্যে শারীরিক অবনতি হইতেছে; সুস্থ ও সবলকায় লোকের সংখ্যা ক্রমে কম হইয়া যাইতেছে, নানাপ্রকার পীড়ায় অনেকে আক্রান্ত হইতেছেন। পার্শীরা এই ব্যাপার উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান যে প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সেইজন্য বোম্বাইয়ের জোরোস্ত্রিয়ান কন্‌ফারেন্সের মন্তব্য অনুসারে একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হইয়াছিল। পঁয়ত্রিশ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই সমিতির সদস্য হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে রমণী চিকিৎসকও আট জন ছিলেন। তাঁহারা বোম্বাই অঞ্চলের বিদ্যালয় সমূহের পার্শী বালকবালিকাদিগকে যথারীতি পরীক্ষা করেন। তাঁহাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ১২৬৫ জন বালকবালিকার মধ্যে ১৯৪ জনের প্লীহা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে; ম্যালেরিয়াই যে ইহার কারণ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ৩৯১ জনের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। চিকিৎসকগণ দেখিয়াছেন যে শতকরা ৫০ জন বালকবালিকা কর্ণ ও নাসিকার রোগে এবং সর্দ্দি কাশীতে কষ্ট পাইয়া থাকে। তাঁহারা আরও একটি বিষয় দেখিতে পাইয়াছেন; তাহা এই যে অধিকাংশ বালকবালিকাই দন্তরোগে কষ্ট পাইয়া থাকে, পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে ১৫০৩ জন ছাত্রের মধ্যে ৮৯৬ জনই দন্তরোগে কষ্ট পাইয়া থাকে। এই সমিতির রিপোর্ট পাইয়া বোম্বাইয়ের পার্শীগণ বালকবালিকাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ম্যালকমবাগ নামক বিস্তৃত উদ্যানটি পার্শী বালকবালিকাগণের ব্যায়াম ও ভ্রমণের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সকল পার্শী বালকবালিকাই যাহাতে যথারীতি ব্যায়াম করে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। চিকিৎসকগণের পরীক্ষার ফল দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে বালকবালিকাদিগকে যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়, তাহাতে তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারে না। পার্শী বালকবালিকাদিগের কথাই বলিতেছি না, আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদিগের সকলেরই এই অবস্থা। প্রথম স্কুলের পড়া, এক একটি ছোট ছেলের উপর এত পড়ার চাপ দেওয়া হয়, এত বিষয় তাহাদের অধ্যয়ন করিতে হয় যে, তাহারা হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পায় না। প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি হাতেমুখে একটু জল দিয়াই পড়িতে বসে, আহার করিবার সময় তাহাদের সময় এত কম যে, তাহারা ভাল করিয়া আহার করিতে পারে না, কোনপ্রকারে খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ করিয়া স্কুলে দৌড়ায়। আহার দ্রব্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করা হয় না, ইহাতে অজীর্ণ রোগ জন্মে, ভাল করিয়া মুখ ধুইবার অভ্যাস নাই। এই সকল কারণে বালকবালিকারা দন্তরোগে অধিক কষ্ট পাইয়া থাকে। তাহার পর চক্ষুর ব্যবহার অত্যন্ত অধিক করিতে হয়; তাহার ফলে ক্রমে

ক্রমে দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। আমরা ছেলেদের স্কুলে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি; কিন্তু তাহাদের শরীর যে দিনে দিনে নানা কারণে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করি না। বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে; গৃহে গৃহে বালকবালিকাগণ যাহাতে স্বাস্থ্যের নিয়ম যথারীতি প্রতিপালন করে, তাহার দিকে পিতামাতা ও অভিভাবকগণের বিশেষ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। পার্শী মহাশয়েরা যেমন সমিতি বসাইয়া পার্শী বালকবালিকাগণের স্বাস্থ্যনষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তৎপ্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেছেন, অন্যান্য প্রদেশেও তাহা করা কর্ত্তব্য।

ভারতে বেত্রদণ্ড।

সার হেনরী কটন বাহাদুরের নাম আমাদের দেশের সকলেরই পরিচিত। তিনি বহুদিন এদেশে বাস করিয়াছিলেন, এবং নানা রাজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এ দেশের অবস্থা বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে বাস করিবার কালে এ দেশের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বিরত হয়েন নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের 'হিউম্যানিটারিয়ান' (Humanitarian) পত্রে ভারতে বেত্রদণ্ড সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সেই প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

সার হেনরী বলিয়াছেন—"মানব জাতি ক্রমে যতই সভ্যতার সোপানে অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহাদিগের মধ্যে দয়ার ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই অবস্থায় যদি আমরা এখনও কোন সভ্য সমাজে পুরাতন সময়ের অসভ্যোচিত বিধি ব্যবস্থার প্রচলন দর্শন করি, তাহা হইলে আমাদিগকে লজ্জিত, ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইতে হয়। এই জন্যই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতবর্ষে বেত্রদণ্ডের কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কিছু কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বেত্রদণ্ডের যে প্রকার প্রচলন ছিল, এখন তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু এই অসভ্যোচিত দণ্ডের ব্যবস্থা এখনও তিরোহিত হয় নাই। আমরা আমাদের ইংরেজ সরকারের একশত বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন কাগজপত্রে পাঠ করিয়াছি যে, রাস্তা ঘাটে সুধু বেত্রদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তি কেন, রাজাজ্ঞায় হস্তছিন্ন ব্যক্তিগণকেও চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। আমি যখন বাঙ্গালা দেশের কোন এক জেলায় মাজিষ্ট্রেট ছিলাম, তখন সেখানকার দপ্তরখানার পুরাতন কাগজপত্র পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে, একজন মাজিষ্ট্রেট এই প্রকার নিষ্ঠুর দণ্ড প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিয়া উপরিতন প্রধান কর্ম্মচারীকে সেই কথা জ্ঞাপন করেন; তদুত্তরে স্বয়ং ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাহাদুর তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়া আদেশ করেন যে, তাড়াতাড়ি দণ্ডবিধান করাই ভাল। আর একখানি পত্র দেখিয়াছি; তাহাতে লিখিত ছিল যে, অমুক ডাকাইতের উপর হস্তপদচ্ছেদ দণ্ড বিহিত হইয়াছে; এই দণ্ডপ্রদান কার্য্য যেন পর পর তিন দিনের মধ্যেই শেষ করা হয়। আর একখানি কাগজে দেখিয়াছি, একজন লোককে চুরী অপরাধে ধৃত করা হয়। তাহার উপর এই দণ্ড বিহিত হয় যে, তাহাকে প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া ২৫ হইতে ৫০ ঘা বেত মারিতে হইবে এবং এই ভাবে ছয় মাস কাল তাহাকে বেত্রদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। এ সকল একরকম সেকেলে কথা; ইংরেজ শাসনের প্রথম আমলের কথা। আর এই দণ্ডবিধি উত্তরাধিকার সূত্রে ইংরেজগণ মোগলদিগের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার গুরুদণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্তও ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও বেত্রদণ্ড খুব চলিতেছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই অসভ্য জনোচিত দণ্ডের ব্যবস্থা লোপ করিবার প্রস্তাব করেন এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে যে আইন কমিসন বসিয়াছিল এবং লর্ড মেকলে যে কমিসনের সভাপতি ছিলেন, সেই কমিসনের মন্তব্য অনুসারে বেত্রদণ্ড রহিত হইয়া যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা অধিক দিন স্থিরতর থাকে না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে একটি আইন দ্বারা বেত্রদণ্ড পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়; তবে যাহাতে এই দণ্ড যখন তখনই, যে সে অপরাধের জন্যই বিহিত না হয়, সেই প্রকার আদেশও করা হইয়াছিল। তাহার পরেই সিপাহী বিদ্রোহ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তখন বেত্র-

দণ্ডের অবাধ প্রচলন হইল এবং ১৮৬৪ অব্দে বেত্রদণ্ড বিষয়ক আইন যথারীতি বিধিবদ্ধ হইল। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে দেশের লোকে এই আইন প্রাপ্ত হইল।"

এই প্রবন্ধে সার হেনরী কটন মহোদয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন বর্ষের শাসন-বিবরণী হইতে সার সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৮৭৮ অব্দে ৭৫২২৩ জন বেত্রদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ১৮৮৯ অব্দে ৬০০৮৭ জন বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ১৯১০ অব্দে এই দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৪৫০৫৪। সার হেনরী বলিয়াছেন যে, যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত আগরা ও অযোধ্যায় বেত্রদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। সার হেনরী এই দণ্ড রহিত করিবার জন্য পার্লামেণ্টে আন্দোলন করেন। সেই আন্দোলনের ফলে যদিও বেত্রদণ্ড একেবারে রহিত হয় নাই; কিন্তু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এ সম্বন্ধে একটী আইন হয়, তাহার ফলে বেত্রদণ্ড অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ যে সকল ব্যক্তি চুরী অপরাধে প্রথম অভিযুক্ত হয়, তাহাদের প্রতিই বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়া থাকে এবং আপীলের সময় অতীত হইবার পূর্ব্বে দণ্ড প্রদত্ত হয় না। অল্পবয়স্ক বালকেরা চুরী অপরাধে অভিযুক্ত হইলে তাহাদের প্রতি অনধিক ১৫ বেতের আদেশ হইয়া থাকে। রাজনৈতিক অপরাধে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা এখন রহিত হইয়া গিয়াছে। সার হেনরী আশা করেন যে, সত্বরই এই দণ্ড একেবারে রহিত হইয়া যাইবে।

শোক সংবাদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল—প্রায় ৭৬ বৎসর বয়সে বিগত ২০শে মাঘ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে জীবনে যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় ভাই ত্রৈলোক্যনাথ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোথায় তিনি পাঠশালাতে সামান্য বিদ্যার সম্বল লইয়া ৬৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন, আর কোথায় পরিণত বয়সে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা। নিজ সাধনাপ্রভাবে ও সাধুসঙ্গে মানুষ কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারে, সান্ন্যাল মহাশয় তাহার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন—অনেকের জীবনে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। কেশব বাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার সহিত মহর্ষিদেবের মিলনের গাঢ়তা হইয়াছিল। শান্তিনিকেতনের উৎসব উপলক্ষে প্রায় প্রতিসংসর তিনি বোলপুর আশ্রমে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেন। সেখানেও তিনি উৎসব-উপযোগী সঙ্কীর্ত্তন রচনা করিয়া অন্যের সহিত মিলিত কণ্ঠে উৎসবপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তুলিতেন। ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উপাসনায় সমুন্নতদেহ ত্রৈলোক্যনাথ কয়েক বৎসর ধরিয়া নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিতেন। ত্রৈলোক্যনাথ একাধারে গায়ক, কবি, প্রচারক উপদেষ্টা ও লেখক ছিলেন। এতগুলি গুণের সমাবেশ একাধারে নিতান্তই দুর্লভ। শেষ জীবনে তাঁহার দেহ জরা ও ব্যাধিসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। বং সরাধিক রোগে কষ্ট পাইয়া শ্রান্তদেহ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজ যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন তাহা বাহুল্য মাত্র। পরমপিতা তাঁহার আত্মার সৎগতি বিধান করুন ইহাই আমাদের কামনা।

আমাদের পরম আত্মীয় শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তা দেবীকে অকালে হারাইয়াছেন। আমরা কি বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিব জানিনা। এলাহাবাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। রূপে ও গুণে বিনয়ে ও ঔদার্য্যে শান্তা অতুলনীয়া ছিলেন। বসন্ত রোগে পরিশেষে তাঁহার দেহান্ত হইল। চারিটি নাবালক শিশু রাখিয়া গত ৮ই ফাল্গুন রাত্রি একটার সময় তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন। পরম মাতা তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন এবং পিতামাতা, স্বামী ও আত্মীয়বর্গের হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুণ, ইহাই প্রার্থনা।

পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(১৮৩৭ শকে)

শ্রীযুক্ত বাবু তুলসীদাস দত্ত	কালীঘাট	৫৶০
,, ,, কল্যাণ চন্দ্র বড়াল	হুগলি	২৶০
,, ,, বেহারী লাল মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
,, ,, কাশীনাথ রুদ্র সরকার	কলিকাতা	১৶০
,, ,, শিশিরকুমার দত্ত	,,	১॥৶০
,, ,, কনক চন্দ্র বড়াল	,,	২৶০
,, ,, অবিনাশ চন্দ্র দাস	,,	২৶০
,, ,, ভগবতী চরণ মিত্র	,,	১॥০
,, ,, সত্যেন্দ্রনাথ রায়	মণিপুর	৩।০
,, ,, যোগেশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা	বাটাযোড়	২৸৶০
,, ,, চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৩৶০
,, ,, ভীমজি হারিজিভনে	বম্বে	৩।০
,, মহারাজা হৃষীকেশ লাহা বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
,, বাবু সতীশ চন্দ্র মল্লিক	,,	৬৲
,, ,, সন্তোষকুমার লাহিড়ী	,,	৩৶০
শ্রীমতী ঊষা হালদার	,,	২৲
শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর নৃত্যগোপাল বসু	,,	৫৶০
,, বাবু আনন্দ প্রকাশ ঠাকুর	,,	৩৲
,, ,, পান্নালাল মিত্র	,,	৫৲
,, ,, নৃপেন্দ্রনাথ রায়	,,	৩৶০
,, ,, সিদ্ধেশ্বর ঘোষাল	চন্দননগর	২৶০
,, ,, গোবিনলাল দাস	কলিকাতা	৩৲
,, রাজা শরদিন্দু নারায়ণ রায়	দার্জ্জিলিং	৩৶০
,, বাবু প্রসাদ দাস মল্লিক	কলিকাতা	৫৲
,, ,, ভুজেন্দ্রনাথ মিত্র	,,	১॥০
,, ,, বনমালী চন্দ্র	,,	৩৲
,, ,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	,,	৫৶০
,, ,, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	৫৶০
,, ,, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	এলাহাবাদ	৩৶০
,, ,, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য	কলিকাতা	১॥৶০
,, মিঃ জি, বড়ুয়া	গৌহাটি	৩৶০
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু	দেবানন্দপুর	৮৵০
শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রবিহারী রায় চৌধুরী	হরিপুর	৩৶০
,, ,, গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর	কলিকাতা	৩৲
,, ,, শশীমোহন দাসগুপ্ত	বামনিয়া	৩৶০
,, ,, শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
,, ,, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	,,	৩৶০
,, ,, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়	,,	৩৲
শ্রীমতী সুনীতিবালা সেন	ঢাকা	২৶০
শ্রীযুক্ত বাবু পান্নালাল দে	কলিকাতা	৩৶০
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	খাগড়া	১৫৲
,, মিঃ কে, বি, দত্ত	কলিকাতা	৩৶০
শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন	রাজসাহী	৩৶০
,, ,, শ্রীদয়াল রায়	কার্সিয়ং	৩৶০
শ্রীমতী ইন্দুবালা সেন	ঢাকা	২৶০
,, সম্পাদক কাঁথি ব্রাহ্মসমাজ	কাঁথি	২৶০
,, বাবু সত্যরঞ্জন বসু	পাবনা	২।০
,, সম্পাদক কাকিনা ব্রাহ্মসমাজ	কাকিনা	১৫৸৶০
,, বাবু প্রকাশচন্দ্র দেব	গৌহাটি	৩৶০
,, বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত	চট্টগ্রাম	৩৶০
,, ,, লালবিহারী বসাক	কলিকাতা	৩৲
শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ	মৈমনসিং	২৶০
শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ রায় রায় সাহেব বাহাদুর	দিনাজপুর	৬৲
,, ,, মনোহর মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	১২৸০
,, ,, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	দিনাজপুর	১৫৲
,, ,, পঞ্চানন দত্ত	লাহেরিয়াসরাই	৩৶০
,, ,, প্রসন্নকুমার মজুমদার শাস্ত্রী	শ্রীহট্ট	৩৶০
শ্রীমতী পঙ্কজিনী গুপ্তা	রিহাবাড়ী	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র দাস	বালেশ্বর	২৶০
ডাক্তার, পি, দেব,	ভাবনগর	৩৶০
শ্রীযুক্ত বাবু সতীনাথ রায়	কলিকাতা	৩৲
,, ,, পূর্ণচন্দ্র দত্ত	,,	১॥৶০
,, ,, অবিনাশচন্দ্র পাল	খিদিরপুর	২৲
শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মনোমোহন বক্সী	কুচবেহার	২৶০
,, বাবু হরিপদ ত্রিবেদী	কলিকাতা	১॥০
,, ,, হৃদয়চন্দ্র আচার্য্য	ঢাকা	৬৲
,, ,, শ্রীশচন্দ্র মল্লিক	আন্দুল	৩।০
,, ,, কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	বেনারস	৩৲
,, ,, সুরেন্দ্রনাথ বসাক	কলিকাতা	১॥০
,, ,, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	,,	৩৲
,, ,, গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী	ভাগলপুর	২৲
,, ,, চারুচন্দ্র বসু	কলিকাতা	৬৲
,, ,, মহেন্দ্রনাথ সেন	আসাম	৬৲
,, ,, সুশীলকুমার ঘোষ	বর্ম্মা	৩৸৶০
,, ,, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	বেহালা	২৲
,, ,, গৌরীশঙ্কর রায়	কটক	১০৲

রাজা রামমোহন রায় (যৌবনে)

F. A. P. S. Calcutta.
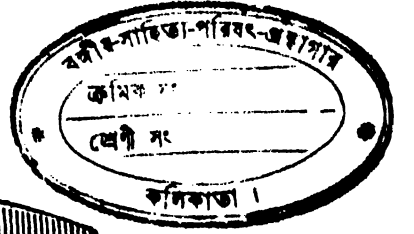
"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

ওম্।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চলিছে মহান বিশ্বে মহাযজ্ঞে হোম।
অনন্ত অনল মাঝে ওঠে ধ্বনি ওম্।
ও...............ম্ ব্রহ্মাগ্নির শব্দ—
শব্দহীন মহাশব্দ গভীর নিস্তব্ধ!

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মকথা।

দেবেন্দ্রনাথের প্রয়োজন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মদিবস। রাজা রামমোহন রায়ের পরে যে মহাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে ইহার স্থায়িত্ব প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যিনি ব্রাহ্মসমাজকে আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, যাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে ভারতবর্ষে, বিশেষত বঙ্গদেশে বেদ বেদান্তের চর্চ্চা পুনর্জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার জন্মমাসে তাঁহার জন্মকথা কীর্ত্তন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি। রাজা রামমোহন রায়ের পরে দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আর কেহই ব্রাহ্মসমাজে প্রাণ আনয়ন করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে সেই প্রাণ আনয়ন করিবার জন্য রামমোহন রায়ের ন্যায় আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল এবং সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষ সেই কার্য্যের জন্য দেবেন্দ্রনাথকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নীলমণি ঠাকুর।

দেবেন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষগণ অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ নীলমণি ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথম যোড়াসাঁকোয় ঠাকুর বংশের বসতি পত্তন করেন। তাহার পূর্ব্বে পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুরবংশের কলিকাতায় আদি বাসস্থান ছিল। যোড়াসাঁকোর এই নূতন বসতি পত্তন করিবার সম্বন্ধে একটী ঘটনা শোনা যায়। সেই ঘটনাতে নীলমণি ঠাকুরের ধর্ম্মনিষ্ঠা জ্বলন্তভাবে প্রকাশ পায়। একবার মহর্ষিদেব তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট কথালাপের সময়ে এই ঘটনার বিষয় গল্প করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহারই কথায় এই ঘটনাটী উল্লেখ করিতেছি। "আমার প্রপিতামহ নীলমণি ঠাকুর। তিনি তাঁহার ভ্রাতা দর্পনারায়ণের সহিত কলহ করিয়া এই স্থানে (যোড়াসাঁকোতে) আমাদের ভদ্রাসন স্থাপিত করিলেন। বিশ্বস্ত হৃদয়ে তিনি দর্পনারায়ণের নিকট অনেক মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যর্পণ করিতে পরে অস্বীকার করিলেন। তিনি কহিলেন "তুমি আমার নিকট মুদ্রা রাখ নাই।" তাহাতে আমার প্রপিতামহ এইমাত্র বলিলেন "তুমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিলে আমি আর তোমাকে কিছুই বলিব না।" তিনি তাহাই করিলেন। সুতরাং

ইনি কেবল তাঁহার আপনার একটী শালগ্রাম ঠাকুরকে তাঁহাদিগের গৃহ হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া এই গৃহে স্থাপিত করিলেন। ইহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে আমাদিগের এই পরিবার ধার্ম্মিক পরিবার; অতএব তোমরাও এই পরিবারের সেই ভাবটী রক্ষা করিও।" *

দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতামহ সম্বন্ধে বলেন যে তিনিও অত্যন্ত ভক্তিশীল পুরুষ ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মাতা ও পিতামহীর ন্যায় নিষ্ঠাবতী রমণী সংসারে চিরকালই দুর্লভ। পিতামহীর বিষয় তিনি "আত্মচরিতে" বলিয়াছেন—"তাঁহার ধর্ম্মে অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখনো কখনো তিনি সংকল্প করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেন।" তিনি স্বপাকে হবিষ্যান্ন আহার করিতেন।

দেবেন্দ্রজননী।

পূর্ব্বোক্ত কথালাপে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মাতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমার মাতা, তাঁহাকে দেখিযাছি—তাঁহার ন্যায় ভক্তিশালী মনুষ্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।" দেবেন্দ্রজননী যেমন নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন, সেইরূপ তিনি একজন তেজস্বিনী মহিলাও ছিলেন। ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগ অপেক্ষা কষ্টকর ব্রত অবলম্বনেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন তাঁহার নিষেধ না মানিয়া সাহেবদিগের সঙ্গে আহার বিহারে অবিরত থাকিলেন, তখন দেবেন্দ্রজননী স্বীয় ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় স্বামীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে জীবননির্ব্বাহের ব্রত ধারণ করিয়া মৃত্যুর দ্বারা তাহার উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর।

অনেকের ধারণা আছে যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্ম্মভাব মাতা ও পিতামহীর নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে কথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। আমরা "দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজ" প্রবন্ধে দেবেন্দ্রপিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধর্ম্মভাবের কথা ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। আমরা এখন দেবেন্দ্রনাথের নিজের উক্তি হইতেই দেখিব যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতিগতি কিরূপ আন্তরিক ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। আমাদের বিশ্বাস যে পিতার নিকট হইতেও দেবেন্দ্রনাথ মনের বল আত্মার বল ও ধর্ম্মভাব বড় অল্প পান নাই। পূর্ব্বোক্ত কথালাপে তিনি বলেন—"দেখ, আমার পিতা—যিনি এত ঐশ্বর্য্যের স্বামী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় কে আর বিষয়ে ব্যাপৃত ছিল? প্রায় সমস্ত বঙ্গভূমির কার্য্য একা তাঁহার হস্তে ছিল। তথাপি তিনি যে প্রকার ঈশ্বরের উপাসনা জানিতেন, তাহাই করিতেন। তাঁহার স্নানের সময় আমি যখন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, তখনই তাঁহাকে গায়ত্রী সন্ধ্যা প্রভৃতি জপ করিতে দেখিয়াছি। এমন কি, বিলাতে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখনও তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই।"

দেবেন্দ্রনাথের জন্ম।

দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। ১৭৩৯ শকে (১৮১৭ খৃষ্টাব্দে) ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অমাবস্যা তিথির শেষভাগে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহন রায়ের জন্মেও যেমন শাক্তবৈষ্ণবের মিলন সাধিত হইয়াছিল, তাঁহারও পিতৃকুল যেমন ঘোর বৈষ্ণব ছিলেন এবং মাতৃকুল ঘোর শাক্ত ছিলেন, আশ্চর্য্য এই যে দেবেন্দ্রনাথের

---

* শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু তিনি ইহা কোথা হইতে পাইয়াছেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

"নীলমণি ঠাকুর চট্টগ্রামে সেরেস্তাদারি কর্ম্ম করিতেন। তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইত। তিনি আপনার ব্যয়ের জন্য যৎসামান্য অর্থ রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ তাঁহার ভ্রাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। দর্পনারায়ণ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বারাণসী ঘোষের সহিত একত্র তেজারতি করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের বিলক্ষণ লাভ হইত। রাণী ভবানীর রংপুরের জমীদারী যখন বিক্রয় হয় তখন তাঁহারা ৯২০০০ টাকাতে সেই জমীদারি ক্রয় করেন। কিছুদিন পরে নীলমণি ঠাকুর সেরেস্তাদারি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা দর্পনারায়ণের নিকট আপনার অংশ চাহিলেন। দর্পনারায়ণ তাঁহাকে টাকা দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু অংশ দিতে সম্মত হইলেন না। বলা বাহুল্য যে নীলমণি ঠাকুরের টাকাতেই ইনি ঐ জমীদারী ক্রয় করেন। এই রূপে দুই ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। নীলমণি ঠাকুর অতি ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি এই বিবাদে মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে সমস্ত দান করিয়া বাড়ীর দামোদর (?) বিগ্রহকে লইয়া বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পৃঃ৭

জন্মেও সেই প্রকার শাক্তবৈষ্ণবের মিলন সাধিত হইয়াছিল এবং তাঁহারও পিতৃকুল ঘোর বৈষ্ণব ছিলেন এবং মাতৃকুল ঘোর শাক্ত ছিলেন। ইহা দেখিয়া মনে হয়, বুঝি ভগবান ভারতের সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব বিদূরিত করিয়া এক মহাসামঞ্জস্য সংস্থাপনেরই জন্য ব্রাহ্ম-সমাজকে এই বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছেন।

যে দিন দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন প্রভাতে সূর্য্যগ্রহণ ঘটিয়াছিল। সেই সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে দ্বারকানাথভবনে নানাবিধ শান্তি স্বস্ত্যয়ন কার্য্য সম্পাদিত হইতেছিল, ইত্যবসরে দেবেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার জন্মের কারণে অশৌচ হওয়ায় সকল প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান বন্ধ হইয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথের জন্মকালে দ্বারকানাথ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন নাই। "তখনো দ্বারকানাথের পৈতৃক গোলপাতার ঘর বর্ত্তমান" ছিল। সেই গৃহই দেবেন্দ্রনাথের সূতিকাগৃহ হইয়াছিল। তখন বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর গৃহই সূতিকাগৃহরূপে গৃহীত হওয়া প্রচলিত প্রথা ছিল। এই গৃহটী অনেক দিন পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া পরে অন্যান্য কার্য্যের জন্যও ব্যবহৃত হইত।

দেবেন্দ্রনাথের জন্মকোষ্ঠী।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীর পরিশিষ্টে তাঁহার জন্মকোষ্ঠী হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সকল অংশ আমরাও এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার জন্মকথার উপসংহার করিলাম। আমরা শুনিয়াছি যে তাঁহার জন্মকোষ্ঠীতে উল্লিখিত ঘটনার সহিত তাঁহার জীবনের ঘটনার বহুপরিমাণে মিল ছিল।

শুভমস্তু ১৭৩৯।১।২।৫২।৩৮

ব্যক্ত নাম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা। রাস্যাশ্রিত নাম শ্রীঅন্নদানাথ দেবশর্ম্মা।

সৌর জ্যৈষ্ঠস্য তৃতীয় দিবসে জীব বাসরেঽমাবাস্যাস্তিথৌ নক্তং দ্বিপঞ্চাশৎপলাধিকোনবিংশতি দণ্ড সময়ে শুভ মীনলগ্নে গুরোঃ ক্ষেত্রে চন্দ্রস্য হোরায়াং গুরোর্দ্রেক্কানে বুধস্য নবাংশে শুক্রস্য দ্বাদশাংশে বুধস্য ত্রিংশাংশে তস্যৈব যামার্দ্ধে চ গুরোর্দণ্ডে কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিত মেষরাশৌ চন্দ্রে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ বাবু মহাশয়স্য শুভ প্রথম কুমার জাতবান্।

ক্ষেত্রফল।

জীবস্য ক্ষেত্রে ধনবাংশ্চিরায়ুর্দাতা পবিত্রোগুণ সিদ্ধিযুক্তঃ। সৎকার্য্যকর্ত্তা পরদারধর্ষ্যো নানা ধনোভুবি গুণানুরাগী।

হোরাফল।

শান্তঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ স্থিরমতির্নিত্যং সুহৃৎ-পূজিতো নানারত্নবরাঙ্গনাত্মজধনৈর্যুক্ত সুবেশঃ শুচিঃ। ত্যাগী দেবগুরুদ্বিজার্চ্চনরতঃ পাত্রং ধরিত্রীপতের্হোরায়াং রজনীকরস্য ভবেচ্ছত্যপ্রিয়ো মানবঃ।

দ্রেক্কানফল।

দ্রেক্কানেঽমরপূজিতস্য সুতনুর্দীর্ঘায়ুরর্থান্বিতঃ সদ্বুদ্ধিঃ প্রিয়ভাষণোগুণনিধির্যুক্তযশো ধার্ম্মিকঃ। মোক্ষজ্ঞানপরঃ কৃপাময়তনুঃ শান্তঃ সুশীলঃ শুচিঃ।*

ইত্যোম্।

রাশিচক্র।
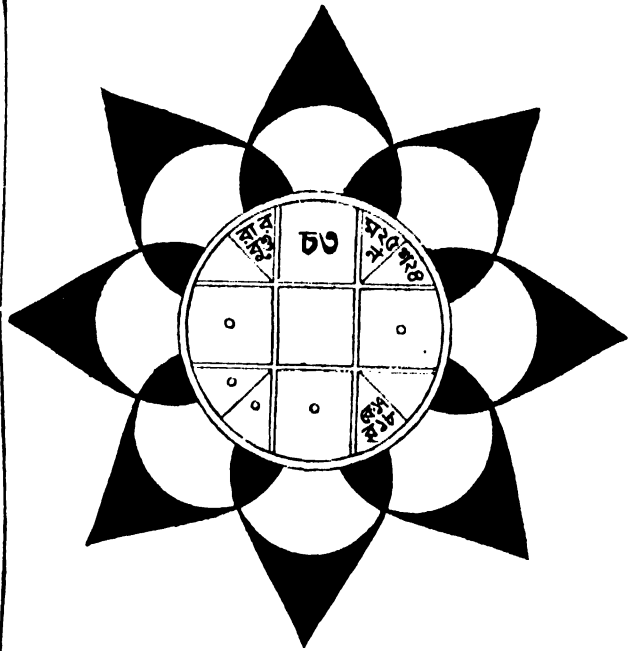
*শকাব্দা ১৭৩৯, সন ১২২৪, ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অমাবস্যা তিথিতে রাত্রি ১৯ দণ্ড ৫২ পলের সময়ে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে ৫২ দণ্ড ৩৮ পলের সময়, মীন লগ্নে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে চন্দ্রের হোরায়, বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে, বুধের নবাংশে, শুক্রের দ্বাদশাংশে, বুধের ত্রিংশাংশে, বুধের যামার্দ্ধে, বৃহস্পতির দণ্ডে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে মেষ রাশিতে শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রথম পুত্র রাশ্যাশ্রিত নাম শ্রীমান অন্নদা নাথ দেবশর্ম্মা ব্যক্ত নাম শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা (ঠাকুর) মহাশয়ের জন্ম।

ক্ষেত্রফল,—অর্থাৎ জাতকের মীনলগ্ন হওয়ায় মীনাধিপতি বৃহস্পতিই ক্ষেত্রাধিপতি। এই জীব (বৃহস্পতি) ক্ষেত্রে জন্ম হইলে জাতক ধনবান, দীর্ঘায়ুঃ, দাতা, পবিত্র

নববর্ষের উদ্বোধন। *

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ সূর্য্যের প্রথম রশ্মিরেখাপাতের সঙ্গে সঙ্গে নববর্ষ সমাগত। সর্ব্বাগ্রে আমরা আমাদের সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তিনি আমাদিগকে কৃপা করুন।

আমরা দুর্ব্বল, কিন্তু যিনি আমাদের চির-সহায়, চির-আশ্রয়স্থল, তিনি সর্ব্বশক্তির আধার, বিশ্বজগতের অধিপতি; আমরা অপূর্ণ, কিন্তু যাঁহার সহিত আমাদের চিরকালের সম্বন্ধ তিনি বিশ্বচরাচর-ব্যাপী অসীম অনন্ত পরিপূর্ণ; আমাদের এই শরীর মন রোগ শোক তাপ জরামৃত্যুর অধীন, কিন্তু আমাদের অশরীরী আত্মা অবিনশ্বর, অক্ষয় অমৃতের অধিকারী। আর সব ছাড়িয়া দিলেও মানব-জীবনের পক্ষে ইহাই কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

ঈশ্বরের অপার করুণা যে, তিনি মানবরূপে আমাদের সৃষ্টি করিয়া মোক্ষফলকে একেবারে আমাদের হাতে তুলিয়া দেন নাই। ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে, নানা চেষ্টা উদ্যম সংগ্রামের মধ্য দিয়া তিনি আমাদিগকে মঙ্গলের পথে, সত্যের পথে লইয়া যাইতেছেন। শিশুর প্রথম চলা অভ্যাসের ন্যায় উত্থানপতন, জয়পরাজয়, ঘাতপ্রতিঘাতে, নানা অভিজ্ঞতায় মানবজীবনের অভিব্যক্তি। ইহাতেই, এই প্রয়াসের মধ্যে লাভেই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। আমাদের নিরাশ হইবার, ভয় করিবার কোনই কারণ নাই, কেন না আমরা স্থির জানি, বিশ্বাস করি, সকল বিপদ সকল সঙ্কটের অন্ত-রালে বিশ্বপতি সেনাপতিরূপে থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন।

মানব আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি পরিমিত, সকল সময়ে মঙ্গলময়ের সকল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি সে সাধ্য সে স্পর্দ্ধা আমাদের নাই; শুধু এইটুকু বুঝি, জানি, যিনি এমন সুন্দর ধরণীতে এত স্নেহ-আয়োজনে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন ও প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি কখনই আমাদের অমঙ্গলের কারণ, বিনাশের হেতু হইতে পারেন না। শীতের পর বসন্ত, অন্ধকারের পর আলো, পুরাতনের পর নূতন,—জগতের ইহাই চিরন্তন নিয়ম। যে বর্ষ অতীত হইল, তাহার বক্ষের উপর ধূধূ কেবল চিতার অগ্নিই জ্বলিয়াছে, শুধু শ্মশানের ভস্ম লইয়া ম্লানমুখে বর্ষ বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও পরমেশ্বরের কি মঙ্গল-ইচ্ছা নিহিত আছে, এই ভস্মের মধ্যেও নবচেতনার নব-জাগরণের নবজীবনের কি কারণ-বীজ প্রচ্ছন্ন আছে তাহা কে বলিতে পারে!

মানবজীবনের লক্ষ্য এই,—ঈশ্বরকে লাভ করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন হইল কিনা তাহা আমরা আত্ম-প্রসাদেই বুঝিতে পারি। আত্মপ্রসাদ অর্থে আত্মার প্রসন্নতা, পরিতৃপ্তি, চরিতার্থতা, শান্তি, আরাম, আনন্দ। পক্ষী যেমন আকাশে বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া দুই পক্ষ দুই দিকে সমানভাবে বিস্তার করিয়া অবলীলাক্রমে ভাসিয়া বেড়ায়, আত্মপ্রসাদে আমা-দের চিত্তও ঠিক এইরূপভাবে আনন্দে ভাসিতে থাকে। যে কার্য্য মঙ্গলকর, ঈশ্বরের প্রিয়, তাহাতে আত্মপ্রসাদ হইবেই হইবে, এবং আত্মপ্রসাদ হইলেই আমরা বুঝিতে পারি আমাদের কার্য্য সত্য-সত্যই মঙ্গলকর, ঈশ্বরের প্রিয় হইয়াছে।

গীতায় আছে, আমাদের দেহের অপেক্ষা ইন্দ্রিয় বড়, ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা মন বড়, মনের অপেক্ষা

গুণ ও সিদ্ধিযুক্ত, সৎকার্য্যকারী, পরদার-বিরত, প্রচুর ধনযুক্ত এবং বহুগুণযুক্ত হইয়া থাকে।

হোরাফল;—লগ্নমানের দ্বিভাগের প্রথম ভাগকে প্রথম হোরা এবং দ্বিতীয় ভাগকে দ্বিতীয় হোরা বলে। মীনলগ্নে প্রথম হোরার অধিপতি চন্দ্র। জাতকের এই চন্দ্রের হোরায় জন্ম হওয়ায় জাতক শান্তমূর্ত্তি, সর্ব্ব গুণভূষিত, স্থিরবুদ্ধি, নিয়ত সুহৃৎপূজিত, বিবিধ রত্ন উত্তম স্ত্রীপুত্র ও ধনযুক্ত, সুন্দর বেশকারী, পবিত্র, ত্যাগশীল, দেবতা ও দ্বিজার্চ্চনে রত, রাজপাত্র, সুন্দর শরীর সম্পন্ন ও সত্যপ্রিয় হইবেন।

দ্রেক্কাণ ফল;—লগ্নের তিন ভাগের এক এক ভাগকে দ্রেক্কাণ বলে। এই তিন ভাগের এক এক ভাগের অধি-পতি এক একটী স্বতন্ত্র গ্রহ। জাতকের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হওয়ায় বৃহস্পতি ইহার অধিপতি। এই বৃহস্পতি দ্রেক্কাণে জন্ম হওয়ায় জাতক সুন্দর দেহ ও দীর্ঘায়ুঃ-বিশিষ্ট, রত্নান্বিত, সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রিয়ভাষী গুণনিধিযশ-যুক্ত, ধার্ম্মিক, মোক্ষজ্ঞানপরায়ণ, দয়ালু, শান্ত, সুশীল, শুচি, বিখ্যাত ও যশস্বী হইয়া থাকেন।

* বিগত ১লা বৈশাখ মহর্ষিদেবের ভবনে নববর্ষের উৎসব উপ-লক্ষে পঠিত।

বুদ্ধি বড়, বুদ্ধির অপেক্ষা আত্মা বড়। এই আত্মার ক্ষুধার অন্ন, একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু সেই পরমাত্মা। এই পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য মানবাত্মা চিরদিনই ব্যাকুল। পরমাত্মাই মানবাত্মার একমাত্র গতি, আর দ্বিতীয় গতি নাই।

এই নববর্ষে এস আমরা নবজীবনযাপনের জন্য সকলেই প্রস্তুত হই, প্রাচীন জীবনের সমস্ত ভুলভ্রান্তি পাপ মলিনতা দূর করিয়া আমরা আমাদের আত্মায় পরমাত্মার সিংহাসন রচনা করি, তাঁহাকে বসাই; সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জীবনে মরণে একমাত্র তাঁহারই চরণ ধরিয়া থাকি।

এস নূতন, তুমি এস। উষালোকে, পুষ্পসৌরভে, মঙ্গল-আবাহনের শঙ্খধ্বনিতে তুমি এস। আমরা তোমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তোমার আগমনে সব বিচ্ছেদ বন্ধুত্বে পরিণত হোক্, হিংসা-দ্বেষ দূর হোক্, সমস্ত বিদ্রোহ সংগ্রামের শান্তি হোক্। নববর্ষ, তুমি আশার মঙ্গলবাণী ল'য়ে এস। ভগবান তোমাকে জয়যুক্ত করুন তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

নববর্ষে নবীনতা।

(শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

নববর্ষের দিনে, যখন চারিদিকে নব কিসলয়ে পুষ্পদলে বৃক্ষলতা সমূহ নবশোভা ধারণ করে এবং বিহগেরা নব নব সুরে তান ধরিতে সুরু করে, তখন আমাদের হৃদয়ে কি নবীনতা সঞ্চারিত হয়! আমরা পুরাতন দুঃখ শোকের কথা ভুলিয়া নবীন আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যাই। এই যে জগতে নবীনতার স্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠে, ইহা কোথা হইতে আসিল? চিরদিনইত আমরা দেখি নববর্ষাগমে সকলই নবীন হইয়া উঠে। তবে কেন এই নবীনতা আমাদিগের অন্তরে নূতন স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে? চিরদিনইত দেখি বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর শীত, শীতের পর বসন্ত ক্রমান্বয়ে ঋতু পরিবর্ত্তনে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল হইতেছে। তথাপি ঐ বর্ষারম্ভ আমাদের মনে এক বিকাশের ভাব জাগাইয়া তোলে কেন? কোন জিনিষই তো নূতন নয়। যাহা গিয়াছে, তাহাই আবার ফিরিয়া আসিতেছে—যাহা আসিয়াছে তাহাই আবার চলিয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে নূতনত্ব কোথায়? অথচ ইহাই আবার চিরনবীনতা জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সেই চিরনবীন পুরুষ—যিনি অন্তরে অন্তরে থাকিয়া এই নবীনতার সঞ্চার করিতেছেন। তিনি ত চিরপুরাতন অথচ তিনি চিরনূতন। এই জগতের অন্তরে সেই আনন্দময় পুরুষ আছেন বলিয়া, আমরা চিরপুরাতনের মধ্যে চিরনূতনত্বের রসাস্বাদ করিতেছি। বৃক্ষের মূল সমস্ত বৃক্ষে রস সঞ্চার করে বলিয়াই বৃক্ষ যেমন নূতন শাখা প্রশাখায় নানা ফলফুলে পরিশোভিত হয়, সেইরূপ চিরনবীন আনন্দপুরুষ জগতের অন্তরে থাকিয়া রস সঞ্চার করিতেছেন বলিয়া জগতের পুরাতনত্ব ঘুচিয়া গিয়া, নিত্য নবীন রসের সঞ্চারে আনন্দের উদ্ভব হয়—জগত নিত্য নবশোভা ধারণ করে।

আমরা নববর্ষের নব পত্রোদ্গমে বিহগের নব নব তানে প্রভাতের নবীন আলোকে সেই নবীন পুরুষের রসাস্বাদন করিতে পারি বলিয়া আমাদের এত আনন্দ। এ আনন্দের অন্ত নাই, ইহাতে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, দুঃখ তাপে জর্জ্জরিত মন আনন্দের বিকাশে ঢল ঢল হইয়া উঠে। সংসারের এই উত্থানপতন এই সুখদুঃখের তরঙ্গে এক নিত্য আনন্দের স্রোত চলিয়াছে। আমাদের কি ভয়? পুরাতনের অন্তরে অন্তরে নবীনতার উদ্গম। আমরা যেখানে থাকিনা কেন, যতই পুরাতন হইয়া যাই না কেন, যতই জীর্ণ হই না কেন, আবার নবভাব নবচ্ছন্দ আমাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিবে। দিনের পর দিন বর্ষের পর বর্ষ—যুগের পর যুগ চলিয়া যায়, তবু এ নূতনত্বের অন্ত নাই। নববর্ষের সমাগমে সেই চিরনবীন পুরুষ তাঁহার আনন্দরসের সঞ্চারে আমাদিগকে সরস ও সজীব করিয়া তুলেন; আমাদিগের মধ্য হইতে সকল অকল্যাণ দূর করিয়া নবীনতর কল্যাণে বিকশিত করিয়া তুলেন।

হে আনন্দময় নবীন পুরুষ তোমার আনন্দের অন্ত নাই। তোমার নূতনত্বের অন্ত নাই। তুমি আমাদের প্রাণে নবীনতার কণা সঞ্চার কর, যাহাতে আমাদের এই জীবনবৃক্ষ নব নব ভাবে বিকশিত হইয়া নব নব ফল ধারণে তোমার চরণে আনত

হইতে পারে। হে প্রভো তোমার নবীনতা আমাদের প্রাণকে যেন চিরনবীন করিয়া রাখে। আমরা নব-বলে বলীয়ান হইয়া তোমার নবীনতায় যেন তন্ময় হইয়া যাই। *

কয়েকটী কুড়ানো গান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমি অল্প কয়েক দিন হইল একবার বোল-পুর গিয়াছিলাম। তথা হইতে ফিরিবার কালে ষ্টেশনে বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটী ভিখারী গান করিতে আরম্ভ করিল। আমি তাহার নিকট হইতে যে তিনটী গান সংগ্রহ করিতে পারিলাম তাহাই প্রকাশ করিলাম। গানগুলি কিন্তু শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইতেছিল যে যেমন এই সকল গানের সাহায্যে আমাদের দেশে ধর্ম্মভাব গুরুভক্তি প্রভৃতি সমাজের নিম্নতম শ্রেণীতে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তেমনি কবে ব্রাহ্মসমাজ থেকে এই রকম প্রাণের সরল ভাষার গান বাহির হইয়া দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মর্ম্মে মর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করাইতে পারিবে? এরূপ আর একটী গানও পুরাতন কাগজের মধ্য হইতে আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে প্রকাশ করিলাম।

১ম গান—নূতন কারখানা।

(নেপালের ক্ষ্যাপা ফকীরের গান)

কত নূতন উঠছে কারখানা (ধুয়া)
দিল দরিয়ার মাঝে।
তাতে ডুবলে পরে রতন মিলে
(ক্ষ্যাপা) ভেসে উঠলে হবে না।
এই নদীতে হরপা এসে
কত দ্বীপ দ্বীপান্তর যায় গো ভেসে
তিনকে যে একই করেছে
তাঁর বা কিসের ভাবনা?
চারি ভিতে বাগান আছে
তাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রয়েছে
সেই ফুলে জগত মেতেছে
আমার নাসা মাতল না।

২য় গান—তেন্নি তেন্নি তেন্নি।

(ক্ষ্যাপা ফকীরের গান)

তেন্নি তেন্নি তেন্নি পিরীত
করবি আমার মন (ক্ষ্যাপা)—(ধূয়া)
দয়াল রামের শরণ লয়ে
চরণ পেলেন বিভীষণ।
প্রহ্লাদ যখন শিশুকালে
পড়ে হস্তি-চরণতলে
ডেকেছিল কৃষ্ণ বলে
রক্ষা করলে নারায়ণ।
বনের পশু বীর হনুমান
সদাই করে রামগুণগান,
ডঙ্কা মেরে লঙ্কায় গিয়ে
করলে সীতার অন্বেষণ॥

৩য় গান—আজব কারখানা।

(ক্ষ্যাপা ফকীরের গান)

কি আশ্চর্য্য আজব কারখানা
তোরা কে যাবি দেখতে যা-না।
হয়েছে কলকাতা বেশ
খবরেতে সকলই গেছে জানা
ভাল ধন্য রাণী কুইন বিক্টোরী
কি করে তয়ের করেছে।
ওরে কল অবিকল হইছে সকল
দেখিলে বুঝিতে নারি—যায় না জানা।
লাল কালা শ্বেত মৎস্য রয় জলে।
সিংহ ব্যাঘ্র বনপশু দেখ সকলে॥
রয়েছে বনমানুষে আর
রাক্ষসী ফণীগণ ধরে ফণা।
নানা জাতি কুল সারি সারি
ওরে তার মধ্যেতে তরমুজকোটা
যাই বলিহারি।
কাঁচা পাকা যায় না লেখা
বাহার তার ষোল আনা।
নানা জাতি পক্ষী রয় সুখে
আপন মনে নৃত্য করে
বাক্য নাই মুখে (ক্ষ্যাপা)।
রয়েছে হাতী ঘোড়া কুঁজো থোঁড়া
চালসে ফরকুটী কাটা

---

* গত ১লা বৈশাখে মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর ৪৭ নং ওল্ড বালিগঞ্জ রোডস্থ ভবনে পঠিত।

আছে মাণিক মুক্তা প্রবাল আর হীরে
যেন চাঁদের চাঁদির তুল্য তেমনি হয়েছে সোনা
দেখিলে জনম ধন্য দেখ নয়ন ভরে
(যে দেখেছে সে)
ক্ষ্যাপা বাউলের এই বাণী
শ্রীগুরু মোর পঞ্চাননের চরণ দুখানি
হরিয়ে হৃদে ধারণ হোক না মরণ
দেখতে আমি পেলাম না।

৪র্থ গান—পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।

আমার শূন্য ঘটকে পূর্ণ কর
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
আমার দেহ বৃক্ষ, তুমি তার মূল গুরু,
ফলে ফুলে হন শোভন॥
আমার জন্ম কর্ম্ম সার্থক হবে
গুরুর সঙ্গেতে হলে মিলন।
পত্র শাখা দৃঢ় হবে
কালের ঝড়ে হবে না পতন॥

মাতৃপ্রেমের অভিব্যক্তি।

(রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব এম, এ,)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যখন জগতের অভিব্যক্তি নৈসর্গিক নিয়মাবলীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সৃষ্টিপ্রকটন ধারাবাহিকরূপে এই নিয়মাবলম্বনেই সংসাধিত হইতেছে, তখন ইহা একপ্রকার নিঃসন্দেহচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, বংশরক্ষাকল্পে ইতর জন্তুদিগের মধ্যে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, মানবের আদিম অবস্থাতেও তদ্রূপই ব্যবস্থা ছিল, ইতর জন্তুর ন্যায় মানবজাতিরও সহবাসের নিমিত্ত বৎসরের বিশেষ সময় কিম্বা ঋতু নির্দ্দিষ্ট ছিল। কালসহকারে মানব যখন শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ ও বল্কল বস্ত্র ব্যবহার দ্বারা সূর্য্যের প্রখর কিরণ, শীতের দারুণ নির্য্যাতন ও বর্ষার বারিধারার আক্রমণ হইতে শিশুর জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইল এবং কিরূপে শস্য উৎপাদন করিতে হয় ও অসময়ের জন্য তাহা সঞ্চয় করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিল, তখন আর তাহার সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য অনুকূল সময়ের মুখাপেক্ষী হইবার আবশ্যকতা থাকিল না। শিশুকে কিরূপে লালন পালন করিতে হয় জননী তাহা শিক্ষা করিয়াছেন; আহার্য্য যোগাইবার ভার জনক আপনার স্কন্ধোপরি গ্রহণ করিয়াছেন—এক কথায় বলিতে গেলে, পারিবারিক জীবন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। একের সহানুভূতিতে অন্যের জীবনধারণভার অনেক লাঘব হইয়াছে—সহবাসের জন্য সময়ের অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার মুখাপেক্ষী হইবার আর কোন আবশ্যকতা আসিতেছে না। ইহাই হইল পারিবারিক জীবনের প্রথম সূত্রপাত। স্বার্থত্যাগ ও পরস্পরের সহায়তা এতদুভয়ের সহযোগিতার উপর পারিবারিক জীবন প্রধানত নির্ভর করে। এই উভয়বিধ কার্য্যের মধ্যে ভালবাসার বীজ লুক্কায়িত থাকিলেও ইহার প্রকাশ সময়সাপেক্ষ।

মানবজাতির আদিম অবস্থার বিষয় অবগত হইতে হইলে সভ্যতার আলোক হইতে সুদূরে অবস্থিত অরণ্যবাসী স্বভাবশিশু অসভ্যদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাহাদিগের জীবন সম্বন্ধে হেনরি ড্রমণ্ড লিখিয়াছেন—"হোবা জাতির মধ্যে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার কথা কেহ চিন্তাই করে না; উইনিবাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার কোনই চিহ্ন দেখা যায় না; বেনি আমেরু জাতির মধ্যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা দেখানো অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। এস্কিমোগণ স্বীয় স্ত্রীদিগের প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। অষ্ট্রেলীয় অসভ্যগণ তাহাদের স্ত্রীদিগের প্রতি যে ভয়াবহ নিষ্ঠুর আচরণ করে তাহা তাহাদের অস্ত্রসমূহেও প্রকাশ পায়।" *

---

* Among the Hovas, we are assured by authorities, the idea of love between husband and wife is hardly thought of; that at Winebah not even the appearance of affection exists between them; that among the Beni Amer it is considered even disgraceful for a wife to show any affection for her husband. The Esquimos treat their wives with great coldness and neglect. The savage cruelty with which wives are treated by the Australian aborigines is indicated even in their weapons.

Henry Drummond P. 385.

ড্রমণ্ড যদি স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার অভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া এখানেই নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা হইলে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তিনি এবিষয়ে হিন্দুদিগকেও অসভ্যদিগের সহিত একই শ্রেণীভুক্ত করিয়া বলিয়াছেন—"'দাস, ক্রীতদাস' প্রভৃতি যে সকল নামে ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে সম্বোধন করে এবং প্রত্যুত্তরে 'মনিব, প্রভু' প্রভৃতি যে সকল নামে তাহাদের স্ত্রীরা স্বামীদিগকে সম্বোধন করে, সেই সকল নামই উভয়ের মধ্যে মহাব্যবধানের পরিচয় প্রদান করে।" * অবশ্য তিনি লেখনীধারণকালে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যে, আর্য্য জাতির যে মূল শাখাকে তিনি অসভ্য জাতিদিগের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সেই শাখাই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের প্রসবিতা, এবং কি ধর্ম্মে কি কর্ম্মে সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই ভারতের আর্য্য নরনারী অদ্যাপি জগতের আদর্শস্থল। ড্রমণ্ডের ন্যায় জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লেখকেরও এরূপ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মত রুডিয়ার্ড কিপলিঙ্গের বিখ্যাত উক্তিকে (East is East and West is West—the two will never meet) স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রতীচ্য জাতির পক্ষে প্রাচ্য জাতির রীতি নীতি আচার ব্যবহার সম্যক উপলব্ধি করা বাস্তবিক কঠিন ব্যাপার। সতী সীতা সাবিত্রীর জন্মে যে জাতি গৌরবান্বিত, সেই জাতি ভালবাসার উচ্চ আদর্শবিহীন, এরূপ অনুমান অজ্ঞতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলা অসংগত হইবে না যে প্রাচীন হিন্দুসমাজে চিরকালই এই উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। প্রাচীনকালে ব্রাহ্ম বিবাহ অপেক্ষা আসুরিক বিবাহ প্রথাই অধিকতর প্রচলিত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ ও পৃথ্বীরাজের সংযুক্তালাভ বীরত্ব প্রদর্শন হিসাবে বিশেষ গৌরবের কারণ হইলেও উভয়স্থলেই যে ভালবাসার উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হয় নাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

স্ত্রীত্ব কি এবং পুংস্ত্বই বা কি, আজ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দানে সমর্থ হন নাই, অথচ সৃষ্টিপ্রকটনের প্রথম ক্রমের মধ্যেই এই ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বংশরক্ষাই যে ইহার প্রধান কার্য্য আমরা এ যাবত তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যে স্থলে অন্য উপায়েও এই কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবপর সে স্থলে পুংজাতীয় ও স্ত্রীজাতীয়ের একত্রবাসের কোন আবশ্যকতা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপে মিসরদেশীয় খর্জুর বৃক্ষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুংজাতীয় বৃক্ষ মরুভূমির অনুর্ব্বর প্রদেশে জন্মিয়া থাকে এবং স্ত্রীজাতীয় বৃক্ষ বাগানের শোভা পরিবর্দ্ধন করে। পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার প্রাক্কালে মরু প্রদেশ হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহ সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহারই সাহায্যে তত্রত্য বৃক্ষের পুষ্পপরাগ উদ্যানে প্রবেশ লাভ করত উদ্যানস্থ খর্জ্জুর পুষ্পের সফলতা সম্পাদন করে।

অনেক স্থলে আবার এরূপও দেখা যায় যে পুংসংসর্গ ব্যতীতও সন্তানোৎপাদন সম্ভবপর হইতে পারে—উদাহরণ স্থলে বাওয়া ডিম্বের (Parthenogenesis) ও মৌমাছির গর্ভাধানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদ্ভিদ জগতে তো নানা উপায়েই এই বংশরক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। প্রাকৃতিক তত্ত্বানুসন্দিৎসুগণ অবগত আছেন, সৃষ্টিপ্রকরণ কিরূপ সাবধানতার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন প্রকার হঠকারিতা কিম্বা চঞ্চলতার স্থান নাই। কোন লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রকৃতি একবার যে উপায় উদ্ভাবন করেন তাহা অপরিহার্য্য ও অপরিবর্ত্তনীয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কেবল সন্তানোৎপাদনের উদ্দেশ্যেই কি এই স্ত্রী পুরুষভেদের সৃষ্টি, অথবা ইহার মধ্যে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে ভাইজম্যান (Weisman) বলিয়াছেন—"নৈসর্গিক নির্ব্বাচন কার্য্যের সাহায্যকল্পে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি ভিন্ন এইরূপ সন্তানোৎপাদনের ব্যবস্থার যে অন্য কি অর্থ আছে, তাহা আমি জানি না।" * ডারউইন-

* "The very names "servant, slave", by which the Brahmins address their wives and the wife's reply "master, lord" symbolize the gulf between the two.

* I do not know what meaning can be attributed to sexual reproduction, other

কৃত "Orgin of Species" নামক গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক পরিবারে আকৃতিগত যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইয়া থাকে, ভাইজম্যান এস্থলে তাহারাই উল্লেখ করিয়াছেন। শারীরস্থানবিদ্যার হিসাবে এই উক্তির মধ্যে যে অনেক সত্য রহিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু লিঙ্গভেদরহস্য যে এইখানেই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। ইহার অন্তরালে কোন নৈতিক তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে কিনা আলোচনা করা যাক।

জীবতত্ত্ববিদগণ সাধারণত জীব সকলকে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সর্ব্বনিম্নস্তরস্থ জীব Protozoa নামে অভিহিত। সিলেনটেরাটস (Coelenterata) তদপেক্ষা সামান্য উন্নত। তৎপর কীট ও শম্বূক জাতীয় জীব। এই সকল প্রাণী মেরুদণ্ডবিহীন। এই সকল হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই মীনজাতীয় জীবের উল্লেখ করা যায়। তৎপরে জল ও স্থল উভচর জীব, তাহার পর বিমানবিহারী এবং সর্ব্বশেষে স্তন্যপায়ী জীব। অনেকে মনে করেন এই স্তন্যপায়ী জীবেতেই মাতৃত্বের প্রথম অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে জন্মদায়িনীর পক্ষে মাতৃত্বের উন্নত পদবী লাভ করা সম্ভবপর ছিল না। বিষয়টা একটু তলাইয়া দেখা যাউক।

স্তন্যপায়ী জীবের বিকাশের পূর্ব্বে অধিকাংশ জীবই সন্তানের পরিবর্ত্তে অণ্ড প্রসব করিত। যাহাতে এই অণ্ড সুরক্ষিত হয় ও ইহা প্রস্ফুটিত হইবার অনুকূল স্থানে সংস্থাপিত হয় তৎসম্বন্ধে প্রসূতির যত্নের কোন ত্রুটি লক্ষিত হইত না এবং এখনও হয় না। সকলেই অবগত আছেন যে নদীর শীতল বায়ুপ্রবাহ হইতে দূরে অথচ নাতিশীতোষ্ণ ও জল হইতে অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক কচ্ছপ তাহার ডিম্ব সংস্থাপন করে—তাহার কারণ এই যে, ঠাণ্ডা লাগিলে ডিম্ব নষ্ট হইয়া যাইবে এবং জল হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে ইহাকে স্থাপন করিলে কচ্ছপ-শাবককে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। প্রজাপতি অতিশয় সাবধানতার সহিত তুঁতপত্রের নিম্নভাগে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, যাহাতে ডিম্ব বাহিরের শত্রুর দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া পূর্ণতালাভে সমর্থ হয় এবং গুটিপোকা তাহা হইতে বহির্গত হইবামাত্রই মুখের সম্মুখে আহার্য্যপত্র লাভ করিতে পারে।

এই উভয়স্থলেই প্রসূতির ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের রক্ষার জন্য আগ্রহাতিশয্য ও সাবধানতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহাকে মাতৃস্নেহ বলা যাইতে পারে না। গুটিপোকার অণ্ড প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই প্রজাপতির জীবনলীলা শেষ হইয়া যায়। কচ্ছপজননীর পক্ষে নিজের সন্তানের সাক্ষাৎকারলাভ কিম্বা পরিচয় গ্রহণের কোন উপায় থাকে না। একপ্রকার মাকড়সা জাতীয় কীট আছে, যাহার ডিমগুলি অতি যত্নসহকারে নিজের বক্ষদেশে সংলগ্ন এক ঝুলির মধ্যে রক্ষিত হয়, ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইবামাত্রই জননী প্রাণত্যাগ করিলেও সদ্যপ্রসূত শিশুগুলি যতদিন পর্য্যন্ত অন্যত্র গমনের উপযুক্ত না হয়, ততদিন জননীর মৃতদেহই তাহাদের একমাত্র আহার্য্য হইয়া পড়ে। সন্তানের হিতার্থে আত্মত্যাগের কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত। কিন্তু এখানেও মাতৃভাবের সম্পূর্ণ অভাব। এই আত্মত্যাগ পূর্ব্বোল্লিখিত পুষ্পের আত্মত্যাগের সহিত একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জননী নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা মা বলিতে যাহা বুঝি তাহার কোন চিহ্ন এই স্থলে বিদ্যমান নাই। শিশুর লালন-পালন, সংরক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার অভাববিমোচনের চেষ্টা ও যত্নই মাতৃত্বের লক্ষণ।

প্রসবিনীর এই মাতৃপদবী লাভ করিবার পূর্ব্বে অন্তত চারিপ্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া গমন করিতে হইয়াছে—

(১) একসঙ্গে প্রসূত সন্তানের সংখ্যাধিক্যের খর্ব্বতা

(২) প্রসূতির সহিত সন্তানের অবয়বগত সাদৃশ্য

(৩) ভূমিষ্ঠ সন্তানের আত্মরক্ষায় অপারগতা

---

than the creation of hereditory individual character to form the material on which natural selection may work. (Biological memoirs P. 281.

(৪) প্রসূতি ও সন্তানের একত্র অবস্থানের ব্যবস্থা।

দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাউক—মৎস্য এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ভেকও সহস্র পরিমাণ ডিম্বের প্রসূতি। সরীসৃপ জাতীয় জন্তু সকলও শত শত ডিম্ব প্রসব করে। এই সকল ডিম্ব হইতে প্রস্ফুটিত শত সহস্র ও লক্ষ লক্ষ সন্তানকে নিজের সন্তান বলিয়া জানাই অসম্ভব। আর, জানিতে পারিলেও এক মাতার পক্ষে এতগুলি সন্তানের লালনপালন ও সংরক্ষণ অসম্ভব এবং ইহারাও সেই যত্নের মুখাপেক্ষী নহে—ডিম্ব হইতে বাহির হইবামাত্রই নিজেদের জীবনরক্ষার উপায় নিজেরাই করিতে সক্ষম। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে মাতা ও সন্তান সম্বন্ধের সম্পূর্ণ অভাব। ইহাদিগকে সন্তান না বলিয়া বরং ইংরাজীতে যাহাকে offspring বলে সেই নামেই অভিহিত করাই অধিক সঙ্গত হইবে। ইহারা যেন ভেকের উল্লম্ফনের ন্যায় এক লাফে জননীর দেহ হইতে উৎপন্ন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনরাজ্যে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু যতই আমরা উপরের দিকে গমন করিতে থাকি ততই দেখিতে পাই সন্তানের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হয় এবং পরিশেষে একবারে মাত্র একটী সন্তানেই পর্য্যবসিত হয়। *

সন্তানের অবয়বগত সাদৃশ্য—সৃষ্টির নিম্নস্তরস্থিত জীবের মধ্যে এই সাদৃশ্যের বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। কোন কোন জন্তুর সন্তানের অবয়বগত বৈষম্য এত অধিক যে বহুকাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এস্থলে প্রজাপতি ও গুটিপোকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় নিজের সন্তানকে চিনিয়া লওয়াই অসম্ভব। যতই আমরা সৃষ্টির উন্নততর স্তরে আরোহণ করি ততই ঐ আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য বিলুপ্ত ও সাদৃশ্য সংস্থাপিত হইতে দেখিতে পাই। ছাগ মেষ গরু প্রভৃতি জন্তুর মধ্যে এই সাদৃশ্য এত অধিক যে শাবককে জননীর ছোটখাটো একটী প্রতিকৃতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

* এ স্থলে যমজ সন্তানের কথা যদি কেহ উল্লেখ করেন, তাহাকে এইটুকু বলিতে পারি যে তাহা বিশেষ কারণে সংঘটিত হয়।

এই সকল জন্তুর মধ্যে সন্তানের প্রতি প্রসূতির যে কিপ্রকার আকর্ষণ, তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমি একবার দেখিয়াছিলাম—রাস্তার উপর একটী মেষ চরিতেছিল ও তাহার পার্শ্বে একটী সদ্যপ্রসূত মেষশাবক ক্রীড়া করিতেছিল। একটী বালক দুষ্টবুদ্ধির পরবশ হইয়া শাবকটীকে মেষের নিকট হইতে ছিনাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন মেষের যে ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, অনেক কাল তাহা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। পরিশেষে মেষের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বালকটী অন্যান্য কয়েকজন বালকের সাহায্যে মেষশাবককে উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন জননীর সকরুণ আর্ত্তনাদ ও পাগলিনীর ন্যায় ঐ বালকের অনুসরণ ও তাহার হস্ত হইতে শাবককে রক্ষা করিবার জন্য শতসহস্র প্রকারের চেষ্টা, এই সকলের স্মৃতি অদ্যাবধি প্রস্তরবক্ষে খোদিত লিপির ন্যায় আমার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর মেষের ন্যায় স্তন্যপায়ীমাত্রের জীবন একমাত্র স্তন্য দুগ্ধের উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ দুগ্ধের অভাব হইলে সন্তানের ধ্রুব মৃত্যু। এই আত্মরক্ষার অসমর্থতা যেস্থলে বিদ্যমান, সেই স্থলেই জননীর মধ্যে শিশুর সংরক্ষণ ও অভাব বিমোচনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেখিলে মনে হয় যে প্রকৃতি মাতৃমূর্ত্তির অভিব্যক্তি মানসেই স্ত্রীপুরুষভেদ দ্বারা বংশরক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন, এবং স্তন্যপায়ী শিশুকে আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া মাতৃত্ব স্ফুরণের অবসর প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মাতৃত্বের পূর্ব্বাভাস মাত্র। মেষশাবক আত্মরক্ষায় পরাঙ্মুখ অবস্থায় জগতে অবতীর্ণ হইলেও ইহার অভাব এতই সামান্য যে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য জননীকে বিশেষ কোন আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই শাবক নিজের পায়ের উপর দণ্ডায়মান হইতে ও দৌড়াইতে শিখে—শারীরিক বলও যথেষ্ট লাভ করে; শরীর ঘনসন্নিবিষ্ট কোমল রোমে আচ্ছাদিত হওয়াতে নৈসর্গিক বাধাবিঘ্ন সকল অতিক্রম করিবার জন্য জননীর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। মাতৃত্ব এখানে নিজ শক্তিবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইতেছে না। মেষশাবক

সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সর্ব্বপ্রকার স্তন্যপায়ী পশু শাবক সম্বন্ধে এই কথা।

পশুরাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক মানবসমাজে যখন আগমন করি তখন কি দেখিতে পাই? মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বাবধিই ইহার জীবনরক্ষার জন্য কত না উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রাণী-জগতে এরূপ অসহায় অবস্থায় আর কাহাকেও আগমন করিতে দেখা যায় না। অপরের সাহায্য না পাইলে এই শিশুকে প্রসবমাত্রই মৃত্যুর আলিঙ্গনে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত। পশুরাজ্যের শীর্ষ-স্থানীয় একটী বানরশিশুর সহিত মানবশিশুর যদি তুলনা করি, তবে দেখিতে পাই যে অনেক বানরশিশু জন্মের অব্যবহিত পরেই জননীর পার্শ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইতে সমর্থ হই-তেছে, কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই সে বৃক্ষের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া নিজের জীবনরক্ষার উপায় বিধান করিতেছে। কিন্তু মানবশিশুকে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাল সর্ব্বপ্রকার অভাব বিমোচন ও জীবন-রক্ষা বিষয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। যে সকল অস্থি ও মাংসপেশীসমবায় বানরশিশুতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানবশিশুতেও তাহার কোন এক-টীরই অভাব নাই। তবে এই বৈষম্য কেন? সৃষ্টিকার্য্য যে পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে গতি এরূপ পশ্চাদগামী হইল কেন? প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যেই বিশেষ উদ্দেশ্য বর্ত্তমান দেখা যায়—এই অকস্মাৎ গতিপরিবর্ত্তনের মধ্যেও যে গূঢ়তত্ত্ব রহি-য়াছে একথা কে অস্বীকার করিবে?

আমরা দেখি যে প্রকৃতি মানবশিশুকে এরূপ অসহায় অবস্থায় সংস্থাপিত করিয়া মাতৃত্বের সৃষ্টি করিতেছেন। অবশ্য এই কার্য্যের প্রারম্ভে প্রত্যেক অসভ্য জননীই যে সন্তানের জন্য এতটা ক্লেশ স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু প্রকৃতির অনুশাসন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, আমার এই অসহায় নবসৃষ্ট জীবকে তোমার বক্ষে ধারণ করিয়া ইহার সর্ব্বপ্রকার অভাব বিমোচন কর। যে জননী এই আদেশ পালন করিল না, তাহার সন্তান অচিরে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইল, এবং সেই অযোগ্য রমণীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার বংশও লোপ পাইল। কিন্তু সেই রমণীর বংশবিনাশ অপরের পক্ষে বিশেষ লাভের কারণ হইল। তাহারা নিজ নিজ শিশুর জীবন-রক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন পাইতে লাগিল।

ইহাই পারিবারিক জীবনের মূল ভিত্তি এবং এই ভিত্তির উপরেই সেই অলঙ্ঘ্য প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত, যাহা পশুরাজ্য হইতে মানবরাজ্যকে পৃথক করিয়া দিতেছে। এই মানবশিশুর জন্মপরিগ্রহ সৃষ্টিরাজ্যের এক বিশেষ ঘটনা। যে নিগূঢ় উদ্দেশ্যে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়া প্রকৃতি সৃষ্টিব্যাপারে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, অগণ্য কোটী কোটী বৎসরের পরিশ্রমের পর আজ তাহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

এই মানবশিশুর আগমনে কেবল যে একটী জড়দেহধারী জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে। ইহাকে অবলম্বন করিয়া নৈতিক জীবন জগতের ইতিবৃত্তে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশে সমর্থ হইয়াছে। এই অসহায় মাংসপিণ্ডপ্রতিম শিশুই সর্ব্বপ্রকার কোমল ও কমনীয় বৃত্তির আদি শিক্ষক।

মানবশিশুকে এই প্রকার আত্মরক্ষার অনুপযুক্ত অবস্থায় প্রেরণ করিয়া স্রষ্টা যে কেবল নৈতিক জীবনেরই উদ্ভব করিয়াছেন তাহাও নহে। ইহার মধ্যে আরো বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। শরীর-তত্ত্ববিদগণ অবগত আছেন যে একটী যন্ত্রের গঠনবৈ-শিষ্ট্য দ্বারা মানবশিশুকে বানরশিশু প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার প্রাণীজগত হইতে পৃথক করা হয়। সেই যন্ত্রটী মানবের মস্তিষ্ক। এই যন্ত্রটী এরূপ জটিল এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী এরূপ সূক্ষ্মভাবে ও নিপু-ণতার সহিত নিষ্পন্ন হইতেছে যে আমরা তাহা ধার-ণাই করিতে পারি না।

প্রকৃতি শিশুকে অসহায় অবস্থায় সংস্থাপন করিয়া একদিকে যেমন মানবের পাশবিক বৃত্তিনিচ-য়ের উপর নৈতিক বৃত্তির আধিপত্য বিস্তারের উপায় বিধান করিতেছেন, অপরদিকে যে উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া সৃষ্টি উন্নতির সোপানে প্রধাবিত হইতেছিল, শিশুকে সেই উদ্দেশ্য সম্পাদনের উপযোগী করিয়া গড়িতেছেন। ইতর জন্তুর জীবনপ্রবাহ যন্ত্রের ন্যায় এক চিরন্তন পদ্ধতি অবলম্বনে চলিয়া যাইতেছে—ইহাতে লেশমাত্র অভিনবত্ব নাই। কিন্তু এরূপ একটী স্বতশ্চল যন্ত্র হইতে মানবশিশু সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

মানবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিকার্য্যের শেষ যবনিকা পতিত হইয়াছে। অতঃপর আর কোন নূতন জীবের সৃষ্টির প্রয়োজন নাই। বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার এই বিশাল শিল্পশালায় মানবকে প্রথমে শিক্ষানবিশ ও তৎপরে সহযোগীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মানবের দ্বারা অনেক নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন, নূতন কার্য্যের সমাধান ও জীবনরহস্যের অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনার্থ মস্তিষ্করূপ যন্ত্রকে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট করা আবশ্যক, তাহার সন্নিবেশকল্পেই প্রকৃতি মানবশিশুকে গর্ভাশয়ে এত দীর্ঘকাল নিশ্চল অবস্থায় রাখিয়া দেন।

বংশরক্ষার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, যাহা দ্বারা চালিত হইয়া মেষ গো মহিষাদি সর্ব্বপ্রকার ইতর জন্তু নিজেদের শিশু সন্তান রক্ষার জন্য এত ব্যাকু-লতা প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই প্রবৃত্তির প্ররোচ-নাতেই অসভ্য জননী যখন তাহার অসহায় শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার মুখপানে তাকাইল, শিশু মাতার সহিত সম্বন্ধজ্ঞাপক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে মুখ ফিরাইল এবং শিশুর অধরে মধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল, তখন জননী আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল—'একি একি—এ যে অপার্থিব বস্তু, স্বর্গের ধন, এমন হাসি তো পৃথিবীতে সম্ভবে না, এরূপ দৃষ্টিতো মানবের হইতে পারে না।" প্রকৃতপক্ষেই ইহা অপার্থিব বস্তু। ঐ মাংসপিণ্ড, যাহাকে জননী আপনার সন্তান বলিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়া-ছেন, উহা হইতে সে হাসি সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। বিদ্যুৎ যেমন ধাতব পদার্থের সংযোগে আপনাকে প্রকাশিত করে, অথচ উহা ধাতুশলাকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, সেইরূপ ঐ যে হাস্য, ঐ যে দৃষ্টি, উহা এই জড়দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—উহার আত্মপ্রকাশের জন্য শিশুর দেহ উপলক্ষ্য মাত্র।

এই যে ভুবনভুলানো হাসি, এই যে প্রাণোন্মা-দক দৃষ্টি, ইহারই ভিতর দিয়া ভালবাসা প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। ইহা জন্মবিহীন, অজর অমর, অহে-তুক ও অতুলনীয় পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে ইহাই স্বর্গের অমৃত—শিশুর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া জগতকে আনন্দরসে নিমজ্জিত করিতেছে। এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে শিশুর শত্রু নাই কেন।

যে পর্য্যন্ত এই শিশু জগতে আগমন করে নাই, ততদিন পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে যে আকর্ষণ তাহা আসক্তি মাত্র ছিল, মানব পশুরাজ্যের শ্রেষ্ঠ পশু মাত্র ছিল। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর আকর্ষণ আসঙ্গ-লিপ্সার নামান্তর মাত্র। ভালবাসা রমণীর অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, স্বামী সেই নিভৃত কক্ষের সন্ধান পান নাই, রমণীও সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার কোন অবসর প্রাপ্ত হন নাই। শিশুই সেই অন্তরতম কক্ষদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ভালবাসার প্রথম পুষ্পা-গুলি গ্রহণ করিয়াছে এবং এই ভালবাসার মধ্য দিয়াই জনকজননী সর্ব্বপ্রথম পরস্পরের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিয়াছে। ভালবাসা উষার দীপ্তি হইতেও উজ্জ্বল, চন্দ্রমার কিরণচ্ছটা হইতেও স্নিগ্ধ ও মধুর। স্বার্থপরতার চিহ্নমাত্রও যথায় রহিয়াছে, ভালবাসার ছায়া পর্য্যন্ত সেই স্থানে পৌঁছায় না। ইহার সংস্পর্শে প্রাণ শীতল হয়। আসক্তির জ্বলন্ত বহ্নি যে সমাজ কিম্বা ব্যক্তিবিশেষকে দগ্ধ করিতেছে সে সমাজে বা সে ব্যক্তির হৃদয়ে ইহার অনুসন্ধান করা আত্মপ্রতা-রণা মাত্র। ইহার শক্তি দুর্জ্জয় হইলেও মধুর।

ভালবাসা আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। ইহার জীবন আত্মত্যাগে—ইহা দেখিতে চায়, দেখা দিতে চায় না।

আমি।

(৺ হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমি আমি করি বটে, জানি না 'আমি' কে ;
'আমি'-রে বেড়াই খুঁজে আমি চারিদিকে।
যখনি এ কথা ভাবি হাসি পায় মোর—
মনে হয় কি মোহে গো রয়েছি বিভোর।
ভাবিয়া দুঃখও আসে—প'ড়ে কি আঁধারে !
সব বুঝি আমি, কিন্তু বুঝিনি আমারে।
বিশ্বমাঝে কি আশ্চর্য্য এই প্রহেলিকা !
কি আশ্চর্য্য 'আমি' টুকু—রহস্য-কণিকা !
'আমি' যেন কুসুমের পরিমল সম।
বিরাজে রাজার মত এ শরীরে মম।
বলি কত কথা সবে বোঝাবারে যাই—
যত বুঝি মনে করি, তত বুঝি নাই।
'আমি' যে কি সার বস্তু কি বুঝিব আমি।
জানেন তা পরমাত্মা মোর যিনি স্বামী॥

জীবনের কর্ম্ম সম্বন্ধে গ্যয়টের মতামত।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

জীবনের সমস্যা।

বাহ্য অবস্থাকে নিজের শাসনাধীনে রাখা, এবং যতটা সম্ভব, নিজেকে বাহ্য অবস্থার শাসনাধীনে আসিতে না দেওয়া—ইহাই মনুষ্যের উচ্চতম ধর্ম্ম। বাস্তুশিল্পীর সম্মুখে যেমন একটা বিশাল প্রস্তর-খনি প্রসারিত থাকে, আমাদের সম্মুখে সেইরূপ আমাদের জীবন প্রসারিত রহিয়াছে। বাস্তুশিল্পীর নিজ অন্তরে যে আদর্শের উদ্ভব হইয়াছে, ঐ দৈবাধীন প্রস্তর-পিণ্ড হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া, এবং মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও স্থায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি তাঁহার সেই আদর্শটিকে তিনি কোন একটা আকার দিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি বাস্তুশিল্পী নামের যোগ্যই নহেন। আমাদের বাহিরের সমস্ত জিনিস—শুধু তাহা নহে—আমাদের অন্তরেরও সমস্ত জিনিস—কেবল কতকগুলি উপাদান মাত্র; কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মার গভীরতম অন্তরতম মন্দিরেই সৃজনী শক্তি অবস্থিত; এই সৃজনী শক্তিই ঐ উপাদানগুলি হইতে আমাদের উদ্দেশ্যমত একটা-কিছু উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। এবং কি আমাদের বাহিরে, কি আমাদের অন্তরে,—যতক্ষণ না এই উৎপন্ন দ্রব্য একটা বিশেষ আকার গ্রহণ করে ততক্ষণ আমাদের নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই।

সংশয়।

যে রকমেরই সংশয় হউক, কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুতেই তাহা দূর হয় না।

কর্ম্ম।

কর্ম্মশীল হওয়াই মানুষের জীবনের প্রথম কার্য্য। মানুষ যখন বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়, বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে স্পষ্টতর জ্ঞান লাভের জন্য সেই অবকাশ সময়কে তাহার নিয়োগ করা উচিত; কারণ উহাই আবার কর্ম্মকে সহজ করিয়া তুলে।

চিন্তা-বিবেচনা।

আমরা যখন দীর্ঘকাল কোন বিষয়ে চিন্তা ও বিবেচনা করি, তাহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, কি স্থির করিতে হইবে তাহা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্টভাবে নাই। আবার যদি তাড়াতাড়ি একটা কিছু স্থির করিয়া ফেলি, তাহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে উহা কি তাহা আমরা জানি না।

সুস্পষ্ট ধারণা ও সঙ্কল্পের স্থিরনিশ্চয়তা।

আমি সেই ব্যক্তিকে ভক্তি করি, যে স্পষ্ট বুঝে, সে কি চাহে; যে অক্লান্তভাবে অগ্রসর হয়; যে জানে কি উপায়ে তাহার লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, এবং সেই সকল উপায় হস্তগত করিয়া সে তাহা কার্য্যে নিয়োগ করে। তাহার লক্ষ্য কতটা বড় বা ছোট, প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয়—আমার নিকট এই সমস্ত বিবেচনা গৌণকল্পের। অধিকাংশ দুঃখকষ্ট যাহা আমরা জগতে দেখিতে পাই, তাহা এইজন্য উৎপন্ন হয় যে, অনেকে তাহাদের জীবনের লক্ষ্যটা কি, তাহা ভাল করিয়া জানিতে নিতান্তই অবহেলা করে এবং জানিলেও আগ্রহাতিশয় সহকারে তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করে না। আমার মনে হয়, তাহারা তাহাদেরই মত, যাহারা একটা বড় কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে চাহে অথচ পত্তন-ভূমির উপাদান ও মজুরীর জন্য যতটা তাহারা ব্যয় করে তাহা একটা সামান্য কুটীরের পত্তনভূমিরই উপযুক্ত।

গতালোচনা।

যাহা কিছু আমাদের ঘটে, তাহা পশ্চাতে একটা চিহ্ন রাখিয়া যায়; আমি এক্ষণে যাহা—তাহা গড়িয়া তুলিবার জন্য সব জিনিসই অলক্ষিতভাবে সাহায্য করে। তথাপি অনেক সময় উহার একটা কড়াক্কড় হিসাব লওয়া বিপদজনক। কারণ, তাহাতে করিয়া হয় আমরা গর্ব্বিত, নয় বিমর্ষ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি। উভয়ই পরিণামে সমান অনিষ্টজনক। যে কাজ আমাদের সব চেয়ে নিকটে আছে, আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে, সেই কাজে ব্যাপৃত হওয়াই প্রকৃষ্ট পন্থা।

আন্তরিকতা।

আন্তরিকতা ব্যতীত, জীবনে কিছুই করিতে পারা যায় না; তথাপি যে সকল ব্যক্তিকে আমরা কৃতবিদ্য বলি, অনেক সময় তাহাদের মধ্যেও আন্তরিকতা খুবই কম দেখা যায়। শ্রমচেষ্টায়, কাজকর্ম্মে, শিল্পকলায়, এমন কি বিনোদ-আমোদের সময়েও তাহারা যেন আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে আপনা-

দিগকে স্থাপন করে। তাহারা রাশি রাশি খবরের কাগজ পড়ে, যেন তাহাদের সহিত পরে আর কোন সম্পর্ক না রাখিবারই জন্য। ইহা রোম-ভ্রমণকারী এক ইংরেজ যুবকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সন্তোষের ভাব মুখে প্রকাশ করিয়া সেই ইংরেজ যুবক কোন এক সায়াহ্নে নিমন্ত্রিত মণ্ডলীর মধ্যে বলিয়াছিল—"আজ আমি ৬টা গির্জ্জা ও ২টা চিত্রশালা সাবাড় করিয়াছি"। উহারা অনেক জিনিস জানিতে চাহে, শিখিতে চাহে—আর প্রায়ই সেই সব জিনিসই জানিতে চাহে শিখিতে চাহে যাহার সহিত তাহাদের খুবই কম সম্পর্ক; তাহারা এটা বুঝিতে পারে না যে, "বায়ু ভক্ষণে" ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। যখন কোন ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় হয়, আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি—সেই ব্যক্তি কি কাজে ব্যাপৃত, কিরূপ ভাবে ব্যাপৃত ও কতটা অধ্যবসায় সহকারে ব্যাপৃত। ইহার যে উত্তর পাই, তদনুসারে সেই ব্যক্তির উপর আমার চিরজীবনের জন্য একটা দরদ হয়, কিংবা দরদের একটু তারতম্য ঘটে।

পাগ্‌লামি।

অন্যদের সাক্ষাতে আপনাকে তফাৎ করিলে পাগল বলিয়া উপহাসাস্পদ হইবার যেরূপ সম্ভাবনা থাকে এমন আর কিছুতেই নহে। আবার জনসাধারণের সহিত সাধারণভাবে থাকিতে পারিলে যেমন কাণ্ডজ্ঞান রক্ষার পক্ষে সহায়তা করে এমন আর কিছুতেই নহে।

মানুষের কেবল একটি মহাবিপত্তি আছে—যখন এমন কোন একটা ভাব তার মনকে দখল করিয়া বসে যাহা তাহার কর্ম্মজীবনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না, বা কর্ম্মজীবন হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়।

লোকের মতামত।

যে সকল খ্যাতনামা লোকের যোগ্যতা সর্ব্ববাদীসম্মত তাহাদের প্রতি লোকের আচরণ একটু বিশেষ ধরণের। লোকেরা ক্রমশ তাহাদের প্রতি উদাসীন হইতে আরম্ভ করে এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইলেও নূতন লোকের গুণের প্রতি পক্ষপাতিতা দেখায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের উপর তাহারা অতিমাত্র দাবী দাওয়া করে এবং শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে একটু কিছু পাইলেই তাহা প্রশংসার সহিত গ্রহণ করে।

আত্মজ্ঞান।

মানুষ আপনাকে কেমন করিয়া জানিতে পারে? বিচার আলোচনার দ্বারা কখনই জানিতে পারে না, কেবল কর্ম্মের দ্বারাই জানিতে পারে। যে পরিমাণে তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টা করিবে সেই পরিমাণে তুমি জানিতে পারিবে,—তোমার মধ্যে কি জিনিস আছে। কিন্তু তোমার কর্ত্তব্যটা কি?—বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত যাহা তোমার নিকট চাহিতেছে তাহাই তোমার কর্ত্তব্য।

জীবনে যাহা আশা করা যাইতে পারে।

কার্য্যক্ষম ও কর্ম্মঠ পুরুষ! তুমি আপনার উপযুক্ত হও এবং প্রত্যাশা করিও:—

বড় লোকের নিকট ... ... প্রসন্নতা।
শক্তিমানের নিকট ... ... অনুগ্রহ।
কর্ম্মশীল ও সদাশয় ব্যক্তির নিকট সাহায্য।
অধিক লোকের নিকট ... ... সদ্‌ভাব।
ব্যক্তি বিশেষের নিকট ... ... ভালবাসা।

মিতাচার।

অপরিমিত কর্ম্মশীলতা, যে রকমেরই হউক, শেষে দেউলিয়ার অবস্থায় পর্য্যবসিত হয়।

অবস্থা ও চরিত্র।

যখন কোন মানুষ নিজের অবস্থার সহিত যুদ্ধে আঁটিয়া উঠা কঠিন মনে করে তখন সে ক্ষুদ্র নহে, কিন্তু সেই অবস্থা যখন তাহার উপর প্রভু হইয়া বসে তখনই সে ক্ষুদ্র।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

তব নন্দন পরশ-চন্দন
কবে ঢালি দিবে গায়ে
শীতলিবে সব অঙ্গ মম
জুড়াবে এ দগ্ধ হিয়ে।
কবে তব পরশ-রসধারে
উথলিবে প্রীতি-হৃদয়ে
নয়ন হতে বিগলিবে বারি
দেহমন লুটাবে পায়ে।

কবে সুশীতল তব পরশে
পুলকরসে যাব ছেয়ে
তোমারি পানে ওগো বঁধু
নিমেষহারা রব চেয়ে ॥

রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির সংস্থাপন।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমিতে যে একটী স্মৃতিমন্দির সংস্থাপিত হইতেছে, ইহাতে আমাদের অপেক্ষা আর কেহই অধিকতর আনন্দিত হইতে পারে না। তাঁহার জন্মভূমি রাধানগরের নিকট-বর্ত্তী খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয় রামমোহন রায়ের জন্মভিটা পরহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। রাম-মোহন লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল এবং বিপিন বাবুর উদ্যোগে সেই জন্মভিটায় এক মন্দির ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ এবং একটী জলাশয় খননের বন্দোবস্ত হইতেছে। তাঁহারা সমগ্র ভারতের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

গত ৯ই বৈশাখ শনিবার প্রস্তাবিত স্মৃতিভবনের ভিত্তিস্থাপন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভিত্তি-স্থাপনের সময়ে মহিলা ও পুরুষে প্রায় দুই সহস্র দর্শক উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাদ্বয় রামমোহন রায়-রচিত সুপ্রসিদ্ধ গান "ভাব সেই একে" গাহিয়া কার্য্যারম্ভ সূচনা করিয়া দিলেন। তৎপরে রামমোহন রায়ের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায়ের পুত্র শ্রীমান ধরণীমোহন রায় নিম্নলিখিতরূপে স্বাগত সম্ভাষণে সমাগত ব্যক্তি-বৃন্দের অভ্যর্থনা করিলেন।

শ্রীমান ধরণীমোহন রায়ের অভিভাষণ।

সমাগত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা সকলেই সুবিজ্ঞ ও মনীষী। আপনারা যে কলিকাতা মহানগরী পরিত্যাগ করিয়া বহু কষ্টের ভিতর দিয়া আজ আমাদের দেশে আসিয়াছেন ইহাতে আমি যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেছি। আপনাদের ন্যায় দেশমান্য লোকপূজ্য ভদ্রমণ্ডলীকে অতিথিরূপে পাইয়া আজ রাধানগর গৌরবান্বিত আর আমি এখানে দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে পারিতেছি বলিয়া আমি নিজকেও ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আপ-নাদের নিকট আমি সর্ব্ববিষয়ে দীন; তাই আশা আছে আপনারা এ দীনের, এ অকিঞ্চনের ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিব-ন্ধন আসিতে না পারায় তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ আমাকে পাঠাইয়াছেন। বলা বাহুল্য এ ভারটা আরো যোগ্য-তর ব্যক্তির উপর পড়িলে ভাল হইত। আর তিনি যদি আজ সুস্থশরীরে স্বয়ং এখানে উপস্থিত থাকিয়া আপনাদের সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার যে কি আনন্দ হইত তাহা কল্পনা করিয়া আমি উল্লসিত হইতেছি। তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, দাতা ও দয়াশীল। তাঁহার ধীশক্তির পরিচয় আপনারা সকলেই পাইয়াছেন। তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ আমি আসিয়া বড় লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি। আমার সমস্ত লজ্জার ভার আপনারা অগ্রাহ্য করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।

যে মহাত্মার মহনীয় নামের সঙ্গে এই গ্রামখানির নাম ও স্মৃতি জড়িত তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলি-বার কিছুই নাই। আমি যে তাঁহার বংশধরগণের সহিত সংসৃষ্ট আছি ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। বহুবর্ষ অতীত হইল একদা এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোধূলিলগ্নে রাজা এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দিন এই সূতিকাগৃহে যে দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার জ্যোতিতে একদিন সমগ্র ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, বহুবর্ষ বহুধা বাধার মধ্য দিয়াও তাহার জ্যোতি ম্লান হয় নাই, তাই আপনারা আজ সেই ক্ষীণ জ্যোতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বহুদিন হইল রাজার তিরোভাব হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদিন রাজার স্মৃতির উপযুক্ত কিছুই এখানে হইল না। এত-দিন পরে আপনাদেরই চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে আমাদের সে অভাব দূর হইল। আপনারা আমাদের ধন্যবাদভাজন হইলেন, সন্দেহ নাই। আপনাদের সহিত আমাদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং আশা করি আমাদের এই যুক্ত সহানুভূতির ফলে অচিরেই রামমোহন স্মৃতিমন্দির গড়িয়া উঠিবে। শুভকার্য্যে কখনই অর্থের অনাটন হয় না ইহাই আমাদের চিরন্তন বিশ্বাস। রাজাই তাহার জলন্ত উদাহরণ এবং আশা করি রাজার কাজে আমাদের বিশ্বাসেরই ফল ফলিবে।

আর বেশী কিছু আমার বলিবার নাই এবং প্রয়ো-জনও নাই। যিনি এই মন্দিরের প্রস্তর আজ প্রোথিত

করিবেন তিনি সাধারণ্যে খুব সুপরিচিতা না হইলেও আমাদের তিনি খুব পরিচিতা। তাঁহার যোগ্যতাসম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলা ভাল। কারণ যাঁহারা এই কার্য্যের উদ্যোক্তা তাঁহারাই সমীচীন স্কন্ধে যোগ্য ভারার্পণ করিয়াছেন। তিনি রাজারই বংশ হইতে উদ্ভূতা। নারীর প্রতি রাজার যে কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা সাধারণ্যে অবিদিত নাই। তিনি স্ত্রীশিক্ষা, সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি অনেক মহৎ কাজের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। রাজার প্রদর্শিত পথ অনুযায়ী কাজ করিয়া আমরা আজ রাজার মুক্ত আত্মার তর্পণ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। আজ এই গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় ভিত্তির যে প্রস্তর সমাহিত হইল তাহা কালের অনুকূল স্রোতে সঞ্জীবিত ও পল্লবিত হইয়া উঠুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, আপনারা যে কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়াছেন তাহার জন্য আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা এ কষ্টের কথা মনে না রাখিয়া প্রতি বৎসর রাজার বাৎসরিক জন্মতিথিতে এই স্থানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহান্বিত করিবেন। আপনাদের সুচেষ্টার যশোভাতিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত হোক্, রাধানগরবাসীর সমবেত জয়ধ্বনি "স্বাগতম্" গ্রহণ করুন।

অবশেষে হিন্দুমুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনীষীগণ বক্তৃতা দ্বারা সমাগত ব্যক্তিগণকে রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে অনুরোধ করিবার পর মহর্ষিদেবের পৌত্র শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হেমলতা দেবীর নিম্নলিখিত অভিভাষণ পঠিত হইল। ইহার পর শ্রীমতী হেমলতা দেবীর রচিত যে অভিভাষণ শ্রীমতী বাসন্তী মিত্র পাঠ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

শ্রীমতী হেমলতা দেবীর অভিভাষণ।

প্রত্যক্ষ প্রকাশমান জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভারতের চিরন্তন ইষ্টদেবতা, আদি অন্ত মধ্যে পরিপূর্ণ, গায়ত্রী মন্ত্রের সাধনীয়, একমাত্র বরণীয় চৈতন্যময় পরমপুরুষকে পূর্ণরূপে বারম্বার নমস্কার।

স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের দেহমুক্ত আত্মার উদ্দেশে বারম্বার নমস্কার।

রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে যে সকল সুধীবৃন্দ এখানে উপস্থিত যে সকল নিষ্কাম ব্রতধারী মহাশয়গণ এই সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা ও উদ্যোগী তাঁহাদের উদ্দেশে বারম্বার নমস্কার।

অশিক্ষিতা অনভিজ্ঞা চিরদিনের অবজ্ঞাভাজনা নারীজাতিকে যাঁহারা নিজগুণে পরম গৌরবের আসন দান করিতে কৃতসঙ্কল্প তাঁহাদিগের উদার মহোচ্চ পবিত্র অন্তঃকরণের উদ্দেশে বারম্বার নমস্কার।

স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের জীবন বর্ত্তমান সভ্য জগতে মহান্ আদর্শরূপে পূজিত হইতেছে, রাজার চরিত্রে জ্ঞান ও প্রেমের যে এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখা যায় তাহা মানবজীবনে একান্ত দুর্ল্লভ। এই সামঞ্জস্যই রাজার জীবনকে ঐ মহান্ আদর্শে সুশোভিত করিয়াছে। জ্ঞানশূন্য প্রেম আসক্তি বা মায়া, প্রেমশূন্য জ্ঞান অহঙ্কার বা মোহ। এ উভয়ের সামঞ্জস্যেই উৎকৃষ্ট মনুষ্যত্বের বিকাশ।

রাজার জীবনে জ্ঞানও প্রেম একাধারে কেন্দ্রীভূত, তাই সে জীবন এত পরিপূর্ণ, তাই সে পূর্ণতা আজ বহু নরনারীকে এক মহান্ আদর্শের দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, শত শত মহৎ জীবনকে জ্ঞানের তপস্যায় নিযুক্ত করিয়াছে ও করিতেছে।

রাজার জীবন বঙ্গভূমির প্রতি, ভারতভূমির প্রতি, সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতি পরমাত্মার আশীর্ব্বাদ। সেই আশীর্ব্বাদ একদিন এই ভূমিখণ্ডটুকুর উপরে রামমোহন মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই এই স্থানটুকুর এত আদর, এত গৌরব, তার প্রতি মানুষের তাই এত প্রীতি। রামমোহনের জন্মমুহূর্ত্তে সেই আশীর্ব্বাদ এই সূতিকাগৃহকে আলোকিত করিয়াছিল, জননীর মুখে হাসি ফুটাইয়াছিল, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের চিত্তকে উৎফুল্ল ও উল্লসিত করিয়াছিল।

সেই আশীর্ব্বাদ পরে অজ্ঞানাচ্ছন্ন বঙ্গভূমিকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়াছিল, নারীজাতির অন্তঃকরণে অনুকম্পা ও সহানুভূতির বারি সিঞ্চন করিয়া তাহাদের প্রাণে জীবনীশক্তি আনয়ন করিয়াছিল ও দেশবাসী বালকবৃদ্ধযুবার অন্তঃকরণে সত্যবিচারাগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তাহাদিগকে সচেতনতার উল্লাসে উল্লসিত করিয়াছিল।

এক্ষণে সেই আশীর্ব্বাদ ঊর্দ্ধলোক হইতে সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্মুখে মনুষ্যত্বের এক পরিপূর্ণ অখণ্ড আদর্শকে উজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে। এক্ষণে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন বিশ্বাকাশে রাজার জীবন। রাজার জীবন, রাজার চরিত্র এক অক্ষয় অবিনাশী ধ্রুবতারা, যাহা শত শত নরনারীকে পথ দেখাইতেছে ও দেখাইবে।

এই মহা আদর্শের মূল কি? কিসের উপর রাজার জীবনগত এই অখণ্ড সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা?

এক সত্যের উপাসনা ও সাধনা তাঁহার জীবনকে এই সামঞ্জস্য দান করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

সমস্তকে লইয়া যিনি এক, যাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোথায়ও কিছু নাই, তাঁহাকে অখণ্ড ভাবে উপলব্ধি করাই প্রকৃত পক্ষে এক সত্যের উপাসনা। যে সাধনায় এই অনুভূতি প্রত্যক্ষ তাহাই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা। রাজার জীবনে ব্রহ্ম-সাধন ও ব্রহ্মোপাসনা মিলিত হইয়া তাঁহাকে এমন এক উচ্চ আদর্শে পরিণত করিয়াছিল।

এই সাধকের প্রতি আমাদের অন্তঃকরণের প্রেম যদি সত্য হয়, তাঁহার অন্তররাজ্যের স্মৃতিচিহ্ন যদি আমাদের অন্তরের মধ্যে স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে বহির্জগতে তাঁহার এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সূতিকাগৃহের এই মৃত্তিকা খণ্ডটুকুর উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার অন্তঃকরণের সঙ্গে নিজের অন্তঃকরণ মিলাইয়া আমরা একযোগে বলি,—

(সবে) এক সত্যে এক নিত্যে
এক চিত্তে ভাব হে।
জ্ঞানসিন্ধু প্রেম ইন্দু যদি
বন্ধু মাগ হে ॥

সর্ব্বশেষে শ্রীমতী কুমুদিনী বসু রামমোহন রায়ের বিলাতগমনকালে জাহাজে অবস্থানকালে সংরচিত সেই সুপ্রসিদ্ধ গান "কি স্বদেশে কি বিদেশে" গাহিবার পর কতিপয় মহিলা-পরিবৃত হইয়া শ্রীমতী হেমলতা দেবী মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলেন।

রাধানগরে সমাগত যাত্রীবর্গকে রামমোহন রায়ের অন্যতর প্রপৌত্র ৺হরিমোহন রায়ের পত্নী শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায়ের পুত্র শ্রীমান ধরণীমোহন রায়, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ প্রভৃতি স্থানীয় ব্যক্তিগণ সাদর অভ্যর্থনা করিয়া অতিথি সৎকারের অশেষ পুণ্য যে অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।*

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই স্মৃতিভবন সম্বন্ধীয় অনেক ইতিবৃত্ত থাকাতে বারান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

* এই বিবরণ সংকলনে আমরা সঞ্জীবনী পত্রিকার নিকটে সম্পূর্ণ ঋণী ও কৃতজ্ঞ। তং বোং সং।

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

[গত মাসের পত্রিকাতে আমরা জগতের উন্নতি-পরিপোষক ঘটনাগুলি "উত্থান ও জাগরণ" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু কয়েকজন পত্রিকার হিতৈষী বন্ধুর অনুরোধে এবার অবধি সেরূপ ঘটনা ঐ নামের পরিবর্ত্তে "উন্নতি-প্রসঙ্গ" নাম দিয়া প্রকাশ করিব।]

আন্তর্জাতিক অনুরোধের জয়।—জগতের চারিদিকে কোথায় কি হইতেছে দেখিতে গেলে সকলেরই চক্ষু সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় মহাসমরের দিকে আকৃষ্ট হয়। সেইরূপ জগতের উন্নতি-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে গেলেও আমরা সর্ব্বাগ্রে দেখিতে চাই যে ঐ মহাসমরের ভিতর দিয়া কোথায় কি উন্নতি হইতেছে, কোন্ ঘটনা জগতকে উন্নতির পথে তুলিয়া ধরিতেছে। গত মাসে উন্নতিপোষক যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে বিবাদ মীমাংসায় আন্তর্জাতিক অনুরোধের জয়ের কথাই আমাদের মনে উদিত হইতেছে। সকলেই জানেন যে জর্ম্মানি আজ প্রায় মাস দুই হইল যে মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছে তাহার প্রকৃত অর্থ এই যে মিত্রসঙ্ঘের এবং বিশেষত ইংরাজ জাতির বাণিজ্য সমূলে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সুবিধা পাইলেই জর্ম্মান ডুবুরি নৌকা ব্যাপারী ও পান্থবাহী জাহাজ সমূহেরও ধ্বংসসাধনে সচেষ্ট হইবে। এই মন্ত্র অনুযায়ী কার্য্য করিবার ফলে অনেকগুলি ব্যাপারী ও পান্থবাহী জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই সকল বিনষ্ট জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামবহির্ভূত মার্কিণ রাজ্যের অধিবাসী কয়েকজনও প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ফলে মার্কিণ যুক্তরাজ্য অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সবল অনুরোধ করিল যে জর্ম্মানি এভাবে ব্যাপারী প্রভৃতি জাহাজসমূহের সঙ্গে নিরীহ নির্ব্বিবাদী মনুষ্যের প্রাণসংহার কিছুতেই করিতে পারিবে না। অনেক বাদানুবাদের পর জর্ম্মনিকে মার্কিণের অনুরোধ রক্ষা করিবার অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। বিবাদবহির্ভূত মার্কিণ রাজ্যের প্রজা যে অধিক সংখ্যক মরিয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যে জাতিসমূহের মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সেই সকল জাতি আপনাপনি মারামারি করিয়া সেই অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হউক, তাহাতে কাহারও

কিছু বলিবার নাই, কিন্তু বিবাদবহির্ভূত রাজ্যের একটীও প্রজার বিনা কারণে প্রাণসংহার করা হইবে কেন? জর্ম্মনির এই অনুরোধ রক্ষার অঙ্গীকার যথাযথ প্রতিপালিত হইবে কি না, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বলিতে পারে। কিন্তু এই অঙ্গীকারে যে আন্তর্জাতিক অনুরোধ স্বীয় বল প্রকাশে সম্যক্ সক্ষম হইয়াছে, ইহাতেই আমরা আনন্দিত। ইহা হইতে আমাদের আশা হয় যে সময়ে জগতের সকল জাতি মিলিত হইয়া আন্তর্জাতিকতাকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে এবং করিলে বিবাদ-বিসম্বাদের পরিবর্ত্তে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, অসংখ্য প্রাণীহত্যার পরিবর্ত্তে মনুষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া দিগ্‌দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া জগতের সকল প্রান্তই ছাইয়া ফেলিবে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়া অজ্ঞান ও অধর্ম্মের সম্যক্ পরাজয় সাধন করিতে পারিবে, ভগবানের মঙ্গলরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

মহাসমরে বঙ্গসেনা—গত বৎসরে পৌষ সংখ্যার পত্রিকাতে "কৃষিকর্ম্মের অন্তরায়" প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম—"বর্ত্তমান মহাসমর যদি আরও কিছুকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্টকে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ভারতবাসীদিগের দ্বারা সেনাদল সংগঠনে মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। এই সেনাদল সংগঠনে বঙ্গবাসীদিগকে কিছুতেই একেবারে বাদ দিতে পারা যাইবে না।" যখন আমরা এই কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলাম, তখন আমরা ভাবিতেই পারি নাই যে এত শীঘ্র মহাসমরের জন্য সত্যসত্যই বঙ্গসেনা সংগঠিত হইবে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত বঙ্গসেনা সংগঠিত করেন নাই, কিন্তু ফরাসি গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। গত ৩০শে ডিসেম্বর ফরাসি-প্রজাতন্ত্রের পরিচালক (President) এক আজ্ঞা প্রচার করেন যে ফরাসী ভারতের হিন্দুমুসলমান প্রজা স্বইচ্ছায় বর্ত্তমান যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত ফরাসী সৈনিকের কার্য্য করিতে পারিবে; সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া অবস্থান ও প্রয়োজন অনুসারে ফরাসী বা দেশীয় ফৌজের অন্তর্গত হইয়া কার্য্য করিবে'। ইতিপূর্ব্বে কে মনে করিতে পারিয়াছিল যে এই আহ্বানের উত্তরে দলে দলে বাঙ্গালী ছেলেরা সেনা-দলে প্রবেশ করিতে উদ্যুক্ত হইবে? 'ভারতবর্ষ' পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার ফরাসি ভারতে বলপূর্ব্বক দেশীয় সেনাদল সংগঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল। তখন শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রভৃতি ব্যক্তির নিতান্ত অনুনয় বিনয়ের ফলে ফরাসি ভারতের নির্ব্বিশেষে সকল প্রজাকে সৈন্যদলভুক্ত হইতে বাধ্য করিবার আইন জারি হইতে পারে নাই। এবারে স্বেচ্ছায় যে এতগুলি বাঙ্গালী, যে মহাসমরের তুলনা নাই সেই মহাসমরে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইবে এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত? এই কার্য্যে মহান উন্নতির বীজ লুক্কায়িত আছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। প্রথমত, বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে মনুষ্যত্ব যে অন্তর্হিত হয় নাই, প্রত্যুত সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইবার উপক্রম করিতেছে, বাঙ্গালীর স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে ভুক্ত হইবার ইচ্ছায় তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। দ্বিতীয়ত, সাধারণ ভারতবাসী এবং বিশেষত বাঙ্গালীকে ইউরোপীয়গণ এতদিন অবজ্ঞার চক্ষে হেয় দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত ছিল—কেবল ভারতবাসী বলি কেন, সাধারণত, প্রাচ্য ও পাশ্চত্য জাতি সমূহের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য অবজ্ঞা-প্রাচীর উঠিয়া উন্নতির মূল একতার পথে মহাবিঘ্নস্বরূপে দাঁড়াইয়া ছিল; আজ সেই অবজ্ঞার প্রাচীর ভূমিসাৎ হইবার সূচনা হইতেছে, সমস্ত জগতে একটা মহান্ ঐক্য সাধনের এবং সুতরাং মহান্ উন্নতি সাধনের পথ উন্মুক্ত হইতে চলিয়াছে। এখন, ভগবানের কাছে যোড়করে প্রার্থনা করি যে, যাঁহারা পথপ্রদর্শক হইয়া নব বঙ্গসেনাদলে প্রবেশ করিয়াছেন, ভগবান তাঁহাদিগের বর্ম্মস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া সমুদয় বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধাবসানে নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরাইয়া আনুন। স্বদেশীয়গণের নিকটেও আমাদের এই অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন সেনাভুক্ত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে অনশনের হস্ত হইতে রক্ষা করেন।

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(সাংখ্য বেদান্ততীর্থ শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রকাশের যে সকল উদ্দেশ্য লিখিত ছিল, তন্মধ্যে একটী হইতেছে—"পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপলক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা জানাইবার নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক।" পরব্রহ্মের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব আমাদিগের শাস্ত্ররাশি অপেক্ষা অন্য কোন দেশের শাস্ত্রে অধিকতররূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিভিন্নপন্থী শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া ঐ একই বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের বিদেশের আশ্রয় গ্রহণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এই কারণেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আমাদের শাস্ত্রসমূহের সারমর্ম্ম প্রকাশরূপ অন্যতম উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকাতেই সর্ব্বপ্রথম বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি অনুবাদসহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই শুভ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আমরাও আজ বেদান্তমূলক একখানি প্রাচীন মীমাংসাগ্রন্থ অনুবাদসহ প্রকাশ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানির নাম বৈয়াসিক ন্যায়মালা। ইহা ব্যাসবিরচিত ব্রহ্মসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার কে তাহা আমরা এখনও ঠিক করিতে পারি নাই। এবিষয়ে আমাদিগের অনুসন্ধানের ফল পরে যথাসময়ে পাঠকবর্গকে উপহার দিব। পুনা আনন্দাশ্রম যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত পুস্তক অবলম্বনেই আপাতত আমরা অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করিব। এই আনন্দাশ্রমীয় সংস্করণ-কর্ত্তা জয়পুর সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত শিবদত্ত শর্ম্মা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পরিচয় দিয়া যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

পণ্ডিত শিবদত্তের গ্রন্থপরিচয়।

"ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের সাধন যে বেদের অর্থজ্ঞানসাপেক্ষ, এ বিষয়ে কোন আর্য্যই অস্বীকার করেন না। এখন, আপস্তম্বাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ং।" এই উক্তি হইতে বেদ কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানপ্রতিপাদক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়াত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে দেবতা ও (ঘৃতাদি) দ্রব্য, এই উভয়সাপেক্ষ যাগাদি হইল কর্ম্ম ; ব্রহ্ম ও জীব, এই উভয়ের মধ্যে উপাস্য ও উপাসকদৃষ্টি স্থাপনাই হইল উপাসনা এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদই হইল প্রকৃত জ্ঞান। প্রাচীন ও নবীনপন্থীদিগের মধ্যে বিরোধ প্রভৃতি কারণে বেদের প্রকৃত অর্থবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তাহা নিরাকরণের জন্য মীমাংসাশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কর্ম্মপ্রধান শ্রুতিসমূহের বিচারভাগ পূর্ব্বকাণ্ড ও প্রথমতন্ত্র নামে অভিহিত হয় এবং তাহা জৈমিনীয় মীমাংসা বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপাসনা ও জ্ঞানপ্রধান শ্রুতিসমূহের বিচারভাগ শারীরক নামে অভিহিত হইয়া ব্যাসকৃত বেদান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অনেক ঋষি বেদের মীমাংসা-প্রণেতা হইলেও, কেবলমাত্র জৈমিনি ও ব্যাস এই ঋষিদ্বয়কেই কেন যে মীমাংসকের পদে বরণ করা হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় কারণ জানা যায় না। এই ব্যাসকৃত * বলিয়া খ্যাত বেদান্তরূপ উত্তরমীমাংসা খণ্ডে পাঁচশত ছাপান্ন সূত্র আছে এবং একশত বিরানব্বইটী অধিকরণ আছে। † এই উভয় কাণ্ডসম্বলিত সমগ্র মীমাংসা শাস্ত্রের উপর ভগবান উপবর্ষ একটী বৃত্তি করিয়াছেন। উপবর্ষ কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত নন্দরাজার রাজ্যকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণপ্রণেতা পাণিনি মুনির গুরু ভগবান বর্ষের সহোদর। "এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫৩) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে "অতএব, প্রথম তন্ত্রে অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসায় আত্মার অস্তিত্ববিষয়ক প্রসঙ্গ

---

* "এই কারণেই ব্রহ্মসূত্র শাস্ত্রের সমাপ্তিসূত্রীয় অবতরণিকায় "নন্বেবং সতি সাতিশয়ত্বাদন্তবত্ত্বমৈশ্বর্য্যস্য স্যাৎ, ততশ্চৈষামাবৃত্তিঃ প্রসজ্যেত, ইত্যত উত্তরং ভগবান বাদরায়ণঃ পঠতি" এই শাঙ্কর ভাষ্য দেখা যায় এবং সেই ভাষ্যসূত্রে রত্নপ্রভাতে "শাস্ত্রসমাপ্তি সূচনা করিয়া ভগবান সূত্রকারকে পূজা করিতেছেন" ইহা উক্ত হইয়াছে বাদরায়ণ ব্যাসেরই নামান্তর। ত্রিকাণ্ডশেষে উক্ত হইয়াছে—
"কৃষ্ণদ্বৈপায়নো বেদব্যাসঃ স্যাৎ সত্যভারতঃ।
পারাশরিঃ সাত্যবতো মাঠরো বাদরায়ণঃ॥"

† অধিকরণ অর্থে মোটামুটি হিসাবে প্রতিপাদ্য বিষয় বলা যাইতে পারে—যাহার অধিকারে সূত্রগুলি বিবৃত হইয়াছে।

উঠিবামাত্রই ভগবান উপবর্ষ বলিয়াছেন যে শারীরক মীমাংসায় (অর্থাৎ উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র) এই বিষয়ে বলিব।" এই সূত্রভাষ্যাদি হইতে জৈমিনীয় ও বৈয়াসিক মীমাংসাদ্বয় একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই উপবর্ষকৃত বৃত্তি দুর্লভ এবং শাঙ্করভাষ্য দুর্বোধ্য হওয়াতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত যতীন্দ্র শ্রীভারতীতীর্থ কর্ত্তৃক এই বৈয়াসিক ন্যায়মালা সংরচিত হইয়াছে।

এই ভারতীতীর্থ জৈমিনীয় মীমাংসার জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তর নামক বিস্তৃত ব্যাখ্যাপ্রণেতা মাধবাচার্য্যের গুরু বলিয়াই অনুমান হয়। উক্ত বিস্তরগ্রন্থে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—"ইন্দ্রের যেরূপ আঙ্গিরস ঋষি, নন্দরাজার যেমন সুমতি, শৈব্যরাজার যেমন মেধাতিথি, ধর্ম্মপুত্রের যেমন ধৌম্য, বৈন্যরাজার যেমন স্বোজা, নিমির যেমন গৌতমি, পুণ্যাত্মা রামচন্দ্রের যেমন প্রত্যক্ষদর্শী অরুন্ধতীসহচর বশিষ্ঠ, সেইরূপ সেই প্রভুর মাধব কুলগুরু ও মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। তিনি জৈমিনি মত সম্বন্ধে ভাবগরিষ্ঠ ন্যায়মালা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বীর বুক্করাজ সভামধ্যে সেই ন্যায়মালার প্রশংসা করিয়া মাধবাচার্য্যকে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিবার জন্য আদেশ করিলেন। মাধবাচার্য্য ভারতীতীর্থের মুখ হইতে অব্যাহত কৃপা লাভ করিয়া পরার্দ্ধ-তুল্য (শ্রেষ্ঠপদে অধিরূঢ়) হইলেন এবং পণ্ডিতদিগের আনন্দদায়ক জৈমিনীয় ন্যায়মালা রচনা করিয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের জন্য তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।"

পঞ্চদশী ব্যাখ্যাতাও প্রত্যেক প্রকরণের ব্যাখ্যা-প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে বিদ্যারণ্য নামধারী মাধবাচার্য্য বহুবেদবিৎ হইলেও ভারতীতীর্থেরই নাম প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন—"নত্বা শ্রীভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরৌ।" এই ভারতীতীর্থ পঞ্চদশীর কয়েকটী প্রকরণও রচনা করিয়াছেন।

ব্যাসসূত্রের বৃত্তিকার রঙ্গনাথ বলেন—"বিদ্যারণ্যকৃত শ্লোক ও নৃসিংহাশ্রমের সুবচনের দ্বারা ব্যাসসূত্রসমূহের ভাষ্যানুসারী একটী বৃত্তি গ্রথিত হইল।" এই উক্তি হইতে মনে হয় যে রঙ্গনাথ বিদ্যারণ্য নামে খ্যাত মাধবাচার্য্যকেই এই ন্যায়মালারও রচয়িতা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুমান যুক্তিসহ নহে। কারণ মাধবাচার্য্যপ্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থেই বুক্করাজের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু এই বৈয়াসিক ন্যায়মালাতে সে প্রকার কোনই উল্লেখ নাই। এ কথা যদি বলা যায় যে ষোড়শাধ্যায়-বিশিষ্ট (জৈমিনীয় ন্যায়মালার দ্বাদশ অধ্যায় এবং বৈয়াসিকের চার) সমগ্র ন্যায়মালা একই গ্রন্থ বলিয়া বৈয়াসিক ন্যায়মালার প্রারম্ভে বুক্করাজার উল্লেখ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া এই ন্যায়মালা যে মাধবাচার্য্যের কৃত তাহাও অস্বীকার করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না—তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে বৈয়াসিক ন্যায়মালার প্রারম্ভে পৃথক মঙ্গলাচরণেরও কোনই প্রয়োজন ছিল না। সমগ্র ন্যায়মালার বৈয়াসিক অংশ সূচনা করিবার জন্যই এইরূপ পৃথকভাবে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, একথাই যদি বা বলা যায়, তাহাও অসঙ্গত। ইহাই যদি প্রকৃত কারণ হইত, তবে এই বৈয়াসিক ন্যায়মালার ব্যাখ্যাবিস্তরের পৃথক প্রতিজ্ঞা বা সাধ্য-নির্দ্দেশ উক্ত হয় কেন? যাই হৌক, আমাদিগের মতে কাব্যপ্রকাশাদির ন্যায় ন্যায়মালার কারিকা ও তাহার ব্যাখ্যা এই সমুদয় লইয়াই ন্যায়মালাগ্রন্থ। এই কারণে অধ্যায়াদি সমাপ্তিস্থলে ব্যাখ্যার উপসংহারেই "শ্রীভারতী তীর্থ প্রণীত বৈয়াসিক ন্যায়মালাতে," এই কথা বলা হইয়াছে।"

উপরে পণ্ডিত শিবদত্ত শর্ম্মা গ্রন্থ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অবিকল বলিয়া আসিয়াছি। এই বৈয়াসিক ন্যায়মালা যে মাধবাচার্য্যের গুরু ভারতীতীর্থের প্রণীত, এই সিদ্ধান্তের অনুকূল কোন যুক্তি উপরোক্ত প্রমাণাদি হইতে পাওয়া গেল বলিয়া মনে হইতেছে না। এই ন্যায়মালাটী প্রকৃতপক্ষে বেদান্তদর্শনের সার বলিতে পারি। বেদান্তদর্শনের একটী বা অনেকগুলি সূত্র লইয়া, যখন যেরূপ আবশ্যক হইয়াছে, অল্প কয়েকটী শ্লোকে তাহার ভাবটুকু প্রকাশ করিয়া আবার তাহারও তাৎপর্য্য লিখিত হইয়াছে। আর্য্য দর্শন-শাস্ত্র পিপাসুগণের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ উপাদেয় লাগিবে নিঃসন্দেহ।

নানা কথা।

আনন্দ সভার একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব— গত ১লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রাসাদোপম ভবনে আনন্দসভার একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই আনন্দসভা হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেশীয় সঙ্গীত শিক্ষা দিবার সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র সঙ্গীতসঙ্ঘের জন্ম। উৎসবক্ষেত্র ভদ্রমহিলা ও গণ্যমান্য বন্ধুবান্ধবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম বালক-বালিকাগণ সুকণ্ঠে "ওঁ পিতা নোঽসি" প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রে ভগবানের অর্চ্চনা করিবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। তৎপরে গীতা হইতে "ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ" প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রটি সুরলয়ে গীত হইল। বালক-বালিকার সুমিষ্ট কণ্ঠে গীত এই স্তোত্রটি সেদিন কি সুমিষ্টই লাগিয়াছিল। বোম্বাই অঞ্চলের অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত স্যার নারায়ণ চন্দ্রাভরকার শাস্ত্রের অনুশাসন দেখাইয়া বৎসরের প্রারম্ভে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের পরস্পর মিলনের উপকারিতা সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলেন। শ্রীমতী প্রতিভা দেবী "সফলতা" বিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "মাতৃত্ব" বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বালক-বালিকাগণ কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত, হিন্দী ভজন প্রভৃতি গান করিয়া এবং সেতার এসরাজ প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্রের সাহায্যে আলাপাদি করিয়া সমাগত ব্যক্তিগণের অত্যন্ত তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল। আমরা এইরূপ নির্দ্দোষ ও আনন্দদায়ক সম্মিলনের বড়ই পক্ষপাতী।

ছাত্রদিগের মধ্যে যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধি।— আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রসারবিষয়ক আলোচনাতে মনোযোগ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা আলোচনাকালে যদি কয়েকটী সোজা কথার উপর মনোযোগ দেন, তাহা হইলেই আমাদের বিশ্বাস যে এই রোগের প্রসার অনেকটা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে। আমরা আবহমানকাল বলিয়া আসিতেছি যে ছাত্রগণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে দেশের মহা সর্ব্বনাশ। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য ছাত্রগণের নৈতিক জীবন সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকে জ্বলন্ত ভাষায় ছাত্রগণের দুর্নীতিদুষ্ট জীবন সম্বন্ধে যে সকল ভীষণ কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে কোন্ পিতামাতা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি যে তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া কি উপায়ে বিদ্যালয়ে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া যথোপযুক্ত উপায় সকল বিধান করুন। আর, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা শিক্ষক নির্ব্বাচনকালে কেবল শিক্ষকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত উপাধিসমূহের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে যেন বিশেষ অনুসন্ধান করেন। সকলে মনে রাখিবেন যে তাঁহাদেরই পুত্রদিগের এবং সেই সঙ্গে কন্যাদিগেরও জীবনের স্বাস্থ্য, পবিত্রতা সকলই ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। এই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে কেবল নীতি পড়াও বলিয়া চীৎকার করিলে বিশেষ কোন ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মের বন্ধন না দিলে ব্রহ্মচর্য্য কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিবে না। ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবার পর, ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রণালী হইতে পাঠ্য বিষয় সকল গলাধঃকরণ করিবার প্রথা বিদূরিত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। একথা বলিলে চলিবে না যে শিক্ষাপ্রণালীর বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ প্রথা কিরূপে বিদূরিত হইবে? যখন উহা দূর না করিলে যক্ষ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া দেশকে অন্তঃসারশূন্য করিতে বসিয়াছে, তখন সর্ব্বপ্রকার ওজর আপত্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐ অগ্নিপ্রসারের পথ প্রতিরুদ্ধ করিতেই হইবে। ইহারই উপর তোমার, আমার সকলেরই এবং আমাদের প্রত্যেকের পরিবারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করিতেছে; ভারতবাসীর অস্তিত্বই নির্ভর করিতেছে। বিলাতে যক্ষ্মার প্রসার দেখিয়া তাহার প্রতিরোধের জন্য কমিশন বসিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যখন এ বিষয়ে অনেকটা সাহায্য করিতে পারেন, তখন এবিষয়ে তাঁহারা বিশেষভাবে মনোযোগ না দিলে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের

ক্রটী হইবে নিঃসন্দেহ। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, ছাত্রদিগকে যেভাবে পাঠ্য বিষয় গলাধঃকরণ করিতে হয়, তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ না হইয়া যাইতে পারে না এবং স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভগ্ন হইলে যক্ষ্মাবীজ অনায়াসে শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া পরিপুষ্ট হয়।

শান্তাবাসে নববর্ষ—আমরা গতমাসে শোক-সংবাদে এলাহাবাদে শান্তাদেবীর পরলোকগমনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেখানে তিনি নিজগৃহের নাম রাখিয়াছিলেন "শান্তাবাস"। গত ১লা বৈশাখে মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী গভীর দুঃখের ছায়ার মধ্যে নববর্ষ উপলক্ষে শান্তাবাসে যে উদ্বোধন ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।*

উদ্বোধন।

এই উষাকালে নব সূর্য্যকিরণ শীতল প্রাতঃ সমীরণ উদ্যানের প্রস্ফুটিত সুগন্ধ পুষ্প তোমার পবিত্র নাম গান করিবার জন্য আজ আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছে। আজ তোমার পূজার জন্য আমরা সকলে মিলিত হইয়াছি। কেবল আজকের জন্য নয়, প্রতিদিন যেন আমরা তোমার পূজার যোগ্য হতে পারি এই বর দান কর। তুমি যেমন পবিত্র নিষ্কলঙ্ক দেবতা, তোমাকে পূজা করবায় জন্য আমাদেরও পবিত্র ও দোষশূন্য হবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতে হবে। তিনি আমাদিগকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব করেছেন, জ্ঞানেতে বুদ্ধিতে প্রেমেতে মানুষ করে দিয়েছেন, আমরা নিজের চেষ্টাতেই সৎ ও সাধু হতে পারি। বৎসরের পর বৎসর চলে যাচ্ছে, পৃথিবীর দিন ক্রমে অবসান হয়ে আসচে, সুতরাং তৎপর হয়ে দেখতে হবে প্রতি বৎসর আমরা কতদূর তাঁর কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হলুম, কতটা মনুষ্যত্ব উপার্জ্জন করলুম, জীবনকে কতটা উন্নত করে ধন্য হলুম, তাঁকে পূজা করবার কতটা যোগ্য হলুম। সৎকাজে ও সত্য ব্যবহারে নিজেদের পবিত্র কর তাতেই মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে। তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন যে করতে পারে সে অমর হয়, সে এই লোকে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যায়।

এসো আমরা সকলে এই নববর্ষে দৃঢ় হয়ে তাঁর মঙ্গল কাজে সাধু কাজে অগ্রসর হয়ে অমরত্ব লাভ করি। যখন তিনি সুখ দেবেন তখন তাঁকে নমস্কার করি, যখন দুঃখ দেবেন তখনও তাঁকে নমস্কার করি। করুণাময় পরমেশ্বর, শোকতাপিত হয়ে তোমার কাছে আমরা এসেছি, তোমার মঙ্গলচ্ছায়া লাভ করে যাতে এই শান্তাবাসের সকলে শান্তি পায় এই আশীর্ব্বাদ কর।

প্রার্থনা।

হে দেব, হে পিতা—তোমার প্রসাদে আমরা যে একটি অমূল্য রত্ন পেয়েছিলুম, ভক্তি প্রীতি স্নেহে যে রত্নটি আমাদের এই আবাস উজ্জ্বল করে রেখেছিল সে তোমারই আহ্বানে এই গৃহ অন্ধকার করে তোমার পুণ্যধামে চলে গিয়েছে। এখন সে তোমার সঙ্গী হয়ে তোমার পূজায় নিযুক্ত আছে। আমরা প্রত্যেকে বিনীতভাবে তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে তুমি তার নির্ম্মল আত্মাকে নির্ম্মলতর কর সুন্দর কর উন্নত কর ও তোমার অমৃত ক্রোড়ে স্থান দেও।

"কল্যাণ প্রতিমা শান্তা সেবাসুধাভরা,
লক্ষ্মী তুমি এধরায় দিয়েছিলে ধরা;
পুণ্য করেছিলে গৃহ ভক্তি প্রীতি স্নেহে
নিজেরে করেছ দান বাক্যে মনে দেহে।
যাঁর সেবা করেছিলে সংসারের কাজে
তাঁরি পূজা কর গিয়ে অনন্তের মাঝে।
পুণ্য হোক তব যাত্রা, শুভ হোক গতি,
পরম পিতার কোলে শান্তি পাও, সতি।"

কবির এই শুভ আশীর্ব্বাদ সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক।

---

* উক্ত শোকসংবাদে "চারিটি নাবালক" শব্দের পরিবর্ত্তে "দুইটী নাবালক" পড়িতে হইবে।

শোক সংবাদ।

ব্যোমকেশ মুস্তফী—গত ১৯ শে চৈত্র দিবসে ব্যোমকেশ মুস্তফীর পরলোকগমন সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্যিক জগতে ব্যোমকেশ মুস্তফীর নাম আজ সুপরিচিত। বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্য উদ্ধার ও বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে আদি-ব্রাহ্মসমাজ যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, আজ সাহিত্যপরিষদ বলিতে গেলে সেই কার্য্যের ভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার বৎসর দুই পরেই ব্যোমকেশ বাবু ইহার সহিত যোগ দেন। যোগদান অবধিই সাহিত্য পরিষদের উন্নতির জন্য ব্যোমকেশ বাবু বলিতে গেলে নিজের জীবন পাত করিয়াছিলেন। ব্যোমকেশকে ছাড়িয়া দিলে সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আর একটী তাঁহার প্রিয়বস্তু ছিল—তাহা বিশ্বকোষ। বিশ্বকোষের সম্পাদনে ব্যোমকেশ বাবু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, একথা অনেকে অবগত নহেন। ব্যোমকেশের সহায়তা ভিন্ন নগেন্দ্র বাবু এত শীঘ্র বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ইচ্ছা করিলে তিনি অধিক বেতনের কর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারিতেন, কিন্তু পাছে সেরূপ কর্ম্ম গ্রহণ করিলে সাহিত্যপরিষদের ও বিশ্বকোষের সেবা করিতে অবসর না পান, তাই তিনি নিজের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করিবার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করেন নাই। সাহিত্যপরিষদের পক্ষে ব্যোমকেশের অভাব শীঘ্র পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ। তিনিই তাঁহার পরিবারের এক-মাত্র নির্ভরস্থল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পরিবার নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের প্রত্যেক সভ্য অন্যূন এক টাকা করিয়া সাহায্য করিলে তাঁহার পরিবারের প্রভুত সাহায্য করা হয়। এরূপ সাহায্য করিলে আমাদের দেশেরও পক্ষে মঙ্গল। আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য অক্লান্তভাবে একনিষ্ঠার সহিত পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হইব না, কারণ আমরা জানিব

যে আমাদের দেহান্তরেও দেশের লোকেরা আমাদের নিঃসহায় পরিবারগণের প্রতি সহায়হস্ত বিস্তার করিবেন।

সুধীরবালা দেবী—মহর্ষিদেবের জামাতা সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ৺ডাক্তার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূর অকালে পরলোক গমনের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। গত ১৮ই বৈশাখ সোমবার হাজারিবাগে অল্প কয়েক দিনের জন্য বৃহৎ নিউমোনিয়া রোগে ভুগিয়া একটী নাবালিকা কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। পরমেশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন এবং তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারকে শোক বহন করিবার উপযুক্ত ধৈর্য্য ও সামর্থ্য প্রদান করুন।

নন্দলাল দে সরকার—গত বৎসরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটী প্রাচীন বন্ধু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। বিগত ৩১শে চৈত্র অপরাহ্নে নন্দলাল বাবু পরলোক গমন করেন। চিত্রপুরের প্রসিদ্ধ দে বংশে তাঁহার জন্ম। দে বংশ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কিন্তু নন্দলাল বাবু মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর এবং তাঁহার সহায়তায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যাবজ্জীবন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর মাস দুই পূর্ব্বে অসুস্থতা নিবন্ধন নিতান্ত অক্ষম না হইলে পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগদান করিতে কখনই অবহেলা করেন নাই। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান লোক জগতে বড়ই বিরল। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্তা সহধর্ম্মিণী ও পরিজনবর্গের অন্তরে সান্ত্বনা বিধান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

চিত্রপরিচয়।

গতবারে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের যে ছবি সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, তাহাই আমরা পাঠক বর্গকে উপহার দিয়াছিলাম। * বর্ত্তমান সংখ্যার সহিত রামমোহন রায়ের একটী পার্শ্ব-চিত্র উপহার দিলাম। ইহা তাঁহার যৌবনের পার্শ্বচিত্র। আর একখানি ইতিপূর্ব্বে অপ্রকাশিত চিত্র প্রকাশ করিয়া আমরা তাঁহার মূর্ত্তি-পরিচয় প্রদান করিব।

আদিব্রাহ্মসমাজের ১৮৩৮ শকের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ।

গত বৈশাখ মাস অবধি আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য নিম্নলিখিতব্যক্তিগণ যথালিখিত পদে নিযুক্ত হইলেন।

সভাপতি।

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল,

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি,

অধ্যক্ষ

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপদে বা exofficio)
২। মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (স্বপদে)
৩। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপদে)
৪। " চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় (স্বপদে)
৫। " সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬। " ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭। " রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮। " সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়
৯। " কেদারনাথ দাসগুপ্ত
১০। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১১। " নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
১২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল গুপ্ত
১৩। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মজুমদার
১৪। " গোবিনলাল দাস
১৫। " আশুতোষ রায়
১৬। " পাঁচুগোপাল মল্লিক
১৭। " শিতিকণ্ঠ মল্লিক
১৮। " শরৎচন্দ্র চৌধুরী
১৯। " শশধর সেন
২০। " নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়
২১। " কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস
২২। " রাজকুমার সেন
২৩। " গৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন শাস্ত্রী
২৪। " এস, পি, মিত্র এস্কোয়ার

হিসাব পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ট্রষ্টী

---

* ইহার জন্য আমরা হিন্দুপেট্রিয়টের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ।
তং বোং সং

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	১৲
" গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
" সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী	১৲
শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চৌধুরী	১৲
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲
জনৈক ভদ্রলোক	১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী সুহাসিনী মিত্র তাঁহার পিতা ৺নন্দলাল সরকার মহাশয়ের চতুর্থী ক্রিয়োপলক্ষে ১৫৲

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী তাঁহার স্বামীর প্রথম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫৲

আয় ব্যয়।

১৮৩১ শকের চৈত্র মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১০৬৯৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৪৬৭/৯
সমষ্টি	...	১৫৩৬।৩
ব্যয়	...	১০৭১॥৶৩
স্থিত	...	৪৬৪॥/

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদিব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
দুই কেতা গভর্ণমেণ্ট কাগজ

	৪০০৲
সেভিংস ব্যাঙ্ক—	৪৯/০
নগদ	১৫॥০
	৪৬৪॥/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪৯৯৸৶৬

মাসিক দান।

২০০৲

গচ্ছিত আদায়।

২৮৪॥/৬

হাওলাত আদায়।

২৲

হাওলাত জমা।

১৩৷৵০

৪৯৯৸৶৬

তত্ত্ববোধিনী	...	৫৬৸০
পুস্তকালয়	...	২৭।০
যন্ত্রালয়	...	৪৮৫৶০
সমষ্টি	...	১০৬৯৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪৭২৸৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৯২॥৶৬
পুস্তকালয়	...	৮৫।/
যন্ত্রালয়	...	১২০৸৶৬
সমষ্টি	...	১০৭১॥৶৩

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বার্ষিক আয় ও ব্যয়।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

১৮৩১ শক।

আয়	...	৭০৪০॥/৩
পূর্ব্ব বৎসরের স্থিত	...	৫৯৮॥৶৬
সমষ্টি	...	৭৬৩৯৶৯
বাদ খরচ	...	৭১৭৪॥৶৯
স্থিত		৪৬৪॥/০

আয়।

দুই কেতা কোম্পানির কাগজ

	৪০০৲
সেভিংস ব্যাঙ্ক	৪৯/০
নগদ	১৫॥০
	৪৬৪॥/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৫১৯০৸৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২৯।০
পুস্তকালয়	...	৩২৪ /৯
যন্ত্রালয়	...	১১৯৬৶৯
সমষ্টি		৭০৪০॥/৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪২৬৬।৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৭৯৯৸০
পুস্তকালয়	...	১৮৯৸ ৬
যন্ত্রালয়	...	১৯১৮॥৶৯
সমষ্টি		৭১৭৪॥৶৯

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

রাজা রামমোহন রায় (বিলাতে)

F. A. P. S.—Calcutta.

উনবিংশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৭।

৮৭৫ সংখ্যা ১৮৩৮ শক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

মুক্তি দাও।

(শ্রীমতী লীলা দেবী)

মুক্তি দাও মুক্তি দাও মুক্তি দাও মোরে।
আর কিছু নাহি চাহি—চাহি প্রেম-লোরে॥
আমার যা কিছু আছে সঁপিনু তোমায়।
বাঁধন সকলি খুলে বাঁচাও আমায়॥
নব দিনে নব প্রেম দাও সঞ্চারিয়া—
তোমার মূরতি হৃদে আঁকড়ি ধরিয়া
চাহি বিশ্ব-অণু সাথে মিলাইয়া যাই;
জগত আমার বলে জীবন জুড়াই॥
স্বার্থ মোর হত হোক প্রেমের আঘাতে।
সারা ধরণীতে চাহি নিজেরে বিলাতে॥
অন্তরের যত দৈন্য দূর কর আসি।
শিথিল কর গো মোর মোহবন্ধরাশি॥
বিমল বৈরাগ্য দাও শান্ত হোক মন।
মোচন কর গো দেব এ ছার বন্ধন॥

সফলতা।*

(শ্রীমতী প্রতিভা দেবী)

আজ নববর্ষের নবদিবসে তোমার স্মরণে তোমার স্তবে তোমার আরতিতে তোমার আনন্দগানে হৃদয়কে পূর্ণ করিব, আনন্দ উৎসব করিব। আজ আবার এই নববর্ষের নবদিবসে উপনীত হইয়া আমরা তোমার নামে মিলিত হইয়াছি। আজ তুমি ভক্তের হৃদয় পবিত্র কর। তোমাকে প্রাণ ভরিয়া পূজা করিবার জন্য আমরা প্রীতি উপকরণ সঞ্চয় করিয়াছি, সারাটি বৎসর ধরিয়া প্রীতিপুষ্প চয়ন করিয়া প্রীতিমাল্য গাঁথিয়া রাখিয়াছি। তোমার জন্যই আজ আমাদের এই আনন্দ উৎসব। আমাদের সকল ভাবনার মধ্যে, সকল চিন্তার মধ্যে, সকল আমোদ আহ্লাদের মধ্যে আজ তোমার নাম স্থান পাইয়াছে, আমরা তোমার মঙ্গলভাবে বিভোর হইয়া তোমার মঙ্গলগান গাহিতে উদ্যত হইয়াছি।

মানুষ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াই অনেক কাজ করে। লোকে কত আশা করে যে এই কাজের এই ফল পাইবে। বীজ রোপণ করিয়া ফলটি পাইবার জন্য মানুষ কত-না পরিশ্রম করে। সম্বৎসর পরে আজ আমরাও লাভের প্রত্যাশা করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমাকে পাইব, তোমাকে লাভ করিব, এই পুরস্কার লাভের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। তোমার ইচ্ছায় এই জগত রচিত হইয়াছে। এই সৃষ্টি তোমারই মঙ্গল ইচ্ছার ফল। তোমারই শুভ ইচ্ছা অনবরত সুফল প্রসব করিতেছে। হে মহাযোগী পুরুষ! তুমি সর্ব্বদাই তোমার নিজ মঙ্গলধ্যানে সমাসীন; তোমারই মঙ্গল ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্ট হইয়া তোমারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। তোমার সেই

---

* গত নববর্ষে আনন্দসভার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পঠিত প্রবন্ধের সার সংগ্রহ।

পূর্ণ মঙ্গল সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া কে নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারে ?

হে বিশ্বপিতা, অখিলমাতা, আমি তোমার আলোক রাজ্যে যাইতে চাহি—তুমি আমার অন্ধ-ভাব ঘুচাইয়া দিয়া আমাকে তোমারি কাছে লইয়া যাও। আমাকে তোমার সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে দাও, আমাকে তোমারই কথা শুনিতে দাও, তোমার রসপানে পরিতৃপ্ত হইতে দাও। আমি চিরদিনই কি এমনই মলিন থাকিব ? আমাকে তোমায় কি স্পর্শ করিতে দিবে না ? জগতের বিচিত্র শোভায় তুমি স্বপ্রকাশ হইয়া রহিয়াছ, তবে তোমার স্বরূপ আমার নিকট গোপন রাখিতেছ কেন ? আমাকে তোমায় দেখিতে দিতেছ না কেন ? পাখীর কলস্বরে তোমারই সুমধুর সঙ্গীত প্রকাশ পায়, আমাকে তোমার সে গান শুনিতে দিতেছ না কেন ? তোমার বাণী প্রচার করিয়া তোমার প্রেমরস আস্বাদন করিয়া আমার রসনা পরিতৃপ্ত হইতে চাহিতেছে। চাতক পক্ষী যেমন আকাশের জলটুকুর জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, আমিও তেমনি উৎসুকচিত্তে তোমারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির নিকটে যেমন তুমি স্বপ্রকাশ, তেমনি তুমি তোমার সেই স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে আমারও হৃদয়ে আসিয়া আমার এই মনুষ্য-জন্ম সার্থক কর।

হে জ্যোতির্ম্ময় তোমার জ্যোতিতে আমার প্রাণপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠুক। আমার অন্তরে তোমার আলো নির্ব্বাণ হইতে দিও না। তোমাকে আমি আমার সকল জ্ঞানের মধ্য দিয়া, সকল প্রেমের মধ্য দিয়া, সকল মঙ্গলভাবের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিতে চাই। অহর্নিশি কত চিন্তার স্রোত আসিয়া আমাদিগকে সংসারের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, মোহমেঘ আসিয়া কতবার জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, মনকে উদ্বেজিত করে, কিন্তু তোমার মঙ্গলজ্যোতি যখনই হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখনই অন্তরের ঝড়ঝটিকা সকলই দূর হইয়া যায় এবং প্রশান্তভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়। কোলা-হলপূর্ণ কর্ম্মের মধ্যে তোমাকে অল্পকালেরও জন্য ধ্যান করিলে সকল নিরানন্দ দূর হইয়া যায়, তোমার আনন্দ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই।

পিতা ! তুমি জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে ও মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ। সকল সময়ে তোমার মঙ্গলভাব বুঝিতে না পারিয়া আমি চারিদিক অন্ধকার দেখি। সেই অন্ধকারে তোমাকে হারাইয়া ফেলি। আমার এমন কি শক্তি যে প্রেমের পাথার, দয়ার সাগর তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবনের প্রত্যেক কাজ করিতে পারিব ? আমার সকল দৈন্য সকল অভাব তুমিই মোচন করিয়া দাও। হে প্রভু, তোমারই প্রেমবন্ধনে আমাকে আবদ্ধ কর। চিরদিনই তোমার প্রেমসূত্র দ্বারা আমাকে বাঁধিয়া রাখ। তোমাতেই মুক্তি। যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার দয়ার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিব। যখন সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া লইবে, মুক্তি দিবে, তখন আমার কত না আনন্দ। তোমার প্রেমের বন্ধনেই আমার আরাম আমার বিশ্রাম। মুহূর্ত্তকালও আমি তোমাকে ছাড়িয়া বাঁচিতে চাহি না। তোমারই প্রেমধনে আমি ধনবান হইতে চাই। এমন ধন আমায় আর কে দিবে ? একটী দিনের জন্যও যেন তোমার অমৃতলাভে তোমার প্রসাদ-ভোগে বঞ্চিত না হই। একটী দিনও যেন আমাকে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইতে না হয়। তুমি পদে পদে আমাকে উপযুক্ত করিয়া তোমার দিকে অগ্রসর করিয়া লও। আমার আমিত্ব ঘুচাইয়া দিয়া তুমি আমার অন্তরের সিংহাসন অধিকার কর। তোমাকে অবলম্বন করিয়া যেন তোমাতে তন্ময় হইয়া যাই। তোমাতেই আমাকে মিশিয়া যাইতে দাও। এই যে ফুলের সুবাস পাইতেছি, ইহা তোমারই সুগন্ধ বহন করিয়া আনিতেছে। এই বায়ু—ইহাতে তোমা-রই নিশ্বাস উপলব্ধি করিতেছি। তুমি আমার দয়াময় পিতা। আমার আর কে আছেন যিনি আমাকে তোমার মত প্রেমসাগরে ভাসাইয়া সেই অমৃতনিকেতনে যাইবার উপযুক্ত করিতে পারেন ? তোমারই শক্তিতে আমি শক্তিশালী হইয়াছি। তোমারই মঙ্গলময় ব্যবস্থায় আমি তোমারই অমৃতের অধিকারী হইয়াছি। তোমাকে ছাড়িয়া যেন আমি সংসারে এক পদক্ষেপও না করি। আত্মা তোমাকে লাভ করিয়া জাগ্রত হউক।

হে গুরুর গুরু, অকিঞ্চনগুরু ! একটী সিদ্ধ-মন্ত্র তুমি আমার কানে দিয়াছ। সেই সিদ্ধ মন্ত্র

ওঙ্কারের আলোকে দেখিলেই অন্তরের সকল অন্ধকারই তিরোহিত হইয়া যায়। সেই জাগ্রত মন্ত্র একবার যখন আমার হৃদয়মন্দিরে তোমার আলোক জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, তখন সে আলোক কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইতে পারে না। আমার এই প্রার্থনা যে তুমি আমাকে তোমার সেই মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ কর। সকল গুণের আধার, সকল জ্ঞানের আধার, সকল প্রেমের আধার, সকল শক্তির আধার তোমার নামগানে যেন সিদ্ধি লাভ করিয়া তোমার অমৃতনিকেতনের যাত্রী হইতে পারি। তোমার মন্ত্রের গুণে আমার জীবন পুণ্যময় হউক, জয়যুক্ত হউক।

পৃথিবীতে সকল স্থানেই অর্থের মান, অর্থের আদর, অর্থের জয়। এখানে ধর্ম্মের কাঙ্গালকে চিরদিনই কষ্ট সহ্য করিতে হয়। ধর্ম্মের জয় তোমার নিকট। ধার্ম্মিক লোক তেমনি সকল তুচ্ছ করিয়া তোমাধনে ধনী হইবার জন্য কত না কষ্ট অকাতরে সহ্য করেন। আমরা ভুলিয়া যাই যে এই অর্থ, এই বিষয় আশয় কিছুই চিরদিনের জন্য স্থায়ী নহে, তুমিই একমাত্র চিরদিনের পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু। তোমার মত বন্ধু আমরা আর কাহাকে পাইব? হে পূর্ণ পুরুষ, তোমারই আশ্রয়ে যেন আমরা চিরকাল থাকি। তোমারই কাছে থাকিয়া, তোমার কাছে শিক্ষা পাইয়া যেন তোমারই আজ্ঞামত চলিতে পারি। গুরু! পিতা! তোমার সুসন্তান হইয়া সকলের কাছে যেন তোমার সন্তান বলিয়া আমরা আপনাদিগের পরিচয় দিতে পারি। তুমি যেমন আপনাকে দিয়া আমাদের প্রতি অতুলনীয় দয়া প্রকাশ করিয়াছ, আমরাও যেন তোমার অনুকরণ করিয়া হৃদয় হইতে হিংসা-দ্বেষ উৎপাটিত করিয়া পরের দুঃখে দুঃখী হইয়া পরকে ভালবাসিতে পারি, যেন দয়ার সাধন করিতে পারি। তোমার আদেশে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্র যেমন আলোক প্রদান করিয়া জীবের মঙ্গল সাধন করিতেছে, আমরাও যেন সেইরূপ তোমার মঙ্গলালোকে বিচরণ করিয়া সমস্ত জগতের মঙ্গলসাধনে একান্তহৃদয়ে নিযুক্ত থাকি।

আজ কত আশা লইয়া তোমার চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি। এখান হইতে আমাদিগকে নিরাশ হৃদয়ে ফিরিতে হইলে আমাদিগের আর আশা কোথায়? ভগবান, আমার হৃদয়কে তোমার বসিবার উপযুক্ত করিয়া লও। এমন শক্তি দাও, এমন বল দাও যাহাতে আমরা তোমাকে পাইতে পারি। তুমি আমাদের জীবনবৃক্ষকে সরস কর, ফলবান কর। তোমাকে ছাড়িলে আমাদের সুখশান্তি কিছুই থাকে না। তোমার সহিত মিলিত হইয়া আমাদের সমস্ত জীবন সফলতা লাভ করুক।

জাগাও আমারে তুমি নব সাজে।
জীবন সফল কর তব কাজে॥

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ধর্ম্ম ও চারিত্রনীতি।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শিবের ব্রহ্মধ্যান।

পর্য্যঙ্ক-আসন যাঁর,
জানু বদ্ধ দুই ফের ভুজগ-বন্ধনে,
বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত
অন্তঃপ্রাণ অবরোধ—ইন্দ্রিয়-সংযমে,
তত্ত্বদৃষ্টি দিয়া যিনি
দেখেন আত্মার মাঝে নিরিন্দ্রিয় পরম-আত্মায়,
শূন্য-দৃষ্টি সেই শম্ভু
ব্রহ্মের ধ্যানেতে মগ্ন—তোমাদের রক্ষুন সবায়।

মৃচ্ছকটিক—নান্দী।

শূন্যতা।

নাহি যার গৃহে পুত্র শূন্য গৃহ সেই,
চির-শূন্য গৃহ যার সৎ মিত্র নেই;
মূর্খের নিকটে শূন্য দিক্ সমুদয়,
দরিদ্র যে, তার কাছে সব্ই শূন্যময়!

মৃচ্ছকটিক—১ম অঙ্ক।

অবস্থা-বিপর্য্যয়।

ঘন অন্ধকারে যথা দীপের দর্শন
দুঃখ-ভোগ-পরে সুখ তেমনি শোভন।
যে জন সুখের পর ধনবিরহিত
শরীর ধারণ করি' বাঁচিয়া সে মৃত॥

ঐ ১ম অঙ্ক।

দারিদ্র্য ও মৃত্যু।

দারিদ্র্য মৃত্যুর মধ্যে
মৃত্যুতেই রুচি মোর জেনো তুমি বেশ।
অল্পই মরণে কষ্ট
দারিদ্র্যের অবস্থায় যাতনা অশেষ ॥

ঐ ১ম অঙ্ক।

ধননাশে বন্ধুত্বনাশ।

ধননাশ হেতু নহি আকুল চিন্তায়—
ভাগ্যবশে ধন আসে, ভাগ্যে ধন যায়।
শুধু দুঃখ এই মোর—নষ্ট হলে ধন
লোকের শিথিল হয় সৌহার্দ্দ্য-বন্ধন।

ঐ ১ম অঙ্ক।

দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা।

দারিদ্র্য হইতে লাজ,
লজ্জিত জনের দেখ, তেজ হয় ক্ষয়,
নিস্তেজের অপমান,
অপমানে চিত্তমাঝে বৈরাগ্য উদয়।
বৈরাগ্যেতে শোকোৎপত্তি
শোক-আক্রমণে বুদ্ধি করয়ে প্রস্থান,
নির্ব্বুদ্ধি বিনাশ পায়,
সর্ব্ব আপদের তাই দারিদ্র্য নিদান ॥
চিন্তার আশ্রয়স্থান,
পর-তিরস্কারভূমি, শত্রুতা-কারণ,
মিত্রের ঘৃণার পাত্র
স্বজন আত্মীয়দের বিদ্বেষ-ভাজন।
বনে যেতে মন যায় দরিদ্র জনের,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহে নিজ কলত্রের।
নাহি দহে একেবারে হৃদি-শোকানল
মর্ম্মে মর্ম্মে দেয় তীব্র সন্তাপ কেবল।

ঐ ১ম অঙ্ক।

তপস্যা ও দেবপূজা।

মনোবাক্য তপস্যায়
বলি-উপহারে পূজা দিলে দেবতারে
পরিতুষ্ট হন তাঁরা,
শান্ত-চিত্ত জনদের কি ফল বিচারে ॥

ঐ ১ম অঙ্ক।

দারিদ্র্য।

দারিদ্র্যে বান্ধবজন
দরিদ্রের বাক্য নাহি করয়ে গ্রহণ।
সুহৃদ বিমুখ হয়
বিপদ বিপুলভাব করয়ে ধারণ ॥
প্রাণ-বল হয় হ্রাস
চরিত্র-শশাঙ্ক-কান্তি হয় পরিম্লান।
অপরে করে যে পাপ
দরিদ্রের কৃত বলি হয় অনুমান ॥
ধনীর উৎসব গৃহে
লোকে সবে দেখে তারে অবজ্ঞার সাথে,—
স্বল্পপরিচ্ছদ বলি'
বড়লোক হতে রহে লজ্জায় তফাতে।
তাই বলি, নির্ধনতা অতীব জঘন্য।
মহাপাতকের মধ্যে ষষ্ঠ বলি' গণ্য ॥
হে দারিদ্র্য! তব তরে
সকাতরে শোক আমি করি গো প্রকাশ;
পরম সুহৃদ্ ভাবি'
এতদিন মোর দেহে করিলে নিবাস,
এই হতভাগ্য দেহ যখন করিব বিসর্জ্জন,
—এই চিন্তা হয় মোর—তুমি যাবে কোথায় তখন?

ঐ ১ম অঙ্ক।

চরিত্রহীনতা।

দুরবস্থা হলে কারো নাহি অপমান,
দৈবও না করে তার দণ্ডের বিধান।
চারিত্র্য-বিহীন হয়ে যদি হয় ধনী,
তাহারি প্রকৃতপক্ষে দুরবস্থা গণি ॥

ঐ ১ম অঙ্ক।

অসম্ভব মিলন।

অন্ধজনে দৃষ্টি, আতুরের পুষ্টি
মূর্খজনে বুদ্ধি, অলসের সিদ্ধি
স্বল্পস্মৃতি ব্যসনীর বিদ্যার অর্জ্জন
নিজ শত্রুজন-পরে প্রণয় যেমন,
তোমাতে তাহাতে দেখি তেমতি মিলন
তোমা হেরি' তাইত সে করে পলায়ন ॥

ঐ ১ম অঙ্ক।

বাহুবল ও প্রেম।

স্তম্ভে বাঁধা যায় হাতী,
বল্গা রজ্জু দিয়া হয় অশ্বের বন্ধন;
হৃদে যায় বাঁধা নারী,
তা যদি না পার, তবে করহ গমন ॥

ঐ ১ম অঙ্ক।

ভাগ্যক্ষয়ে মিত্রক্ষয়।

দৈববশে মানবের
ভাগ্যক্ষয় হয় গো যখন
মিত্র সে অমিত্র হয়,
বিরক্ত, যে অনুরক্ত জন॥

ঐ ১ম অঙ্ক।

দ্যূতের পরিণাম।

দ্রব্য লব্ধ দ্যূতেতেই
দারা মিত্র দ্যূতেতেই
দত্ত ভুক্ত দ্যূতেতেই,
সর্ব্ব ভ্রষ্ট দ্যূতেতেই॥

ঐ ২য় অঙ্ক।

সতী ও সত্যের মহিমা।

অনুগতা ভার্য্যা মোর বিভবে অভাবে,
সুখ দুঃখে সখা তুমি গাঢ় অনুরাগে।
সত্য যা' দুর্ল্লভ অতি ধনহীন জনে
—হইনি তাহতে ভ্রষ্ট জানি আমি মনে।

ঐ ৪র্থ অঙ্ক।

দোষী জনের অন্তরাত্মা।

সচকিত শশব্যস্ত
আমি যবে করি গো গমন,
যদি কেহ দ্রুতগতি
আসি' মোরে করে নিরীক্ষণ,
দাঁড়ায়ে থাকিলে কিংবা
দ্রুত যদি কাছে আসে কেহ
দোষী অন্তরাত্মা মোর
সবারেই করয়ে সন্দেহ ;
—নিজ দোষে সদা নর
সশঙ্কিত বিকম্পিতদেহ॥

ঐ ৪র্থ অঙ্ক।

প্রার্থনা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্ততীর্থ)

বিশ্ব জুড়িয়া রয়েছ বসিয়া
(তোমায়) তবুত দেখিতে পাইনা।
সকলই তোমার—কি দিব তোমায়
(হায়) আমি বিভু তাহা জানি না॥

তোমারি প্রকাশে বিশ্ব প্রকাশিত
(তবু) আমার আঁধার যায় না।
দিয়েছ আমার নয়ন বাঁধিয়া
(তুমি) খুলিয়া কি আর দিবেনা ?

এ আঁধারে আর রব কতদিন—
(আমায়) আলোকেতে নিয়ে চলহে।
তোমারি আলোকে হয়ে আলোকিত
(আমি) ভাসি আনন্দসাগর হে॥

রাখিলে আমায় আঁধারে ডুবায়ে
(কেবল) দীরঘ নিশ্বাস ফেলিতে।
কি হলে উদ্ধার পাবে এ পাতকী
(প্রভু) জানায়ে দাও হে ত্বরিতে॥

শুনেছি তুমি হে দয়ার সাগর
(আমায়) দয়া কেন তবে করনা ?
যাহা কিছু পাপ কর গো মোচন
(আর) সহিতে পারিনা যাতনা॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা।

দেবেন্দ্রনাথ যে সময়ে শৈশব হইতে বাল্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে বঙ্গের বিশেষত কলিকাতার হিন্দুসমাজে উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দামভাবের একটা প্রবল বায়ু বহিবার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করিলে বেশ মনে হয় যেন ভগবান তাঁহাকে বঙ্গীয়সমাজের একটা আদর্শ জীবনে পরিণত করিবার জন্য সেই সকল উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবল বাত্যা হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। কি প্রকার উপায়ে যে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

গৃহের পাঠশালাতে।

ছয় বৎসর বয়সে ১৭৪৫ শকে (১৮২৩খৃষ্টাব্দে) দেবেন্দ্রনাথ গৃহের পাঠশালায় গুরু মহাশয়েরই

নিকটে "হাতে খড়ি" করিয়া বিদ্যারম্ভ করেন। সেকালে প্রায় প্রত্যেক ধনীর গৃহে একটী করিয়া পাঠশালা স্থাপিত হইত। পাঠশালা স্থাপন গৃহের একটা গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইত। সেই পাঠশালায় গৃহের বালকেরা তো বিদ্যালাভ করিতই, সেই সঙ্গে দরিদ্র প্রতিবেশীদিগেরও সন্তানেরা বিনা বেতনে বিদ্যালাভ করিতে পারিত। বর্ত্তমানে সেই পাঠশালার প্রথা অনেক পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। গুরুমহাশয় প্রধানতঃ "শিশুবোধক" শ্রেণীর পুস্তক অবলম্বনে শুভঙ্করী, চাণক্যশ্লোক প্রভৃতি ছাত্রদিগের কণ্ঠস্থ করাইয়া এবং বাটীর কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকটে সেগুলি আবৃত্তি করাইয়া বাহাদুরী লইতেন। গৃহের পাঠশালায় দেবেন্দ্র নাথেরও এই সকল বিষয়ে যথারীতি শিক্ষালাভ হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ে।

১৭৪৪ শকে (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) রাজা রামমোহন রায় তাঁহার ইংরাজী বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় খুলিবার পাঁচ বৎসর পরে ১৭৪৯ শকে (১৮২৭ খৃষ্টাব্দে) তদানীন্তন স্কুল পরিদর্শক অ্যাডাম সাহেব তাঁহার পরিদর্শন বিবরণীতে এই বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই প্রশংসাপত্র পাইয়া রামমোহন রায় দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার বিদ্যালয়ে পাঠাইবার জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট নিঃসঙ্কোচে অনুরোধ করিলেন। তখন হিন্দু কলেজ এবং আরও দুএকটী ভাল বিদ্যালয় ছিল। রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই ছিল যে সেখানে ধর্ম্ম ও নীতি বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা করিয়া এবং রামমোহন রায়ের অনুরোধে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রামমোহন রায়ের স্কুলেই ভর্ত্তি করাইবার পক্ষে সম্মতি প্রদান করিলেন। রামমোহন রায়ও বন্ধুপুত্রকে আপনার গাড়ীতে লইয়া গিয়া নিজের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে রামমোহন রায় বালক দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও নীতিতত্ত্ব যথোপযুক্তরূপ মুদ্রিত করিয়া দিবার সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। আমাদের বিশ্বাস যে এই রামমোহন রায়ের স্কুলে প্রাপ্ত উপদেশ উত্তরকালে তাঁহাকে বিশেষভাবে রক্ষা করিয়াছিল এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সহজে গ্রহণ করিবার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ।

যে সকল বিষয় ও ঘটনা দেবেন্দ্রনাথের জীবনকে উত্তরকালে নিয়মিত করিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের বিবাহকে তন্মধ্যে অন্যতর পরিগণিত করা যাইতে পারে। ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) দ্বাদশ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নী সারদা দেবীর বয়স তখন সবেমাত্র ছয় বৎসর ছিল। সারদা দেবী অত্যন্ত ধর্ম্মশীলা ও পুণ্যবতী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ মহাধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ স্বার্থপর চাটুকারদিগের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁহার পত্নী এবং সমগ্র পরিবারের ধর্ম্মভাব এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের সঙ্গ ও উপদেশাদি যৌবনসুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না করিতেই তাহা হইতে তাঁহাকে সম্যকরূপে রক্ষা করিয়াছিল।

বাল্যে দেবেন্দ্রনাথের আহার।

আমাদের মতে আরও একটী বিষয় তাঁহাকে উত্তরকালে সাধুচরিত্র রক্ষা করিবার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। সেটী তাঁহার বাল্যে নিরামিষ আহার। যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার একটী পরম বৈষ্ণব ও ভক্তিমান পরিবার ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জীবনের শেষাশেষি ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কারবারের সুবিধার কারণে সাহেবদিগের সহিত সান্ধ্য ভোজনাদি করিবার পূর্ব্বে মাংসাদি তাঁহার বাটীর ত্রিসীমানা স্পর্শ করিতে পারিত না। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন সাহেবদিগের সহিত আহারাদিতে কোন ধর্ম্ম্য প্রতিবন্ধক না দেখাতে পরিবারের কাহারও কোন নিষেধ গ্রাহ্য করিলেন না, তখনও মাংস পেঁয়াজ প্রভৃতি বৈষ্ণবনিষিদ্ধ আহার্য্য অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। সাধারণত গৃহস্থের ঘরে যাহা ঘটিয়া থাকে, দ্বারকানাথেরও গৃহে তাহাই ঘটিয়াছিল—তাহার কোন ব্যতিক্রম

হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতামহীর নিতান্ত আদুরে ছেলে হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার শয়ন, ভোজন, উপবেশন সকলই অন্তঃপুরে পিতামহীর নিকটেই হইত। অগত্যা তাঁহাকে নিরামিষ আহারেই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইত। প্রাতে জলখাবারের জন্য রুটিডিম্বাদির পরিবর্তে এক ধামা মুড়ি মুড়কি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইরূপ আহারাদির ফল সদ্য সদ্য প্রত্যক্ষ না হইলেও ইহা তাঁহার জীবনে যে বিশেষভাবে কার্য্য করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবনের অনেক সময় তাঁহাকে শরীর রক্ষার জন্য মাংসাদি আহার করিতে হইলেও নিরামিষ আহারেরই প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়া ছিল। তিনি জন্মিয়া উৎসবের দিনে, বিশেষত মাঘোৎসবের দিনে তাঁহার পরিবারের মধ্যে নিরামিষ আহারেরই বিধান করিয়া গিয়াছেন; বোলপুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমে নিরামিষ আহারেরই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল হইতে তাঁহার বাল্যকালের সেই নিরামিষ আহারেরই ফলে সাত্ত্বিকতার প্রতি একটা প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাইতেছি।

বাল্যকালে অধিকাংশ বাঙ্গালী ধনীসন্তানের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথও কৃশ ছিলেন। একদিন বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে রামমোহন রায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি বালক দেবেন্দ্রনাথকে নিরামিষ আহার করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং খুব বলের সহিত দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দেবেন্দ্রনাথের জন্য মাংসাহার ও অল্প পরিমাণে শেরি মদ্যের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। শুনিয়াছি যে রামমোহন রায় দ্বারকানাথ ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন "বেরাদর, এই ঘাস খাইয়া কেহ কখনও কি মানুষ হইতে পারে?" দ্বারকানাথের গৃহচিকিৎসক ডাক্তার সাহেবও রামমোহন রায়ের কথার অনুমোদন করাতে বহির্ব্বাটীতে দ্বারকানাথের নিজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সান্ধ্যভোজনের ব্যবস্থা করা হইল এবং সেই ভোজনের সময়ে মাংস ও অল্পপরিমাণে শেরি মদ্যেরও ব্যবস্থা করা হইল। ইহার ফলে যৌবনে দেবেন্দ্রনাথ মদ্যপান বিষয়ে অল্পস্বল্প অতিরিক্ত মাত্রায় গিয়া পড়িয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সেই বাল্যকালের নিরামিষ আহারের প্রতি অন্তঃসলিল আন্তরিক অনুরাগ অল্পকালের মধ্যেই তাহা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উত্তরকালে যেদিন স্থির হইয়াছিল যে মদ্য অস্পৃশ্য, দেবেন্দ্রনাথ বাল্যের নিরামিষ আহারের ফল সাত্ত্বিকতার প্রতি গভীর অনুরাগের বলেই সেইদিন অবধিই মদ্য চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন।

হিন্দুকলেজে প্রবেশ।

১৭৫২ শকে (১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে) দ্বারকানাথ ঠাকুর গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিমকবিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত থাকিবার কালেই কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুর সাহায্যে সুপ্রসিদ্ধ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ বুঝিয়াছিলেন যে দেবেন্দ্রনাথকে স্বকার্য্যের সহায়রূপে পাইতে ইচ্ছা করিলে ভালরূপ ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এদিকে, রামমোহন রায়ের স্কুলে যতটুকু শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল, দেবেন্দ্রনাথের তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল। আর, রামমোহন রায়ও এই বৎসরেই বিলাত গমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার স্কুলের প্রতি তেমন পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করিতে পারিতেছিলেন না। এই প্রকার নানা কারণে দ্বারকানাথ এই বৎসরেই দেবেন্দ্রনাথকে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতামহী, জননী প্রভৃতি পরিবারস্থ গুরুজনদিগের প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবদেবীকে প্রণাম করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন— "প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রামশিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসর যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন আমার মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা দুর্গা ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।" হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হইবার পর তাঁহার সে ভাব কাটিয়া গিয়া প্রাচীন-বিদ্রোহী ভাব হৃদয়ে

জাগিয়া উঠিয়াছিল, পিতামহীর স্নেহপ্রভাবও দেবেন্দ্রনাথের যৌবনের সেই বৈপ্লবিক ভাবকে প্রত্যক্ষভাবে দমন করিয়া রাখিতে পারে নাই।

ডিরোজিওর প্রভাব।

দেবেন্দ্রনাথ যখন হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন, তখন তাঁহার বয়স অনধিক চতুর্দ্দশ বৎসর। তখন তিনি সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিও সাহেব কলেজের অন্যতর অধ্যাপক থাকিলেও সৌভাগ্যক্রমে দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার সংস্রবে আসিতে হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ যে নিম্নশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, সে শ্রেণীতে ডিরোজিওর কোনই সম্পর্ক ছিল না। আর, তাঁহার ভর্ত্তি হইবার প্রায় চারমাস পরেই ডিরোজিও পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ডিরোজিও সভা করিয়া হিন্দুকলেজের প্রধান ছাত্রদিগকে সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বাধীনতামূলক যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার ফলে স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃংলতা ও দুর্নীতির পক্ষপাতী "ইয়ং বেঙ্গল" আখ্যাধারী এক যুবক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বসমাজবহির্ভূত আচার ব্যবহারে হিন্দুকলেজের কর্ত্তৃপক্ষদিগের মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ফলে তাঁহারা ডিরোজিওর উপদেশাদিকেই নব্যসম্প্রদায়ের এইরূপ আচার ব্যবহারের মূল স্থির করিয়া তাঁহাকেই অবসর গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর সহিত সংস্রবে আসিলে বঙ্গের ইতিহাস যে কোন্ পথ অবলম্বন করিত তাহা বলা যায় না। তিনিও যে ডিরোজিওর প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন তাহাও বোধ হয় না। সেখানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলই ডিরোজিওর শিক্ষার বাতাস প্রবহমান ছিল। সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং বিশেষত ডিরোজিওর স্বহস্তনির্ম্মিত ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁহার সহপাঠী না হইলেও বন্ধুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বাল্যে দেবেন্দ্রনাথের সমাজদ্রোহী-ভাব।

একদিকে দেবেন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে হইলেও ডিরোজিওর প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন, অপরদিকে তাঁহার পিতৃবন্ধু অনেক ধনীলোকের পুত্রগণ তাঁহার সহপাঠী ও বন্ধু জুটিয়াছিলেন। কি ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল, কি সেকালের ধনীসন্তান, কোন শ্রেণীরই ভিতরে সত্য সত্য ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা দেখা যাইত না। উভয় শ্রেণীর লোকেই বিভিন্ন কারণে ধর্ম্মের প্রতি সমান অশ্রদ্ধাবান ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে এই সকল অশ্রদ্ধাবান লোকের সঙ্গলাভ করাতে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় হইতে মূর্ত্তিপূজার শৃঙ্খল যে সহজেই খসিয়া গেল তাহা বলা বাহুল্য। দেবেন্দ্রনাথ ভাইদিগকে লইয়া একটা দল পাকাইয়া স্থির করিলেন যে তাঁহারা পূজার সময়ে পূজার দালানে কেহই উপস্থিত থাকিবেন না এবং যদি কেহ উপস্থিত হন, তিনি প্রতিমাকে প্রণাম করিবেন না। দ্বারকানাথ ঠাকুর বড়ই রাশভারী লোক ছিলেন। আরতির সময়ে তিনি নিজে দালানে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার ভয়ে দেবেন্দ্রনাথ নিজের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতারা পিতার ভয়ে দালানে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু 'প্রণামের সময় যখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত, তাঁহারা তখন দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাঁহারা প্রণাম করিলেন কিনা কেহই দেখিতে পাইত না। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের "চারিদিকে কেবল বিলাস ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল।" এই বায়ুর সর্ব্বনাশকর প্রভাব দেবেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

আকাশ দর্শনে ধর্ম্মভাব।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে নিরামিষ আহারের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অন্তঃসলিল গভীর অনুরাগ তাঁহাকে মদ্যপানে ডুবিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছিল। সেইরূপ ভগবৎকৃপায় বংশপরম্পরাগত অন্তঃসলিল প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ তাঁহাকে ইয়ং বেঙ্গলের নাস্তিকতার ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। যখন বিলাসিতা ও নাস্তিকতার মধ্যে পড়িয়া প্রথম বয়সে তিনি হাবুডুবু খাইতেছিলেন, সেই সময়ে এক দিন নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশ দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয় প্রসারিত হইল, অনন্তের বিশালতা তাঁহার হৃদয়ে মূর্ত্তিপূজার স্থান অধিকার করিল। আপাতচক্ষে মনে হয় না বটে যে ইহার ফলে তাঁহার হৃদয়ে কোন প্রকার স্থায়ী ধর্ম্ম-

ভাব আসিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার অন্তঃসলিল ভাবপ্রবাহ তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছিল। তাই এই ঘটনাটী যখন তখন তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া উঠিত এবং তিনি এই ঘটনাটীর কথা সর্ব্বথা উল্লেখ করিতে কখনই কাতর হইতেন না।

দেবেন্দ্রনাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহকারী কোষাধ্যক্ষ।

দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো বৎসর, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্য্যক্ষেত্র অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে ১৭৫৬ শকে (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁহাকে ব্যাঙ্কের কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথকে ব্যাঙ্কের কোন পদে নিযুক্ত করিলে তাঁহার বিলাসিতা দূর হইবে ও বিপ্লবমুখী মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইবে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার নিজেরও কাজকর্ম্মে বিশেষ সহায়তা হইবে ভাবিয়া দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহকারী কোষাধ্যক্ষ করিয়া দিলেন। ইহার এক বৎসর পরে ১৭৫৭ শকে (১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে) দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথের উপরে গৃহসংসারের সমুদয় ভার সংন্যস্ত করিয়া ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে আপনি আপনার প্রভু হইয়া বিলাসসাগরে আরো ডুবিতে বসিয়াছিলেন। তিনি স্বরচিত জীবনচরিতে এই সময়ের বিষয়ে বলিয়াছেন—"এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম।"

দেবেন্দ্রনাথের এই বিলাসসাগরে ক্ষণেকের জন্য অবগাহন করা ভগবানের অভিপ্রেত এবং বিশেষ মঙ্গলজনক হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এরূপ না হইলে বিলাসিতার বিষময় ফল তো তিনি সম্যক অবগত হইতে পারিতেন না এবং উত্তরকালে তিনি যেভাবে বিলাসিতা মদ্যপান প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেরূপ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ভগবান যখন তাঁহাকে নানাবিধ সুমঙ্গল কর্ম্মসম্পাদনে নিজের যন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে বিলাসসাগরে চিরনিমগ্নও থাকিতে দিতে পারেন না। অনন্ত আকাশের ভিতর দিয়া স্বীয় মধুর মূর্ত্তিতে একবার দর্শন দিয়াও যখন ভগবান তাঁহাকে বিলাসিতার আবর্ত্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন তিনি তাঁহাকে এক গুরুতর আঘাত প্রদান করিয়া তাঁহার রক্ষাসাধন করিলেন।

পিতামহীর মৃত্যু।

দ্বারকানাথের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থানকালে, যে পিতামহীকে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং যে পিতামহীর তিনি অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন, সেই পিতামহীর মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হইল। পূর্ণিমার শেষভাগে তাঁহার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটিল। দেবেন্দ্রনাথ বলেন—"আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত বক্ষস্থলে এবং অনামিকা অঙ্গুলিটি ঊর্দ্ধমুখে আছে। তিনি হরিবোল বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোক চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, মরিবার সময় ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন 'ঐ ঈশ্বর ও পরকাল'।" এই শোকের কঠোর আঘাতে তিনি বিলাসের মোহ হইতে আপনাকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে রামমোহন রায়ের স্কুলে প্রাপ্ত ধর্ম্মশিক্ষা, পিতামহীর ধর্ম্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত এবং বংশগত ধর্ম্মভাব, সকলগুলি মিলিত হইয়া বিলাসসাগর হইতে তাঁহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল।

য়ুরোপীয় দর্শনে তৃপ্তির অভাব।

শোকভার লাঘব করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ অবসর পাইলেই বোটানিকেল গার্ডেনে যাইয়া বাগানের মধ্যস্থিত সমাধিস্তম্ভের উপর বসিয়া থাকিতেন এবং পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতেন। তৎকালে প্রচলিত পাশ্চাত্য দর্শনগ্রন্থসমূহের অধিকাংশেই হয় নাস্তিকতা সমর্থিত হইত অথবা বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিষয়ক বিচারবাহুল্য থাকিত। সুতরাং বলা বাহুল্য যে সেই সকল দর্শনগ্রন্থ দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে নাই। এই বিষয়ে তিনি স্বরচিত জীবনচরিতে সুন্দর ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—"আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব, সেই অভাব, তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। সেই বিষাদের অন্ধকার, সেই অশান্তি, হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করিতেছিল। ভাবিলাম প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্ব্বস্ব? তবে তো গিয়াছি। এই

পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার। অগ্নি স্পর্শমাত্র সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘূর্ণাবর্ত্ত তোমাকে রসাতলে দিবে, বায়ু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। ইহার নিকটে নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয় তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কৈ, ভরসা কৈ? আবার ভাবিলাম, যেমন ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে সূর্য্যকিরণের দ্বারা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্য বস্তুর একটা আভাস হয়, ইহাই তো জ্ঞান। এই পথ ছাড়া জ্ঞানলাভের আর কি উপায় আছে? য়ুরোপের দর্শনশাস্ত্র আমার মনে এইরূপ আভাস আনিয়াছিল। কিন্তু একজন নাস্তিকের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। সে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু চায় না। কিন্তু আমি ইহাতে কিরূপে তৃপ্ত হইব? আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য—অন্ধ বিশ্বাসে নহে, জ্ঞানের আলোকে।”

দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম।

পিতামহীর মৃত্যুজনিত শোকের প্রথম আঘাত চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিলাসবাসনা আরও একবার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ১৭৫৭ শকের (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) শেষভাগে দ্বারকানাথ দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং ১৭৫৮ শকে (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। যতদূর জানা যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম অবধি দেবেন্দ্রনাথের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, পঙ্কিল বিলাস সমূহ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইল এবং কাজেই তাঁহার মোসাহেব কুসঙ্গীদিগের অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা।

এই সময়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে দেবেন্দ্র নাথের প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। বাল্যাবধি সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িবার কালেই তিনি চাণক্যশ্লোক বিশেষ যত্নের সহিত মুখস্থ করিতেন। তাহা ছাড়া যখনই কোন একটী ভাল শ্লোক শুনিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা শিখিয়া লইতেন। ইহার উপর, সম্ভবত দ্বারকানাথ ঠাকুরের সভাপণ্ডিত কমলাকান্ত চূড়ামণি কর্ত্তৃক সংস্কৃত কাব্য প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং বহুকাল যাবৎ কঠোর নীরস পাশ্চাত্য দর্শনসমূহ অধ্যয়নের প্রতিঘাত ফলে তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা করিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সভাপণ্ডিতের নিকটেই তাঁহার সংস্কৃত শিখিবার বন্দোবস্ত হইল। সেকালে ধনীদিগের গৃহে পাঠশালা সংস্থাপনের ন্যায় এক একটী সভাপণ্ডিত পোষণ করাও গৌরবের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। দ্বারকানাথের সভাপণ্ডিত ছিলেন বাঁশবেড়ে (বংশবাটী) নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কমলাকান্ত চূড়ামণি। তিনি সুপণ্ডিত ও তেজস্বী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ভক্তি করিতেন এবং তিনিও দেবেন্দ্রনাথকে ভাল বাসিতেন। ইহাঁরই নিকটে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল শিক্ষাকার্য্য চলিতে না চলিতেই চূড়ামণি মহাশয়ের দেহান্তর ঘটিল এবং তখন তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথকে নিয়মিতরূপে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের তত্ত্বকথা মহাভারতে আছে ইহা তাঁহার নিকট অবগত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। সেকালে পণ্ডিতদিগেরও মধ্যে সকলে সম্পূর্ণ সংস্কৃত মহাভারত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতেন না। এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় নিঃসন্দেহ। কিন্তু মহাভারতেও তিনি নানা দেবদেবীর নাম ও বিবরণ দেখিতে পাইলেন। সেই কারণে মহাভারতের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা অর্পিত হইতে পারে নাই। ক্রমে তাঁহার মনে এই ভ্রম হইল যে “আমাদের সমুদয় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র।”

ঈশোপনিষদের ছিন্নপত্রের কথা।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ভগবৎলীলার একটী বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে তিনি পাশ্চাত্যদর্শনে ঈশ্বরের সম্পর্কবিরহিত প্রকৃতিরই প্রাধান্য স্বীকৃত দেখিয়া তাহা হইতে শান্তিলাভে হতাশ হইয়াছিলেন, অপরদিকে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ মাত্রকেই পৌত্তলিকতার সমর্থক জ্ঞান করিয়া

অশ্রদ্ধার সহিত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় একদিন তাঁহার সম্মুখ দিয়া ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রলিখিত একখানি ছিন্নপত্র উড়িয়া যাইতেছিল। কৌতূহলবশত তিনি তাহা ধরিলেন। তাহাতে যাহা লিখিত ছিল, তিনি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। সাধারণ সংস্কৃত ভাষা হইতে উপনিষদের সংস্কৃত ভাষা অনেক প্রভিন্ন। ভট্টাচার্য্যও কাজেই তাহার অর্থ বুঝাইতে না পারিয়া দেবেন্দ্রনাথকে ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে উপদেশ দিলেন। বিদ্যাবাগীশ তাঁহাকে মন্ত্রের অর্থ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শান্তিলাভ করিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিল। উপনিষদের সবল ভাষায় উক্ত সহজ সত্যগুলিতে তিনি নির্ভরস্থান প্রাপ্ত হইলেন। উপনিষদের একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়াই তিনি এত মুগ্ধ হইলেন যে তিনি বিলম্ব না করিয়া সমগ্র উপনিষৎ অধ্যয়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশেরই নিকট উপনিষদ অধ্যয়নের বন্দোবস্ত হইল।

উপনিষদ অধ্যয়ন ও শাস্ত্রসমূহে শ্রদ্ধা।

১৭৬৪ শকে (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বভাবতই দেবেন্দ্রনাথের উপর সংসারের সমুদয় ভারার্পণ করিয়া বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ইত্যবসরে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিয়া তাহারই উন্নতিকল্পে মন দেওয়াতে তাঁহার উপর সংন্যস্ত বিষয়কর্ম্ম ভালরূপ পরিদর্শন করিবার অবসর পান নাই। ১৭৬৫ শকের মাঝামাঝি দ্বারকানাথ দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বিস্তৃত বিষয়কর্ম্ম নিতান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখিয়া কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার পুত্রের কোন কার্য্যে কোন প্রকার বাধা প্রদান করেন নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রথম বন্দোবস্ত অবধি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত রাত্রিব্যাপী সাম্বৎসরিক উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সূক্ষ্মদর্শী দ্বারকানাথ এই তিনটী ঘটনারই তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে অর্থের বলেই দেবেন্দ্রনাথ এইগুলি সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি দেবেন্দ্রনাথের বিষয়কর্ম্মে অমনোযোগ সম্বন্ধে বিদ্যাবাগীশের নিকট বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য স্পষ্টই দেখা যাইতেছে দেবেন্দ্রনাথকে ধর্ম্ম ও অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা শিক্ষা দেওয়া। যাই হৌক সেই বিরক্তি প্রকাশের কারণে বিদ্যাবাগীশ দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার বাটীতে উপনিষদ পড়াইতে অস্বীকৃত হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে গিয়া বিদ্যাবাগীশের নিকট উপনিষদ পড়িয়া আসিতেন। অধ্যবসায়ের গুণে তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যাবাগীশের নিকটে ক্রমে ক্রমে ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই কয়েকটী উপনিষদ শেষ করেন, এবং পরে অন্যান্য পণ্ডিতের সাহায্যে অবশিষ্ট ক্ষুদ্র কয়খানি উপনিষদ পাঠ শেষ করেন। এই উপনিষদ অধ্যয়নের ফলে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিয়া আশ্চর্য্য ফলদায়ক হইয়াছিল।

শোক।

(শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম-এ-বি-এল)

আবরি হৃদয় তব কালিমার ছায়ে
শোকের আঁধার যবে আসিবে ঘনায়ে,
সম্মুখে পশ্চাতে তব চারিদিক হ'তে
বেদনার ভার ল'য়ে দাঁড়াইবে পথে,
সুধাংশুর সুধা ছলে সান্ত্বনা বর্ষণ,
মিটি মিটি তারকার স্নেহাবলোকন,
রবির কিরণমাখা শুভ্র মেঘরাশি,
লাবণ্যপূরিত তনু কুসুমের হাসি
বিষাদের ছবি শুধু দিবে জাগাইয়া
তোমার নয়নে অশ্রু আনিবে টানিয়া,
নতশিরে পূতচিতে করিও গ্রহণ,
দেবতার দূত বলে করিও বরণ ;
জগতের মহাপান্থ, যোগ্য গৃহী হয়ে
সম্ভাষিও অতিথিরে নির্ভীক হৃদয়ে,
ভক্তিভরে মেগে নিও দীক্ষা কাছে তার,
সে মহান্ গুরু তব অনন্ত শিক্ষার।

বজ্রহস্তে আগুনের শলাকা লইয়া
ঐ যে হৃদয় তব দিতেছে পুড়াইয়া
তারি সনে পুড়ে যাক প্রবৃত্তি দুর্ব্বার,
উন্মুক্ত হউক তব সংযমের দ্বার;
হৃদয়ের শাণযন্ত্র এসেছে তোমার
চিত্ত শুদ্ধি তরে,—লহ দান দেবতার।
যাহারে হারায়ে তুমি করিছ ক্রন্দন,
সাজাইতে স্বরগের উদ্যান আপন
তাহারে লয়েছে বিধি,—তুমি ভাগ্যবান্
মহামূল্য লভিয়াছ মনুষ্যত্ব দান;
পান্থরূপে আসিয়াছে শোক ভৃত্য তাঁর
তাঁহারি বারতা লয়ে দুয়ারে তোমার।
তব গৃহ ছাড়ি যবে করিবে প্রস্থান,
অসহ্য শোকের যবে হইবে নির্ব্বাণ
দেখিবে হৃদয় তব পঙ্কিল চঞ্চল
অতিথি-সেবায় পূত প্রশান্ত নির্ম্মল।

বাঙ্গলার প্রাচীন পল্লীচিত্র।

(শ্রীতারকদাস মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল)

আজকাল পুরাতনের উপর সাধারণের একটা বিরক্তি আসিয়া পড়িয়াছে। সভ্যতার প্রসারের সহিত কালধর্ম্মে এমন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে যে পুরাতনে আর কাজ চলে না; পুরাতনের স্থবির দেহ দিগ্বিজয়ী নবীনের সহিত আর চলিতে পারে না। পুরাতন একটা বোঝার মত নবীনের আকাঙ্ক্ষাদৃপ্ত, যৌবনসুলভ স্বচ্ছন্দ পাদক্ষেপে প্রতিহন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজেরা good old days বলিয়া আক্ষেপ করিলেও কালধর্ম্মে তাহারা পুরাতনকে বর্ত্তমান সময়ের নিতান্ত অনুপযোগী বলিয়া অভিযোগ করিতে সঙ্কুচিত হন না। আমরা ইংরাজের শিষ্য, আমরাও তাহা বলি। ফরাসী দেশের সেই বিখ্যাত বিপ্লবের সময় অবধিই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এক মহাপ্রলয় বাধিয়া গেল। Liberty, Fraternity ও Equality এই মহামন্ত্রের মন্ত্রধ্বনিতে উদ্দৃপ্ত হইয়া মানবসমাজ যাহা কিছু প্রাচীন তাহারই বিনাশসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। সে মহাপ্রলয়ে প্রাচীন স্নেহ, মমতা ও প্রণয়ের গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু পৃথিবীর সহিত একপ্রকার সম্বন্ধহীন ভারতে সে মন্ত্রধ্বনি তৎসময়ে প্রতিধ্বনিত হয় নাই। প্রাচীন ভারত চক্ষু বুজিয়া প্রাচীনের সুখস্বপ্নে সময় অতিবাহিত করিতেছিল। তাহার পর ইংরাজের আগমনের সহিত, ইংরাজী ভাষার প্রসারের সহিত ভারতেও একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। সেই চাঞ্চল্যের ভিতরে আমরা ভারতের স্বভাবসুন্দর প্রাচীন ভাবগুলিকেও হারাইতে বসিয়াছি, ইহাই দুঃখের কারণ। এখন ভারতের অবনতির কথা বলিতে গেলেই জাতিভেদ প্রভৃতিকেই তাহার প্রধান কারণরূপে নির্দ্দেশ করি। কিন্তু প্রাচীনকালে সমাজের সকল শ্রেণী সকল জাতির পরস্পরের মধ্যে জাতিভেদের মধ্যেও যে একটী সুকোমল প্রীতি, হৃদয়ের প্রকৃত ভ্রাতৃভাব দেখা দিত, বর্ত্তমানে জাতিভেদ ভাঙ্গিবার শত চীৎকারের মধ্যেও আমরা সে সৌহার্দ্দ্য, সে ভ্রাতৃভাব, সে প্রণয় দেখিতে পাই না। এখনকার যে ভ্রাতৃভাব, তাহার ভিত্তিতে উদারতা নাই, হৃদয়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত ভালবাসা নাই, দুঃখে সহানুভূতি নাই। দরিদ্র কৃষিজীবীর সহিত ভ্রাতৃত্বস্থাপনকে আমরা বর্ত্তমানে ill breeding বলি। যাঁহারা আজ কাল অবস্থাপন্ন ও কলিকাতাপ্রবাসী তাঁহারা নিজ দরিদ্রপল্লীর সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন। আজ কাল ধনী সম্প্রদায় কখন কখন দরিদ্রকে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতকে অর্থ সাহায্য করেন বটে কিন্তু সেটা অনেক সময়ে হৃদয়ের টানে নয়। সে দানের ভিতরে একটা গর্ব্ব আছে। উহা নির্ধনের প্রতি কৃপাকটাক্ষ মাত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীনকালে পরস্পরের মধ্যে প্রীতিসৌহার্দ্দ্য একটু অন্য ধরণের ছিল। সেই পার্থক্য দেখাইবার জন্য প্রাচীন কালের একটী পল্লীচিত্র আজ পাঠকগণের সম্মুখে আমরা উপস্থিত করিতেছি।

আমি একটী ব্রাহ্মণকে জানি। আজ ষোল কি সতের বৎসরের কথা—তাঁহার পিতার পিতামহী তখন জীবিত ছিলেন। গ্রামের মধ্যে তিনি বুড়ী। গ্রামের মধ্যে আর একটী বুড়ী ছিল, সে নীচ জাতীয় কুম্ভকার। সে বুড়ী একদিন ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত—দুই বুড়ীতে বেশ মিলিয়া গেল। সে একটা আসন লইয়া ব্রাহ্মণ বুড়ীর পাশে বসিয়া

সুখদুঃখের নানা কথা বলিতে লাগিল। শেষে পরস্পরের এত প্রণয় জন্মিল যে দুইজনে সই পাতাইল। বুড়ো ঠাকুরমার সইকে বামুনবাড়ীর ছেলেরা বড় ভক্তি করিত। সেও তাহাদিগকে পুত্রাধিক স্নেহ করিত। সে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিলেই বুড়ো ঠাকুরমার আদেশানুসারে তাহাকে বসিবার জন্য সকলে আসন পাতিয়া দিত। সেই বামুনবাড়ীর ছেলেরা কতবার তাহার বাড়ীতে যাইয়া পাকা কলা, দুধ খাইয়া আসিত এবং প্রতি রথের সময় মাটীর ঘোড়া বা রথ কতবার স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ প্রাপ্ত হইত। দুই বুড়ীই এখন স্বর্গে গিয়াছেন।

সেই সময়ের বনভোজনের কথা মনে পড়ে। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একটা আমবাগান আছে। বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া গ্রামের মেয়েরা (বৃদ্ধারাই বেশী) বেলা এগারটা কি বারটার সময় বৃক্ষতলদেশ পরিষ্কৃত করিয়া সেইখানে বসিয়া স্বস্ব ভোজ্য লইয়া প্রীতিভোজন করিত। এ উপলক্ষে ব্রাহ্মণশূদ্র মহানন্দে একত্র মিলিয়া ফলাহার করিত। একমুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের জাতিগত পার্থক্য সে প্রীতিভোজনকে নিরানন্দ করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র স্ত্রীলোকের এরূপ প্রীতিমিলন আজকাল উঠিয়া গিয়াছে। হায় সে দৃশ্য আর দেখিতে পাইব বলিয়া মনে হয় না।

অরন্ধনের দিন সেকালে দেখিয়াছি যে এক বৃদ্ধ পিতামহের এই ব্যবস্থা ছিল যে যত হিন্দু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত শূদ্র সেদিন তাঁহার বাটীর সন্নিহিত গ্রাম্য পথ দিয়া যাইবে, সকলকেই তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রামের পাশ দিয়া একটী নদী বহিয়া যাইত। সেই নদীতে যে সকল নৌকা যাইবে, তাহারও আরোহীগণকে ডাকিয়া সমাদরে বাটীতে খাওয়ান হইত। নিম্নজাতিরা সেদিন জোর করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া মহানন্দে তামাকু সেবন করিত আর "আমার কৈ" বলিয়া রন্ধনগৃহের নিকটে যাইয়া আপনার দাবী বুঝিয়া লইত। তাহাদের কাছে ভিতর বাহির থাকিত না—যেন তাহাদেরই ঘর, তাহাদেরই বাড়ী।

সে সময়ে ব্রাহ্মণও যেমন শূদ্রদের কার্য্যে আপনার রক্তপাত করিতে কুণ্ঠিত হইত না শূদ্রগণও তেমনই ব্রাহ্মণের কার্য্যে মরিতে প্রস্তুত ছিল। তাহারাই আমাদের জ্যেঠা, দাদা, কাকার পদ গ্রহণ করিত। একচক্ষে শাসনের তীব্রাগ্নি ও অপর চক্ষে বাৎসল্যের কারুণ্য লইয়া যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত তাহারা নীচজাতীয় হইলেও আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিত ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করিত। তাহাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিবার সাহস আমাদের ছিল না। ডাকিলে পিতামাতার রক্তচক্ষুতে সে দুঃসাহসের পুনরাবৃত্তি চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া যাইত।

আমার মা'র কুম্ভকারজাতীয়া এক সই আমার ও আমার কনিষ্ঠ সহোদরের উপনয়নের সময় আমাদিগকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া দুধ, কলা, বাতাসা ও চিঁড়ে খাওয়াইয়া পরে একখানি করিয়া লালপেড়ে কাপড় দিয়াছিল এবং এইরূপে তাহার স্নেহের বন্ধনে আমাদিগকে আজও জড়াইয়া রাখিয়াছে।

যেখানে উচ্চনীচের মধ্যে এত সৌহার্দ্দ্য এত হৃদয়বিনিময় সেখানে জাতিভেদের বন্ধন ততটা ঠেকিত না, ঐক্যসাধনের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইত না। বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণ শূদ্রের উচ্চনীচতামূলক অন্তর্বিদ্রোহ সে সময়ে ছিল না। পরস্পরের সহানুভূতি পরস্পরের হৃদয়কে সরস করিয়া রাখিত। আজকাল মনোমালিন্য আসিয়া বহুদিনের প্রেমসিঞ্চিত স্নেহবর্দ্ধিত একতার মূলোৎপাটনে উদ্যোগ করিতেছে—কি পরিতাপের কথা।

কেবলমাত্র হিন্দুর ভিতরে নহে, হিন্দুমুসলমানেও সখ্যের অভাব ছিল না। এক গ্রামবাসী বলিয়া তাহাদের জাতিগত পার্থক্য কখনও পরস্পরের সখ্য স্থাপনে বাধা প্রদান করিত না। হিন্দুর সহিত মুসলমানের প্রীতির সম্বন্ধ বেশ দৃঢ় ও স্থায়ী ছিল। এখনও আমাদের গ্রামে মুসলমান দাদা কাকা আছে। আমি বাড়ী যাইলে, তাহাদের বাড়ীতে পদার্পণ না করিলে তাহারা তাহাদের স্নেহের দাবী চাপিয়া ধরে এবং অভিমান ও রাগ প্রকাশ করে।

এইরূপ এক মুসলমান দাদার কন্যার বিবাহের সময় দাদা ও দাদার স্ত্রী আসিয়া এক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। বিবাহের সময় সেই ব্রাহ্মণকে উপস্থিত

থাকিতে হইয়াছিল। গরীব কৃষকের প্রাণ যেমন কোমল, তেমনই মধুর। সে জানে ব্রাহ্মণসন্তানেরা তাহার ভাই এবং সে তাহাদের দাদা—তাহার কন্যার বিবাহে তাহারা না যাইলে সে তো দুঃখিত হইবেই। মুসলমান ও তাহার স্ত্রী ব্রাহ্মণসন্তানদিগকে স্নেহপূর্ণ "তুই" প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিত। এপ্রকার হৃদয়বিনিময়ের তুলনা নাই। ধনী ইহাতে হাসিবে, গর্ব্বিত ইহাকে ঘৃণা করিবে, শিক্ষিত ইহাকে অতিমাত্রা বলিবে। যাহারা অর্থপ্রাচুর্য্যকে মহত্ব বলে, যাহারা মদোন্মত্ত আচারকে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বলে, বাহ্যিক শোভাসম্পত্তিকে যাহারা সুখ বলে তাহারা এই হৃদয়বিনিময়ের মূল্য বুঝিতে পারিবে না।

একটী ব্রাহ্মণের বিবাহ দেশে না হইয়া কলিকাতার বাসা বাটীতে হয়। সেই বিবাহের সময় দেশের অনেককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ব্রাহ্মণের এক মুসলমান দাদাকে ভুলক্রমে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। বিবাহের পর সে এই বিষয় লইয়া সেই ব্রাহ্মণকে বেশ লজ্জা দিয়াছিল। কিছুদিন পরে সে বধূকে একখানি রেশমের রুমাল, গন্ধ দ্রব্যাদি ও টাকা দিয়া তাহার মুখ দেখিয়া গেল। কিন্তু হায়, এরূপ আত্মীয়তা বর্ত্তমানে দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। এখন অর্থই উচ্চনীচনির্দ্দেশক যন্ত্র। যেখানে হৃদয়ের আদানপ্রদান ও যথার্থ প্রীতিসৌহার্দ্দ্য নাই সেখানে প্রকৃত ঐক্য অসম্ভব।

শুদ্ধ যে এক গ্রামে এইরূপ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র মুসলমানে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য ছিল তাহা নহে। বাঙ্গালার প্রতিগ্রামে এইরূপ হৃদয়বিনিময় চলিত। তাহা না হইলে সীতারাম রায়ের সময়ে, প্রতাপ রায়ের সময়ে ব্রাহ্মণ শূদ্র মুসলমান জাতিভেদ ভুলিয়া স্বদেশের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিত না। দরিদ্রের জন্য ধনী ভাবিত আর সেই জন্যই পরস্পরে প্রীতিসংস্থাপনে কোন বাধা ছিল না। এখনও বহুসংখ্যক হিন্দু পরিবারে বাড়ীর প্রভুর সহিত চাকরের সম্বন্ধ অতি মধুর ও হৃদয়স্পর্শী। চাকর প্রভুর বাড়ীরই একজন। এই চাকর ও চাকরাণীরা বাটীর বালক বালিকাদের সহিত দাদা, কাকা, দিদি সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলে। আমাদের বাড়ীর বহু দিনের প্রাচীনা দাসী আমাদের দিদি। আমার পুত্র তাহাকে পিসি বলিয়া ডাকে। পিসি দেশ হইতে আসিবার সময় ভাইপোর জন্য চিঁড়ে, মুড়কি লইয়া আসিয়া ভাইপোকে কোলে লইয়া তাহার বিরহক্লিষ্ট বক্ষস্থল জুড়াইয়া থাকে।

প্রকৃত কথা এই যে হৃদয়ের উদারতা চাই, পরদুঃখে সহানুভূতি চাই—তবে ঐক্যসাধন হইবে, অন্যথা নহে। আমরা পূর্ব্বের যাহা কিছু ভুলিয়া যাইতেছি, অন্ততঃ ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি। বিদেশের আদর্শে পড়িয়া নিজস্ব হারাইতেছি, নিজদের মহত্ব, উদারতা, বদান্যতা পরোপকারিতা সবই যাইতেছে। সরস অতীত ভুলিয়া গিয়া আপনাদের ভিতরে এক বিষম বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে বসিয়াছি।

বট বৃক্ষতলে।

(৺ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আকাশে বিস্তৃত করি
শাখা প্রশাখা
বৃদ্ধবট রহিয়াছে দণ্ডায়মান।
তাহে বসে কত পাখী
ঝাপটে পাখা
কত পাখী কত প্রকার করে গান॥

তলে তার ছোট ছোট
শিলা অনেক
রয়েছে পড়ে সাদা-কালো রাঙ্গা রাঙ্গা।
অদূরে দাঁড়ায়ে গিরি
প্রকাণ্ড এক—
চৌদিকে ভূমি অসমান ভাঙ্গা ভাঙ্গা॥

একেলা বসিয়া আছি বটের তলে
গাছটি কি স্তব্ধ কি ঘন কি প্রকাণ্ড!
মনে আসিছে উপনিষদ কি বলে
বৃক্ষসম স্তব্ধ একে পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড!
স্তব্ধ তিনি করিছেন কত কি কাণ্ড!

রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষের বক্তৃতা।

(গত ২১ শে বৈশাখের সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত)

অদ্য হইতে ১৪৩ বৎসর ১১ মাস পূর্ব্বে, কলিযুগের ৪৮৭২ বৎসরে, সম্বৎ ১৮২৮, শকাব্দা ১৬৯৩, সন ১১৭৯ সাল ৮ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে, খৃষ্টাব্দ ১৭৭২,* ১৯শে মে, জলুস সাহালম ১৩ অর্থাৎ দিল্লীশ্বর সাহালম বাদশার রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে বর্ত্তমান যুগ-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ রাজা রাম-মোহন রায় এই পবিত্র স্থানে আবির্ভূত হন। তিনি শাণ্ডিল্য বংশসম্ভূত ভট্টনারায়ণ বংশীয়। তিনি যে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন পূর্ব্বে তাহার কোন নিরা-করণ ছিল না। তাঁহার জন্মের ৮৭ বৎসর এবং মৃত্যুর ২৬ বৎসর পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পাদরী লং সাহেব এই দেশে আসেন এবং তৎকালীন রায় বংশীয়দের বৃদ্ধ ত্রিলো-চন রায় ও কানাই লাল রায় মহাশয়দের নিকট কোন্ স্থানে রায় বংশীয়দের বংশপরম্পরায় সূতিকাগার ছিল তাহা নিরাকরণ করেন এবং তদনুসারে এই স্থান তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া স্বীকৃত করেন এবং এই স্থান হইতে রাজার স্মারক চিহ্নস্বরূপ কিছু মৃত্তিকা লইয়া যান। তদবধি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি রাজার প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শনার্থ এই স্থান দর্শন করিতে আসেন। কেহ বা একটুকুরা ইট লইয়া যান। † সিটী কলেজের ভূত-পূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রায় প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে রাজার জন্মমাস জ্যৈষ্ঠ মাসে আসিয়া দুই এক দিবস এই স্থানে অতিবাহিত করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী এক বৎসর উমেশ বাবুর সহিত আসেন। ১৯০৮ সাল (খৃষ্টাব্দ) এপ্রেল মাসে শ্রীযুত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় ও ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর এই স্থান পরিদর্শন করিয়া যান এবং এই স্থানে রাজার কোন স্মৃতিচিহ্ন না থাকায় তাঁহারা বহু দুঃখ প্রকাশ করেন।

রামমোহন রায়ের কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয় নাই বলিয়া অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক পুস্তকে বহু অনুতাপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় ভারতবাসিগণ রাজার গুণগ্রাম ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়া নানাস্থানে তাঁহার স্মৃতিমন্দির স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার যথা-যোগ্য স্মৃতিমন্দির স্থাপিত হয় নাই। বোম্বাই নগরে ৺ দামোদর গোবর্দ্ধন দাস কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া "রামমোহন আশ্রম" স্থাপন করিয়াছেন। বাঁকীপুরে "রামমোহন সেমিনারী" নামে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে "রামমোহন লাইব্রেরী" স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে রতনমণি গুপ্ত ৫০০০ হাজার টাকা দিয়া রাজার স্মৃতি চিরস্মরণীয় করি-য়াছেন। কলিকাতার মহানগরীতে রাজা রামমোহন রায়ের বাসস্থানের সম্মুখে ২৬৭ নং অপার সারকিউলার রোডে "রামমোহন লাইব্রেরী ও ফ্রীরীডিং রূম" নামে জন-সাধারণের সাহায্যে যে বৃহৎ স্মৃতিমন্দির স্থাপিত হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে যাঁহারা উদ্যোগী

* ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দই রামমোহন রায়ের জন্মবৎসর বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। তঃ বোঃ সং।

† রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির স্থাপনের ইতিহাস সম্বন্ধে বিপিন বাবু অনেক তত্ত্বকথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু একটী কথা উল্লেখ না করিয়া তাঁহার বক্তৃতাটীকে বড়ই অসম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়া-ছেন। রামমোহন রায়ের স্মৃতিস্থাপনাবিষয়ক ইতিহাস হইতে স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ থাকিবে। ঈশানচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিলে রামমোহন রায়ের স্মৃতিস্থাপনের ইতিহাস নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রথমত ঈশান বাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ না করিলে এই শতাব্দী পরে কে রাজাকে ঠিকভাবে চিনিতে পারিত? ছায়ার মত হয়তো সকলেই উপলব্ধি করিত যে রামমোহন রায় একজন দেশের জ্ঞানী ও গুণী সন্তান ছিলেন, কিন্তু তিনি যে কত বড় ছিলেন, দেশের কতদিকে উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থাবলীর অভাবে কে তাহার পরিচয় পাইত? ইহা সকলের জানা উচিত যে তাঁহার সমুদয় গ্রন্থাবলীই একমাত্র ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃকই সংগৃহীত হইয়া বিভিন্ন প্রকাশকের নামে প্রকাশিত হইয়া-ছিল।

দ্বিতীয়ত, রাজা রামমোহন রায়ের একটী প্রকাশ্য স্মৃতিমন্দির স্থাপনার প্রস্তাবনাতেও ঈশান বসুর নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকিবে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজার ইংরাজী গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া সুই-ডেনবাসী একেশ্বরবাদী কায়ল এরিক হামারগ্রেন রাজার জন্মভূমি দেখিবার জন্য এদেশে আগমন করেন। কলিকাতায় আসিয়া দেখেন যে এখানে তাঁহার কোনই স্মৃতিচিহ্ন নাই এবং সে জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ঈশান চন্দ্র বসু উমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহাশয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজের কয়েকখানি পুস্তকের দ্বারা "রাজা রামমোহন লাইব্রেরী" স্থাপন করেন। ইহাই কলিকাতায় রাজার সর্ব্বপ্রথম স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ। উক্ত লাই-ব্রেরীর পরিচালন ভার স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র দত্ত গ্রহণ করেন। গোল-দিঘীর পূর্ব্ব পাড়ে ৪ নম্বর কলেজ স্কোয়ারস্থ একটী বাটীতে তখন মূকবধির বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। তাহারই নিম্নতলে উক্ত লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। ঈশান চন্দ্র তাহার অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক হইয়া নিজের প্রায় শতাধিক টাকার পুস্তকাদি দান করিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর একনিষ্ঠ সেবা দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র উমেশ বাবুপ্রমুখ কয়েকটী বন্ধু সমভি-ব্যাহারে রাজার জন্মস্থানে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে হোরমিলার কোম্পানির ঘাটালযাত্রী ষ্টিমারের সাহায্যে রাধানগর যাত্রা করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে রাজার সূতিকাগার বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাজার কতিপয় জ্ঞাতিজনের সাহায্যে ঈশানচন্দ্র স্বয়ং সেই জঙ্গল কাটিয়া রাজার সূতিকাগার নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তথায় একটী হোম করেন এবং সেই হোমাবশেষ ভস্ম আনিয়া কলিকাতায় বন্ধুবান্ধ-বের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এত দিনের পরে ঈশান চন্দ্রের সংকল্পমূলক হোম ফলবান হইতে চলিয়াছে ইহাতে আমাদের কত না আনন্দ হইতেছে। জন্মস্থানে রাজার স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনে স্থানীয় অধি-বাসীদের যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে তাঁহার আত্মীয়দিগের সহানুভূতির অভাবে তাহা সংসিদ্ধ হইতে পারে নাই। তঃ বোঃ সং

হইয়া উক্ত লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই স্মৃতিমন্দিরের সভাপতি জগৎবিখ্যাত আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উক্ত স্মৃতিমন্দিরের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। আশা করি অচিরে তাহা স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতির উপযুক্ত একটী মন্দিরে পরিণত হইবে। উক্ত রামমোহন লাইব্রেরীর ১৯০৯, ৯ই মার্চ্চ তারিখে যে বাৎসরিক অধিবেশন হয় তাহাতে সেই সভার সভাপতি হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যে বক্তৃতা দেন তাহাতে বলেন, I regret that that there is no monument erected at the native village of Rajah Rammohon Ray অর্থাৎ রাজার জন্মস্থান রাধানগর গ্রামে তাঁহার কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন না হওয়ায় আমি দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ১৯১৪, ১লা ডিসেম্বর তারিখে রামমোহন লাইব্রেরীতে শ্রীযুত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর প্রদত্ত রাজার বৃহৎ তৈল চিত্রখানি উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত যে মহতী সভা হয় তাহাতে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার ও এই স্থান হইতে ২০০ হাত অন্তরের অধিবাসী ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি, আই, ই, বলেন, "No memorial of Raja would be complete till Radhanagore has its memorial library or memorial hall" অর্থাৎ রাধানগরে তাঁহার স্মৃতিচিহ্নের জন্য লাইব্রেরী বা হল প্রস্তুত না হইলে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন অসম্পূর্ণ থাকিবে।

প্রায় ৪০ বৎসর অতীত হইল ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি রামমোহন লাইব্রেরী নামক পুস্তকাগার এই স্থানে স্থাপন করেন কিন্তু সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে না পারায় উহা অকালে তিরোহিত হয়। প্রায় ৩০ বৎসর হইল স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয় এই স্থানে রাজার একটী স্মৃতিমন্দির স্থাপনের সমস্ত ব্যয়ভার নিজে বহন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া স্থানটী অধিকার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তৎকালে স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণে ১০০০০৲ পড়িবে এরূপ অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন এই স্থানের স্বত্বাধিকারীরা এই স্থান হস্তান্তর বা অর্পণ করিতে অসম্মত হওয়ায় উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তৎপরে এই স্থানটী হস্তগত করিতে না পারায় আমরা বহুকাল স্মৃতিমন্দির স্থাপন বিষয়ে নিরস্ত ছিলাম। ১৯০৫, এপ্রেল মাসের প্রথমে শ্রীযুক্ত ভূপতি গোস্বামী, আরামবাগ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কান্তিভূষণ সেনকে এই স্থান দেখাইবার জন্য লইয়া আসেন। তিনি উহা পরিদর্শন করিয়া এই স্থানে রাজার একটী স্মৃতি স্থাপন করিবার জন্য একখানি পত্র লেখেন। উহা এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে তদবধি এই স্থানবাসী সকলে রাজার একটী স্মৃতিমন্দির স্থাপন বিষয়ে বদ্ধপরিকর হন।

অদ্য হইতে ৮ বৎসর পূর্ব্বে ৫ই বৈশাখ ১৩১৫, ইং ১৮ই এপ্রেল, ১৮০৯, কৃষ্ণনগর গ্রামে কৃষ্ণনগর সমাজের যে অধিবেশন হয়, এবং যে সভায় "নব্য ভারতের" সম্পাদক শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সভাপতি ছিলেন, তাহাতে ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উপস্থিত করা হইলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, "জগদ্বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের জন্মস্থান রাধানগর গ্রামে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রাখা নিতান্ত আবশ্যক, অতএব কি উপায় অবলম্বন করিলে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা অবধারণার্থ নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে সদস্য করিয়া একটী সমিতি গঠন করা হউক। তাঁহাদের নাম :—

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
৺অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু
ডাঃ শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।"

তাহার পর উক্ত সনের ১৪ই চৈত্র তারিখে কলিকাতার অন্তঃপাতী ৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এক সভা হয়। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হাইকোর্টের উকিল ৺কৃতান্তকুমার বসু এম, এ, বি, এল, রামমোহন লাইব্রেরীর সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর উপস্থিত থাকেন। ঐ সভায় কিছুক্ষণ আলোচনার পরে এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর গ্রামে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ উপযুক্ত ভূমি সংগ্রহের জন্য উক্ত জন্মভূমি ও তৎসন্নিকটস্থ ভূমির স্বত্বাধিকারিগণকে এতৎ উদ্দেশ্যে অনুরোধ করা হউক।"

উক্ত জমির স্বত্বাধিকারী ৺অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় রামমোহনস্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে উহা দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ট্রাষ্টডিড্ প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেন। তদনুসারে ১৯১০।৩ অক্টোবর তারিখে এক ট্রাষ্টডিড্ লিখিত ও খানাকুল সবরেজেষ্ট্রারী আফিসে ৭ই অক্টোবর তারিখে রেজেষ্টীকৃত হইয়াছে এবং তাহা ১৯১৪।২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রে ছাপান হইয়াছে। এই ট্রাষ্টডিড্ অনুসারে ৺অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ও নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় দাতাগণের পক্ষে ট্রাষ্টী হন এবং শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ ও শ্রীকিশোরিমোহন গুপ্ত

সাধারণের পক্ষে ট্রাষ্টী হন। এতদ্ভিন্ন ৺মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি, ৺অক্ষয়কুমার রায়, ৺অমৃতলাল রায়, শ্রীযুত সুরথনারায়ণ রায় শ্রীযুত ক্ষিতিপতি রায় প্রভৃতি অন্যান্য রায়বংশীয়েরা এবং রায়বংশীয়দের নিকট খরিদদার শ্রীগোবর্দ্ধন দত্ত ও মোহিনীমোহন দত্ত প্রভৃতি সকলে ১৩১৬।১৯শে বৈশাখ তারিখে রাজার মেমোরিয়েল কমিটি এবং সেক্রেটারীকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া দিয়াছেন।—"মহাশয়! রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি (থানাকুল কৃষ্ণনগর অন্তপাতী রাধানগরের) সংলগ্ন ও সন্নিহিত আমাদের যে সকল পতিত ভূমি আছে তৎসমস্ত ভূমি উক্ত রাজার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থ ও সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য আমরা সজ্ঞানে সুস্থশরীরে সমর্পণ করিলাম। ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত ভূমিতে আমাদের উত্তরাধিকারিগণের অথবা আমাদের স্থলাভিষিক্তগণের স্বত্ব সম্পর্ক রহিল না ও থাকিবে না।" ১৯১০।২ অক্টোবর তারিখে তৎকালীয় বঙ্গেশ্বর সার এডওয়ার্ড বেকার তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে—

"I am desired by His Honour to say that he fully sympathises in your desire to erect a memorial of Raja Rammohan Ray"

শ্রীযুক্ত নন্দলাল গুঁই ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় স্মৃতিমন্দিরের নক্সা ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ এষ্টিমেট অনুসারে কেবল মন্দিরটী প্রস্তুত করিতেই ১৫০০০, হাজার ব্যয় পড়িবে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য রামমোহন সরোবর নামক একটী পুষ্করিণী খনন করিতে প্রায় হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে।

এই জন্য রাজার পৌত্রবধূ শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী মহাশয়া গত বৎসর বৈশাখ মাসে ট্রাষ্টীদিগের নামে ১টী পুষ্করিণী খরিদ করিয়া দিয়াছেন। যে সমস্ত যাত্রিগণ রাজার জন্মস্থান দেখিবার জন্য গমন করিবেন তাঁহাদের বাসের জন্য একটী বিশ্রামাগার তৈয়ার করিতে হইবে। এই সমস্ত রক্ষার জন্যও কিছু টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে। তাহার সুদ হইতে ইহা রক্ষিত হইবে ও দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। এতদ্ভিন্ন যথার্থ জ্ঞান বিস্তার করা রাজার জীবনের এক মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তজ্জন্য বেদান্ত উপনিষদাদি অধ্যাপন করাইবার জন্য এই স্থানে অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিবেন। ইহা খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রস্তাব। এই স্থানে রাজার মতাবলম্বী একেশ্বরবাদিগণের ঈশ্বর উপাসনার ব্যবস্থা হইবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইবে।

লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে ষড়্ভুজাকৃতি ঘর প্রস্তুত করিবার হেতু কি? রাজা এই রাধানগর গ্রাম হইতে উঠিয়া গিয়া যখন লাঙ্গুলপাড়ায় বাস করেন, তদনন্তর তথায় "ওঁতৎসৎ" চিহ্নিত ইষ্টকের দ্বারা একটী ষড়্ভুজাকৃতি গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রত্যেক শিলানের উপর "একমেবাদ্বিতীয়ং" "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং," "সত্যমেব জয়তে" ইত্যাদি মূল বচন লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর যখন লাঙ্গুলপাড়া বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া রঘুনাথপুরে আসেন তখন সেইখানেও একটী "ওঁতৎসৎ" লিখিত ইষ্টকের দ্বারা ষড়্ভুজাকৃতি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসবাস করিতেন। তজ্জন্য ঐরূপ ওঁতৎসৎ লিখিত ইষ্টক দ্বারা এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিবার মনস্থ করিয়াছি।

এক সময়ে স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসের ন্যায় বদান্য সদাশয় পুরুষ নিজ ব্যয়ে আমরা যে স্মৃতি মন্দির স্থাপনের জন্য এই স্থানে সমবেত হইয়াছি তাহা নির্ম্মাণ করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় স্থানটী অর্জ্জন করিতে না পারায় উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাহার পর যদিচ এই স্থানের স্বত্বাধিকারী ৺অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ও সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়দিগর রাজার উপর তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া অর্পণ করেন তথাপি উক্ত অর্পণের অব্যবহিত পরেই এই দেশে দুর্ভিক্ষ ও ১৯১৩ জলপ্লাবন ইত্যাদি নানা দুর্বিপাক উপস্থিত হওয়ায় এই স্মৃতিমন্দির স্থাপনের বিষয়ে আদৌ অগ্রসর হইতে পারা যায় নাই। এক্ষণে স্থানটী অধিকার হইয়াছে ও অসংখ্য নরনারীর সহানুভূতিও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং এই কার্য্যটী যে অচিরে সুসম্পন্ন হইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া নৃশংস সতীদাহ প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতীতি জন্মাইলে গবর্ণমেণ্ট ১৮২৯। ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ করেন। উক্ত আইনের মর্ম্ম এই যে জমীদার তালুকদার ও তাহাদের নায়েব প্রভৃতি কর্ম্মচারী ঐরূপ কোন সতীদাহের উদ্যোগ হইতেছে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী পুলিশ ষ্টেশনে খবর দিতে আইন অনুসারে বাধ্য, যদি তিনি না দেন তাহা হইলে ২০০৲ টাকা জরিমানা হইতে পারিবে। তদন্যথায় ছয় মাস কারারুদ্ধ হইতে পারিবে। ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৭৬ ধারা মতে ঐরূপ সংবাদ না দিলে ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাবাস ও ১০০০৲ টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ সাজা হইতে পারিবে। এইরূপ আইনের কথা সভাস্থানে আমার বলিবার হেতু এই যে এই নৃশংস প্রথা

ভিন্ন আকারে আবার আমাদের সমাজে উদয় হইতেছে, আমরাও তাহার প্রকারান্তরে অনুমোদন করিতেছি।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্বামীত্যক্ত সম্পত্তিতে বিধবা পত্নীর দায়াধিকার থাকিলেও যতদিন না রাজা ঐ বিষয়ে তীক্ষ্ণ লেখনী চালনা করিয়া "Brief Remarks regarding modern encroachments on the Ancient Rights of female according to Hindu Law of Inheritance" লিখিয়া উক্ত দায়াধিকার সাব্যস্ত না করিয়াছিলেন, ততদিন কোন হিন্দু বিধবা তাঁহার স্বামীত্যক্ত সম্পত্তি পান নাই। এক্ষণে অনেক হিন্দু বিধবা তাঁহাদের স্বামিত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া চৌধুরাণী, মহারাণী, অধিরাণী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, এমন কি বোধ হয় কেহই জানেন না, যে ইহা রাজার লেখনী চালনার ফল। অতএব নারীকুলের উপর রাজার বিশেষ দাবি এবং সেই জন্যই বোধ হয় মহিলাগণ রাজার উপর তাঁহাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য অদ্য এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা কখন রাজাকে তাঁহাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য সুযোগ পান নাই, সেই জন্য এই ব্যাপারের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদিগকে সেই সুযোগ দিবার জন্য শ্রীমতী হেমলতা দেবীকে এই স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিতে আহ্বান করিয়াছেন এবং তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। আপনাদের সকলের নিকট প্রার্থনা যে আপনারা সকলে তাঁহাকে এ শুভকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য অনুমতি দিন।

নারীকুলে তাঁহার ন্যায় বিদুষী অতি বিরল, তিনি এই স্থানে উপস্থিত সকলের নিকট সুপরিচিতা না হইলেও তিনি আমাদের। তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই স্থানেই। তিনি লাঙ্গুলপাড়ার যে বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছেন সেই তাঁহার জন্মস্থান এবং এই স্থানের অনতিদূরে রামনগর গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়। তিনি রাজার পৌত্রীর পৌত্রী। সুতরাং এই স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিবার তাঁহার ন্যায় যোগ্য মহিলা আমাদের বিবেচনায় এস্থলে আর কেহ নাই।

উন্নতি প্রসঙ্গ।

প্রাচ্য প্রকৃতির পরিচয়—বর্ত্তমান যুদ্ধে আর যাহা কিছু ফল হোক না কেন, একটী মহান সুফল সংসিদ্ধ হইয়াছে—প্রতীচ্যবাসী প্রাচ্যবাসীদিগের প্রকৃতির যথার্থ পরিচয় পাইয়াছে। এতদিন প্রতীচ্যবাসীগণ প্রাচ্যবাসীদিগকে প্রথমত হীনচক্ষে দাসদৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক ইংরাজ কর্ত্তৃক সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের পর যে সকল ভ্রান্তমত-বিপর্য্যস্ত ইতিহাস সকল ধারাবাহিকরূপে দেশীয় ও বিদেশীয় যন্ত্রালয় সমূহ হইতে উদ্গীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সেই সকল ইতিহাসই এই প্রকার দাসদৃষ্টি প্রবর্ত্তনের জন্য অনেকাংশে দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ অবধি প্রাচ্যবাসীদিগের উপর একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহ আসিয়া প্রতীচ্যবাসীদিগের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে প্রাচ্যবাসীদিগেরও মনে যে প্রতীচ্যবাসীদিগের প্রতি ন্যূনাধিক পরিমাণে অবিশ্বাস ও সন্দেহ আসে নাই তাহা বলা যায় না। মানবদিগের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা প্রভৃতি নীচভাব সকল ক্রমশই বিস্তৃত হইতে হইতে এই যুদ্ধের পূর্ব্বে অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বর্ত্তমান ভীষণ সমরাগ্নিতে সেই সকল নীচভাব ভস্মসাৎ হইয়া মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীন জাপানীকে ছাড়িয়া দিলেও শত শত ভারতবাসী সমরক্ষেত্রে যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীচ্যবাসীগণ শত চেষ্টা করিলেও আর প্রাচ্যবাসীকে কেবল দাসত্বের উপযুক্ত বোধ করিয়া গর্ব্বিত প্রভুর উপযুক্ত হীনদৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাসী উভয়েই এখন দেখিতেছে যে উভয়েই মানুষ—পরস্পর দেখিতেছে যে পরস্পরের চরিত্রে মনুষ্যত্ব কিরূপ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অনেক দিনের নীচভাবের জঙ্গলে পরিপূর্ণ পার্থক্যের বেড়া এখনও সম্পূর্ণ অপসারিত না হইলেও, আমরা দেখিতেছি যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অল্পে অল্পে সখ্যহস্ত বিস্তার করিতেছে। রুষ-জাপানের যুদ্ধ এই বেড়া ভাঙ্গিবার পক্ষে আশ্চর্য্য সহায়তা করিয়াছে, তজ্জন্য আমরা জাপানের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বর্ত্তমান যুদ্ধেও জাপানের মিত্রসঙ্ঘের প্রতি প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় আচরণ প্রাচ্যবাসীদিগের প্রতি মিথ্যাবাদী ও গুপ্তশত্রু প্রভৃতি বলিয়া প্রতীচ্যবাসীদিগের ভ্রান্ত সংস্কার দুরীকরণে

বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, একথা বর্ত্তমানে সর্ব্ববাদ-সম্মত। এই বেড়া একবার যখন ভাঙ্গিবার সূত্রপাত হইয়াছে, তখন ইহা সম্পূর্ণ অপসারিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। বর্ত্তমান মহাসমর যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাসীদিগের মধ্যে পার্থক্য ভাঙ্গিয়া দিয়া সখ্য-বন্ধন দৃঢ় করিতে পারে, তবে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ এই ভীষণ যুদ্ধেরও জয়জয়কার করিতে বিরত হইবে না।

নীরব সাধনা—মহাসমরের অগ্নির ভীষণ আকার দেখিয়া দেশবিদেশের অনেকেই এখন ভয়ত্রস্ত ও শোকে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। অস্ত্রের ঝনঝনানি, কর্ম্মের ঘড়ঘড়ানি শুনিয়া শুনিয়া লোকেরা এতই অস্থির ও বধির হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা আর কর্ম্মের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে অবস্থান করিতে চাহে না, একটু নীরব সাধনা করিতে চায়। এক সময়ে যেমন ভারতের উপনিষদের ঋষিরা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে ধর্ম্মের বহিরাড়ম্বরে বিশেষ কোন ফল হয় না—ধর্ম্ম প্রকৃতই অন্তরের বস্তু, সেইরূপ প্রতীচ্য ভূখণ্ডেরও প্রকৃত সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছেন যে একমাত্র ধর্ম্মই এসময়ে জগতের উদ্ধার সাধন করিতে পারে—আর, সেই ধর্ম্ম সত্য সত্য অন্তরের বস্তু হওয়া চাই, সেই ধর্ম্ম শক্তিশালী ও মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবার উপযুক্ত হওয়া চাই, কেবলমাত্র তাহা কতকগুলি মন্ত্রনিহিত বা অনুষ্ঠানে আবদ্ধ ধর্ম্মের খোসা হইলে চলিবে না। এতদিন প্রতীচ্যবাসীগণ ধর্ম্মের বহিরাবরণ লইয়াই অনেকটা পরিতৃপ্ত ছিলেন, এখন তাঁহারা ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব স্বীয় অভিজ্ঞতাতে উপলব্ধি করিতে চাহেন। এই জন্যই একটী ধর্ম্মযাজক বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠতম ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জ্জনের জন্য, উচ্চতম ভাবসমূহের আবাহনের জন্য এবং পূততম জীবন গঠনের জন্য নীরব সাধনার উপযোগিতা আমাদের নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। পুরাকালের জ্ঞানীপ্রবর পিথাগোরাস এই নিঃসঙ্গিতার মূল্য বুঝিতেন এবং সেই কারণে তিনি তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যকে এক বৎসর কাল মূকভাবে অবস্থিতি করিতে অনুশাসন করিতেন; এবং বর্ত্তমানের এক ভারতবর্ষীয় উপদেষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতিদিন মুক্ত বায়ুতে অন্তত পনেরো মিনিট নির্জ্জনে অবস্থিতি করিবার বিধি দিয়াছেন। কুমারী হজকিন বলেন যে ভূতত্ত্ববিৎগণের মতে কতকগুলি দানাদার পদার্থ নিঃসঙ্গভাবে অবস্থিতির অবসর পাইলে ভালরূপ দানা বাঁধিতে পারে। মানুষের পক্ষে একথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ডাক্তার মার্টিনো ঠিকই বলিয়াছেন যে নির্জ্জনতার ভিতরেই আত্মা স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে পারে, নবতর তেজ ধারণ করে এবং জীবন পথের অমঙ্গল ও বিঘ্নরাশি বাত্যার সম্মুখে ধূলিরাশির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার উপযুক্ত বল সঞ্চয় করে।" প্রতীচ্য ভূখণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এখন বুঝিয়াছেন যে অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরে মনঃসমাধান করিলে তাঁহা হইতে আশ্চর্য্য জ্ঞানলাভ করা যায় এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে আশ্চর্য্য বল পাওয়া যায়। তাঁহারা এখন এই কথাই বলিতে চাহেন যে নীরব সাধনারই ফলে পরম শান্তি ও পরম আনন্দ আমাদের করায়ত্ত হয়। বর্ত্তমান মহাসমর ব্যতীত আর কোন কিছুই এই চরম সত্য মূর্ত্তিমান করিয়া পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পূর্ব্বে "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়" এই সত্য ভারতবাসীর নিকটে মূর্ত্তিমান হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে বিশেষ কোন পরিচয় পাই না।

যুক্তাহারে প্রবৃত্তি—আহার ও মনোবৃত্তি যে অনেকাংশে পরস্পরসম্বদ্ধ তাহা বোধ হয় বিস্তৃত করিয়া বুঝাইতে হইবে না। আমাদের আহার আমাদিগকে ধ্যানপ্রবণ করিয়া তুলিয়াছে এবং আমাদের ধ্যানপ্রবণতা আমাদিগকে অযুক্তাহার হইতে বিরত রাখিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে এতদিন পর্য্যন্ত কেবল কতকগুলো মদ্যমাংস গলাধঃকরণ করা অধিকাংশের অভ্যস্ত ছিল—উপবাসের নামে পাশ্চাত্যবাসীগণ চমকাইয়া উঠিত। তাহার ফলে তাহারা সাধারণত যে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পশুভাবের অধিকারী ছিল সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে নানা কারণে পাশ্চাত্যবাসীকে মদ্যমাংস বিষয়ে এবং অতিভোজন বিষয়েও বাধ্য হইয়া সংযত হইতে হইয়াছে। এখন সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে যুক্তাহার ও উপবাসের একটা বাতাস উঠিয়াছে। এই ভাবটী স্থায়ী হইলে—এবং স্থায়ী হইবারই

সম্ভাবনা—পাশ্চাত্যবাসীগণেরও ধ্যানপ্রবণ হইয়া উঠিবার বিশেষ সম্ভাবনা। তখন তাহারা স্বভাবতই পরের প্রতি অন্যায় অত্যাচার হইতে বিরত হইতে থাকিবে। তখনই আমরা বর্ত্তমান মহাসমরের ভিতরেও উন্নতির বীজের সন্ধান পাইয়া ভগবানের মঙ্গলভাবের জয়কীর্ত্তন করিব।

নানা কথা।

লর্ড কীচনারের মৃত্যু—পৃথিবীর একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া গেল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। কীচনার রুসিয়াতে রুস-সম্রাটের আহ্বানে যাইতে-ছিলেন—পথে তাঁহার জাহাজ ডুবিয়া গেল। এই যুদ্ধের সময়ে এই এক ব্যক্তি মিত্রসঙ্ঘের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা আর কেহ করিতে পারিত কি না এবং পারিবে কি না সন্দেহ। একজন মানুষ যে কি ক্ষমতা ধারণ করিতে পারে, কীচ-নারের ন্যায় লোকই তাহার পরিচয়। তাঁহার একনিষ্ঠা প্রত্যেক মানবের অনুকরণীয়। সেই একনিষ্ঠার বলে তিনি মিত্রসঙ্ঘের হিতোদ্দেশ্যে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহার জন্য আজ তাঁহার প্রতি সমগ্র ব্রিটিস সাম্রাজ্য কৃতজ্ঞ।

য়ুআন শিকাইয়ের মৃত্যু—সমস্ত চীনদেশকে মাঞ্চুজাতির পরাধীনতা হইতে যিনি উদ্ধার করিয়া এক বিশাল সাধারণতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহারও সম্প্রতি দেহান্তর ঘটিয়াছে। কাহারও মতে রোগে, কাহারো বা মতে বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। সং-বাদপত্র হইতে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে বিষ-প্রয়োগের কথাই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। বিষ-প্রয়োগের কারণ এই অনুমিত হয় যে তিনি দেশকে সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিয়া তাহার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হৌক, তাহার কিছু দিন পরে তিনি নিজেকে চীনের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা কবিয়াছিলেন। অন্যায় উচ্চাশা মানুষকে অনেক সময়ে হিতাহিত বিচার করিবার অবসর দেয় না। ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করি-তেছে যে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইবার পর একচ্ছত্র স্থাপনের চেষ্টা অমঙ্গলজনক। জুলিয়স সীজার এবং নেপোলিয়ন এই সত্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। য়ুআন শিকাই নিজেকে চীনের সম্রাট ঘোষণা করিবার পরেই একদিকে সীমান্ত প্রদেশ সমূহে বিদ্রোহের সম্বাদ পাওয়া গেল, অপরদিকে তাঁহার অত্যন্ত অসুস্থ হইবার সম্বাদও আসিল। সেই অসুস্থতার পরিণামেই আজ তিনি ইহলোক পরি-ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তিনি সাধারণতন্ত্রের কর্ণধার হইয়া থাকিলে চীনের কত উপকার করিতে পারিতেন।

পানিশ্চল গ্রামের কথা—আমরা পত্রিকাতে কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধীয় যে সকল কথা লিখিয়াছি, হুগলি জেলার অন্তর্গত পানিশ্চল গ্রামের বিবরণে সেই সকল কথার যাথার্থ্য ও উপযোগিতা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হইতেছে। ষ্টেটসম্যান পত্রে প্রকাশ যে উক্ত গ্রামের জমীদার আজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নানা উপায়ে এই গ্রামের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। সেই জমীদারের অভিজ্ঞতামূলক মতে জমীদারেরা নিজেদের জমীদারীতে না থাকিলে শত চেষ্টাতেও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে না।

কেরোসিনে নারীহত্যা—আজকাল প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায় যে স্ত্রীলোকে গাত্রে কেরো-সিন তেল লাগাইয়া অগ্নিসংযোগে নিজেকে দগ্ধ করিতেছে। কি কুক্ষণেই স্নেহলতা নিজের পিতাকে বিবাহপণের ঋণদায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেরোসিনের আগুনে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে অনেক স্ত্রীলোক বৈধব্যের হস্ত এড়াই-বার জন্যও ঐ প্রকারে আত্মহত্যা করিয়াছেন। কয়েকটী সংবাদপত্রে স্নেহলতাকে শতমুখে প্রশংসা করিয়া এবং শেষোক্ত স্ত্রীলোকদিগকে সতী নাম দিয়া প্রকারান্তরে সমগ্র হিন্দুরমণীসমাজকে ঐ প্রকার কার্য্যে উৎসাহ দিয়াছিলেন। আমরা সেই সময়ে ভাবিয়াছিলাম যে ইহার ফল বড়ই শোচনীয় হইবে। ফলেও তাহাই ঘটিয়াছে। এখন আর স্ত্রীলোকেরা কেবলমাত্র সতীদাহের সীমা রক্ষা করিতে চাহেন না। গৃহে পরিবারের মধ্যে সামান্য তুচ্ছ কলহের কারণে তাঁহারা আত্মহত্যা করিতে-ছেন—আত্মহত্যার যেন একটা বাতাস পড়িয়া গিয়াছে। আরও একটী শোচনীয় সংবাদ সেদিন

সংবাদপত্রে পড়িলাম যে একটী চৌদ্দ পনেরো বৎসরের বালক বাড়ীতে সামান্য একটু বিবাদ কলহ হইয়াছিল বলিয়া দেহে কেরোসিন ও অগ্নিসংযোগ করিয়া কাপুরুষের ন্যায় আত্মহত্যা করিয়াছে। এই আত্মহত্যার জন্য বিধাবাদিগের আত্মহত্যাসমর্থক একটী সংবাদপত্র বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। একটী প্রবাদ আছে যে ঢিল না ছোড়া উচিত, কারণ ঢিল একবার হাত হইতে চলিয়া গেলে কোথায় গিয়া যে পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই। এখন আত্মহত্যার জন্য এপ্রকার দুঃখপ্রকাশ করিলে কি ফল? বিধবাদিগের আত্মহত্যার প্রশংসা করিবার সময়েই ভাবা উচিত ছিল যে আত্মহত্যার ফল কিছুতেই মঙ্গলজনক হইতে পারে না এবং আত্মহত বিধবা দিগকে সতী নামে অভিহিত করিয়া সমগ্র জনসমাজকে ঐপ্রকার কার্য্যে কিছুতেই উৎসাহ দেওয়া উচিত ছিল না। বরঞ্চ, প্রত্যেক আত্মহত ব্যক্তিকে স্ত্রীলোক হউক বা পুরুষ হউক, কাপুরুষ, স্বার্থপর ও নীচ বলিয়া ঘোষণা করিয়া জনসমাজকে আত্মহত্যা হইতে সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত করা কর্ত্তব্য। আমরা প্রকৃতই মনে করি যে, যে ব্যক্তি যে কোন কারণে আত্মহত্যা করিতে পারে, সে নিতান্ত স্বার্থপর, নিজের সুখান্বেষী ও কাপুরুষ। এই আত্মহত্যা নিবারণের ইচ্ছা করিলে উহার মূল কারণের প্রতিবিধানে অগ্রসর হওয়া উচিত।

কুমারী এভারেষ্টের দান—ভারতবাসীদিগের দ্বারা ভারতবাসীদিগকে ভারতীয় প্রণালীতে শিক্ষা দানের একটী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কুমারী এভারেষ্ট ১৪০০০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। কালের পরিবর্ত্তন ও হৃদয়ের মহত্বের পরিচয়।

সাহিত্য পঞ্জিকা—নিম্নলিখিত পত্রখানি আমরা পত্রিকাতে মুদ্রিত করিবার জন্য পাইয়াছি। সমাদ্দার মহাশয়ের প্রস্তাবটী শুভ এবং সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়,
মোরাদপুর (পাটনা)
২০শে ফাল্গুন, ১৩২২।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ইংরাজীতে যেরূপ "Literary Year Book" আছে আমাদের সেরূপ কিছুই নাই। এরূপ একখানি পুস্তকের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের এই "সাহিত্য পঞ্জিকা" চারিভাগে বিভক্ত হইবে। (১) বঙ্গীয় জীবিত লেখকগণের নাম, ঠিকানা, পুস্তকের নাম, পুস্তক উপন্যাস, কি ইতিহাস, অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীর পুস্তকের সংস্করণ ইত্যাদি (২) এই বৎসরের সাময়িক পত্রিকাদির উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধের সারাংশ (৩) বঙ্গভাষার প্রকাশিত সকল পত্রিকাদির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (৪) বঙ্গের পাঠাগারাদির তালিকা। খরচ বাদ দিয়া যাহা লাভ হইবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মোরাদপুরস্থ পাঠাগারের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে, এক-তৃতীয়াংশ বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে ও অন্যাংশ সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। সাহিত্য সম্মিলনে (বঙ্গীয়, উত্তর বঙ্গীয় অন্যান্যে) যাঁহারা সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন তাঁহাদের ছবি প্রদত্ত হইবে। সাহিত্য সম্মিলনগুলিরও ছবি দেওয়া হইবে। অপর কোন গ্রন্থকার ছবি দিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকে ছবি প্রস্তুতের ব্যয়, আর্টপেপারের মূল্য ও ছবি ছাপিবার খরচ দিতে হইবে।

পুস্তক, সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হইবে। "সাহিত্য পঞ্জিকা" ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারের হইবে এবং প্রতি পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ১০৲ করিয়া লওয়া হইবে। পুস্তক ২৫০০ করিয়া ভাল কাগজে ছাপা হইয়া প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইবে এবং মূল্য যথাসম্ভব কম করা হইবে। আমরা এই নূতন ধরণের পুস্তক প্রকাশের জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি-এ, মহাশয় মাসিক পত্রের উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধাদির সার সঙ্কলন করিতেছেন। মাসিকের সম্পাদকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ মাসিক আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলে আমরা সহজে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব। অন্যান্য সংবাদ পত্রাদির সম্পাদকগণ দয়া করিয়া নিজ নিজ পত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পত্র লিখিবার সময় রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট দিয়া পত্র দিবেন।

বিনীত নিবেদক
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
অধ্যাপক, পাটনা কলেজ।

অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৮ শক।

১লা জ্যৈষ্ঠ দিবসে সম্পাদকের আহ্বান-পত্রের মর্ম্মানুসারে ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার কার্য্যবিবরণী নিম্নে প্রকাশিত হইল।

উপস্থিত সভ্য:—(১) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, (২) শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক, (৩) শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর, (৪) শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, (৫) শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং (৬) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সর্ব্বসম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ১৮৩৭ শকের ১৫ই ফাল্গুনের অধ্যক্ষ-সভার কার্য্যবিবরণ আলোচিত হইল।

এই কার্য্যবিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত কার্য্যবিবরণ নির্ভুলরূপে লিপিবদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

২। ১৮৩৭ শকের ১৫ই ফাল্গুনের নির্দ্ধারিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রস্তাব পুনরালোচিত হইল।

৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রস্তাবে স্থির হইয়াছিল যে বাৎসরিক অন্যূন পাঁচ টাকা চাঁদা দিলে দাতাকে আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলীভুক্ত করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে। এই প্রস্তাবের ফলে অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মসমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিকে প্রকারান্তরে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে রাখা হয় বিবেচনায় ট্রষ্টীগণ উক্ত প্রস্তাবদ্বয় পুনরালোচনা করিতে অনুরোধ করাতে উহা পুনরালোচিত হইল।

স্থির হইল যে কেবলমাত্র মণ্ডলীভুক্ত হইতে গেলে আদিব্রাহ্মসমাজহিতৈষী ব্যক্তিকে বাৎসরিক অন্যূন ১৲ একটাকা চাঁদা দিতে হইবে এবং মণ্ডলী-ভুক্ত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনা মূল্যে পাইতে ইচ্ছা করিলে বাৎসরিক অন্যূন ৩৲ তিন টাকা দিতে হইবে।

৩। কয়েক বৎসরের পুরাতন তত্ত্ববোধিনীর মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয় আলোচিত হইল।

শ্রীযুক্ত ভাই কে, সদাশিব রাও নববিধান সমাজের একজন প্রচারক। তিনি ১২ বৎসরের পুরাতন তত্ত্ব-বোধিনী লইয়াছেন এবং বাৎসরিক ৩৲ টাকা হিসাবে ৩৬৲ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন। তিনি ঐগুলি ২৷৹ টাকা হিসাবে পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনীর বাৎসরিক মূল্য ৪৲ টাকা হিসাবে নির্দ্দিষ্ট আছে।

স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত সদাশিব রাও একজন প্রচারক এবং তাঁহার প্রচার কার্য্যের সহায়তার জন্য এই পত্রিকাগুলি লইতেছেন, এই বিশেষ কারণে তাঁহার জন্য বার্ষিক ২৷৹ টাকা হিসাবে উক্ত ১২ বৎসরের মূল্য গ্রহণ করা হউক এবং তাঁহাকে বাকী ৬৲ টাকা প্রত্যর্পণ করা হউক।

৪। বঙ্গদেশের বাহিরে আদিব্রাহ্মসমাজের মতপ্রচার ও কার্য্যপ্রসার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন বিশ্বাসের একখানি ইংরাজী পত্র প্রকাশের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল যে প্রস্তাবটী সুন্দর বটে, কিন্তু এ-বিষয় আরও বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত। আগামী অধিবেশনে স্থায়ী সভাপতিদ্বয়ের মধ্যে কেহ উপস্থিত থাকিলে এই বিষয়ে পুনরালোচনা হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্রেয়ের পত্র আলো-চিত হইল।

পূর্ণবাবু আদিব্রাহ্মসমাজের নানাবিষয়ে প্রকৃত মতা-মত কি জানিতে ইচ্ছা করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্র ও সম্পাদকলিখিত তাহার খসড়া উত্তর অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণের মধ্যে দেখাইয়া আনা হইয়াছিল।

স্থির হইল যে খসড়া উত্তরে আদিব্রাহ্ম-সমাজের মতজ্ঞাপক পুস্তকের নাম সংযোজিত করিয়া প্রেরিত হউক।

৬। কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ব্যয়বৃদ্ধি ও তৎসূত্রে অন্যান্য ব্যয়সংকো-চের বিষয় আলোচিত হইল।

যেরূপ বাজারে কাগজ প্রভৃতির দাম চড়িয়া যাই-তেছে, তাহাতে অনুমান হয় যে এ বৎসর পত্রিকার জন্য আনুমানিক ৩০০৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় পড়িবে। পত্রি-কার গ্রাহক ও আদিব্রাহ্মসমাজের হিতৈষীগণ ইচ্ছা করিলে অচিরাৎ ইহা পূর্ণ করিতে পারেন।

স্থির হইল যে ইহার জন্য বিশেষভাবে চাঁদা সংগৃহীত হউক।

৭। দেওঘরের “রাজনারায়ণ বসু লাইব্রেরী”তে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য পুস্তক বিনামূল্যে প্রদানের বিষয় আলোচিত হইল।

স্থির হইল যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ডাকমাশুল সহ ১৷৴০ মূল্যে দেওয়া হউক এবং উক্ত লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটী পুস্তকতালিকা চাওয়া হউক। আদি ব্রাহ্মসমাজের যে সকল পুস্তক লাইব্রেরীতে নাই দেখা যাইবে, সেগুলি যথাসম্ভব বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।

৮। আদিব্রাহ্মসমাজের হাত দিয়া কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কেহ কিছু দান করিলে তাহা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয় হইবে, এই বিষয়ে আদেশ প্রদান আলোচিত হইল।

কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা যে সকল দান করেন, সেগুলি আদিব্রাহ্মসমাজের হাত দিয়া করিবেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ করিলে সমাজের কার্য্য প্রসারের সুবিধা হইবে। তাঁহারা এইটুকু জানিতে চাহেন যে তাঁহাদের দানের টাকা আদিব্রাহ্মসমাজের সাধারণ ধনভাণ্ডারে ঢুকিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত কোন কার্য্যে ব্যয় না হয়।

স্থির হইল যে এই প্রস্তাব আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক বলিয়া গৃহীত হউক এবং আদিব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী মাত্রকেই এ-বিষয়ে অনুরোধ করা হউক।

৯। আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর অনুপস্থিত কালের বেতন পাইবার আবেদন আলোচিত হইল।

দ্বিজেন্দ্র বাবু মাঘোৎসবের ছুটী উপলক্ষে ১৭ই মাঘ বাড়ী যাইয়া ২৪শে চৈত্র পুনরায় কার্য্যে যোগদান করেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে মোটে ৫ দিন ছুটী প্রাপ্য ছিল।

স্থির হইল যে দ্বিজেন্দ্র বাবুকে সমগ্র অনুপস্থিত কালের জন্য অর্দ্ধবেতন দেওয়া হউক এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হউক যে পুনরায় এরূপ বিনা আদেশে ছুটীর অতিরিক্ত কাল অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করা যাইবে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদক।	সভাপতি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ট্রষ্টী।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৭, ১৮৩৮ শক বৈশাখ।

আয়	৭৬২৸৬
পূর্ব্বস্থিত	৪৬৭৷৴০
সমষ্টি	১২২৭৷৶
ব্যয়	৭৭০৷৶৩
স্থিত	৪৫৬৸৶৩

জমা।

দুই কেতা কাগজ	৪০০৲
সেভিং ব্যাঙ্ক	৪১৴০
নগদ	৭৸৴৩
	৪৫৬৸৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	২০০৲
আনুষ্ঠানিক দান	২০৲
এককালীন দান	১২৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৮৷৶
গচ্ছিত আদায়	২৯৩৷০
	৫৩৩৸৶

তত্ত্ববোধিনী—

বকেয়া মূল্য	৬৲
হাল মূল্য	২৫৷০
মাশুল	২৷৴০
নগদ	৷০
	৩৪৷৴০

পুস্তকালয়—

সমাজের বই	৩৸৶০
অপরের পুস্তক	।৵০
কমিশন	৶০
মাশুল	।০
	৪॥৶০

যন্ত্রালয়—

অপরের পুস্তক	৬৭।০
কাগজ	৯২৴০
দপ্তরী	২৭।৵০
বিবিধ	৩৵০
	১৮৯৸৴০
সমষ্টি	৭৬২৸৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ—

পাথের	১০৲
কর্ম্মচারীদিগের বেতন—	৬১।৴৪
অন্যান্য—	১২॥০

Electric Light

Electric Light	৩৸৶০

গচ্ছিত।

গচ্ছিত—	৩৮৮৲

হাওলাত।

হাওলাত—	৩৲
	৪৭৮৸৬

তত্ত্ববোধিনী—

কাগজ	৬৸৴১
প্রবন্ধ	১৮॥৶৬
মাশুল	৫৶৩
কর্ম্মচারীর বেতন—	৬৷৴৪
বিবিধ	৫৬
	৩৭৫৲১০

পুস্তকালয়—

পুস্তক ক্রয়	১৲
মাশুল	॥৴৩
	১॥৴৩

যন্ত্রালয়—

কর্ম্মচারীর বেতন—	৮৪।৴৪
ছাপায় কাগজ ও কালী—	১১৭৵৩
অক্ষর	৪১৲
মাশুল	৷৴৩
শিরিষ প্রভৃতি সরঞ্জাম—	৯।৩
বিবিধ	৸৶৯
	২৫৩৲১০
সমষ্টি	৭৭০।৶৩

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই আষাঢ় শুক্রবার রাত্রি সাত ঘটিকার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুঃ-ষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

উনবিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
শ্রাবণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৭।
৮৭৬ সংখ্যা
১৮৩৮ শক।
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

প্রভাতের উদ্বোধন।

এই পবিত্র স্থানে পবিত্র সময়ে আমরা পবিত্র উপাসনা কার্য্যের জন্য সম্মিলিত হইয়াছি। আমাদের যত কিছু সংসারের কথা সংসারের চিন্তা সকলই ঘুচিয়া যাক। যখন সংসারে অবস্থিতি করি, তখন তো সংসারের ছোটখাটো নানা কথা দ্বারা হৃদয়কে ভরিয়া রাখি। এখানে আসিয়াও যদি সেই সংসারেরই চিন্তা করিব, তবে এত পথ অতিক্রম করিয়া এত ভিড় ঠেলিয়া এই নির্জ্জনস্থানে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? সমস্ত সংসারের যিনি নিয়ন্তা অথচ যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি এখানে সম্মুখে বর্ত্তমান। তাঁহাকে যদি এখানে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তবে ফেলিয়া দাও তোমার চিন্তা যে তুমি কি খাইবে, কি পরিবে। তাঁহাকে যদি এখানে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে চাও, তবে ফেলিয়া দাও তোমার উৎকণ্ঠা যে তোমার স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ কেমন করিয়া চলিবে। একবার সমস্ত বিষয় হইতে মনকে কূর্ম্মের ন্যায় সংকুচিত করিয়া কান পাতিয়া শোন যে তিনি কি বলিতেছেন। তাঁহার অভয় বাণী একবারও যদি শুনিতে পাও, তবে তোমার মৃত্যুভয়ও যে চলিয়া যাইবে। তখন কি আর তোমাকে সংসার ভয় দেখাইতে পারে? তাঁহার কথা শুনিতে পাইলে অন্য কোন কথা কি আর ভাল লাগিবে? তখন মন যে আর কিছুই চাহিবে না। তাঁহারই অক্ষয় আনন্দরসে হৃদয় যে ভরিয়া থাকিবে। তাঁহার মুখজ্যোতি একবার অন্তরে অনুভব করিলে সংসারের আর কোন কিছুই তোমার ভাল লাগিবে না। গোলাপের সৌন্দর্য্য, নক্ষত্রগগনের আনন্দহাসি, তাঁহার সেই আনন্দজ্যোতির নিকটে এসকল কিছুই মুহূর্ত্তের জন্য স্থান পাইতে পারে না। সেই পবিত্রস্বরূপ আনন্দময় প্রাণের প্রাণকে অন্তরে অনুভব করিবার এমন সুন্দর অবসর অবহেলায় নষ্ট হইতে দিও না। এসো একবার সমস্ত চিন্তা হৃদয় হইতে দূর করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার, প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যত্নবান হই।

গান।

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি-এ)

তোমার তরুর কুসুমগুলি যেমনি ভালো
(মোর) জীবনতরুর কুসুমগুলি তেমনি ভালো।
যে আলো তোমার ফুটিয়ে তোল আকাশে,
যে আলো তোমার রবিতারায় ভাসে,
(মোর) হৃদগগনে যবে জ্বালাই আলো
সে যে তেমনি আলো।
শুভ্র উজ্জল তোমার শিশিরজল
স্নিগ্ধ শীতল করে ধরাতল
সরস করে হরষ দিয়ে তেমনি আঁখিজল
সে যে তেমনি ভালো॥

খেলা ও সাধনা।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

মানুষ খেলা লইয়াই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। তাহার সে খেলার বিরাম নাই। যখন সে মাতৃ-ক্রোড়ে শায়িত, সে হস্তপদাদি সঞ্চালন করে। যতক্ষণ সে নিদ্রা না যায়, ততক্ষণ সে খেলা করি-বেই করিবে। ক্রমে যতই সে হস্তপদাদিতে বল লাভ করে, তাহার খেলা বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করে। কিশোর বয়সেও তাহার খেলা। প্রথমে সে উদ্দামভাবে খেলা করিতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু ক্রমে তাহার সেই খেলাতে নিয়ম পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা দেখা দেয়। সে নিয়মের অধীন হইয়া খেলিতে থাকে। সে কিছুতেই নিয়ম ভঙ্গ করিতে চায় না। আমাদের দেশে যে সমস্ত ক্রীড়া প্রচলিত আছে, চোর-চোর খেলাই বল, আর কপাটি খেলাই বল, আর তাস বা পাশা প্রভৃতি খেলাই বল, আর বিলাতী লনটেনিস্ ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলাই বল, তাহার ভিতরে শৃঙ্খলা রহিয়াছে, নিয়ম রহিয়াছে, প্রণালী রহিয়াছে ; উহা ক্রীড়া হইলেও উহা উদ্দাম-ভাবের খেলা নহে। নিয়মের অধীন হইয়া খেলা করিতে কিশোর-বয়স্কের আনন্দ, যুবকের আনন্দ, প্রৌঢ়ের আনন্দ, বৃদ্ধের আনন্দ। কিন্তু নিয়মের বশ-বর্ত্তী হইয়া এই সমস্ত খেলাতে অভ্যস্ত হওয়া সাধন-সাপেক্ষ। দুই চারিদিনের চেষ্টাতে নয়, কিন্তু কাল-ব্যাপী চেষ্টা ও সাধনায় এই সমস্ত ক্রীড়াতে অভ্যস্ত হইতে হয়, তবেই এক পক্ষ আর এক পক্ষের উপরে জয় লাভ করিতে পারে। ক্রীড়া হইলেও তাহার ভিতরে সাধনা আছে। বালকদের ক্রীড়া ক্রমে ক্রমে এই ভাবে সাধনায় পরিণত হয়।

নিতান্ত অল্পবয়স্ক শিশুর মুখ হইতে অস্পষ্ট ধ্বনি বিনির্গত হয়। কতকবা অস্পষ্ট ভাষায়— বাণীতে, কতক বা আকার ইঙ্গিতে ক্ষুদ্র শিশু তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করে, ইহা তাহার ক্রীড়ামাত্র ; কিন্তু তাহার অভিভাবকগণ তাহা বুঝিয়া লয়। ক্রমে সেই অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং অর্থের সহিত কণ্ঠধ্বনিকে মিলিত করিবার চেষ্টা আইসে। কণ্ঠবিনির্গত সহজ ও স্বাভাবিক স্বরের ভিতরে ক্রমে ক্রমে বালকের অজ্ঞাতসারে নিয়ম ও প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশু তাহার পিতামাতার নিকট হইতে ক্রমে এইরূপে ভাষা শিখিয়া লয়। ক্রমে যখন সে ভাষার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিবার আনন্দ অনুভব করে, তখন তাহার কণ্ঠ-বিনির্গত শব্দ আর অস্ফুট-ধ্বনি বা স্বর লইয়া ক্রীড়া নহে, কিন্তু উহা সুস্পষ্ট নিয়ম-পরিচালিত ও পদ্ধতি-নিহিত বাণী। ইহাকে একভাবে বলিতে পারা যায়, শব্দের সাধনা বা ভাষার সাধনা। ক্ষুদ্র শিশু অস্ফুট শব্দ লইয়া খেলা করিতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু ভাষায় তাহার পরিসমাপ্তি।

ক্ষুদ্র শিশুও গান করিবার চেষ্টা করে। অপরের মুখ হইতে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া শিশু তাহা অনুকরণ করিতে যায় ; প্রতি মনুষ্যের ভিতরে যে একটা সুরতরঙ্গ স্বভাবতই বিদ্যমান আছে, উহাতে ঈষৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র শিশু যখন সঙ্গীতের সামান্য অনুকরণ করে, তখন তাহার সঙ্গীত-চেষ্টাকে খেলা বলা যাইতে পারে। কিন্তু শিশু বয়োবৃদ্ধি সহকারে কণ্ঠস্বর লইয়া আর সে ভাবে খেলা করিতে চায় না। ক্রমে অপরের সাহায্য লইয়া সে তাহার কণ্ঠস্বরের ভিতরে তাহার সঙ্গীতের ভিতরে সে নিয়ম প্রণালী পদ্ধতি আনিতে চেষ্টা করে ; তাহাতে সে আনন্দ পায়। ক্রমে তাহার কণ্ঠস্বর সপ্তস্বরের অনুগত হইয়া আইসে, তারা মুদারা প্রভৃতি গ্রামের অধীন হইয়া পড়ে, তাহার ভিতরে তাল আসিয়া দেখা দেয়, রাগ রাগিণী জাগিয়া উঠে। আপনার স্বরকে এইরূপ নিয়মপ্রণালীর অধীন করিয়া লওয়াই কণ্ঠের সাধনা।

ছোট বালকের হস্তে একটি কলম বা পেন্সিল দিলে সে যেখানে সেখানে ইচ্ছামত দাগ কাটিতে থাকে। এই দাগ কাটা লইয়াই তাহার ক্রীড়া। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে তাহার দাগ কাটার ভাবকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করে। অপরের নিকট হইতে দাগ কাটার নিয়মপ্রণালী সে ক্রমে ক্রমে শিখিয়া লয়। ক্রমে ক্রমে এইরূপ দাগ কাটিবার ভিতরে নিয়ম প্রণালী ও শৃঙ্খলা আসিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র বালক এখন আর শিশু নহে, সে এখন যুবক। সে নিয়মিত ভাবে দাগ কাটিতে গিয়া দেখিতে পায় যে সে ভাষা লিখিতেছে, চিত্রাঙ্কন অভ্যাস করিয়া

* গত ৯ই আষাঢ় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে বিবৃত।

ফেলিয়াছে। লিখনের ভিতর দিয়া, চিত্রের ভিতর দিয়া সে তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে। ইহাতে কত না তাহার আনন্দ। দাগ কাটা লইয়া তাহার ক্রীড়ার সূচনা হইলেও ভাষা লিখনে ও চিত্রাঙ্কনে তাহার পরিণতি। বলিতে গেলে ইহা চিত্রাঙ্কনের সাধনা।

শিশুর হস্তে একটি বাদ্য-যন্ত্র দাও। সে তাহার উপরে আঘাত করিতেছে বা যন্ত্রের চাবি টিপিতেছে। তাহা হইতে যে শব্দ ধ্বনিত হইতেছে, তাহা বাজাইবার খেলা মাত্র; তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু শিশু বয়োবৃদ্ধি সহকারে উদ্দামভাবে বাজাইয়া আর আনন্দ পায় না। সে তাহার ভিতরে নিয়ম শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি আনিতে চায়। এইরূপে ক্রমাগত চেষ্টায় এবং অন্যের নিকট নিয়ম শিক্ষায় সে যন্ত্রযোগে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী বাজাইতে বা বিভিন্ন তাল বাজাইতে শিক্ষা করে। ক্রীড়া হইতে আরম্ভ হইলেও বাজনায় এই যে সিদ্ধিলাভ, ইহাও এক প্রকারের সাধনা।

মনুষ্যের অন্তরে বাল্যবয়সে কত চিন্তা কত ভাব এক এক বার ছুঁইয়া চলিয়া যায়। সে কখন বা হাসিতেছে, পরক্ষণেই কাঁদিতেছে, তাহার অব্যবহিত পরে দৌড়িয়া পালাইতেছে; কখন বা দ্বন্দ্বে কখন বা মিলনে তাহার স্পৃহা জাগিয়া উঠিতেছে। এ সমস্তই তাহার খেলা। কিন্তু এই সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং চিন্তা করিবার ভিতরে এবং অনুভবের ভিতরে যতই নিয়ম প্রণালী শৃঙ্খলা আসিয়া দেখা দেয়, ততই তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসে। তাহার ভিতরে গাম্ভীর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়। শিক্ষার ফলে সে তাহার চিন্তার ধারাকে একদিকে ব্যাপক কাল ধরিয়া ছুটাইতে সক্ষম হয়, এবং ক্রমে সে চিন্তাশীল লেখক কবি মনীষী বা শিল্পী হইয়া উঠে। ইহাও এক প্রকারের সাধনা।

বালকের হস্তে একটু মৃত্তিকা দাও; সে তাহা হইতে ইচ্ছামত পুতুল গড়িবে, ভাঙ্গিতেছে আবার গড়িতেছে, ইহাই তাহার খেলা। কিন্তু ঐ মূর্ত্তি গঠনের খেলার ভিতরে যখন নিয়ম শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি আসিয়া দেখা দেয়, তখন মৃত্তিকা হইতে সুগঠিত মনুষ্যমূর্ত্তি বা অন্য কোন প্রাণী মূর্ত্তি বা কোন ফলের মূর্ত্তি বাহির হইয়া উঠে। ইহাও এক ভাবের সাধনা। ইহাকে মূর্ত্তিগঠনের সাধনা বলা যাইতে পারে।

এইরূপে যতই আমরা আলোচনা করিয়া দেখি, বুঝিতে পারি, যাহা প্রথমে খেলার অবস্থায় থাকে, ক্রমে যখন তাহার ভিতরে নিয়ম প্রণালী বা পদ্ধতি আসিয়া দেখা দেয়, তখন তাহা আর খেলা থাকে না, তাহা একটি সাধনায় পরিণত হইয়া যায়। উদ্দাম ভাবে খেলা করিবার একটা আনন্দ আছে, কিন্তু নিয়মিত প্রণালী-নিয়ন্ত্রিত খেলার ভিতরে যে একটি আনন্দ আছে, তাহার মাত্রা নিতান্তই অধিক এবং তাহাই যুবা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধেরও পর্য্যন্ত উপভোগ্য।

আমরা বয়স্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে যে আলোচনা করিয়া থাকি, অথবা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া এক এক দিন যে উপাসনালয়ে গমন করি, বলা যাইতে পারে যে উহা একভাবে ধর্ম্ম লইয়া খেলা। ঐ খেলার ভিতরে যে পর্য্যন্ত না আমরা নিয়ম প্রণালী বা পদ্ধতি আনিতে পারিব, ততদিন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে আমরা ধর্ম্ম লইয়া খেলা করিতেছি। সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে হয়ত আমরা ধর্ম্মমন্দিরে একবার মাত্র গমন করি, হয়ত সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দ পাই, ফিরিবার সময় হয়ত অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনা করিতে করিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হই, পরক্ষণে হয়ত আর কিছুই থাকে না। ইহা ধর্ম্ম-সাধনার ভাব নহে, উহা খেলা।

আমরা আমাদের ধর্ম্মজীবনে নিয়ম প্রণালী ও শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেছি না; নিয়ম প্রণালীর মাধুর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তাই আমাদের এই দুর্গতি। আমাদের শত শত দিকে নিয়ম স্থাপনের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে আমাদের প্রাত্যহিক কার্য্যকলাপে আমাদের প্রতি বাক্য উচ্চারণে, অপরের সহিত প্রত্যেক ব্যবহারে, নিয়ম প্রণালী পদ্ধতি সংস্থাপন সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ দায়িত্ব আছে, এমন আর কাহারও নাই। নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনে একবার নিয়ম প্রণালী পদ্ধতি অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়া দেখ দেখি, উহাতে অভ্যস্ত হইবার জন্য চেষ্টা কর দেখি, স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইবে,

জীবন আশ্চর্য্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। তখনই সাধনার প্রকৃত মূল্য অবধারণ করিতে সক্ষম হইবে। একথা আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে ধর্ম্ম লইয়া আমরা খেলা করিতে এখানে আসি নাই, উহাকে সাধনায় পরিণত করিবার জন্য আসিয়াছি। আর আর সমস্ত দিকে নিয়ম প্রণালী পদ্ধতি স্থাপনের আবশ্যকতা আছে, আর আধ্যাত্মিক জীবনের ভিতরে তাহার প্রয়োজন নাই, ইহা হইতেই পারে না। আমাদের দেশে যে দীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে এবং তিনবার সন্ধ্যা বন্দনার যে অনুশাসন আছে, তাহা নিয়ম-সংস্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে। শমদমাদি অভ্যাসের যে আদেশ আছে, তাহা প্রণালী প্রবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে; অনুকূল স্থানে বসিয়া ধ্যান ধারণার যে উপদেশ আছে, তাহা পদ্ধতি প্রবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের ধর্ম্মজীবনে আমরা নিয়ম প্রণালী ও পদ্ধতিতে যতই অভ্যস্ত হইব, ততই সাধনায় অগ্রসর হইয়া পড়িব। যতদিন আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সাধনা-বিরত হইলে চলিবে না। সাধনায় ভাব নিশ্চেষ্টতার ভাব নহে, উহা সচেষ্টতার ভাব। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের সাধনা চাই। আমরা কখন এমন এক অবস্থায় উঠিতে পারিব না, যখন বলিতে পারিব যে আমার সাধনা আবশ্যক নাই। সুগায়ক যদি কিছুদিন ধরিয়া তাহার কণ্ঠসাধন না করে, তাহার কণ্ঠধ্বনি আর সুমিষ্ট থাকিবে না। সুলেখক যদি কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার লেখনীর বেগ সংহরণ করেন, তাঁহার হস্ত হইতে আর সেরূপ সুললিত রচনা বাহির হইবে না। সুবাদক যদি কয়েক দিন ধরিয়া বাদ্য যন্ত্রের উপরে তাহার অঙ্গুলি সঞ্চালন বন্ধ রাখেন, তাঁহার হস্ত হইতে আর সে সুর বহির্গত হইবে না। নিত্য চেষ্টা চাই, নিত্য অনুশীলন চাই, তবেই সাধনা ঠিক থাকিবে; কিছুতেই তাহাতে মন্দীভূত হইলে চলিবে না। সাধনা ছাড়িয়া দিলে, নিয়ম-প্রণালী-পদ্ধতি বিরহিত হইলে, ধর্ম্ম ক্রীড়ার সামগ্রী খেয়ালের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইবেই দাঁড়াইবে। লক্ষ্য-হীন যে কার্য্য, তাহা খেলা অর্থাৎ খেয়াল মাত্র। প্রকৃত পক্ষে খেয়াল শব্দের অর্থ অন্য যাহা কিছু হউক না কেন, আমরা বলি খেলা ও খেয়াল সমান অর্থ-বাচী। উদ্দেশ্য লইয়া যে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, উদ্দেশ্যের দারুণ চাপ যে আমাদের প্রত্যেকের উপরে রহিয়াছে, দারিদ্র্য-মোচন যে আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা স্মরণে রাখিয়া আমাদিগকে ধীরভাবে সুচিন্তার সহিত প্রতি পদনিক্ষেপ করিতে হইবে। আমাদের সকল প্রকার খেলাকে সাধনাতে পরিণত করিতে হইবে, ইহাই আমাদের শেষ কথা।

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন। উৎসবের এই মঙ্গলমুহূর্ত্ত আমাদিগকে উদ্বোধিত করুক; খেলা হইতে সাধনার পথে, বাক্য হইতে কার্য্যের অভিমুখে, মতের কোলাহল হইতে প্রকৃত জীবনের দিকে আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলুক; আমাদের জীবনের আহ্নিক গতির ভিতরে নিয়ম প্রণালী পদ্ধতি স্থাপনের ব্যাকুলতা প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিক। সাধনা বিনা যে আমাদের আধ্যাত্মিকতা কিছুতেই স্ফুর্ত্তিলাভ করিতে পারে না, পরমাত্মার সহিত আমাদের যোগ যে স্থায়ী ও ঘনীভূত হইতে পারে না, এই নবসত্যে আমাদিগকে দীক্ষিত করুক। ঈশ্বরের প্রসাদবারি আজ আমাদের সকলের উপরে বর্ষিত হউক, তাঁহার প্রেরিত শান্তিসলিলে হৃদয়-দেশ অভিষিক্ত হউক। সাধনার প্রভাবে ধর্ম্মভাব আমাদের জীবনে সহজ হইয়া উঠুক, ভগবৎদর্শন সুসাধ্য হইয়া দাঁড়াক, প্রাণ কোমল ও মধুময় হউক, জীবন পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করুক। আমরা ধন্য হইয়া যাই, উৎসব রজনীতে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মুস্কিল আসান।

(শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী)

শৈশবে গৃহের দ্বারে মুস্কিল আসান
আঁধার নিশীথে হেরি ভয় অবসান,
বনানীর ছায়াপথে দীপ হস্তে নিয়া
ফকির যাইত ধীরে আশ্বাস কহিয়া।

(২)

বহুদিন বহুবর্ষ অতীত এখন,
তবুও বাজিছে কর্ণে তাহারি বচন,
নির্ব্বাপিত আশাদীপ পদ্ম ঘুরে মরি
নয়নের অন্তরালে কেমনে বা স্মরি?

(৩)

কোথায় বাঞ্ছিত মম,—দূর ব্যবধান,
হৃদয় কহিছে শুধু মুস্কিল আসান,
পথ ঘাট কোনদিকে নাহি চেনা জানা,
অবাধে চলেছি তবু না শুনিয়া মানা।

(৪)

যেখানে আঁধার সেথা অসীমের আলো
একদিন প্রিয়সঙ্গে মিলাইবে ভালো।

গ্যয়টের মতামত।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

জীবনের বিশেষ কাজ।

প্রত্যেক অসাধারণ মনুষ্য একটা বিশেষ কাজের জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরিত হন, এবং সেই কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার উপর একটা ডাক পড়ে। যদি সেই কাজ তিনি সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই আকারে পৃথিবীতে থাকা আর তাঁহার আবশ্যক হয় না। বিধাতা আর কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহাকে নিয়োগ করেন। নেপোলিয়ান ও তাহার মতো আরো অনেকের এইরূপ হইয়াছিল। ৩৬ বৎসর বয়সে Mozartএর মৃত্যু হয়। ঐ বয়সে র‍্যাফেলেরও মৃত্যু হয়। আর একটু বেশী বয়সে বায়রণের। কিন্তু উঁহারা সকলেই স্বকীয় জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন; তাই, তাঁহাদের যাবার সময় হইয়াছিল;—এইজন্য যে, এই দীর্ঘস্থায়ী জগতে অন্য লোকেরও কিছু কাজ করিবার আছে।

ধন-ঐশ্বর্য্য।

যাহার যে ধন আছে তাহা যদি সে ব্যবস্থাপূর্ব্বক ও সুপ্রণালীক্রমে খরচ করে তাহা হইলে তাহাই তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত; ধনকে যদি তুমি তোমার আয়ত্তের মধ্যে না রাখিতে পার, তাহা হইলে ধনী হইয়া কেবল একটা বোঝা বহা হয় মাত্র।

সুশিষ্ট ব্যক্তি।

সুশিষ্টতার ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করা বড়ই কঠিন। খুব ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, ইহা নেতিবাচক এবং ইহার মধ্যে একটা ধারাবাহিক পূর্ব্বশিক্ষাসাধনা আছে এইরূপ বুঝায়। অন্যের প্রতি ব্যবহারে তোমার এমন কিছু করিতে হইবে না যাহাকে "গম্ভীর চাল" বলে। কারণ, এইরূপ করিলে, তুমি লৌকিকতা ও ঔদ্ধত্যের মধ্যে গিয়া পড়িতে পার। তোমার বর্জ্জন করিতে হইবে—যাহা কিছু অযোগ্য অশোভন ও ইতর। আপনাকে কখনই বিস্মৃত হইবে না। আপনার উপর এবং অন্যের উপর সর্ব্বদাই নজর রাখিবে। তোমার নিজের দোষ কখনই মার্জ্জনা করিবে না। অন্যের দোষও উপেক্ষা করিবে না, কিন্তু যথাপরিমাণে উহার বিচার করিবে। কোন কিছু তোমাকে স্পর্শ করিতেছে বা বিচলিত করিতেছে এরূপ যেন প্রকাশ না পায়। কখনই অতিব্যস্ত বা অতিত্বরান্বিত হইবে না; ভিতরে যতই ঝড় বহুক না কেন, আপনাকে শান্ত সংযত রাখিবে, বাহ্যতঃ একটা শান্তভাব রক্ষা করিবে। কোন মহৎচরিত্র ব্যক্তিও কখন কখন নিজ আবেগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন; কিন্তু সুশিষ্ট ব্যক্তি তাহা কখনই করেন না। সুশিষ্ট ব্যক্তি যেন সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুভ্র ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন; তিনি কোনকিছুর উপর ভর দিয়া দাঁড়ান না; অন্যেরাও সতর্ক থাকে যাহাতে তাহারা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া না যায়। অন্যের সহিত তিনি পার্থক্য রক্ষা করেন, অথচ পৃথক হইয়া না থাকিতেও পারেন। উচ্চপদস্থ কোন সুশিষ্ট ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, মনে হয় যেন তিনি তাঁহার চারি পার্শ্বের লোকের সহিত সর্ব্বদাই সম্মিলিত হইয়া আছেন। তিনি কখনই আড়ষ্টভাব ধারণ করেন না, বা অনুরোধবিমুখ হয়েন না। তিনিই সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি এইরূপ সকলের মনে হইবে অথচ এই প্রাধান্য লাভের জন্য তিনি জেদ করেন না।

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আপনাকে সুশিষ্ট বলিয়া দেখাইতে হইলে সত্য সত্যই সুশিষ্ট হওয়া চাই। ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায়, সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা কেন স্ত্রীলোকেরাই বেশী শিষ্টতার ভাবটা শীঘ্র গ্রহণ করিতে পারে; অন্য লোক অপেক্ষা রাজপারিষদ ও সৈনিকেরাই কেন শিষ্টতার আদবকায়দা চট্ করিয়া ধরিতে পারে।

সংসার হইতে অবসর গ্রহণ।

লোকে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যতই দূরে অবস্থান করুক না কেন, এক-সময়ে-না-এক-সময়ে দেখিতে পাইবে, তাহারা কাহারো-না-কাহারো হয় অধমর্ণ, নয় উত্তমর্ণ।

কথোপকথন।

আমাদের অনুভূতি ও মনোভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া বলাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেটি বলা হইল ঠিক সেইটি যথাযথভাবে গ্রহণ করাতেই মানসিক উৎকর্ষের পরিচয়।

অন্য লোকের কথা আমরা কতটা ভুল বুঝি ইহা যদি ভাল করিয়া বুঝিতাম, তাহা হইলে জনসমাজে আমরা বেশী কথা কহিতাম না।

কথোপকথনের সময় কাহারো নিকট কোন কথা শুনিয়া যখন অন্যের নিকট তাহা আবার পুনরাবৃত্তি করি, তখন আমরা উহার একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বলি; সাধারণত ইহা ভুল বুঝিবার দরুণই হয়।

অন্যের সহিত কথোপকথনে যে ব্যক্তি প্রধান "কহিয়ে বলিয়ে"র স্থান অধিকার করে সে যদি সেই সময় কতক পরিমাণে শ্রোতৃবর্গের মনস্তুষ্টি বা চাটুবাদ না করে, তাহা হইলে তাহাদের অসন্তোষ ও অপ্রীতি উদ্রেক করে।

কথোপকথনের সময়, উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দ স্বভাবত উহার বিপরীত শব্দটিকে আনিয়া ফেলে।

প্রতিবাদ ও স্থূল রকমের তোষামোদ—দুয়েতেই উত্তম কথোপকথন নষ্ট হয়। সেই বৈঠকই খুব সুখের, যেখানে সেই বৈঠকের লোকেরা পরস্পরের প্রতি প্রসন্নচিত্তে সম্মান প্রদর্শন করে।

কে কোন্ বিষয় হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে করে, তাহা হইতেই তাহার প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পায়।

যে ব্যক্তির বুদ্ধির তেমন গভীরতা নাই তাহার নিকট সকল জিনিসই হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট বস্তুত কিছুই হাস্যাস্পদ নহে।

একজন বৃদ্ধের উক্তি।

কোন নিমন্ত্রণ সভায় একজন বৃদ্ধ অল্পবয়স্ক মেয়েদের প্রতিই ক্রমাগত মনোযোগ ও যত্ন দেখাইতেছিলেন বলিয়া অপরে তাঁহাকে নিন্দা করিতেছিল। বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, আপনাকে যুবা রাখিবার জন্য এখন আমার এই একমাত্র উপায়। যৌবনরক্ষা করিতে কে না চাহে?

নিজের অভ্যাস।

নিজের অভ্যাসের বিপরীত কোন কাজ অন্যকে করিতে দেখিলেই লোকে বলে "তুমি শীঘ্র মরিবে"।

নিরীহ রকমের দোষ।

কি প্রকারের দোষগুলা আমাদের মধ্যে আমরা রাখিতে পারি বা পোষণ করিতে পারি? সেই সকল দোষ যাহা অন্যের প্রীতিকর—অনিষ্টকর নহে।

কতকগুলি বিশেষত্ব দোষের মধ্যে ধর্ত্তব্য হইলেও যদি আমাদের কোন পুরাতন বন্ধু তাঁহার সেই বিশেষত্বগুলি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমাদের তাহা ভাল লাগে না।

ভদ্রতার শিক্ষা।

ভদ্রতার এমন কোন বাহ্য লক্ষণই নাই যাহার মূল মানবের নৈতিক স্বভাবের মধ্যে নিবদ্ধ নহে। অতএব ভদ্রতার সমস্ত বাহ্য রূপগুলি যে নৈতিক ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই নৈতিক ভূমির বিষয় না বুঝাইয়া যুবকদিগকে শুধু বাহ্য ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়া কখনই উচিত নহে।

কোন ব্যক্তির ব্যবহার যেন একটি দর্পণ—সেই দর্পণে বুদ্ধিমান দর্শক সেই ব্যক্তির প্রতিরূপ দেখিতে পান।

এক প্রকার হৃদয়ের ভদ্রতা আছে, যাহার সহিত ভালবাসার খুব নিকট সম্বন্ধ। এই স্বাভাবিক ভদ্রতার সুবিমল উৎসটি যে পাইয়াছে, তাহার পক্ষে বাহ্য ভদ্রতা প্রকাশ করা খুবই সহজ।

মনের শান্তি ও প্রেম।

একই কর্ম্মক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আমাদের প্রতিযোগী, সেই প্রতিযোগীর সুনিশ্চিত শ্রেষ্ঠতার সম্মুখে আমাদের যথাযোগ্য স্থৈর্য্য ও মনের শান্তি যদি প্রফুল্ল চিত্তে রক্ষা করিতে হয়, তবে তাহার এক মন্ত্র আছে; সে মন্ত্রটি—প্রেম।

জহুরীই জহর চিনে।

এইরূপ একটা কথা আছে, আপনার খানসামার কাছে কেহই বড়লোক নহে। কিন্তু ইহার কারণ, বড়লোকই বড়লোককে চিনিতে পারে। এইরূপ,

খানসামার মধ্যে কে ছোট বড়, তাহা খানসামাই সহজে বুঝিতে পারে।

সাধারণ লোকের সান্ত্বনা।

সাধারণ লোকের মধ্যে কোন একশ্রেণীর সব চেয়ে বেশী সান্ত্বনার বিষয় এই যে—যাহারা প্রতিভার বলে সকলের মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহারা অমর নহে।

প্রতিভা ও যুগপ্রভাব।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তিও লক্ষণপরিচায়ক কোন দুর্ব্বলতার দ্বারা স্বীয় যুগের প্রভাব স্বীকার করিয়া থাকেন।

নির্ব্বোধ ও বুদ্ধিমান।

নির্ব্বোধ ও বুদ্ধিমান উভয়ই সমান অনপকারক। কিন্তু অর্দ্ধ নির্ব্বোধ ও অর্দ্ধ বিজ্ঞ ইহাদের লইয়াই ঘোর বিপদ।

তাঁর দৃষ্টি।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পড়ে
মেঘের জল,
ফলে
গাছের ফল—
তাঁর
কত কৌশল !
তাঁর
এ মেঘ বৃষ্টি—
তাঁর
এ সব সৃষ্টি ;
তাঁর
সবেই দৃষ্টি ॥

একতাল।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমি প্রতিদিন কোথায় উঠিতেছি ? উঠিয়া উঠিয়া কোথায় যে যাইব, তাহা কে বলিতে পারে ? যাইবার পথে প্রচুর আনন্দের আয়োজন—পুষ্প পত্র ফল সমুচ্চয়ে ধরণী প্লাবিত, মধুর সারসুগন্ধ হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু কোথায় যে চলিয়াছি তাহা কে নির্দ্দেশ করিবে ?

গম্যস্থান যে কোথায় তাহা জানিবার জন্য মানবের অষ্টপ্রহর চেষ্টা। ইহারই কারণে জীবগণের কখনো সংশয়, কখনো উল্লাস, কখনো সাহস, কখন ত্রাস, কখনো কম্পবেগ, কখনো সুখদুঃখ, সকলই পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইতেছে। এই তরঙ্গে পড়িয়া আমাদের জীবনে কত বিভিন্ন তালের সৃজন হইতেছে—মধ্যে তাহার একতাল। একতালের সূক্ষ্ম জ্যোতির অন্তরে আমাদের মোহনয়নে প্রবেশ নিষেধ। দেবতারা বিচিত্রতাপূর্ণ শোভাসম্পন্ন একতালের দ্বারে জ্যোতি বিস্তার করিয়া পাহারা দিতেছেন। দেবতাদের সেই বিমল জ্যোতির মধ্যে মগ্ন হইতে না পারিলে একতালের মাধুরী উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। থাকিয়া থাকিয়া আমাদের চৈতন্য হয়—পথে চলিতে চলিতে একতালের রশ্মিরেখা নয়নে আসিয়া এক একবার লাগে। আবার বিপথে যাইয়া পড়ি, আলোক হইতে অন্ধকারে পড়ি। তখন মনেতে ধিক্কার আসে ; তখন মনের নাড়ীতে নাড়ীতে বিপ্লবের ধ্বনি শুনিতে পাই। আর, হৃদয়ের মোহ-আবরণ যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন দেবতাদের জ্যোতিস্ফুলিঙ্গে তেজস্বী হইয়া একতাল-প্রবেশময়ী বুদ্ধি আয়ত্ত হয়। তখন মান অপমান শত লাঞ্ছনা ঘুচিয়া যায়, জীবনের প্রভাব বর্দ্ধিত হয়। আমরা হলাহলের রাজ্য হইতে অমৃতরাজ্যে আসিয়া পড়ি।

অমল জ্যোতির্ম্ময় নিয়মপুঞ্জের উপর চরাচরে যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, সেই প্রাণই সুখের কারণ। কোথাও সেই প্রাণের একটু হ্রাস হইলে সেই হ্রাস পূরণার্থ চারিদিক হইতে প্রাণপুঞ্জ ছুটিয়া যায়। দুঃখের তলে তিলে তিলে সুখ রচিত হইতেছে, আমরা তাহা না বুঝিয়াই দুঃখী হই ; দুঃখ নিবারণের জন্য কত না প্রয়াস পাই, কিন্তু দুঃখ নিবারণ হয় না। দুঃখ নিবারণ হয় না বলিয়াই সুখের সমৃদ্ধি বুঝিতে পারি। সুখদুঃখের সংঘর্ষ না থাকিলে আমরা অচেতন হইয়া পড়িতাম। সে অচৈতন্য ভঙ্গ করা কাহার সাধ্য থাকিত ?

দুঃখের মধ্যে আমরা ভিতর হইতে একটা সহানুভূতি পাই। এই সহানুভূতি প্রকাশ করা কাহার

কার্য্য ? এটা সেই একতালের কার্য্য। দুঃখের ফাঁকের পর আবার সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সহানুভূতিই আমাদের জীবনে তাল আনয়ন করে, তখন আবার আমাদের শিরানাড়ী সুশৃঙ্খলায় চলিতে থাকে। আমরা আমাদের বিশৃঙ্খলার বেতাল লইয়া যখন তালের সুপ্রণালীর উপর কৃত্রিমতার স্পর্শ দিই, তখনই আমাদের অন্তর অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। সেই অশুদ্ধ অন্তর লইয়া আমরা কতক্ষণ টিঁকিতে পারি ? আমরা নিজেরাই নিজেদের ভগ্নাবস্থা গড়িয়া শেষে ক্রন্দন করিতে থাকি। নিজেরাই তাল ভঙ্গ করিয়া শেষে তালের জন্য হাহাকার করি। আমরা স্বকীয় কর্ম্মফলে নিজেদের অনিষ্ট করিয়া শেষে উন্মত্তের ন্যায় বিধিকে ডাকি।

বিধি তো সাম্যের মূলমন্ত্রধারী একতাল হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে কেবল ডাকিলেই চলিবে না। তাঁহার নিয়ম অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে হইবে। আমাদিগকে তালে চলিতে হইবে। বিধি অন্তর্ভাগে গূঢ় থাকিয়া কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশিত হন। বিধি রহস্য, কর্ম্ম প্রকাশ্য। বিধি অন্তর রক্ষা করেন, কর্ম্ম দেহ রক্ষা করেন। বিধি মন্ত্র, কর্ম্ম তন্ত্র। বিধি একতাল হইয়া আছেন বলিয়া আমাদিগের তাল হইতে নিরস্ত হইলে চলিবে না। যখন দেহ ধারণ করিয়া সংসারে আসিয়াছি, তখন কর্ম্মের তালের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তবে আমরা দিন দিন প্রস্ফুটিত হইব।

বিধি তো ঠিক একতাল হইয়াই আছেন। কিন্তু তিনি থাকিলেই বা আমাদের কি হইল, যদি না আমরা সেই একতালকে কেন্দ্র করিয়া তালের অভিব্যক্তি সাধন করিলাম। তালমূলক কর্ম্মকে সম্মুখে করিয়াই বিধির পূজা করা বিধেয়। সংসারে কর্ম্মে অগ্রসর হইয়া তালে চলিলে বিধির সহিত আমাদের কেমন সম্প্রীতি হয়। আমরা নিজেরা বেতালে চলিতে গিয়াই দুঃখে ক্রোধে অভিভূত হইয়া পড়ি এবং বিধিকে অমঙ্গলের হেতু ভাবিয়া হা বিধি হা বিধি করিয়া বুক চাপড়াইতে থাকি। ইহা অরণ্যে রোদন মাত্র। আমরা তালে চলিলে আমাদের আর এ ক্রন্দন থাকে না। আমরা তালে চলিলে সমুদ্রে যেমন নদী মিশিয়া যায়, সেইরূপ আমাদের তাল সেই একতালে মিশিয়া যায়। তখন আমাদের সমুদয় অভাব ঘুচিয়া যায়। সেই পূর্ণ শমতা আমাদের বুদ্ধির সমতা আনয়ন করে। সেই সমতার মধ্যে বামনদেবকে সমাসীন দেখিয়াই আমরা জীবন লাভ করিতে সমর্থ হই।

যে কাল আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া বিশীর্ণ করিতে বসে, যে কালের ভীষণ উক্তি শুনিলে মহাভীতি জাগে, শরীর শিহরিয়া উঠে—"সংসারাবলয়ো গ্রস্তা বিশীর্ণা রুদ্রকোটয়ঃ, ভুক্তানি বিষ্ণুবৃন্দানি ক ন শক্তা বয়ং মুনে" *, যে কালের ভীষণ রুদ্রশক্তির ক্রোড়ে সকলই লয় পাইতেছে, সেই কালকে আমরা কিরূপে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব ? একমাত্র সেই বামনদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই উপাসনা দ্বারা হৃদয়কে একতালের অভিমুখে কেন্দ্রীভূত করিলেই আমাদের সকল তালবেতালের মধ্যে শৃঙ্খলা আসিবে, তখনই আমরা পূর্ণ শমতার দিকে যাইয়া সমত্ব লাভ করিয়া কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিব।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কার্য্যপ্রণালী।

ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ যে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি। এখন আমরা দেখিব যে ব্রাহ্মসমাজে কিরূপ কার্য্যপ্রণালী প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের এক বৎসর পূর্ব্বে ১৭৫০ শকে (১৮২৮ খৃষ্টাব্দে) রামমোহন রায় "ব্রহ্মোপাসনা" নামক এক পুস্তিকা লেখেন †। এই পুস্তিকা লিখিবার কালেই আমাদের বিশ্বাস যে রামমোহন রায় খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ উপাসনাপ্রণালার ন্যায় হিন্দু ব্রহ্মোপাসকদিগের জন্য একটা সাধারণ উপাসনাপ্রণালীর অভাব ও প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। তাই দেখি যে

---

* হে মুনি, আমরা সংসার সমূহ গ্রাস করিয়াছি, কোটী রুদ্রকে বিশীর্ণ করিয়াছি এবং বিষ্ণুবৃন্দকে খাইয়া ফেলিয়াছি—আমরা কোথায় না সক্ষম ? (যোগবাশিষ্ঠ)

† পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে" বলিয়াছেন যে রামমোহন রায় "১৭৪১ শকে ব্রহ্মোপাসনার একটী সংক্ষেপ পুস্তক মুদ্রিত করিলেন—তাহার নাম অবতরণিকা। এই পুস্তকেই ব্রহ্মোপাসনার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।" এই উক্তির মূল আমরা কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই।

তিনি উক্ত পুস্তিকাতে ব্রহ্মোপাসনার একটী প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই প্রণালীটী নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

ওঁ তৎসৎ ॥ ১ ॥ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

১ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্য। ২ একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্য।

এই দুয়ের সাহিত্যে (এক সঙ্গে) অথবা পার্থক্যে (পৃথকভাবে) শ্রবণ এবং চিন্তন করিবেক।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।

এই শ্রুতির পাঠ এবং ইহার অর্থ চিন্তন কৃতার্থের হেতু হয়। অর্থ চিন্তনের ক্রম সংস্কৃতে এবং ভাষাতে জানিবেন।

(অর্থ) যস্মাল্লোকাঃ প্রজায়ন্তে যেন জীবন্তি জন্তবঃ।
যস্মিন্ পুনর্লয়ং যান্তি তদেব শরণং পরং॥
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যস্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে তদেব শরণং পরং॥
তরবঃ ফলিনো যস্মাদ্ যেন পুষ্পান্বিতা লতাঃ।
যচ্ছাসনে গ্রহাবান্তি তদেব শরণং পরং॥

(ভাষার্থ) যাহা হতে এই বিশ্ব জন্মে পরে পরে।
জন্মিয়া যাহার ইচ্ছামতে স্থিতি করে॥
মরিয়া যাহাতে বিশ্ব ক্রমে পায় লয়।
জানিতে বাঞ্ছহ তারে সেই ব্রহ্ম হয়॥

তন্ত্রোক্ত স্তব তান্ত্রিকাধিকারে হয়।

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ১

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং।
ত্বমেকং জগৎকর্তৃ পাতৃপ্রহর্তৃ ত্বমেকং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥২

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণাং॥ ৩

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ননির্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ব্যাপকাধীশ্বরাধীশ নিত্য॥ ৪

বয়ং ত্বাং স্মরামো বয়ং ত্বাং জপামো বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
বয়ং ত্বাং নিধানং নিরালম্বমীশং নিদানং প্রসন্নং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫

রামমোহন রায়ের সময়ে তান্ত্রিকদিগের কিছু বেশী প্রভাব ছিল বলিয়া তাঁহাদিগের জন্য মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া একটী পৃথক স্তোত্রের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। উপরোক্ত উপাসনা-প্রণালীতে রামমোহন রায় ব্রহ্মোপানার একটী আদর্শ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার গ্রন্থপ্রকাশক বলেন যে "তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মসমাজে এই পদ্ধতিমতে উপাসনা হইত না। তখন কেবল উপনিষৎ ব্যাখ্যান, পাঠ ও সঙ্গীত হইত।" তাঁহার সময়ে যে ভাবে ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ হইত, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

রামমোহন রায় সমাজপ্রিয় ছিলেন। উপাসনার দিন সমাজে আসিবার প্রণালীতে তাহা সুব্যক্ত হয়। সমাজে একাকী আসিতে তাঁহার ভাল লাগিত না। "যে দিন সাধারণ উপাসনার দিন ছিল, সেদিন গঙ্গার বা জগন্নাথের যাত্রীরা যেমন দূর হইতে পদব্রজে আইসে, তেমনি রামমোহন রায় তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মানিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ী করিয়া যাইতেন।" সমাজের ভিতরে বেদী দক্ষিণমুখী ছিল। "বেদীর পূর্ব্বদিকে ফরাশ চাদরপাতা থাকিত, তাহাতে পাঁচজন কি ছয়জন উপবেশন করিতেন; তার পশ্চিমদিকে খান কতক চৌকী পাতা থাকিত, তাহাতে আগন্তুক পথিকেরা আসিয়া বসিত।" বেদীর সম্মুখে একটী মোড়া থাকিত, তাহাতে রামমোহন রায় মুসলমানী দরবারী বেশে উপবেশন করিতেন। তাঁহার সঙ্গীদিগেরও অনেকে তাঁহারই অনুকরণ করিয়া দরবারী বেশে সমাজে উপস্থিত হইতেন।

"সূর্য্য অস্ত হইবার কিছুপূর্ব্বে একজন মহারাষ্ট্রিয় ব্রাহ্মণ সমাজের পার্শ্বগৃহে পর্দ্দার অন্তরালে উপনিষৎ পাঠ করিতেন। তিনি রুদ্রাক্ষমালা ও চন্দনবিভূতি-বিভূষিত হইয়া আগমন করিতেন। তাঁহার সঙ্গে একটী জলপাত্র থাকিত। তিনি আচমন প্রভৃতি কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়া উপনিষৎ পাঠ আরম্ভ করিতেন। কেনোপনিষদই রামমোহন রায়ের অতি প্রিয় ছিল ও তাহাই পাঠ করা হইত। যে গৃহে উপনিষৎ পাঠ হইত, সেই গৃহে কেবল রামমোহন রায়, বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে পাইতেন। শূদ্রদিগের সেখানে

যাইবার অধিকার ছিল না।" "সূর্য্যাস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজের ঘরে আসিয়া বেদীতে বসিতেন। উৎসবানন্দ উপনিষৎ ব্যাখ্যা করিতেন, বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়ের রচিত ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন এবং কখনও কখনও বেদান্তদর্শনেরও ব্যাখ্যা করিতেন। সঙ্গীত হইয়া সেই সমাজ ভঙ্গ হইত।"

আলোচনার ফলে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে অনুমান হয় যে রামমোহন রায়ের মতে শূদ্রাদির সম্মুখে বেদপাঠে কোন দোষ না থাকিলেও তিনি এবিষয়ে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন নাই এবং বোধ হয় ইচ্ছাও করেন নাই, কারণ তাঁহার মতে শূদ্রাদির সম্মুখে মূল বেদপাঠ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, সে সময়ে শূদ্রাদির নিকটে বেদপাঠে সম্মত ব্রাহ্মণ পাওয়াও সুদুর্লভ ছিল।

যে সকল ব্যাখ্যান ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় পঠিত হইয়াছিল, সেগুলি টোলের অধ্যাপকদিগের উপযুক্ত ভাবে ও ভাষায় লিখিত এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বয়সের উপযুক্ত। এই সকল ব্যাখ্যান এবং রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুদিগের বিরচিত ব্রহ্মসঙ্গীত সকল আলোচনা করিলে ইহা প্রত্যক্ষ হয় যে, যেমন মানুষের ব্যাল্যাবস্থায় নিষেধের কারণ ও দণ্ডভয় প্রভৃতি দেখাইয়া দুষ্কর্ম্ম প্রভৃতি হইতে নিরস্ত করিতে হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজেরও প্রথমাবস্থায় উক্ত ব্যাখ্যান ও স্তোত্রের অতিরিক্ত সঙ্গীতসমূহে প্রত্যেকে উক্তির কারণ ও মৃত্যুভয়ের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সাধারণ উপাসনার প্রথম দিন নিম্নলিখিত তিনটী সঙ্গীত গীত হইয়াছিল—

(১)

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং।
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং।
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং।
দিনকরশিশিরকরাবভিযাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
ভবতি যতোজগতোহস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতি পুনর্ন গুহামধিরোহঃ।
যেন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং।
জগতি পরং শরণং শরণানাং॥

(২)

বিগতবিশেষং, জনিতাশেষং, সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং, ত্রিগুণাতীতং, স্মর পরমেশং তূর্ণং॥
গচ্ছদপাদং, বিগতবিবাদং, পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং বিরহিতবর্ণং, গৃহ্ণদহস্তমপীনং॥
বেদৈর্গীতং, প্রত্যগতীতং, পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং, জগদালোকং, সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং।
ব্যাপ্যাশেষং, স্থিতমবিশেষং নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং।
বিততবিকাশং জগদাবাসং, সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং॥

(৩)

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥

বিষ্ণু ও তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণ গান করিতেন এবং গোলাম আব্বাস পাখোয়াজ বাজাইতেন।

ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মসঙ্গীত প্রবর্ত্তনসংবাদ বেশ কৌতুহলজনক। সাধারণ উপাসনার দিন স্থির হইবার পূর্ব্বে রামমোহন রায় সমাজে আসিয়া কখনো বা খৃষ্টান বালকগণকে ডাকাইয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক গান করাইতেন, আর কোন দিন বা বিষ্ণুর ওস্তাদ রহিম খাঁর মুখে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় পারসী গান শুনিতেন। এইরূপ গান শুনিতে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন সঙ্গী প্রায় সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। "যাঁহারা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো জানিতেন না যে কিসের জন্য তথায় আসিয়াছেন। তাঁহারা রামমোহন রায়ের সন্তোষের জন্য, তাঁহার অনুরোধরক্ষার জন্যই যেন আসিতেন। একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয়। অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানাভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন—ওসব গান

কেন, অলখনিরঞ্জন গাও। তখন অবধি ব্রহ্ম-সঙ্গীত চলিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে এতটুকুও তখন কাহারো বুঝা হয় নাই যে ব্রাহ্ম-সমাজে সঙ্গীত গাহিতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাহিতে হইবে।”

রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে (বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজে) এখন বুধবার সাধারণ উপাসনার দিনরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। “প্রথম যখন সমাজ স্থাপিত হয়, তখন শনিবারে সমাজ হইত। রবিবারে সকলের অবকাশ ছিল, শনিবার রাত্রিতে অধিককাল পর্য্যন্ত উপাসনা হইলেও কাহারো অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু যাঁহারা রামমোহন রায়ের সহযোগী, তাঁহাদের পক্ষে আমোদের দিন শনিবার, সুতরাং সেদিন সমাজে আসিতে তাঁহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন। এইজন্য বুধবার সমাজের দিন স্থির হইল।”

ঢাকার পুরাতন কথা।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঢাকা জিলার সাধারণ গৃহস্থদের আর্থিক অবস্থা যে কিরূপ ছিল তাহা আমরা ডাক্তার টেলর সাহেবের “Topography and Statistics of Dacca” হইতে জানিতে পারি। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ সময়ে বাজার দর ও জনসাধারণের অবস্থা নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া টেলর সাহেব এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নূতন সহরের অতীত গৌরবের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি কথাটি কত না আদরের, তাই আমরা বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য প্রাচীন ঢাকার কৌতূহলোদ্দীপক দুই চারিটি বিষয় প্রকাশ করিলাম।

১। আয় ও ব্যয়—

বড় ঘরের বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ব্যয়বাহুল্য যে ছিল না এমন বলা যায় না। ঢাকার কালেক্টর ক্লে সাহেব (A. L. Clay Esqr. I. C. S.) বলেন—

“বিবাহের ব্যয় বিষয়ে বিস্তর পার্থক্য ছিল; কিন্তু সহরের অপেক্ষাকৃত ধনী হিন্দু ও মুসলমানদের ভিতরে ধনীশ্রেষ্ঠদের এক হইতে দুই হাজার টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর চার হইতে আট শত টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর একশত হইতে দুইশত টাকা বিবাহ ব্যয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই ব্যয়ের অধিকাংশ রাত্রে রাজপথ দিয়া সুখী দম্পতীর বন্ধুগণের শোভাযাত্রাতে চলিয়া যাইত। এই শোভাযাত্রাতে বাদ্যকর যাইত, মশালধারী যাইত, নকল ফুলের ছড়াছড়ি হইত, রঙ্গিন আলো জ্বালান হইত এবং ইহা ছাড়া নিশানধারী, ঢুলি প্রভৃতি বিস্তর লোক দেশী মড়াঞ্চে টাটুঘোড়ায় চড়িয়াও শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যায়।” *

দরিদ্রের ঘরে অন্য ব্যবস্থা। দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়ের তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(ক) দরিদ্র হিন্দুর বিবাহ ব্যয়।

ব্রাহ্মণ	১৲
বরকনের ধুতি	২৲
শাঁখার বালা	১৲
চিরুণী ও সিন্দুর	।০
অলঙ্কার	১৲
বাদ্যকর	।০
বরকনের মাথার টোপর ও ‘কপাটী’	১৲
ধোপা	।০
নাপিত	।০
ভোজ	২৲
অন্যান্য খরচ	১৲
মোট	১০৲ টাকা

---

* “Marriage expenses vary greatly, but among the more wealthy Hindoos and Mussalmans in the city may be estimated at the following rates, viz, from 1000 to 2000 Rupees for the higher classes, from 400 to 800 for the middle, and 100 to 200 Rupees for the 3rd class. * * * * The greater portion of the money is thrown away on processions through the streets at night, composed of the friends of the happy couple, attended by musicians, bearers of torches, artificial flowers, coloured lights &c, and a ragged train of bearers of flags and batons, beaters of drums, &c, mounted on miserable country ponies or tattoos.”

(খ) দরিদ্র মুসলমানের বিবাহ ব্যয়।

কাজি	॥০
বরকন্যার ধুতি	৩৲
চিরুণী	।০
চুড়ী অথবা লাক্ষার বালা	॥০
বরকন্যার টোপর	॥০
নাপিত	।০
ভোজ	২৲
বাদ্যকর ও বাজে খরচ	৩৲
মোট	১০৲ টাকা

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ আরও কম।

হিন্দু—

(ক) শবদাহের নূতন বস্ত্র	॥০
চিতা প্রস্তুতের জন্য ডোমের প্রাপ্য	॥০
চিতা কাষ্ঠ	৸০
ঘৃত, চন্দন ও বাঁশ	।০
মোট	২৲ টাকা

(খ) মুসলমান

কবর খননকারী	৸০
শবাধার—কাপড়, বাঁশ প্রভৃতি	১৲
মোল্লা	।০
মোট	২৲ টাকা

(ক) হিন্দুর শ্রাদ্ধ—

ব্রাহ্মণ	১৲
কাপড়	১৲
চাউল ডাল	২৲
ব্রাহ্মণভোজন	১৲
পিতলের জিনিসপত্র	১৲
নাপিত	।০
ধোপা	।০
অন্যান্য খরচ	॥০
মোট	৭৲ টাকা

(খ) মুসলমানের চতুর্থ ফতেহা।

মোল্লা	১৲
খাদ্যদ্রব্য	।০
তাম্রপাত্র প্রভৃতি	১৲
কাঙ্গালী বিদায় (কড়ি)	।০
১ম, ২য় ও ৩য় ফতেহার খরচ	২॥০
মোট	৫৲ টাকা

যদি কোন দরিদ্র হিন্দু শ্রাদ্ধাদি ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইত তাহা হইলে "অগ্রদানী" ব্রাহ্মণকে সামান্য কিছু দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। সাধারণতঃ সহর ছাড়া ডোমের আবশ্যক হইত না। পল্লীতে গৃহস্থেরা সকলে মিলিয়া মৃতের সৎকার করিত। অথবা যাহারা অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল তাহারা মৃতদেহ নদীতে বিসর্জ্জন দিত। আত্মীয় বান্ধবহীন দরিদ্র মুসলমানের পক্ষেও 'ফতেহা' সম্পন্ন করা অনেক সময়ে সম্ভবপর ছিল না।

এখানে বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর মনে হইতে পারে দুইটী টাকায় কি করিয়া বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা হইত? এই তালিকা দেখিয়া আমাদের আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে টেলার সাহেব লিখিয়াছেন "ঐ সময়ে (১৮৩৮ খৃঃ) ঢাকা জিলার একটি মজুরের খোরাকী খরচ দৈনিক আড়াই পয়সার অধিক লাগিত না। দুই চারিজন লোক একসঙ্গে বাস করিলে গড়ে প্রতিজনের খরচ দুই পয়সা পড়িত। ইহা হইতে বুঝা যায় ২৲ টাকায় ৫০।৬০ জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ভোজের ব্যবস্থা যে হইতে পারিত ইহা কিছু অতিশয়োক্তি নহে।

২। আমোদ প্রমোদ—

ঘুড়ি উড়ান, পাখীর লড়াই, নানাজাতীয় কবুতরের খেলা, নাচ, "লীলা" (নাটকাভিনয়) তাস ও অক্ষক্রীড়াই প্রধান আমোদ প্রমোদ ছিল। নৌকা বাইচও প্রচলিত ছিল; সম্ভবতঃ নবাবী আমল হইতেই নৌ-বিহার প্রথার সূচনা হয়। নবাব পরিবারের আমোদের জন্য বড় বড় নৌকা সর্ব্বদাই সজ্জিত থাকিত। নবাব বাড়ার অনুকরণে সদাগর, তন্তুবায়, প্রভৃতি জনসাধারণেরাও সাধ্যমত বাইচের নৌকা সাজাইত, ময়ূরপংখী হাঙ্গর মুখো, ঘোড়ামুখো কত রকমেরই না নৌকা তৈরি হইত। নৌকায় মাঝিদের পোযাকও অদ্ভুত রকমের ছিল। চাঁদনি রাতে নৌ-বিহার তখনকার সময়ে প্রধান আমোদের ভিতর ছিল।

ঘুড়িখেলা তখনও বিশেষ আমোদজনক ছিল। এ সম্বন্ধে ক্লে সাহেব লিখিয়াছেন—

"Kite flying is a very general pastime during the cold weather and spring months. The kites are made of coloured paper stretched over a light frame work of bamboo, and, as a rule have no tail or tassels like the kites at home. The string is wound on a revolving spindle, and is let out, or shortened at pleasure by a rotary motion of the hands. Kite flying at times becomes a perfect nuisance, and has to be prohibited in the public streets and thoroughfares for carriages."

তখন মারবেল ও "ফ্রেঞ্চ ও ইংলিশ" খেলার অনুকরণে 'ডুডু' খেলার প্রচলন ছিল। হরিণ-শিকার সাধারণতঃ মুসলমানেরাই করিত। বড়শী দিয়া মাছ ধরা (angling) সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। ভেড়া, বুলবুল, দয়েল ও ময়নার লড়াইয়ে হিন্দুরা অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করিত। অনেক সময়ে এই সব খেলাতে বহু অর্থ বাজী রাখা হইত। নাচ এবং 'নীলা' (নাটকাভিনয়) তন্তুবায় ও বৈষ্ণবদের প্রধান আমোদ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিষয় লইয়াই 'নীলা' অনুষ্ঠিত হইত। হিন্দুদের বেহালা ও মুসলমানদের 'সীতা' (তিন তার বিশিষ্ট) নামক বাদ্যযন্ত্র অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ঢাকা জিলাবাসীদের আমোদ প্রমোদ প্রসঙ্গে ক্লে সাহেব উপসংহারে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা জনসাধারণের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে না। তিনি বলেন—

"The above sports and pastimes, requiring, as a rule, no courage or endurance, and little or no physical exertion are eminently characteristic of the indolent and spiritlers nature of the natives of this district, who are, as a body, fair average specimens of that most degraded section of humanity, the Bengali Asiatic."

তদানীন্তন ছাত্রদের পুরুষোচিত ক্রীড়াসক্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন "শীত ঋতুতে গবর্ণমেণ্ট কলেজের ছেলেরা য়ুরোপীয়দের অনুকরণে ক্রিকেট খেলিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা এই খেলার ভিতরকার জিনিষটা (The spirit of the game) বুঝিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না।"

৩। খাদ্য দ্রব্য—

ভাতই প্রধান খাদ্য। ডাল, মাছ, তরকারী, তৈল, লবণ, মশলা সংযোগে ভাত খাওয়া হয়। সুস্থ ব্যক্তি দৈনিক /৮ তিন পোয়া চাউলের ভাত খাইয়া থাকে। নৌকার মাঝিরা সাধারণতঃ সাড়ে তিন পোয়া চাউলের ভাত খায়। চিপিটক প্রস্তুত প্রণালীর বর্ণনা বড়ই উপভোগ্য। ক্লে সাহেব বলেন—

"Chyura is made by soaking paddy in cold water till the grain swells, then drying it over a fire in an earthen vessel, and finally pounding it in the Dhenki or Ukli (a kind of large wooden mortar) till the husk is separated. The bran is them winnowed away and it is ready for use."

মিষ্টান্ন ব্যতীত গম বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে না। সহরের মুসলমানেরা পাঁউরুটী ও বিস্কুট খাইয়া থাকে। আর শূকর মাংস ব্যতীত সমস্ত মাংসই তাহাদের আহার্য্য। হিন্দুরা মাংসাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত সংযমী। পায়রা, হাঁস, ডিম ও পূজার প্রসাদী ছাগমাংস ভোজন নিষিদ্ধ নয়। নীচজাতীয় ও দরিদ্র লোকেরা কচ্ছপ খাইয়া থাকে।

প্রতিজনের দুই ছটাক ডাল প্রয়োজন হয়। মুগ, বুট, মুশুর, ও কলায়ের ডালই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। খিচুড়ী খাওয়া হয়, কিন্তু ইহা অত্যন্ত গুরুপাক।

অল্প জালের দুধ ও দধি জনসাধারণ খাইয়া থাকে। মাখন বড় একটা কেহ খায় না। তরকারী ও ডালের সঙ্গে ঘি দেওয়া হয়। মিষ্টান্ন ঘিয়ে ভাজা হয়। ভোজনান্তে পায়স ভোজন বিলাসিতার মধ্যে পরিগণিত।

শাক সবজি—সহরের বাজারে বিলাতী শাক সবজি ধনীরা খরিদ করিয়া থাকে। চেরাপুঞ্জীর আলু সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়; ঢাকা সদরের উত্তর পশ্চিমে কলাতিয়ার হাটের নিকটবর্ত্তী জমিতে উৎকৃষ্ট আলু জন্মিয়া থাকে।

মাছ—নানা শ্রেণীর মাছ বাজারে পাওয়া যায়। শীতকালে প্রচুর পরিমাণে মাছ আমদানি হয়। কিন্তু বর্ষাকালে মাছ খুবই কম মিলে। গরীব লোকেরা পুঁটী, চিংড়ী, "নলা" মাছ খাইয়া থাকে।

ফল—আম, কাঁটালই প্রধান ফল। অন্যান্য ফল নারিকেল, খেজুর, বেল, কলা, পেপে, শশা ও তরমুজ। মকাই ফল ঢাকাবাসীরা অত্যন্ত ভালবাসে। "The kernels of the seeds consist of starchry matter. They are eaten alone, or with milk and sugar.

৪। শ্রমজীবির মজুরীর হার—

৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার শ্রমজীবিদের দৈনিক আয় কিরূপ ছিল তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

কুলি—প্রাতে ৭টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত—আহারের জন্য ২ ঘণ্টা ছুটী—দৈনিক মজুরী ৴০।

গরুর গাড়ী—দুইটি দামড়া সহ প্রাতে ৬টা হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত দৈনিক মজুরী ৷৷৴১০

গরুর গাড়ী দুইটি দামড়াসহ প্রাতে ৬টা হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত দৈনিক মজুরী ৷৷৶৬ এবং প্রাতে ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত দৈনিক মজুরী ১৲

নৌকা—একশত মণ বোঝাই ১৷০

নৌকা—পাঁচশত মণ বোঝাই ৩৸০

নৌকা—এক হাজার মণ বোঝাই ৫৲

বেহারা (কাহার) প্রতি জন ৷৷০

ঠিকাগাড়ী—১ জোড়া ঘোড়াসহ প্রতি ঘণ্টা ৷৷০

মাজিষ্ট্রেট আফিসের জেলা বিবরণী হইতে জানা যায়, সেই সময়ে সদর থানার এলাকায় ৩৪টা হাতী, ১৭৫টা বইল, ২২০ জন বেহারা, ১০২ খানা গরুর গাড়ী ও দেড়শত টাটু ঘোড়া ছিল। সে সময়ে খেদা বিভাগ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া গবর্ণমেণ্টের হাতী ছিল না। নবাবগঞ্জ থানা হইতে ১৫০ শত টাটু ঘোড়া আমদানি করা হইত। সহরে ৬০খানা ভাড়াটিয়া গাড়ী ছিল। আর্ম্মানি সওদাগর শরকোর (Mr Shircore) সাহেব ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঠিকা গাড়ীর প্রথা প্রথম প্রচলন করেন। পরবর্ত্তী চারি বৎসরে অন্যান্য দোকানদারেরা বহু সংখ্যক ঠিকা গাড়ীর আমদানি করে।

৫। আমদানি ও রপ্তানি—

প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য—ঢাকার ধুতি, নীল, সুপারি, কুসুম ফুল, পাট, সাবান (এই সাবান চাঁদনি ঘাটে প্রস্তুত হয়), চামড়া, শাঁখার বালা, অলঙ্কার, তাম্রপাত্র,পনির এবং নানাবিধ মোরব্বা (preserved fruit)। ঢাকাই মসলিন ও বহু রত্নখচিত জামদানি কাপড় বসরা ও জেদ্দা নগরে প্রেরিত হইত এবং তথা হইতে মিশর ও তুর্কিস্থানে যাইত। কথিত আছে সম্রাট ঔরংজেবের জন্য ২৫০৲ টাকায় এক এক খানা জামদানি প্রস্তুত হইত। ১৬৬৬—৭০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার মসলিন সর্ব্বপ্রথম লণ্ডনে প্রদর্শিত হয়। সেই সময় হইতে প্রতি বৎসর এককোটী টাকার মসলিন য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইত।

নীল ও কুসুম ফুলের বীজ কলিকাতায়, সুপারি রংপুর, আসাম ও পেগুতে, চামড়া ও পাখীর পালক কলিকাতায়, সাবান মরিশস্ ও অন্যান্য দেশে, পনির ও মোরব্বা জেদ্দা ও বসরায় রপ্তানি করা হইত।

আমদানি—আসাম ও ময়মনসিংহ হইতে সরিষা ও তিল ; ফরিদপুর ও গাজিপুর হইতে চিনি ; শ্রীহট্ট হইতে চুণ ; আসাম, মোরাং, রংপুর প্রভৃতি স্থান সমূহ হইতে কাঠ ; পূর্ণিয়া ও রংপুর হইতে তামাকু ; আরাকাম, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ হইতে তুলা ; আরাকান ও পেগু হইতে খয়ের, সেগুন কাঠ, হস্তীদন্ত, লঙ্কা, আর্সেনিক, মোম, স্বর্ণ এবং রৌপ্য। আসাম ও শ্রীহট্ট হইতে মুগা ও তসর ; চট্টগ্রাম ও বাখরগঞ্জ হইতে নারিকেল ও 'ভুকুম' (?) কাঠ ; শ্রীহট্ট হইতে 'অগুরু চন্দন' কাষ্ঠ ; পাটনা হইতে গম, জুতা ও বনাত ; কলিকাতা হইতে শঙ্খ, বিলাতী সুতা, বিলাতী বস্ত্র, লবণ, লৌহ, শাল, গরম কাপড়, মাটীর ও চিনা বাসন, ছুঁচ, গরম মশলা, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি।

৬। বাণিজ্যোপযোগী হাট বাজার—

নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ এবং মাণিকগঞ্জই এ জিলার প্রধান বাণিজ্যোপযোগী স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নারায়ণগঞ্জ লক্ষ্যা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। বাজার লইয়া এই সহর দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। ইহাকে 'ঢাকার বন্দর' বলা যাইতে পারে। এই সহর হইতে স্থলপথে ঢাকা ৯ মাইল এবং জলপথে ১৭।১৮ মাইল। এই স্থান হইতে কলিকাতা, শ্রীহট্ট আসাম ও কাছাড় প্রভৃতি স্থানে রীতিমত বাষ্পীয় জলযান যাতায়াত করিয়া থাকে। চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালি হইতে সুলুপে (sloop) এখানে লবণ আমদানি করা হয়। টেলর সাহেবের সময়ে প্রায়

১৬০ খানা স্লুপ এই বন্দরে যাতায়াত করিত। এ জেলায় ধানের পর প্রধান ফসল পাট বা কোষ্ঠা। বর্ত্তমান সময়ে নারায়ণগঞ্জ পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। তখনও পাটের ব্যবসা তেমন সাফল্যলাভ করে নাই। টেলর সাহেব বলেন—

"The trade in kosta or pat (Jute) has considerably increased of late years; it is largely imported from Tipperah and Mymensingh packed at Naraingunge and sent to Calcutta by steamer and rail, Via Koostea."

বিগত ১০ বৎসর (১৮৬৮ খৃঃ) যাবৎ নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জের পাটের ব্যবসা অতি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ বাজারে ৭০ হাজার মণ পাটের আমদানি হইলে যথেষ্ঠ মনে হইত। তখন পাটের মণ ১।০ ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিমণ পাট ২॥০ টাকায় বিক্রী হইত। বর্ত্তমান সময়ে ৬৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকায় মণ বিক্রী হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দির মধ্য ভাগে নারায়ণগঞ্জ বন্দরে ৭০হাজার মণ পাটের ব্যবসা অত্যধিক বলিয়া মনে হইত। আজ সেই স্থান হইতে প্রতিবৎসর ৫ লক্ষ মণ পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে!

সেই সময়ে রংপুর ও কুচবিহার হইতে সরিষা তৈল ও তামাকু ধলেশ্বরীর তীরবর্ত্তী মানিকগঞ্জে আমদানি করা হইত। এবং তথা হইতে নারায়ণগঞ্জ এবং কলিকাতায় চালান দেওয়া হইত।

বংশী নদীর তীরবর্ত্তী সাভারের ব্যবসাও মন্দ ছিল না। কলিকাতা হইতে লৌহ ও মোরাং পাহাড় হইতে কাঠ এখানে আসিত। 'বালু' নদীতীর ডেমরা কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল।

৭। ঢাকা কলেজ—

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই ভারতগবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গের যুবকমণ্ডলীর ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য "ঢাকা ইংলিশ সেমিনরী" বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই ঢাকা জিলার প্রথম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

ঢাকা কলেজগৃহের জমির উপর পূর্ব্বে কোম্পানীর কুঠী ছিল। কালক্রমে গুদাম ঘরগুলি ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়; ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকার এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মাসিক ১৭৲ টাকা খাজানায় ঐ জমি খরিদ করিয়া লন।

ঢাকার শিক্ষাবিভাগের স্থানীয় কমিটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টীকে কলেজে উন্নীত করিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন। কর্ম্মসাধনকল্পে কমিটী জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৮৪১সনে দুইহাজার টাকায় ঐ জমি মিঃ শেপার্ডের নিকট হইতে খরিদ করা হয়।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২০ শে নবেম্বর কলিকাতার লর্ড বিশপ ঢাকা কলেজগৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

লর্ড বিশপের সময়োপযোগী বক্তৃতার পর মিঃ প্র্যাট (Mr. pratt) একখানা খোদিত তাম্র খণ্ড হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি পাঠ করেন :—

The
College of Dacca.

Founded by the British Govt. of India, for instruction of the Native youths of the Eastern Districts of Bengal in European literature and science. This Stone of Edifice is laid by the Right Reverend Daniel, Lord Bishop of Calcutta and Metropolitan of India, on the 20th day of Novr.—A. D. 1841, in the reign of Her Most Gracious Majesty Queen Victoria, and during the administration of the Right Honourable the Earl of Auckland, G. C. B., Governer General.

সেই নব প্রতিষ্ঠিত কলেজে ৩০৯ জন ছাত্র ছিল। কলেজ ৮টী ক্লাসে বিভক্ত ছিল এবং ৮জন শিক্ষক দ্বারা অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ হইত।

ভিত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ক্লে সাহেব বলেন :—

"The record was then placed in a bottle, enclosed in a case of lead and was deposited by the Bishop in a small chamber cut in the centre of a large stone imbedded in the foundation of the building, at the north-east angle, along with the copper plate, a few coins, English and Indian, of late and present reigns, and a Government Gazette of 1841. The ceremony was completed by covering them with a stone slab, and cementing it with lime and mortar, the

Band at the same time playing the National Anthem."

ঢাকা কলেজের দালানের ভার পূর্ত্তবিভাগের হাতে সমর্পণ করা হয়। কর্ণেল গারস্‌টিন (Col. Garstin) ডিজাইন প্রস্তুত করেন। এই গৃহ নির্ম্মাণে ২৪॥০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। ১৮৪৪ সনে দালানের কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৮৪৬ সনের প্রথম ভাগে নির্ম্মাণ ক্রিয়া শেষ হয়। সেই বৎসর জুলাই মাসে কলেজ ক্লাস নূতন গৃহে বসিতে আরম্ভ করে।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

অহং-ভূপালা—কাওয়ালী।

কেমনে গাহিব তব মহিমা;
সেথা নীরব নিষ্ফল কবি-রসনা,
ত্রিভুবনে কোথা তব উপমা।
ক্ষুদ্র যে আমি, অণুর অধম,
তুমি ভূমা—মহত্তম।
কিসে তবে হায় তুষিব তোমায়;
তুমি তো না চাও শূন্য স্তুতিগান,
তুমি প্রভু চাও আত্ম-বলিদান,
আর কিছু না॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

০ ১ ২
গমা II ধপা মমা গরা গমগা। রসা -া -া গমা। ধপা মমা গরা গমগা।
কেম নে,গা হিব তব মহি মা ০ ০ কেম নে,গা হিব তব মহি

৩ [-া -া -া]॥ ০ ১
। রসা গগা সা গগা I রসা গগা গমা গমা। পা -া সর্সা সধা।
মা, সেথা নী রব নি ষ্ফল কবি রস না ০ ত্রিভু বনে

২ ৩
। র্সা র্সা ধপা মগা। রগা -া -রসা গমা II
কো থা তব উপ মা০ ০ ০ "কেম"

০ ১ ২ ৩
II পনাঃ নঃ না ধনা। সর্রা -া র্সা র্সা। পপা ধা র্রা -া। সা রা সা -া I
ক্ষু০ দ্র, যে, আমি অণু র্ অ ধম্ তুমি ভূ মা ০ ম হ ত্ত ম্

I { গগা গগা পা -া। গগা রগা রসা -া } I সর্সা সর্সা ধা র্রা।
কিসে তবে হা য় তুষি ব,তো মা য় তুমি ত,না চা ও

১ ২ ৩ ০
। র্সা ধা পা গা। সা -গমা -পা -া। -া -া -া -া I সর্সা সধা ধা র্রা।
শূ ন্য, স্তু তি গা ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্ তুমি প্রভু চা ও

১ ২ ৩
। রর্সা -া পা ধণা। ধপা -মগা পধপা মগা। রসা -া -া গমা II
আ ০ ত্ম বলি দা০ ০ন্ আর্ কিছু না ০ ০ "কেম"

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিভিন্ন ভাষার অনুশীলন।

সেদিন সংবাদ পত্রে পড়িলাম যে কোন চিন্তা-শীল লেখক বলিয়াছেন যে জর্ম্মনির সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র হইতেছে তাহার ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন। জর্ম্মানেরা কেবল বিভিন্ন জাতির ভাষা বলিতে পারে না, বিভিন্ন জাতিকে তাহাদের নিজ নিজ ভাষা শিক্ষা দিতে পারে। বলা যাইতে পারে যে ইংলণ্ডের জন্য যাহা সামরিক জাহাজ করি-য়াছে, জর্ম্মনির পক্ষে সেই কার্য্য ভাষাতত্ত্বের দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছে। জর্ম্মান দালালকে দোভাষীর অপেক্ষা করিতে হয় না। জর্ম্মানির বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিদেশীয় ভাষা শিক্ষাবিষয়ে গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষিত হয় এবং যে ব্যক্তি যত ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, সে ব্যক্তি তদনুপাতে শিক্ষিত বলিয়া স্বীকৃত হয়। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান দার্শনিক সোপেনহোর বলিয়াছেন যে ব্যক্তি যত ভাষা জানে, সে ব্যক্তি ততগুণ মানুষ। ভাষা জ্ঞানের ফলে জর্ম্মনির অনেক সুবিধা হয় দেখিতে পাইয়া ইংরাজ জাতিও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী হইতেছেন। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ফলে বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে চিনিতে পারিবে এবং বিভিন্ন জাতি ঐক্যসাধনের পথে অগ্রসর হইবে। ইহা জগতের উন্নতিরই পরিপোষক।

বাঙ্গালী বিভাগীয় কমিশনার।

ভারতের গতি যে উন্নতির অভিমুখে চলিয়াছে, চারিদিকেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি। ভারত-বাসীর বিশেষত বঙ্গবাসীর একটা চিরন্তন দুর্নাম ছিল যে তাহার পরিচালন ক্ষমতা (Executive power) নাই বলিলেই চলে। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত যখন বিভাগীয় কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা স্বীয় পদে খুব কৃতকার্য্য হইলেও স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন নাই। কিন্তু প্রকৃত গুণ থাকিলে তাহার প্রকাশের পথ ভগবানই উন্মুক্ত করিয়া দেন। বাঙ্গালীর গুণের পরিচয় প্রদানের আজ সুন্দর অবসর আসিয়াছে, তাই ভগবানের কৃপায় আজ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের দুইজন কৃতী সন্তানকে স্থায়ীভাবে বিভাগীয় কমিশনরের পদে অধিষ্ঠিত দেখিলাম। কবে আমরা বিভাগে বিভাগে ভারতবাসী কমিশনর দেখিতে পাইব ?

বালক বাহিনী।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিকের উদ্যোগে একটী বালক বাহিনী (Boys Scouts) সংগঠিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। আমরা ইহার ভিতরে জাতীয় উন্নতির বীজ নিহিত দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। বাল্যকাল হইতে ছেলেরা যদি আত্মনির্ভর শিক্ষা করে, অন্যের প্রতি জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে শিখে, বিনা দ্বিধায় সত্য কথা বলিতে ও সত্য ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে, তবে যৌবনে তাহারা যে দেশের সুসন্তান হইয়া মঙ্গলসাধন করিবে, ইহা সম্পূর্ণ আশা করা যায়। কেহ কেহ ইহাকে সন্দেহ চক্ষে দেখেন। আমরা কিন্তু ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে কেন এ প্রকার সন্দেহ আসে। ইহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছুতেই যাইতে পারিবে না, বরঞ্চ একটা সুনিয়মের মধ্যে পরিচালিত হইতে হইতে নিয়মবহির্ভূত বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া উঠিবে বলিয়াই অনুমান হয়। আমাদের বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়া প্রতি বিদ্যালয়ে এক একটী বালক-বাহিনী সংগঠনের সহায়তা করিলে দেশের পক্ষেও মঙ্গল এবং গবর্ণমেণ্টের নিজের পক্ষেও মঙ্গল।

আরব দেশের স্বাধীনতা।

আরবদেশ সম্প্রতি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। এতদিন যে ইহা হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। আরবদেশ নামে মাত্র তুরস্কের অধীন ছিল। তুরস্কের সুলতান মহম্মদের দুহিতার বংশধর বলিয়া মুসলমানদিগের ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার প্রতাপ একপ্রকার অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সম্ভবত সেই কারণে এতদিন আরবও নিজের স্বাধীনতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে নাই। বর্ত্তমানে আরবের সেরিফ, যিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন, তিনিও মহম্মদের বংশধর বলিয়া মহাপ্রতাপবান। সুতরাং মনে হয় না যে আরব আবার তুরস্কের নিকট অবনতমস্তক হইবে। এই স্বাধীনতা ঘোষ-ণার ফলে মুসলমানদিগের ভিতরে আত্মার স্বাধীনতা

প্রতিষ্ঠার পক্ষে যে বীজ প্রোথিত হইল, তাহার ফল যে কতদূর পর্য্যন্ত যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? ভগবান জগতের প্রত্যেক নিমেষ তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের দিকে নিয়মিত করিতেছেন।

আমাদের শিক্ষা।

সম্প্রতি মডার্ণ রিবিউ নামক ইংরাজী মাসিক পত্রে লালা লাজপত রায় কর্ত্তৃক লিখিত "আমাদের শিক্ষা" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী যে আমাদের প্রকৃত উন্নতির সহায় নয়, এই কথা সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। আমরা যে এই কথা বুঝিয়াছি, ইহাতেই মনে হয় যে আমাদের উন্নতির এখনো আশা আছে। লাজপত রায় গবর্ণমেণ্টের উপর শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতিসাধনের জন্য বেশী নির্ভর করিতে চাহেন। আমাদের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় সেটী অসম্ভব। আমরা যতই এবিষয়ে আলোচনা করিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে গবর্ণমেণ্টের উপর কতকটা নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেও আমাদিগের নিজের চেষ্টা ব্যতীত এই উন্নতি সাধনের দ্বিতীয় উপায় নাই। প্রত্যেক পিতামাতার যে স্বল্পপরিসর জমীজমা আছে, সেই জমীজমাতে তাঁহাদের সন্তানদিগকে নিযুক্ত করিয়া দেখুন দিকিন যে সহসা জাতীয় উন্নতি কতদূর অগ্রসর হয়। কিন্তু সেটী তো হইবে না—প্রত্যেক পদে ছুঁই ছুঁই ভাব। একটী ব্রাহ্মণ, অবশ্য নিরক্ষর, দশবিঘা জমী পাইয়াছে, কিন্তু তুমি কি মনে কর যে সে নিজে সেই জমীটুকু চাষ করিবে? না, সেটী সে করিতে পারিবে না, কারণ তাহার বাপপিতামহ সেটা তো করে নাই। সে হয় মজুর রাখিয়া অনেক লোকসান সহ্য করিয়া যেটুকু লাভ হয় তাহাই পাইয়া মহাখুসী হইবে অথবা ভাগে বিলি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। এ উপায়ে কখনও কি উন্নতির আশা করা যায়? এরকম কুসংস্কারে ডুবিয়া থাকিলে আমরা তো নিজেকে পদদলিত হইয়া থাকিবার উপযুক্ত করিয়া তুলি। মূলে গিয়া না ধরিলে শত শত লাজপত রায়ের শত সুন্দর প্রবন্ধ কিছুতেই জাতিকে উঠাইতে পারিবে না। প্রত্যেকে কৃষি অবলম্বন কর, যে কৃষি অবলম্বনে মানুষ প্রথম জীবনে ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সেই কৃষি অবলম্বন কর—দেখিবে উন্নতির বিলম্ব হইবে না। কুসংস্কার সমূলে উচ্ছেদ করিবার বিষয়ে উপদেশ দাও এবং প্রত্যেক পিতামাতা নিজের নিজের সন্তানকে কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দিন। এই মহান কার্য্য আমাদের হাতে—এর জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে না—তবে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে যেমন প্রজার পক্ষে মঙ্গল হইবে, সেইরূপ আমাদের দৃঢ় ধারণা গবর্ণমেণ্টেরও পক্ষে মঙ্গল হইবে। আর, যদি তোমরা এখনও এবিষয়ে মনোযোগ না কর, তবে পরমার্থ হইতে বিচ্যুতির কারণে আজ পাশ্চাত্য জাতিগণ যেরূপ কঠোর আঘাত পাইতেছে, আমাদের আশঙ্কা হয় যে আমরাও কোন্ দিন সেইরূপ ভগবানের হস্তে বজ্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইব।

জিজ্ঞাসা।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

তটিনী সাগর পর্ব্বত অরণ্য
এ সকল বল হয়েছে কি জন্য?
এ সব ধরায় যদি না রহিত,
তা হলে হত কি সংসারের হিত?
হত কি না হত, কে বলিতে পারে?
যাঁর সৃষ্টি, কর জিজ্ঞাসা তাঁহারে॥

নানাকথা।

দিবালোক সঞ্চয়।

বিলাতে পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা আজকাল সময়কে একঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে সত্য সত্য ৯টা বেজেছে, সেখানে ঘড়িতে দেখবে ১০টা। কাজেই যাদের ১০টায় আফিস যেতে হবে, তারা নামে ১০ টায় যাচ্ছে, কিন্তু আসলে ৯টায় যাচ্ছে। ইহাকে দিবালোক সঞ্চয় নাম দেওয়া হয়েছে। আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বাবধি জর্ম্মানি প্রভৃতি দেশে এই আলোক

সঞ্চয়ের নিয়ম চলেছে, এখন কয়লা তড়িৎ প্রভৃতি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বিলাতেও এই আলোকসঞ্চয় চলেছে। আলোকসঞ্চয়ের ফলে অন্যান্য বিষয়ে সঞ্চয় কিরূপে সাধিত হয় তাহা একবার বুঝে দেখা যাক। সূর্য্য ওঠে মনে কর ৬টার সময়। লোকেরা ৬টার সময় বিছানা থেকে উঠতে অভ্যস্ত। এখন ঘড়িতে সময় একঘণ্টা এগিয়ে দিলে লোকে ৫টার সময় ৬টা মনে করে উঠে মুখ হাত পা ধুয়ে ৭টার বদলে সত্য সত্য ৬টায় কাজে লেগে যাবে। আর তারপর, সন্ধ্যা বেলা আফিস প্রভৃতি মনে কর খোলা থাকত ৭টা পর্য্যন্ত—এর কারণ এই যে ওদিকে সকালে ১১টায় খুলত। এখন কিন্তু আসলে বেলা ১০টায় খোলাতে এদিকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে আফিস বন্ধ করতে পারা যায়। ঐ যে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত আলো জেলে কাজ করতে হোত, সেটা আর এখন দরকার হয় না। আর, ঐ আলো দরকার না হওয়াতে ঐ এক ঘণ্টার তড়িৎ উৎপন্ন করবার জন্য যে সকল কলকারখানা চলতে বাধ্য হোত সেগুলিও একঘণ্টা দেরীতে চলতে লাগল। এইরূপে দেখা গেছে যে ঐ এক ঘণ্টায় যে খরচটা হো'ত সেটা একটা বৃহৎ সংখ্যা। এই বেঁচে যাওয়া খরচটা বিলাতবাসীগণ এখন কামান ও গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণেই প্রয়োগ করিতেছেন বলিতে হইবে। কাহারো কাহারো মতে ইহা ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর ছাড়িয়া দিলে ভাল হইত। কিন্তু এত বড় একটা কাজ যখন দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে করাতে হবে তখন আইন ছাড়া অন্য আর কি উপায়? আমাদের দেশে অবশ্য আইনের দ্বারা ঘড়ির কাঁটা না সরাইয়াই দিবালোক সঞ্চয় সাধিত হইয়াছিল। ভারতের হিন্দুদিগের নিয়ম ছিল ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠা। এই নিয়ম প্রতিপালিত হলে দিবালোক সঞ্চয় খুবই সহজ হয়—সূর্য্যদেব ফাঁকি দিয়ে অদৃষ্টিগোচরে উঠে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পালাতে পারেন না।

৺রাজেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে ৺রাজেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। ইহাঁকে বন্ধুবান্ধবগণ রাজা বাবু বলিয়া ডাকিতেন। কলিকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার যে এতদূর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,বলিতে গেলে তাহার মূল রাজা বাবু। গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া বঙ্গবাসীরা যে স্বাধীনভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পর বোধহয় রাজা বাবুই সে বিষয়ে পথ দেখাইয়াছিলেন। রাজা বাবুর একটা খেয়াল ছিল। তাঁহার মতে ভাত, ডাল, তরকারী প্রভৃতি পৃথকভাবে রাঁধা উচিত নয়—উদরে পড়িয়া যখন সমস্ত ভোজ্য দ্রব্যই একস্থানে যায়, তখন সেই মিশ্রণটী তাঁহার মতে পূর্ব্ব হইতে করিয়া দেওয়াই সঙ্গত। একবার তিনি মহর্ষির পুত্রগণের নিকট এইরূপ সর্ব্বমিশ্রিত রন্ধনের উপকারিতা ও সুস্বাদুতা বুঝাইয়া একদিন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে একদিন রন্ধন দ্রব্য ও খাদ্যদ্রব্য (দুগ্ধ আমস্বত্ব প্রভৃতি পর্য্যন্ত) সংগৃহীত হইল। একটা সুবৃহৎ কটাহে এক এক করিয়া চাউল হইতে আরম্ভ করিয়া আমস্বত্ব পর্য্যন্ত সকলই নিক্ষিপ্ত হইল। রাজা বাবুর সঙ্গে মহর্ষির পুত্রগণও অনাহারে আছেন—আশা যে কি আশ্চর্য্য দ্রব্যের আজ আস্বাদ পাইবেন। অবশেষে বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ হইয়া বেলা ২টার সময় রন্ধন শেষ হইলে সেই অপরূপ দ্রব্যসম্ভারবিশিষ্ট কটাহ উনান হইতে অবতরণ করিলেন। সকলেই আসনোপরি উপবিষ্ট হইলে, সেই ত্রিলোকদুর্ল্লভ আহার সকলের পাতে পরিবেশন করা হইল। রাজা বাবু মহাসুখে পরম পরিতোষের সহিত তাহা দ্বারা উদর পূর্ণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীগণ কোন প্রকারেই তাহা গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। রাজা বাবুর সম্বন্ধে আমরা বাল্যকালে আরও অনেক মজার গল্প শুনিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনীলেখক সেগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে নিশ্চয় সুখপাঠ্য হইবে।

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে যামিনী বাবু গবর্ণমেণ্টের আর্টস্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র সকল যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার নৈপুণ্য বিশেষরূপে অবগত আছেন। তাঁহার চিত্রের বিশেষত্ব এই যে তাহা দর্শকের মনকে সর্ব্বদাই উচ্চ আদর্শের মুক্ত গগনে লইয়া যায়! ভারতবাসী তাঁহার নিকট অনেক প্রত্যাশা করে।

পৃথিবী ও চাঁদের কথা।

সম্প্রতি ভারত জ্যোতিষ সমিতিতে রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ, সি, রিডসডেল "পৃথিবী ও চন্দ্রের অভিব্যক্তির উপর জোয়ারের প্রভাব" বিষয়ে একটা বক্তৃতা করিয়াছেন। তন্মধ্যে দু একটী বিষয় বড়ই

কৌতূহলপ্রদ বলিয়া আমরা নিম্নে উল্লেখ করিলাম। পৃথিবী হইতে চন্দ্র আজ অন্যূন ৬০০০০০০০ ছয় কোটী বৎসর পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন হইয়া উপগ্রহে পরিণত হইয়াছে। সেই কাল অবধি জোয়ারের সংঘর্ষণ চন্দ্রকে ক্রমাগত পৃথিবী হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্র ও পৃথিবীর পৃষ্ঠে জোয়ারের ঝাঁপ খুব বেশী ছিল। সেই ঝাঁপের চাপের কারণে চন্দ্রের পৃথিবী-মুখী বৃত্তার্দ্ধ পৃথিবীর দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। গত ৪৬০০০০০০ বৎসরে দেখা যায় যে পৃথিবীর দিন ১৫২ ঘণ্টা হইতে ২৪ ঘণ্টায় দাঁড়াই যাছে। গণনাতে দেখা যায় যে ৫৭০০০০০০ বৎসর পূর্ব্বে ৫২ ঘণ্টায় এক দিন হইত এবং ০.২৩ দিনে একমাস হইত। সেই সময়ে চাঁদের পৃষ্ঠভাগ পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ হইতে এক হাজার মাইল দূরবর্ত্তী ছিল। ৪৯০,০০০,০০ বৎসর পূর্ব্বে ১৫.৫ ঘণ্টায় একদিন হইত এবং ১৮.২ দিনে একমাস হইত। তখন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ছিল ১৮৮,০০০ মাইল। বর্ত্তমানে ২৩.৯৩ ঘণ্টায় এক দিন হয় এবং ২৭.৩২ দিনে এক মাস হয়। এখন পৃথিবী হইতে চন্দ্রের মাধ্যমিক দূরত্ব হইতেছে ২৩৮, ৯০০ মাইল।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয়ের সম্মান প্রাপ্তি।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে যে সকল যোগ্যপাত্র উপাধিভূষিত হইয়াছেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় তাঁহাদের অন্যতর। তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিলাভ করিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম কবিরাজ ৺বিশ্বনাথ সেন বিদ্যাকল্পদ্রুম। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্রও যে একজন অসাধারণ চিকিৎসক হইয়া উঠিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বাল্যকালেই ইঁহার প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি কেবলমাত্র পিতার নিকট ও ৺বিজয়রত্ন সেন মহাশয় প্রভৃতি পিতৃবন্ধুর নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পড়িয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু মেডিকেল কলেজে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ভারতীয় বৈদ্যসম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ "প্রত্যক্ষশারীরং" আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার সমালোচনা আমরা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিব। ইনি বিদ্যাবুদ্ধির কারণে কেবল রাজসম্মান লাভ করেন নাই, আমাদের দেশেরও সুধীবর্গ তাঁহাকে "বৈদ্যাবতংস", "বিদ্যানিধি" "সরস্বতী" প্রভৃতি নানা উপাধি প্রদান করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা আশা করি, কবিরাজ গণনাথ, কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিরাজগণের যত্নে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক, কুইনাইন ব্যতীত নবজ্বর নিবারণে অক্ষম প্রভৃতি যে সকল অপবাদ দেওয়া হয় সেই সকল অপবাদ দূরীকৃত হইবে। কবিরাজ মহাশয়ের উন্নতি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

রহিব তোমার।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চাতকের ন্যায় ঊর্দ্ধমুখে
চেয়ে আছি দেখা দেবে কবে।
দেখা পেলে নাথ মহাসুখে
তব কাজ করিব নীরবে॥
তব কাজ করিবারে আর
হইবে না মনে গুরু ভার—
তব কাজ হইবে আমার,
আমি সদা রহিব তোমার॥

শোক সংবাদ।

গত ৩০শে আষাঢ় শুক্রবার প্রাতে ৬টার সময় মানবপ্রকৃতি প্রণেতা ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী কটকে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক সময়ে ক্ষীরোদ বাবু সাহিত্য জগতে একজন শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি যে সময়ে মানবপ্রকৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে চিত্তাকর্ষক অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে মানবপ্রকৃতি ব্যতীত দ্বিতীয় পুস্তক ছিল না। সে সময়ে এবিষয়ে গ্রন্থ রচনা করাই তাঁহার প্রতিভা ও মানসিক সাহসের পরিচয়। "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র স্থাপনকালে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে বঙ্গবাসী দাঁড়াইত কি না বলা বড়ই কঠিন। তিনি শিক্ষাবিভাগে বহুকাল চাকরীর পর অবসর গ্রহণ করিয়া কটকের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেখানেও তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া উড়িষ্যার মুখপত্রস্বরূপ Star of Utkal নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পরে তাহা গবর্ণমেণ্টের আদেশে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতেই তিনি গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার বিধবা পত্নী ও সন্তানদিগের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বর পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের হৃদয়ে সান্ত্বনা দিন এবং এই দুর্ব্বহ শোকভার বহনের সামর্থ্য প্রদান করুন।

রাজা রামমোহন রায়ের উপাসনা গৃহের ধ্বংসাবশেষ।

লাঙ্গল পাড়া, হুগলি।

রাজা রামমোহন রায়ের গৃহের ধ্বংসাবশেষ।

লাঙ্গল পাড়া, হুগলি।

উনবিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
ভাদ্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৭।
৮৭৭ সংখ্যা ১৮৩৮ শক।
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুঃসপ্ততি বৎসরে পদার্পণ।

তিয়াত্তর বৎসর অতীত হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শুভক্ষণে বঙ্গদেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বীয় জ্যোতিতে দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে দেশে কত পরিবর্ত্তন কত বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অক্লান্তভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছে। কত মাসিক পত্র উদিত হইল, আবার স্বীয় সংক্ষিপ্ত জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া চিরতরে ডুবিয়া গেল, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অটুট ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই দীর্ঘ জীবনকালে স্বীয় কর্ত্তব্য পথ হইতে একটী পদও স্খলিত হয় নাই। সময়ে সময়ে পত্রিকার যে অল্পাধিক অবসাদ ঘটে না সে কথা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার ফলে ক্ষণকালের মধ্যেই সেই অবসাদ কাটিয়া যায় ও তাহার দেহে নূতন বল আসে। প্রথমাবধি আজ পর্য্যন্ত ইহার প্রতি পত্র, প্রতি ছত্র অন্বেষণ করিয়া দেখ, দেখিবে যে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার ফলে ইহার ভিতরে একটীও মন্দকথা, একটীও কুবাক্য পাওয়া যাইবে না। আদি-ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ লইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখা এবং অন্যান্য ধর্ম্ম-সমাজের সহিত অনেক বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছে, কিন্তু পত্রিকা ব্রহ্মচর্য্য ও উদারতার উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া সেই সকল তর্ক বিতর্ক করাতে তাহার মধ্যে বিবাদের মর্ম্মন্তুদ তীব্রতা কোথাও দেখা যায় নাই। পত্রিকার একটী প্রধান উদ্দেশ্য নিজেকেও ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীকেও ব্রহ্মচর্য্যে দাঁড় করানো। তাই ইহার প্রথম জন্মদিনে এই একটী উদ্দেশ্য লিখিত হইয়াছিল—"কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমন সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।" এই উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণের কারণেই, যে সকল বিষয়ের আলোচনায় মানবহৃদয় তিলার্দ্ধও ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, পত্রিকায় সে সকল বিষয়ের আলোচনায় বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

একদিকে যেমন পত্রিকা ব্রহ্মচর্য্যের উপর অটলভাবে বসিয়া আছে, অপর দিকে সেইরূপ পত্রিকার উদারতাও আশ্চর্য্য। দেবযক্ষ হইতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটাণুকীট পর্য্যন্ত এবং অনাদি অনন্ত গগনবিস্তৃত ব্যোম অবধি ধূলিকণা পর্য্যন্ত সকলের স্রষ্টা পাতা ও নির্ব্বহিতা পরমেশ্বর যে পত্রিকার মূল আলোচ্য বিষয়, সেই পত্রিকাতে

উদারতার অভাব দৃষ্ট হইলেই আমরা আশ্চর্য্য হইতাম। এই উদারতার কারণে ইহাতে দোষ প্রদর্শন কালেও কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই প্রতি একটীও কুবাক্য প্রযুক্ত হয় নাই।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যেরূপ অবস্থা পড়িয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য ও উদারতার উপরে প্রতিষ্ঠিত এইরূপ একখানি মাসিক পত্রের অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। যিনিই একটু প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করিবেন, তিনিই আমাদের এই কথার গুরুত্ব পদে পদে অনুভব করিবেন। এই যে বিলাসপূর্ণ প্রেমের কবিতা, দীর্ঘনিশ্বাসে ভরা ছোট গল্প এবং হত্যাকাহিনীর রক্তরঞ্জিত ডিটেক্টিভ উপন্যাস সকল দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং স্বীয় সুগভীরপ্রোথিত শিকড়জালে দেশের অন্তস্তল পর্য্যন্ত চিরকালের জন্য আঁকড়াইয়া রাখিবার উপক্রম করিতেছে, ইহার কুফল কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? গভীর নিশীথে এই কলিকাতা সহরের গলিঘুঁজিতে অল্পবয়স্ক বালক ও যুবকবৃন্দকে সিগারেটের ধূম উদ্গীর্ণ করিতে করিতে দুষ্কর্ম্ম করিবার মতলব আঁটিতে যদি কেহ দেখিয়া থাকেন বা শুনিয়া থাকেন, তিনি যদি পিতামাতার সন্তান হন, তিনি যদি পুত্রকন্যার পিতা হন, তিনি যদি ভগিনীর ভ্রাতা হন, তবে তিনি সহজেই ঐ সকলের অপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমাদের একটী বন্ধু একটী জ্ঞানগর্ভ পুস্তক কোন সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতাকে যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে ক্রয় করিবার অনুরোধ করাতে তিনি প্রত্যুত্তর পাইলেন এই যে—"এ সকল পুস্তক লেখেন কেন? ইহা পড়িবে কে? যদি কোন ডিটেক্টিব উপন্যাস লেখেন, তাহা হইলে আমরা তাহা অর্দ্ধ মূল্যেও ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।" আমাদের দেশ কি নরকস্থ হইবার দিকে এতই দ্রুতপদে চলিয়াছে? আশ্চর্য্য এই যে প্রেমের কবিতা, ছোট গল্প, ডিটেক্টিব উপন্যাস প্রভৃতির লেখকগণই আবার সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর। আমাদের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে আমাদের পেটে নাই ভাত, কিন্তু মুখে এক মুহূর্ত্তের জন্য সিগারেট বন্ধ থাকিবে না এবং হাতে একমুহূর্ত্তের জন্য ঐ সকল মহাসর্ব্বনাশকর পুস্তকও বন্ধ থাকিবে না। আমাদের এক একবার ইচ্ছা হয় যে প্রত্যেক দেশবাসীর চরণে কাঁদিয়া বলি যে অন্তত দশটী বৎসর প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের উপর দাঁড়াও, জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থরাজিকে দিবারাত্রের সহায় কর—দেখ দেশ উন্নতির কোন্ উচ্চ শিখরে উঠিয়া যায়।

ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই উদারতার অভাবেরও অন্যতর কারণ। আমার দেহে প্রভূত বল থাকিলে, আমার অন্তরে জ্ঞানের অসদ্ভাব না থাকিলে আমি অপরের অজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতা অনায়াসে ক্ষমা করিতে পারি। সিংহরাজ মূষিককে ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আমার দেহ যখন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, জ্ঞানের চর্চ্চা করিতে যখন ইচ্ছাই হয় না, তখন কাজেই অজ্ঞতার জঞ্জালেও পড়িয়া থাকিতে আমার কোনপ্রকার আপত্তি হয় না, কেবল যদি চিরন্তন প্রথামত অন্নজল পাইবার ব্যবস্থা থাকে। কেবলই ভয় হয় যে পাছে জ্ঞানপ্রদীপ কেহ আনিয়া দেখাইয়া দেয় যে আমি কিরূপ গভীর পঙ্কের মধ্যে বাস করিতেছি। এই আশঙ্কাই বলিতে গেলে প্রধানত আমাদের হৃদয় হইতে উদারতা বিদূরিত করিয়া দেয়। এই উদারতার অভাব দেশকে যে কিরূপ অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছে তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। রাজনীতিক্ষেত্র বল, সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, সকল ক্ষেত্রেই অনুদার ভাব। কোন ক্ষেত্রেই আর আমরা সদ্ভাবে কার্য্য করিতে পারি না। প্রত্যেক কার্য্যেই আমরা পরস্পরের কুৎসা করিতে পারিলে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষসাধনের সর্ব্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিলেই সুখী হই। ইহার ফলে আমরা কেহ কাহারও সাধুভাবে বিশ্বাস করিতে চাহি না, সহস্র ভাল হইলেও কোন উপদেশ শুনিতে চাহি না।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শত অর্থসমাগমের সম্ভাবনা সত্বেও ব্রহ্মচর্য্য বা ব্রহ্মকেন্দ্রক উদারতা, এই উভয়ের কোনটিই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। তত্ত্ববোধিনী কোনও কারণ সাম্প্রদায়িকতার অনুদার ভাব সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহে। সংসারের যে কোন কার্য্য পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগ বন্ধনে সহায়তা করিবে, তত্ত্ববোধিনী

সেই কার্য্যেরই সমর্থন করিবে। এই কারণে আমরা আমাদের পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে বড়ই প্রিয় জ্ঞান করি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে এতদিন আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই, তাহার দুইটী কারণ আছে—একটী হইতেছে ইহা ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে ইহার দর্শনপ্রধান মাসিকপত্র বলিয়া খ্যাতির বিভীষিকা। বলা বাহুল্য যে ইহা আদিব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হইলেও কখনও সাম্প্রদায়িকতার পাশবদ্ধ হইয়া পরিচালিত হয় নাই এবং হইবেও না। উপধর্ম্ম প্রভৃতির সাম্প্রদায়িকভাবের সমর্থনে প্রবন্ধাদি প্রকাশ না করিলে যদি কেহ উহাকে সাম্প্রদায়িক পত্র মনে করেন, তাহা হইলে আমরা নিরুপায়—সে তর্কবিতর্কের সীমায় কেহ কখনও উপস্থিত হইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় কারণ দর্শনপ্রধানত্বের বিভীষিকা—তাহা যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহা আমরা বলিতে পারি না। মধ্যে একটা সময় আসিয়াছিল যে সময়ে দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার দর্শনসংহিতা প্রভৃতি প্রবন্ধাদির দ্বারা পত্রিকাকে দর্শনপ্রধান করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সকল প্রবন্ধ দর্শন হিসাবে অতি মূল্যবান হইলেও জনসাধারণের রুচি-কর হইতে পারে নাই। সেই সময়ের খ্যাতি জন-সাধারণের নিকট তত্ত্ববোধিনীর নামে বিভীষিকা আনিতে আজ পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই। গত বৎসর অবধি পত্রিকাকে সচিত্র বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য নানাবিষয়ক প্রবন্ধাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া সেই বিভীষিকা দূর করিবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি এবং ভগবানের প্রসাদে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছি। গত বৎসর হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যার আশাতীত বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছি। কোথায় উত্তর পশ্চিমের প্রান্তদেশ, কোথায় বোম্বাই প্রদেশ এবং কোথায় বা আসাম প্রদেশের সীমান্তভাগ, এই সকল বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অনেকগুলি সাধুব্যক্তি অযাচিতভাবে পত্রিকার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন।

কিন্তু ইহাতেও আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। আমরা চাই যে স্বদেশে বা বিদেশে প্রত্যেক শিক্ষিত বঙ্গবাসী ইহার গ্রাহক হইয়া নিজ নিজ সন্তানগণের ব্রহ্মচর্য্যে চলিবার পথ এবং অন্তরে উদারতা মুদ্রিত করিয়া দিবার উপায় করিয়া দিন। যাঁহারা আপনাদিগকে রাজা রামমোহন রায়ের স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত স্মৃতিচিহ্ন আদিব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহায় হউন। যাঁহারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শনে ইচ্ছুক, আমাদের সম্পূর্ণ আশা যে অন্তত তাঁহারা তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিশ্চয়ই সহায় হইবেন। যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী তাঁহারা বর্ত্তমান বিশুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের আদিম মূল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহায় হইবেন নিঃসন্দেহ। যাঁহারা সন্তানগণকে ব্রহ্মচর্য্যের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত ও উদার অসাম্প্রদায়িকভাবে ব্রহ্মপথের পথিক দেখিতে চাহেন, তাঁহারাও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন বলা বাহুল্য।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ,)

ঝাঁপ দিয়ে ঐ সুধা-সাগরে
জীবন পড়বে কবে
প্রেম-সুধায় সকল হৃদয়
ভরবে কবে।
জীবন-কমল দুলবে অতল জলে
সুখের বায়ে খেলবে পরাণ ঢেলে
টল্‌বে রে মোর হৃদয়খানি রসের ভারে
সুধা তলে নিলীন্ হবে॥

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।)

আজ ১লা ভাদ্র। ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই দিনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্ত্তী সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার প্রতিপোষক। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক সময়ে ইহার তত্ত্বাবধান

করিতেন। কত সুলেখকের কত সুচিন্তিত প্রস্তাব ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা বড় কঠিন। এ দেশে দর্শনশাস্ত্র প্রকাশের প্রথম সময়ে ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ তাঁহার অনুবাদ সহ সাংখ্য দর্শন, পাতঞ্জল দর্শন এই পত্রিকায় প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম খণ্ড ইহাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রথম বক্তৃতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক সময়ে ইহার সম্পাদক ছিলেন। মহর্ষিদেবের রচনা ও ব্যাখ্যান ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, প্রভৃতি সুধীবর্গের সুচিন্তিত বিবিধ প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় তাড়িত বিজ্ঞান প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এই বিষয়ে ৺ সীতানাথ বসু ইহাতে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের অনেক লেখা পত্রিকার কলেবর বিভূষিত করিয়াছে। এই সেদিন শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কত মাসিক পত্র তত্ত্ববোধিনীর আদর্শে বাহির হইয়া লীলাসাঙ্গ করিয়াছে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী আজও সজীব। যে সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় তখন মাসিক পত্রিকার অসদ্ভাব ছিল। লোকে সোৎকণ্ঠে পত্রিকার প্রকাশকাল অপেক্ষা করিত। বলা বাহুল্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গভাষাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছে, লোকের রুচিকে সুপথে পরিচালিত করিয়াছে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ভাবকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এই পত্রিকায় ঋক্ বেদের প্রথম অংশ ভারতবর্ষে প্রথম বাহির হয়। মনীষী মোক্ষমুলার তাঁহার পুস্তকে পত্রিকায় প্রকাশিত ঋক্‌বেদের ও তাহার অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে মহর্ষিদেব ভাষ্যসহিত কয়েকখানি উপনিষদ প্রকাশিত করেন। রামমোহন রায়ের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থাবলীর অনেক অংশ ইহাতে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বিপুল বিক্রমে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার অনেক কাহিনী ইহাতে প্রকাশিত হয়। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের প্রচার বিবরণ ইহাতে বাহির হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় স্বদেশীয়ের প্রথম হিমালয়ভ্রমণ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ও তাহার অভিব্যক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভাবী বংশীয়গণের নিকটে তত্ত্ববোধিনী অমূল্য হইয়া থাকিবে।

এখনও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইতেছে। ইহাতে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, প্রাচীন ইতিহাস, বিভিন্ন ধর্ম্মের সমালোচনা ও তাহার ধারা স্থান পাইতেছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একদিকে আদি-ব্রাহ্মসমাজের ভেরী হইলেও নানা বিষয়ের গবেষণা ইহাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

পত্রিকা সম্পাদন কার্য্য বড় কঠিন। সম্পাদকের কার্য্য বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। সাধারণের রুচিকে পরিশুদ্ধ করিয়া তোলাই সম্পাদকের কর্ত্তব্য। লোকের রুচির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার অনুকূল বিষয় লিখিতে হইলে অনেক সময়ে প্রকৃত দায়িত্ব প্রতিপালন করা যায় না। বিশেষতঃ কোন ধর্ম্মসমাজের মুখপত্র চালাইতে হইলে তাহাতে কোন প্রকার লঘু বিষয় প্রকাশ করা আদৌ চলে না। তাহার উপর ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব কঠোর, পাঠক জ্ঞানাপন্ন না হইলে ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া তাঁহাদের তৃপ্তিদান অসম্ভব হইয়া উঠে। এই কারণে তত্ত্ববোধিনীর মত পত্রিকা চালান বিশেষ কষ্টসাধ্য। সাধারণকে কিছু না কিছু শিক্ষাদান করিতে হইবেই হইবে, সাধারণের রুচির দিকে দৃষ্টি না দিয়া কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে, ইহাই আমাদের লক্ষ্য। সকল সময়ে হয়তো আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্যক পালন করিয়া উঠিতে পারি না।

আর একটি কথা এই—বর্ত্তমানে যে যুগ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সত্য প্রচার করিয়া যাইতে হইবে অথচ কাহারও হৃদয়ে আঘাত দিলে চলিবে না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই জন্য ধীরতার সহিত পরিচালিত করিতে হয়। অন্য ধর্ম্মের গ্লানি করিতে আমরা চিরকালই সঙ্কুচিত। আমরা সত্যের দিকে সকলকে আকৃষ্ট করিতে চাই, প্রেমের সহিত সক-

লকে আহ্বান করিতে চাই, অকারণ বিবাদ বিসম্বাদে বা তর্কযুদ্ধে কাহারও সহিত প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। সম্রাট অশোকের অনুশাসন পাঠ করিতে করিতে তাঁহার দ্বাদশ আদেশে দেখিলাম "যে লোক আপনার ধর্ম্মকে আদর করে, এবং অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করে, সে নিজ ধর্ম্মকে বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করে। সেই জন্যই বলিতেছি যে সদ্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পদার্থ।" আমাদেরও সেই কথা। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিব, অথচ অপরের নিন্দাবাদ করিব না। অপর সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদে সঙ্কীর্ণতা নিজ ধর্ম্মকে স্পর্শ করে। অপরের ধর্ম্ম হইতেও লইবার যথেষ্ট সামগ্রী থাকে। বিপ্লবের স্রোতে পড়িয়া আমরা অনেক মূল্যবান দ্রব্য হারাইয়া ফেলি। আমরা এই প্রকার বিপ্লবের মধ্য হইতে সত্যধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি বলিয়াই আদিব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আদর ও সম্মানের পাত্র। সেই আদর ও সম্মান যাহাতে না হারাইয়া ফেলি, তদ্বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি চিরনিবদ্ধ থাকিবে। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

বিরলে।

(শ্রীনলিনী নাথ দাস গুপ্ত এম-এ, বি-এল)

দূরে যাই সংসারের কোলাহল ফেলে—
এখানে লাগেনা ভাল মোর।
বিরলে শান্তির কোলে দেহখানি ঢেলে
এ জীবন করে দেই ভোর।

মানুষের মুখপানে শুধু চেয়ে চেয়ে
হেথায় কাটাই নিশিদিন।
ঘৃণা লজ্জা ভয়ে গেল এ জীবন ছেয়ে,
প্রাণ গেল হয়ে লক্ষ্যহীন।

কে করেছে মোর পরে আজি অভিমান,
কে করেছে ক্রোধ এক তিল;
কে মোরে বলেছে মূর্খ কেবা বুদ্ধিমান,
কে বলেছে সরল, কুটিল;

এ সকল ভেবে আর পারিনা চলিতে,
এ যে লাগে অশান্তি বিষম।
এর চেয়ে দেখি গিয়ে একাকী নিভৃতে
প্রকৃতির শোভা মনোরম;—

শান্ত হবে হৃদি সেথা চিত্ত হবে স্থির,
আনন্দে ভরিয়া যাবে প্রাণ;
অন্তরে জাগিবে এক ভাব সুগভীর
দেবতার ছবি সুমহান।

উপদেশ।*

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)

অদ্যকার এই উৎসব দিনের পবিত্র প্রাতঃকালে আমরা সকল বন্ধুবান্ধবে এখানে একত্র মিলিত হইয়াছি। যদি উৎসবের মধুরঙ্গ আমাদিগকে এখানে আসিবার জন্য আহ্বান না করিয়া থাকে, তবে এই বিশেষ উপাসনা আমাদিগের নিকট নিষ্ফল। যদি উৎসবের আবশ্যকতা আমরা হৃদয়ে প্রকৃতরূপে উপলব্ধি না করিয়া থাকি তবে সকল আয়োজনই বৃথা, সকল উদ্যোগই অন্তঃসারশূন্য। প্রতি সপ্তাহে আমরা সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়া যে ঈশ্বরচর্চ্চা ঈশ্বরোপাসনা করিয়া আসিতেছিলাম, অদ্যকার এই সম্মিলনের দিনে তাহাতে নববল নবোৎসাহ সঞ্চারিত হইবে। প্রাত্যহিক জীবনে রসস্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় দৃঢ়তর অভ্যাস জন্মিবে। পরমেশ্বরের সত্যসুন্দর মঙ্গলময় ভাব উজ্জ্বলতররূপে উপলব্ধি করিবার শক্তি জন্মিবে

পরমেশ্বরের সৃষ্টি প্রণালী এতই রহস্যময়, সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমন এক আশ্চর্য্য কৌশলে বিচিত্র নিয়মে আবর্ত্তন করিতেছে, আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী হইতে আরম্ভ করিয়া তাবৎ সচেতন অচেতন পদার্থ, পর্ব্বত সমুদ্র হইতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম মনুষ্য,

* বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বিবৃত।

প্রকৃতই এক মহাজ্ঞান মহাশক্তির আশ্রয়ে কি ভাবে আশ্রিত রহিয়াছে, তাহা যুগযুগান্ত হইতে সকলেই বিস্মিত ও স্তব্ধভাবে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। কে এই বিরাট সৃষ্টির বিরাট কার্য্যপ্রণালীর রহস্য ভেদ করিবে!

পরমেশ্বর মনুষ্যকে জ্ঞান-রত্নের দ্বারা ভূষিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া মনুষ্য অপরাপর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ। মানব এই জ্ঞান দ্বারা সেই মহাজ্ঞানের অনুধাবন প্রথম অবস্থা হইতেই করিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে ঈশ্বরতত্ত্বের কত নব নব কাহিনী ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা যে জ্ঞানের কণা পাইয়াছি, তাহা লইয়া দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন ধর্ম্মোপদেশকের ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ঈশ্বরতত্ত্বের সেই ব্যাখ্যাই ঠিক,সেই প্রচারপ্রণালীই সঙ্গত, যাহা প্রাচীনকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা না করিয়া সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করে। সেই ব্যাখ্যানই যথার্থ আদরের, যাহা বহু প্রাচীন হইলেও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই ধর্ম্মই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম যাহা পুরাতন হইলেও সত্যে চিরনবীন। কত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ভারতের পূর্ব্বতন ঋষিগণ তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় উপনিষদ্ পত্রে রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিজ্ঞান তাহার উপর রেখাপাত করা দূরে থাকুক, তাহার উজ্জ্বলতা প্রচারে আনুকূল্য করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাচীন ও নবীনের এই মণিকাঞ্চন যোগ-ক্ষেত্র। মহাত্মা রামমোহন রায় এই উভয় ভাবের সংযোজক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহার প্রতিপোষক।

সাধুজীবনের আলোচনা ও সাধুসঙ্গ জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান সহায়। আমরা মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়াছি, আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য আদর্শ-মনুষ্যত্ব লাভ করা। আমাদের যত প্রকার সুকোমল বৃত্তি আছে, সে সকলের চূড়ান্ত বিকাশই আদর্শ মনুষ্যত্ব। ইহা যতই কেন দুঃসাধ্য হউক না, আদর্শ হিসাবে উহা রাখিতেই হইবে। একদিকে আশা, অন্যদিকে লক্ষ্য চ্যুতির আশঙ্কা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা ছাড়িলে চলিবে না।

পরলোক এবং আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারের উপরেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। যদি সমুদ্রমধ্যস্থ তরঙ্গ রাজির মত কেবল মাত্র মনুষ্যজীবনগুলি প্রকাশিত ও বিলীন হইয়াই পরিসমাপ্তি লাভ করিত, তাহা হইলে আত্মা ও পরলোক লইয়া এত মতামত ও তর্কসংগ্রাম চলিত না এবং বিবেক-চালিত নীতি-শাস্ত্রের সার্থকতা থাকিত না। আকাঙ্ক্ষা জীবনকে সজীব রাখে, আকাঙ্ক্ষাই জীবনের ভাব। সেই সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করে। পরলোকই আত্মার পরিতৃপ্তি লাভের ক্ষেত্র। পরমেশ্বর যখন মঙ্গলময়, তখন তাঁরই আশ্রয়ে আত্মার সদ্গতি হইবে। ইহ-জীবনে বিবেককে পদদলিত না করিয়া যদি সাধুপথ অবলম্বন করিয়া চলিতে পারি, তবে আত্মার সদ্গতি সুনিশ্চিত। প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া একাগ্রতার সহিত অগ্রসর হইলে গন্তব্য স্থানে শীঘ্রই উপনীত হওয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা যে প্রার্থনা করি, তাহার মধ্যে প্রার্থনা ভিন্ন আরও দুইটী বিষয় আছে যাহা আমাদের উন্নতির পথের সহায়। প্রথম নির্ভরেচ্ছা, দ্বিতীয় তাঁহাকে অনুভবের ভিতরে আনয়ন করা। তিনি সত্যস্বরূপ, আর সকলই অসত্য, অতএব তাঁহার উপর নির্ভর না করিয়া আর কাহার উপর নির্ভর করিব, এই চিন্তাই আমাকে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে বলিতেছে। 'তুমি চির-সহায় তুমি চির নির্ভর। তোমা হইতেই এই জগত সংসারের উৎপত্তি, তোমাতেই রক্ষা এবং তোমাতেই লয়, ইহাই তোমার পরিচয়। চন্দ্র সূর্য্য একসময়ে বিলীন হইয়া যাইবে। এই সুরম্য পৃথিবীর এক-সময়ে চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। কিন্তু তুমি অক্ষয় অব্যয়, তাই আমরা প্রার্থনা করি তোমার যে সত্য ভাব, তোমার যে মঙ্গল অব্যয় ভাব, একথা সকল কার্য্যে সমস্ত অবসরে যেন অনুধাবন করিতে পারি, এ শক্তি তুমি দান কর। সকল বিষয়ে আমরা সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান, একমাত্র তুমিই সন্দেহের অতীত। যেখানে সন্দেহ, সেইখানেই আলোকের অভাব। যেখানে আলোকের অভাব সেইখানেই তোমার অভাব। তাই প্রার্থনা করি তোমার সত্তায় সকল সন্দেহ সকল ধন্ধা সকল অন্ধকার দুরীভূত হইয়া যাক।' পরমেশ্বরের সত্তা সকল বিষয়ে উপ-

লব্ধি করিতে পারিলে নিঃসংশয়তার আলোকে মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেইজন্য আমাদের প্রার্থনা 'তমসোমা জ্যোতির্ম্ময়, তোমার অভাববোধই দারুণ অন্ধকার; মোহের মধ্যে পড়িয়া সংশয়াচ্ছন্ন চিত্ত তোমার আলোকে মুক্ত হয়, এ কথা যেন আমরা সকল হৃদয় দ্বারা প্রতিনিয়ত হৃদয়ঙ্গম করি। তুমি আমাদের সেই সৎবুদ্ধি দান কর। সংসারের ধূলিকণা লইয়া আমরা যতই ব্যস্ত থাকিব, অসত্যের দিকে আমরা ততই ধাবমান হইব। ক্ষণভঙ্গুর বিষয় লালসায় মন যতক্ষণই পরিপূর্ণ থাকিবে, তাহার সহিত সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠতর হইবে, মৃত্যুর করাল ব্যাদানের ভিতরে ততইআমরা প্রবিষ্ট হইব।'

মৃত্যুর অপর নাম বিচ্ছেদ। যাহার সহিত সম্বন্ধের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহিত বিচ্ছেদ কালে আমরা মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করি। লোকলোকান্তরে যিনি আমাদের সঙ্গী, যিনি আমাদের বিধাতা, যিনি আমাদের লক্ষ্য, তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ কোনও কালে হইবার নহে এবং হওয়া অসম্ভব। তাঁহার এই পরিচয় অন্তর মধ্যে নিয়ত জাগরূক থাকিলে মৃত্যুর ভীষণতা আপনিই কমিয়া আইসে। দুর্ব্বল মনুষ্য যখন সাংসারিক পাঁচ রকমের ধাঁধাঁয় পড়িয়া ইহ সংসারের নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হয়, তখনই মৃত্যুর ভৈরবমূর্ত্তি তাহাকে ভীত করিয়া ফেলে। সেইজন্য আমরা অন্তরের বল সঞ্চয়ের জন্য প্রার্থনা করি "মৃত্যোর্মামৃতং গময়" 'সংসার অনিত্য, তুমিই মরণের অতীত, যুগ-যুগান্তে লোকলোকান্তরে একমাত্র তুমিই দেদীপ্যমান, আমাকে তোমার অভিমুখীন কর। তোমার সহিত ঘনিষ্ঠতায় বিচ্ছেদের ভয় নাই। তুমি অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্তু, তোমার ধ্বংস নাই। তোমার সহিত সকল প্রকারে যোগযুক্ত হইয়া থাকাই মনুষ্যত্ব। তুমিই একমাত্র অমর, আর সকলই ধ্বংসশীল, এ সত্য যেন হৃদয়ে সম্যকরূপে প্রতিভাত হয়। তুমি আমাদিগকে এই ধারণার শক্তি প্রদান কর।'

আমরা পরলোকে বিশ্বাস পোষণ করি। মনুষ্যত্বের বিকাশ আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোক পরলোক এই বিকাশের ক্ষেত্র। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এখানে যতটুকু পারি, কর্ত্তব্যের প্রতি আমাদের চেষ্টাকে নিহিত করিতে হইবে। জীবনের একমুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয় করিবার নহে। আত্মা উন্নতিশীল, সেই উন্নতির অভিমুখে আমাদিগকে অনুক্ষণ ধাবিত হইতে হইবে। কোলাহলের মধ্যে থাকিলে চলিবে না। মোহ-তিমির যখন দশদিক আচ্ছন্ন করিবে, তখনই ভূমা পরমেশ্বরের সত্তা হৃদয়ে অনুভব করিবার চেষ্টা করিব। তিনি স্বপ্রকাশ, কেননা তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ। সত্যস্বরূপ যখন তিনি, তখন সকল সময়ে সকল স্থানে তাঁহার সত্যভাব অনুভব করিতে হইবে। ইহাতেই হৃদয়ের যাবতীয় অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবে, হৃদয় শান্তি পাইবে। অজ্ঞানতাই বিষাদের কারণ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, এ ভাবটী আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেক কাজ কর্ম্মে বুঝিবার ও সাধনা করিবার চেষ্টা করিলেই হৃদয়ে কোন বিষয় হইতেই আঘাত লাগিবে না। তিনি অনন্ত তিনি ভূমা। যাহা সীমা-নির্দ্দিষ্ট তাহাই ক্ষয়-শীল। যিনি অসীম অনন্ত তিনি ক্ষয়ের অতীত, সেই জন্যই তিনি অমৃতস্বরূপ। অভ্যাস যোগে পরমেশ্বরের এই প্রকার ভাব অনুভব করা চাই। ব্রহ্মোপাসনার প্রথম মন্ত্র এই যে তিনি সকলের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। তিনি অগ্নিতে, তিনি জলেতে, তিনি ওষধিতে সকলের মধ্যে প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। সেইজন্যই তিনি অণোরণীয়ান্, অন্যদিকে তিনি মহতো মহীয়ান্। তাঁহার এই ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমানতা আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করিবার চেষ্টাই তাঁহার সাধনা। এইভাবে সাধনা করিলে তাঁহার সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। স এবাধস্তাৎ স পুরস্তাৎ সপশ্চাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ, মনে হইবে আমরা তাঁহার ক্রোড়ে সমাসীন। সংসারের শোক তাপ সংশয় মোহ বিচ্ছেদ কিছুতেই ক্ষুণ্ন হইব না। প্রাণের মধ্য হইতে আপনা আপনিই ধ্বনিত হইবে "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং" 'তোমার মুখ রুদ্র-মুখ নহে, প্রসাদপূর্ণ অর্থাৎ প্রসন্ন; আমার আত্মার সদ্গতির জন্যই তুমি সময় সময় মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। অতএব তোমার সে মুখ রুদ্র-মুখ নয়। তুমি আমাকে উদ্ধার করবার

জন্য, হে আনন্দময়! রুদ্রমূর্ত্তির আবরণ পরিয়া, আমার সমুখে আবির্ভূত হও। তোমার সে মুখ সত্যসত্যই প্রসন্ন মুখ, অন্তরের মধ্যে জ্ঞানে তাহা উপলব্ধি করি।'

আজ এই উৎসবের শুভদিনে হে পরমেশ্বর তোমার নিকট আমাদের সকলের এই ব্যাকুল প্রার্থনা হউক যে অহরহ তুমি আমাদের শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, তুমি যে স্বপ্রকাশ এ কথা প্রতিনিয়ত অনুভব করিবার শক্তি দাও।

তাঁরে জানা।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পড়ে আছি একপ্রান্তে
হয়ে ম্রিয়মান
দীনহীন অতি।
ইচ্ছা হয় তাঁরে জান্‌তে
কে দিবে সে জ্ঞান?
আমি মূঢ়মতি॥

চারিধারে দেখি চেয়ে—
যেন অন্ধকার
সব মনে হয়।
অন্ধকারে আছে ছেয়ে
পরাণ আমার—
মনে কি সংশয়!

এ অজ্ঞান অন্ধকারে
জাগিবে আমার
কি সুখ স্বচ্ছন্দ?
তাঁরে যে জানিতে পারে
কি আনন্দ তার—
তার কি আনন্দ॥

জড় ও জীব।

(শ্রীজগদানন্দ রায়)

রাজারা তাঁহাদের রাজ্যের সীমান্তে কড়া পাহারা বসাইয়া রাখেন,—কোন্ রাজার অধিকারে সীমান্ত প্রদেশের কতটা স্থান রহিল, তাহা পাহারাওয়ালারা নির্দ্দিষ্ট রাখে। সীমান্তরেখার বাম পার্শ্বস্থ ভূমি যে রাজার অধিকারভুক্ত, দক্ষিণের ভূমিতে সে রাজার অধিকার নাই; বামের ও দক্ষিণের আইন-কানুন শাসন পদ্ধতি এবং ভাষাও হয়ত ভিন্ন। ইহাকেই বলে মানুষের হাতে গড়া কৃত্রিম বিভাগ। কিন্তু প্রকৃতির পাহারাওয়ালারা রাজার পাহারাওয়ালাদের খবরদারি মানে না,—একরাজ্যের বর্ষণশীল মেঘ সীমান্তের গণ্ডী ভাঙিয়া আর এক রাজ্যে গিয়া সমভাবেই বারিপাত করে, নদীও সীমান্তরেখা ভেদ করিয়া উভয় রাজ্যকে সমভাবে সরস রাখে। রাজারা যেমন কৃত্রিম গণ্ডী কাটিয়া ভূতলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকেরাও প্রায় সেইরকমেই পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে জড়, প্রাণী ও উদ্ভিদ্ এই তিনটা বৃহৎ ভাগে ভাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি বৈজ্ঞানিকদিগের এই কৃত্রিম বিভাগ মানিয়া চলে নাই। কোন জিনিষকে ভাল করিয়া না বুঝিয়া একটা কিছু করিয়া ফেলিলে ভবিষ্যতে তাহা লইয়া গোলযোগে পড়িতে হয়। পূর্ব্বেকার বৈজ্ঞানিকগণ সৃষ্টিতত্ত্বটাকে ঠিক বুঝিতে পারেন নাই,—তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, আমরা সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকে যেমন বাহির হইতে প্রাণী উদ্ভিদ ও জড় এই তিনটি স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে দেখি, স্বয়ং বিধাতা বুঝি সেই সকল মূর্ত্তি দিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কাজেই ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই বিভাগের রেখাগুলি ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এখন বুঝিতেছেন, আকৃতিতে পার্থক্য থাকিলেও উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রকৃতিতে স্বতন্ত্রতা অতি অল্পই আছে,—অতএব রেখা টানিয়া প্রাণীকে উদ্ভিদ হইতে পৃথক করা বৃথা। জীব ও জড়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা যে রেখা টানিয়াছিলেন, তাহাও ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। প্রাচীনেরা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্য্যগুলিকে ঘোর রহস্যের অন্ধকারে আবৃত বলিয়া মনে করিতেন, বিজ্ঞানের আলোক যে কোন কালে সেই অন্ধকার নষ্ট করিতে পারিবে, তাহা তাঁহারা অনুমান করিতে পারেন নাই। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে রহস্যের অন্ধকার ধীরে ধীরে তরল হইতে আরম্ভ

করিয়াছে; বৈজ্ঞানিকেরা অস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিতেছেন যে জীবের জীবন জড়ের জড়ত্বেরই রূপান্তর। যাঁহারা ঘোর জড়বাদী ছিলেন এবং জড়ধর্ম্মের আলোচনাই যাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল, তাঁহারাও অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছেন যে জড়বস্তু বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া সময়ে সময়ে এ প্রকার কার্য্য দেখায় যাহাকে প্রাণীর জীবনের কার্য্য বলিয়া মনে হয়। জড়বস্তু স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে এবং শক্তি প্রয়োগ না করিলে তাহার স্থানচ্যুতি ঘটে না, এই সকল বিশ্বাসই বৈজ্ঞানিকদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। জলে মিছরির টুকরা রাখিয়া দিলে তাহা যে সজীব বস্তুর ন্যায় আপনা হইতেই সমস্ত জলে গুলিয়া যায় এবং চিনির রসে দানা বাঁধিতে থাকিলে জীবদেহের কোষের সৃষ্টির মত তাহাতে যে সহস্র সহস্র দানা আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়, জড়ের এই সকল সুপরিচিত জীবসুলভ ধর্ম্ম নূতন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

এক হইতে বহু বিচিত্র বস্তুর উৎপত্তি করা, সুসম্বদ্ধভাবে নিজেদের প্রকৃতি অক্ষুন্ন রাখা এবং দেহের নির্দ্দিষ্ট অংশ দিয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করা,—এই তিনটিই জীবের জীবনের স্থূল ও প্রধান লক্ষণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণায় প্রাণহীন জড়বস্তুতে এই কয়েকটি জীবলক্ষণ কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমরা একে একে আলোচনা করিব।

পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিকদিগের একটি গুরুতর সংস্কার ছিল যে আমাদের দেহের ভিতরে যে সকল রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা আমাদের পরীক্ষাগারের রাসায়নিক পরিবর্ত্তনগুলির সহিত এক নয়। "জীবনী শক্তি" নামে এক মহাশক্তিতে তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। তাই তাঁহারা বলিতেন—প্রাণিদেহে যে পরিবর্ত্তন এবং যে ভাঙাগড়া চলে, তাহা সেই জীবনী-শক্তিই চালায়; এবং আমরা যখন পরীক্ষাগারে বসিয়া নানা জড়বস্তুর সংযোগ বিয়োগ দেখাই তখন রাসায়নিক শক্তি আসিয়া ঐ সকল কার্য্য দেখায়। জীবনী শক্তি এবং রাসায়নিক শক্তিকে তাঁহারা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক শক্তি বলিয়া মানিতেন। জীবনী শক্তির কার্য্য কারণ আবিষ্কার করিয়া যে কোন দিন মানুষ তাহার মূলতত্ত্ব পরীক্ষাগারে দেখাইতে পারিবে, প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ তাহাতে মোটেই বিশ্বাস করিতেন না।

গত কুড়ি পঁচিশ বৎসর মধ্যে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বারথেলো (Berthelot) ও তাঁহার শিষ্যবর্গ "জীবনী শক্তি" নামক ঐ অদ্ভুত বিশ্বাসের মূলে কি প্রকারে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠক অবশ্যই জানেন। জীবনী শক্তির সাহায্যে প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে যে ইউরিয়া (urea) এবং নানাজাতীয় গন্ধদ্রব্য উৎপন্ন হয়, বারথেলো সেই সকল সামগ্রীকেই সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়া সকলকে অবাক করিয়াছিলেন। জীবগণ কেবল তাহাদের দেহের পোষণোপযোগী পদার্থই প্রস্তুত করে না,—যাহা শরীর রক্ষার জন্য অপ্রয়োজনীয় তাহা উহারা নানা আকারে দেহ হইতে নির্গত করে। পূর্ব্বোক্ত ইউরিয়া এবং তৈলময় গন্ধদ্রব্য ও নির্য্যাসাদি প্রাণী ও উদ্ভিদ্ দেহের আবর্জ্জনা মাত্র। প্রোটীন্ (protein) নামক যে পদার্থ দিয়া জীবদেহ মাত্রই গঠিত, তাহা বারথেলো সাহেব কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে পারেন নাই, এমন কি স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা জীব-দেহ হইতে বিচ্ছিন্নও করিতে পারেন নাই; কিন্তু তথাপি জীব-দেহজাত অপর দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিয়া তিনি যে অসাধ্য-সাধন করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বারথেলো সাহেব যে প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহার শত শত শিষ্য আজও সেই প্রক্রিয়ায় অপর অপর জৈব বস্তু প্রস্তুতের জন্য গবেষণা করিতেছেন, এবং তাঁহাদের গবেষণা সার্থক হইতেছে।

যাহাই হউক, নিজের দেহ হইতে বিচিত্র নূতন পদার্থের উৎপত্তি করা কেবল জীবেরই বিশেষত্ব বলিয়া যে একটা বিশ্বাস ছিল, বারথেলো ও তাঁহার শিষ্যবর্গের পূর্ব্বোক্ত গবেষণার ফলে তাহার মূল শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। জনসাধারণ বুঝিয়াছিল যে, যে সকল বস্তুকে আমরা প্রাণহীন জড় বলি, তাহা রাসায়নিক শক্তিতে জীবদেহজ পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারে। বারথেলো সাহেবের

আবিষ্কারের পরে অপর বৈজ্ঞানিকেরা স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া ক্রমে যে সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা জড় ও জীবের ভিতরকার স্বতন্ত্রতা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া দিতেছে।

যাঁহারা আধুনিক শারীর বিজ্ঞানের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদিগের নিকটে প্রাণিদেহের ভিতরকার Enzymes নামক পদার্থগুলির পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই জিনিসগুলিই শারীর-বিজ্ঞানের মতে জীবন ক্রিয়ার প্রধান অবলম্বন। যেমন এক বিন্দু দম্বল বা সাঁজা একমণ দুগ্ধকে দধিতে রূপান্তরিত করে, এন্‌জাইম-গুলি অতি অল্প পরিমাণে দেহের ভিতরে থাকিয়া ঠিক সেইপ্রকারে শরীরস্থ নানা পদার্থের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। যাহাদিগকে আমরা জীবনের ক্রিয়া বলি, তাহাদের প্রত্যেকের মূলে শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ এক-এক জাতীয় এন্‌জাইমের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। উদরস্থ খাদ্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেহস্থ করা এবং দেহস্থ অনাবশ্যক বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়া বর্জ্জন করা প্রভৃতি সকল কার্য্যের মূলেই ঐ এন্‌জাইম বর্ত্তমান। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ এন্‌জাইমের কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু জিনিষটা প্রাণিদেহে কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতে পারেন নাই। খুব চাপাচাপি করিয়া ধরিলে তাঁহারা বলিতেন, প্রাণীর "জীবনী-শক্তি" সেগুলির উৎপাদক,—সুতরাং তাহাদের উৎপত্তিরহস্য মানুষের বুদ্ধির অগম্য। সম্প্রতি ব্রেডিগ্ (Bredig) এবং বার্ণেক্ (Berneck) প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই রহস্যের মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন যে আমাদের সুপরিচিত প্রক্রিয়ার জড়-বস্তু দিয়াই এন্‌জাইমের অনুরূপ পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

যে পরীক্ষায় এন্‌জাইমের অনুরূপ বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অতি সহজ। পরীক্ষকগণ প্লাটিনম্ এবং স্বর্ণ বা রৌপ্যের দুইটি দণ্ড পরিষ্কার জলের মধ্যে গায়ে গায়ে ঠেকাইয়া ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং দণ্ড দুইটির দুই প্রান্ত ব্যাটারির তারের দুই প্রান্তে সংলগ্ন করিয়া প্রবল বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রবাহ দণ্ডদুটির ভিতর দিয়া চলিয়াছিল। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা দণ্ড দুইটিকে জলের মধ্যেই একটু তফাৎ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনও বিদ্যুৎ-প্রবাহ জলের ব্যবধান ভেদ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিষ্কার জল ধাতুদণ্ডের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকায় ঘোলা হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্র অতি ক্ষুদ্র জিনিসকেও বড় করিয়া দেখায়, কিন্তু জলমিশ্রিত ধাতুকণিকাগুলি এত ক্ষুদ্রাকার গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও সেগুলিকে দেখা যায় নাই। এই ধাতুকণাতেই পরীক্ষকগণ এন্‌জাইমের অনুরূপ কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রক্ত যেমন জমাট বাঁধে, এই ধাতুকণিকাময় জলও তাপপ্রয়োগে এবং লবণ, অম্ল ও ক্ষার পদার্থের যোগে জমাট বাঁধিয়াছিল। কেবল ইহাই নহে,—এন্‌জাইম যেমন অত্যল্প পরিমাণে প্রাণিদেহে থাকিয়া দেহে নানা পরিবর্ত্তনের সূচনা করে, ঐ পদার্থটিও সেই প্রকার অত্যল্প পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া চিনিকে বিশ্লিষ্ট করিয়াছিল এবং সুরাকে (Alcohol) এসেটিক এসিডে (Acetic Acid) রূপান্তরিত করিয়াছিল। প্রাণিদেহ বিষের সংযোগে মৃত হয়, এবং প্রাণিদেহজ পদার্থেরও ক্রিয়া বিষের স্পর্শে লোপ পায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধাতু হইতে উৎপন্ন পূর্ব্বোক্ত কণিকাগুলিরও ক্রিয়া বিষপ্রয়োগে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। খাঁটি ধাতুজ পদার্থের সহিত জৈব পদার্থের এই ঐক্য উপেক্ষার বিষয় নয়। বিধাতা প্রাণীর জীবনের কার্য্য চালাইবার জন্য যে পৃথক শক্তির সৃষ্টি করেন নাই, তাহা ইহাতে বেশ বুঝা যায়। জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমরা একদিন জড়ে এবং জীবে একই মহাশক্তির প্রত্যক্ষ লীলা দেখিতে পাইব।

কোনো জীবদেহ হইতে নূতন আর একটি জীবের জন্ম হইলে উভয়ের আকারগত ঐক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাকেই প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ Organisation বলিয়াছেন। আমের বীজ হইতে আম গাছের উৎপত্তি, গাভীর গর্ভ হইতে গোবৎসের জন্ম প্রভৃতি বংশানুক্রম (Heredity) এই ব্যাপারেরই অন্তর্গত। তা ছাড়া সন্তানের দেহে মাঝে মাঝে যে মাতাপিতার দেহের

কতকগুলি ধর্ম্ম প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তাহাও এই ব্যাপারের অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, বৈজ্ঞানিকগণ জড় হইতে জড়ের উৎপত্তিতে ঠিক এই প্রকার বংশানুক্রমের পরিচয় গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তবে প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের প্রত্যেক কোষ যেমন নিজেরই অনুরূপ কোষ উৎপন্ন করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে, দানাদার (Crystalline) জড়পদার্থে কতকটা সেই প্রকারেই দানার উৎপত্তি দেখা গিয়াছে।

মিছরি তুঁতে ফটকিরি এবং লবণ প্রভৃতি দানাদার পদার্থমিশানো জলে কিপ্রকারে দানার উৎপত্তি হয়, জনৈক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক (von Schron) যন্ত্রসাহায্যে তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দানা বাঁধিবার সময়ে মিশ্র তরল পদার্থে হঠাৎ একটা গোলাকার পৃথক অংশ নজরে পড়ে এবং উহার ভিতরে জালের ন্যায় কতকগুলি সুতা দেখা দেয়। ইহার পরে বলের (ball) ন্যায় ঐ গোলকের অংশ অঙ্গুরীয়াকার হইয়া দাঁড়ায় এবং ইহা চেপ্‌টা হইয়া ক্রমে দুইটি সুস্পষ্ট কোণের উৎপত্তি করে। এই দুই কোণের মধ্যেই দানার অক্ষরেখা থাকে। প্রাথমিক দানাটি এই প্রকারে উৎপন্ন হইলে তাহা জলের ভিতরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। জীবের দেহস্থ কোষের উৎপত্তিও অনেকটা এই প্রকারেই হয়। তা ছাড়া জীবকোষ যেমন কখন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এবং কখন নিজের গায়ে নূতন কোষ উৎপন্ন করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে, জড় পদার্থের দানাগুলিও অবিকল সেই প্রকারেই অসংখ্য নূতন দানার উৎপত্তি করে। সজীব প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে কোষের সৃষ্টি এবং নির্জীব মিছরী বা লবণের জলে দানার উৎপত্তির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ঐক্যের কথাটি উপেক্ষার বিষয় নয়। দানাদার পদার্থে দানার উৎপত্তি এবং এক জীবকোষ হইতে বহু কোষের উৎপত্তির মূলে প্রাকৃতিক শক্তির একই প্রকার কার্য্য বর্ত্তমান আছে কিনা, তাহা চিন্তার বিষয়।

পদার্থবিদ্যার "সংমিশ্রণ" অর্থাৎ Diffusion নামে একটা ব্যাপার আছে। যে সকল তরলপদার্থ পরস্পর মিশ খায়, তাহাদেরি মধ্যে এই গুণটি দেখা যায়। সুরা-সার (Alcohol) জল অপেক্ষা লঘুতর হইলেও পরস্পর মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু জল ও তৈল পরস্পর মিশ্রিত হয় না। সুরা-সার ও জলের মধ্যে সংমিশ্রণ গুণ দেখা যায়, কিন্তু জল ও তৈলের মধ্যে তাহা থাকে না। কিছু সুরা-সার রঙিন্ করিয়া ধীরে ধীরে জলের উপরে ঢালিয়া দাও,—সুরা-সার জলের তুলনায় লঘু, এজন্য তাহা জলের উপরেই দাঁড়াইয়া থাকিবে। কিন্তু অধিকক্ষণ ইহাদের এই অবস্থা দেখা যাইবে না,—রঙিন্ সুরা-সার ক্রমে জলে প্রবেশ করিয়া সমস্ত পদার্থটিকে রঙিন্ করিয়া দিবে। এই প্রকার ব্যাপারগুলিকেই বৈজ্ঞানিকগণ Diffusion অর্থাৎ সংমিশ্রণ বলেন। দুই তরল পদার্থের আর এক প্রকার মিশ্রণ আমাদের জানা আছে। ইহাকে বৈজ্ঞানিকেরা osmosis অর্থাৎ অন্তঃপ্রবাহ বলেন। কোন দুইটি লঘু ও গুরু তরল পদার্থ লইয়া ইহার পরীক্ষা করিতে হয়। মনে কর, কোন পাত্রের মাঝে সূক্ষ্ম চামড়ার ব্যবধান রাখিয়া যেন পাত্রটিকে দুইটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করা গেল,—এক প্রকোষ্ঠে খাঁটি জল এবং অপর প্রকোষ্ঠে চিনি ও গুড়মিশ্রিত জল রাখা গেল। কিছুক্ষণ পরে পাত্রটি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, চামড়ার সচ্ছিদ্র ব্যবধান ভেদ করিয়া চিনি ও গুড়ের রস ধীরে ধীরে জলের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছে।

তরল পদার্থের পূর্ব্বোক্ত দুইটি ধর্ম্ম প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্য্যে নিয়ত দেখা যায়। শুষ্ক বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে, সেটিকে সরস মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখিতে হয়। মৃত্তিকার রস বীজে প্রবেশ করিয়া সেখানে সংমিশ্রণ ও অন্তঃপ্রবাহের সূচনা করে। প্রাণীর দেহের ভিতরে সচ্ছিদ্র চামড়ার ব্যবধানের অভাব নাই। এই সকল ব্যবধান ভেদ করিয়া যাহা অনাবশ্যক তাহা দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায় এবং যাহা দেহরক্ষার জন্য আবশ্যক তাহা দেহেই থাকিয়া যায়। বাহির হইতে এই সকল কার্য্য হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বুঝি "জীবনী শক্তিই" দেহের প্রয়োজন বুঝিয়া তাহা চালায়; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে,—নির্জীব পদার্থের মধ্যে তরল বস্তুর যেমন মিশ্রণ ও প্রবাহ চলে, সজীব দেহের সেইপ্রকার কাজকেই জীবনী শক্তির ফল বলিয়া আমাদের ধাঁধাঁ লাগে।

বাহিরের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া উঠা জীব-দেহের একটা প্রধান ধর্ম্ম। নির্জ্জীব জড় পদার্থের এই ধর্ম্মটি একবারে নাই বলিয়া এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। এই ব্যাপারেও জড় ও জীবের মধ্যে কতকটা মিল ধরা পড়িয়াছে। আমাদেরই স্বদেশবাসী মহাপণ্ডিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ইহার আবিষ্কারক। বসু মহাশয়ের আবিষ্কারের একটু আভাস দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সরল লোহার স্প্রিং (Spring) জোর করিয়া বাঁকাইয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহা জোর করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইহা কেবল লোহারই ধর্ম্ম নয়, সজীব প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহেরও কোনো অংশকে এই প্রকারে বিকৃত করিলে তাহাও পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর যে সকল ধর্ম্ম প্রাণী, উদ্ভিদ ও নির্জ্জীব জড়পদার্থের সাধারণ সম্পত্তি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সেগুলি লইয়া আলোচনা করেন নাই; যে ধর্ম্মগুলি জীবেরই বিশেষত্ব বলিয়া পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়া আসিতেছেন তাহারই অনুরূপ কিছু নির্জ্জীব পদার্থে দেখা যায় কি না ইহাই তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সজীব মাংসপেশীতে আঘাত দিলে তাহা সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু মৃত মাংসপেশীতে হাজার উত্তেজনা দিলেও তাহাকে সঙ্কুচিত হইতে দেখা যায় না। এই কারণে বাহিরের উত্তেজনায় সঙ্কুচিত হইয়া সাড়া দেওয়াকে প্রাণী ও উদ্ভিদের সজীবতার একটি লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বসু মহাশয় ধাতুপিণ্ডে আঘাত দিয়া বৈদ্যুতিক উপায়ে সাড়ার অস্তিত্ব ধরিতে পারিয়াছেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়া প্রাণীমাত্রেই দেখা যায়। সজীব ভেকের মাংসপেশীতে যদি বারবার আঘাত করা যায়, তবে প্রথম আঘাতগুলিতে পেশী সঙ্কুচিত হইয়া বা বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন করিয়া সাড়া দেয়, কিন্তু আঘাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে ঐ সাড়া মৃদুতর হইয়া ক্রমে লোপ পাইয়া যায়। তখন হাজার আঘাত দিলেও মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় না বা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে না,—ইহার এই আড়ষ্ট ভাবটাকে ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই ব্যাপারটি কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব নয়,—উদ্ভিদেও ইহা দেখা যায়। মুলা বা কপির ডাঁটায় পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে তাহাও অবসন্ন হইয়া ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত হয়; এই অবস্থায় শত আঘাতেও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অবসন্ন বা ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে বিশ্রামের সময় দিলে তাহারা সুস্থ হইয়া উঠে,—তখন তাহাদের দেহে নিয়মিত আঘাতে নিয়মিত সাড়া প্রকাশ পাইতে থাকে। প্লাটিনম্ ধাতুতে পুনঃ পুনঃ আঘাত দিয়া বসু মহাশয় তাহাতেও অবসাদের লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। টিন অর্থাৎ রাঙ্ শ্রমসহিষ্ণু প্রাণীর ন্যায় অল্প আঘাতে অবসন্ন হয় নাই—কয়েক দিন ধরিয়া পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা প্রয়োগের পরে তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু প্রাণী ও উদ্ভিদের ন্যায় ধাতুও বিশ্রামে সুস্থ হইয়াছিল।

বিষ এবং নানা প্রকার ঔষধ প্রাণীর দেহে কি প্রকার কাজ করে তাহা আমরা সকলেই জানি। আচার্য্য বসুমহাশয় ধাতুর উপরে ঐ সকল বস্তু প্রয়োগ করিয়া একই ফল পাইয়াছেন। পোটাসিয়ম্ ব্রোমাইড্ প্রাণীর অনুভূতি হ্রাস করে; ধাতুতেও ইহা প্রয়োগ করিয়া তিনি অবিকল সেই লক্ষণ দেখিয়াছেন। ক্লোরোফরম্ ক্লোরাল্ ও ফরমালিন্ প্রভৃতি দ্রব্য প্রাণীর সংজ্ঞা লোপ করে, কিন্তু কিছু কাল প্রতীক্ষা করিলে এই অবস্থা দূর হইয়া যায়। উদ্ভিদ্ ও ধাতুতে ঐ সকল দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া তিনি ঠিক্ ঐ রকমই ফল পাইয়াছেন। তীব্র বিষ প্রয়োগে প্রাণীর সংজ্ঞা ও অনুভবশক্তি চলিয়া যায়, দীর্ঘকাল বিশ্রামের অবকাশ দিলেও তাহারা পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা আর ফিরাইয়া পায় না,—ইহাই মৃত্যু। পোটাসিয়ম্ সাইনাইড্ এবং করোসিভ সব্লিমেট্ প্রভৃতি তীব্র বিষ ধাতুপিণ্ডে প্রয়োগ করিয়া তিনি ধাতুতেও অসাড়তার লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন,—এই অসাড়তা ধাতুপিণ্ডে মৃত্যুর ন্যায়ই স্থায়ী হইতে দেখা গিয়াছিল।

বিধাতা প্রাণিজাতিকে যত সম্পদ্ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বোধ হয় দৃষ্টিশক্তিই সর্ব্বপ্রধান। কাজেই সাধারণ জড়শক্তির সহিত প্রাণীর দৃষ্টিশক্তির কোনো সম্বন্ধ নাই, এই কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিকেরা এপর্য্যন্ত তাহাই মনে করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেন,—দৃষ্টি

শক্তি খাঁটি জীবনীশক্তির বিকাশ, সুতরাং ইহার তুলনা জড়জগতে দুর্লভ। কিন্তু এই বিশ্বাসও টলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র রৌপ্যময় একটি কৃত্রিম চক্ষুকোটর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ভিতরটাতে ব্রোমিনের বাষ্প লাগাইয়াছিলেন। তারপরে প্রাণীর অক্ষি-স্নায়ু (optic nerve) যেমন চক্ষুর ভিতর ও বাহিরের যোগ রক্ষা করে, ধাতুনির্ম্মিত তার দিয়া তিনি কৃত্রিম চক্ষুর ভিতর ও বাহির সেইপ্রকার সংযুক্ত রাখিয়াছিলেন। আলোকপাত করায় কৃত্রিম-চক্ষুতে বিদ্যুতের প্রবাহ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং তাহার হ্রাসবৃদ্ধি পূর্ব্বোক্ত তার-সংলগ্ন তড়িৎমান যন্ত্রে (galvanometre) দেখা গিয়াছিল। ভেকের চক্ষুতে আলোকপাত করিলে তাহাতে যে বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের জানা আছে। আচার্য্য বসু মহাশয়ের কৃত্রিম চক্ষুর বিদ্যুৎপ্রবাহকে অবিকল ভেকচক্ষুর প্রবাহের ন্যায় দেখা গিয়াছিল। আলোকপাতে প্রাণীর চক্ষুতে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহাই আমাদের দৃষ্টিশক্তির মুল, কারণ উহাই অক্ষি-স্নায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আমাদের মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে উত্তেজিত করে এবং তাহাতেই দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে।

আমরা এই প্রবন্ধে যে সকল পরীক্ষাসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ব্যাপারের আলোচনা করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন, জীব ও জড়ের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, আধুনিক বিজ্ঞান তাহা এখনো লোপ করিতে পারে নাই ; কিন্তু সেই ব্যবধান যে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের যে সকল কার্য্য রহস্যাবৃত ছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে এখন তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে ; কাজেই "জীবনীশক্তি" নামক এক কাল্পনিক জিনিসের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া জীবনের কার্য্যের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। বৈজ্ঞানিকগণ এখন অন্তরে অন্তরে বুঝিতেছেন, জড়শক্তি ও জীবনীশক্তি মুলে একই ব্যাপার। উভয়ই প্রকৃতির চিরনির্দ্দিষ্ট কঠোর নিয়মের অনুগত হইয়া চলে।

ভগবৎ-বিশ্বাস।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঈশ্বর ! তুমিই জানি সকলের আদি—
ইহাই বিশ্বাসি' আমি একেশ্বরবাদী।
তুমি এক অদ্বিতীয় সকলের মূল—
ইহাই বিশ্বাসি' আমি দূরি মিথ্যা ভুল ;
বিচিত্র ভাবের মাঝে সামঞ্জস্য পাই—
কণিকা বিশৃঙ্খলতা কোথাও যে নাই।
আমাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, বিবেক—
অনেক বিষয়, মধ্যে তুমি মন্ত্র এক।
আশ্চর্য্য মহিমাময় তুমি চির সত্য,
বিশ্বচরাচরে কর চির আধিপত্য।
তব ভাব হতে জাগে সত্য সমুদয়,
তোমারে জানিলে ঘুচে সকল সংশয়।
বিশ্বাসে তোমায়, জ্ঞানে জেগে ওঠে প্রাণ,
কেটে যায় পাপ, জাগে পুণ্য পরিত্রাণ ॥

সাংখ্যে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন শাস্ত্রী)

জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল যেরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় এ দর্শন খানি বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় Idealism মতের পথপ্রদর্শক। আমরা একথা বলিতেছি না যে ইয়ুরোপীয় Idealism সাংখ্যদর্শন অবলম্বনে হইয়াছে। বলার উদ্দেশ্য এই যে, সাংখ্যকার যে পথের পথিক, ইয়ুরোপীয় Idealistic সম্প্রদায়ও সম্পূর্ণভাবে না হউক কতকটা সেই পথে চলিয়াছেন। সাংখ্যকার যে জগতের বাহ্যিক অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না ইহা সাংখ্য দর্শনের মতটী সম্যকরূপে ধারণা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা সেই সম্বন্ধে অদ্য কিছু আলোচনা করিব।

সাংখ্য মতে জগতের স্রষ্টা কেহ নাই। যদিও প্রকৃতিকে জগৎপ্রসবিত্রী জগতের কর্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ত্রী ও

প্রসবিত্রী অর্থে আমরা যাহা বুঝি সে অর্থে প্রকৃতি কর্ত্রী ও প্রসবিত্রী নহেন। তিনি জড়ধর্ম্মবিশিষ্টা ও জড়স্বরূপা, তাঁহার সৃষ্টিক্রিয়া তাঁহার জড়ধর্ম্মবলে হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত (Personal) কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই, যেমন দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয়; দুগ্ধের দধি উৎপাদনের কর্ত্তৃত্ব যতটুকু, প্রকৃতির জগৎ উৎপাদনের কর্ত্তৃত্ব ততটুকুই; তদপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক কি অন্য প্রকারের নহে।

জগতের স্রষ্টা কেহ নাই। সাংখ্য মতে জগত এই জড়রূপা প্রকৃতির পরিণাম দ্বারা আপনাআপনি সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া একটী হইতে অপরটীতে পরিণত হয়—যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর; জল হইতে বাষ্প। জগতের কেহ স্রষ্টা না থাকিলেও ইহার দ্রষ্টা এক জন আছেন। এই দ্রষ্টা দেখিতেছেন যে জগৎ আছে। তিনি যদি না দেখিতেন তাহা হইলে জগতের কোন অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা কাহারও নিকট প্রতীয়মান হইত না। অর্থাৎ জগতে অস্তিত্ব না থাকাই হইত। দ্রষ্টার নাম পুরুষ। পুরুষ আর কিছুই নহে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে চৈতন্য বা চিদংশ বর্ত্তমান আছে তাহাই। যদি আমাদের মধ্যে এই চিদংশ না থাকিত, তাহা হইলে জগৎ আছে কি নাই কেমনে জানা যাইত? থাকিলেও না থাকারই সামিল হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জগতের অস্তিত্ব পুরুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। পুরুষ না থাকিলে জগৎ প্রকাশিত হইত না ইহা সত্য, কিন্তু অপ্রকাশিত অবস্থায় জগৎ থাকিত কিনা?

সাংখ্যকার বলেন—প্রকৃতির প্রাথমিক অবস্থা অব্যক্ত। সেই অবস্থায় প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ তম তিনটী গুণ নিষ্ক্রিয় থাকে কেবল মূলশক্তি প্রকৃতি অব্যক্ত থাকে। গুণত্রয়ের যখন ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন প্রকৃতি ক্রমে একটী হইতে অপরটীতে পরিণত হইয়া ব্যক্ত হইয়া পড়ে এবং জগতের সৃষ্টি হয় এবং সেই জগৎ পুরুষের দ্বারা প্রকাশিত হয়। পরিণামের ক্রম সাংখ্য এইরূপ দিয়াছেন—প্রকৃতি হইতে মহৎ (বুদ্ধি সমষ্টি), মহৎ হইতে অহঙ্কার (আমি জ্ঞান), অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র (ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাবস্থা), ইত্যাদিক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অব্যক্ত প্রকৃতি প্রথমে বুদ্ধিতে পরিণত হয়; এই বুদ্ধি বাহ্য বস্তু নহে। বুদ্ধি আবার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কারে পরিণত হয়; ইহাও বাহ্য বস্তু নহে। যখন অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রে পরিণত হয় তখনই বাহ্য জগতের আরম্ভ হইল বলিয়া বোধ হয়—কিন্তু বিবেচনা করিযা দেখিলে বুঝা যাইবে যে পঞ্চতন্মাত্র ও স্থূল ভূত ইহারা কেহই বাহ্য বস্তু নহে। বুদ্ধি ও অহঙ্কার দুইটী আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম বস্তুর পরিণামে স্থূল জগতের উৎপত্তি সম্ভব নহে। কারণের গুণ কার্য্যকে আশ্রয় করে। কারণ সূক্ষ্ম হইলে কার্য্য স্থূল হইতে পারে না। সাংখ্যকার ইহাও বলেন যে বুদ্ধি ও অহঙ্কার একেবারে জড়রূপ প্রকৃতি নহে। ইহাদের মধ্যে পুরুষ (চৈতন্য) ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত আছে। এই সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে বাহ্য জগত বলিলে আমরা যাহা বুঝি সাংখ্যকারের মতে সেরূপ একটা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই। অন্তর্জগতই বাহ্য জগৎ। বুদ্ধি ও অহঙ্কারই বাহ্য জগৎরূপে প্রকাশিত হয়। যাহা আছে, ভিতরেই আছে—বাহিরে কিছু নাই। ভিতরের প্রকাশই বাহিরের প্রকাশ। শুদ্ধ বুদ্ধি প্রথমে কিছু করিতে পারে না। তাহার কার্য্যের জন্য একটী আশ্রয় চাই অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে পারে এমন একটী ব্যক্তি চাই; সেই ব্যক্তিই অহঙ্কার। বুদ্ধি অহঙ্কার সৃষ্টি করে। অহঙ্কার অর্থাৎ আমি যখন হইল তখন সবই হইল। আমি জগৎ দেখিতেছি, মনে মনে জগৎ সৃষ্টি করিতেছি ও তাহার প্রকাশ বাহিরে দেখিতেছি। আমি কোন্ উপকরণ অবলম্বন করিয়া বাহ্য জগৎ সৃষ্টি করি? আমার অন্য উপকরণ কিছুই নাই—বুদ্ধিই আমার উপকরণ—এই বুদ্ধিবলে আমি নানা প্রকার আকৃতি কল্পনা করিতে পারি এবং এই কল্পিত আকৃতি গুলিই জগৎ; উহার বাহ্যিক সত্তা কিছুই নাই। সাংখ্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ।

স্বরলিপি।

মিশ্র সাহানা—একতালা।

তুমি কোন্ স্বরগেরি অনুপ মাধুরী কোন্ গগনেরি তারা,
কোন্ চাঁদিমার পীযূষ-পূরিত স্নিগ্ধ কিরণধারা।
তুমি কোন্ সাগরের লুকান রতন পরাণ শীতলকরা,
কোন্ বীণাতারের মধুর রাগিণী হৃদয়বেদনাহরা।
আসিলে গো কোন্ সুদূর হইতে আজি এ নবীন প্রভাতে,
জাগাতে আমার সুপ্ত পরাণ (তব) মুক্ত অভয় বাণীতে।
উজলিলে মোর কালিমা-লিপ্ত বদ্ধ হৃদয়-কারা,
ঢালিলে যতনে কে তুমি মরমে শান্তি-সলিলধারা॥

কথা—শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

১´ ২ ০ ৩ ॥
II মা -রজ্ঞা। রা -া সা। -সরা ন্সা নসরা। রা রা রা। ন্সা রা রা I
তু ০মি কো ০ ন্ ০স্ব রগে রি০০ অ নু প মা০ ধু রী

১´ ২ ০ ৩
I রা -রপা পা। পা পা পধা। মপা মপধপা -মপা। ৷া মা -রজ্ঞা I
কো ০০ ন্ গ গ নেরি তা০ রা০০০ ০০ ০"তু ০মি"

১´ ২ ০ ৩
I মা -জ্ঞমপা পা। পা পা -পধপা। মা পা পর্সা। র্সা র্সা -নর্সর্রা I
কো ০০ন্ চাঁ দি মা ০০র পী যূ ষ পূ রি ০ত০

১´ ২ ০ ৩
I র্সণা ণা ণা। ধা -পা পধা। মপা মপধপা -মপা। -া মা -রজ্ঞা II
স্নি০ গ্ধ কি র ০ ণ০ ধা০ রা০০০ ০০ ০"তু ০মি"

১´ ২ ০ ৩
II না -া না। না না -ধনর্সা। র্সা -া -া। র্সা র্সা র্সা I
কো ০ ন্ সা গ ০০রে রি ০ ০ লু কা ন

১´ ২ ০ ৩
I র্সা র্সা র্সা। র্সনা র্সা র্সা। র্রজ্ঞা র্রর্সা র্সা। না -নর্সর্রর্সা -র্সণা I
র ত ন প০ রা ণ শী০ ত০ ল ক ০০০রা ০০

১´ ২ ০ ৩
I ণা ণা ণা। ধা পা পা। মা জ্ঞমপা -া। পা পা -ধপা I
কোন্ বী ণা তা রে র ম ধু০০ র রা গি ০ণী

১´ ২ ০ ৩
I মা পা পর্সা। র্সা ণা পা। মপা মপধপা -মপা। -া মা রজ্ঞা II
হৃ দ য় বে দ না হ০ রা০০০ ০০ ০"তু ০মি"

১´ ২ ০ ৩
II মা মা মা। মা মা -জ্ঞমপা। পা পা পা। পা পা পা I
আ সি লে গো কো ০০ন্ সু দূ র হ ই তে

১´ ২ ০ ৩
I পা ধা ধা। ধা পা -পধা। -মপা -মপধপা -পধা। মা -জ্ঞা -া I
আ জি এ ন বী ০ন ০প্র ভা০০০ ০০ তে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I রা রা রা। রা রজ্ঞা মা। রা -া রা। সা সা সা I
জা গা তে আ মা০ র সু প্ ত প রা ণ

১´ ২ ০ ৩
I সা সা -া। ণা ধা পা। পধা রা -মজ্ঞা। মা সা -া I
(তব) মু ০ রু অ ভ য়০ বা ০০ ণী তে ০

১´ ২ ০ ৩
I না না না। না না -ধনর্সা। র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সা I
উ জ লি লে মো ০০র কা লি মা লি প্ ত

১´ ২ ০ ৩
I র্সনা -র্সা র্রর্সা। র্রজ্ঞা র্রর্সা র্সা। না -নর্সর্রর্সা -র্সণা। ণা -ধা -পা I
ব০ ০ ন্ধ০ ন্ধ০ দ০ য় কা ০০০০ ০০ রা ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I মা জ্ঞমপা পা। পা পা -ধপা। মা পা পর্সা। র্সা র্সা নর্সর্রা I
চা লি০০ লে য ত ০নে কে তু মি ম র মে০০

১´ ২ ০ ৩
I র্সণা -ণা ণা। ধা পা পধা। মপা মপধপা -মপা। -া মা -রজ্ঞা II
শা০ ০ ন্তি স লি ল০ ধা০ রা০০০ ০০ ০"তু ০মি"

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী বেদান্তসাংখ্যতীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

* প্রারিপ্সিতগ্রন্থস্যাবিঘ্নেন পরিসমাপ্তয়ে প্রচয়গমনায় শিষ্টাচারপরিপালনায় চ বিশিষ্টেষ্টদেবতাতত্ত্বং গুরুমূর্ত্ত্যুপাধিযুক্তং নমস্কৃত্য গ্রন্থং প্রতিজানীতে।

অনুবাদ।—গ্রন্থারম্ভে নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি, সবিস্তার লিখন এবং শিষ্টাচার পরিপালন নিমিত্ত গুরুমূর্ত্তিধারী বিশিষ্ট ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থের প্রণয়নপ্রণালা উল্লিখিত হইতেছে।

তাৎপর্য্য। "বিশিষ্টেষ্টদেবতাতত্ত্বং"—ইষ্টদেবতা বা পরমাত্মা; তৎস্বরূপ অর্থাৎ পরমাত্মাই; সেই পরমাত্মা গুরুদেহরূপ উপাধিযুক্ত হওয়াতে বিশিষ্ট বা বিশেষণযুক্ত হইলেন।

দৃষ্টান্ত—সাধারণ মৃত্তিকাকে যখন ঘটাদি অবয়ব বা উপাধি দেওয়া হয় তখনই তাহা বিশেষণযুক্ত বা বিশিষ্ট হইল। "বিশিষ্ট" শব্দের দ্বারা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে গুরুমূর্ত্তি দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়া বলা হইতেছে যে গ্রন্থকার পরমাত্মার অন্যান্য মূর্ত্তিকে নমস্কার করিতে চাহেন না, কেবল গুরুমূর্ত্তিধারী পরমাত্মাকেই বা গুরুকেই নমস্কার করিতে চাহেন।

প্রণম্য পরমাত্মানং শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপিণং।
বৈয়াসিকন্যায়মালা শ্লোকৈঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটং ॥১॥

প্রণম্যেতি। ব্যাসেনোক্তা বৈয়াসিকী বেদান্তব্যাক্যার্থনির্ণায়কান্যধিকরণানি ন্যায়াঃ, তেষামনুক্রমেণ গ্রথনং মালা। যদ্যপ্যেষা সূত্রভাষ্যকারাদিভিঃ প্রপঞ্চিতা, তথাপি সূত্রাদীনামতিপ্রাজ্ঞবিষয়ত্বান্মন্দবুদ্ধ্যনুগ্রহায় শ্লোকৈরেষা মালা স্ফুটং সংগৃহ্যতে॥

শ্লোকার্থ। শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপধারী পরমাত্মাকে প্রণাম পূর্ব্বক বৈয়াসিক ন্যায়মালা শ্লোকের আকারে স্পষ্টভাবে সংগৃহীত হইতেছে।

টীকার্থ। "বৈয়াসিক" অর্থে ব্যাস কর্ত্তৃক উক্ত। "ন্যায়" শব্দের অর্থে বেদান্তবাক্যসমূহের অর্থনির্ণায়ক অধিকরণসমূহ। যথাক্রমে সম্বন্ধ সেই সকল অধিকরণগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে মালা। যদিও এই ন্যায়মালা (বা অধিকরণ শ্রেণী) সূত্রকার ও ভাষ্যকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি সেই সকল সূত্রাদি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই সুবোধ্য বলিয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের উপকারার্থ শ্লোকের দ্বারা এই মালা সহজে বোঝান যাইতেছে।

তাৎপর্য্য। ব্যাসদেব যে বেদান্তসূত্রসমূহ রচনা করিয়াছেন, সেগুলি ভাষ্যাদির দ্বারা ব্যাখ্যাত হইলেও সাধারণের পক্ষে তেমন সুখবোধ্য ছিল না। সেই সূত্রগুলির তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত হইতেছে। শ্লোক হইতে দেখা যাইতেছে যে বিদ্যাতীর্থ মুনি গ্রন্থকারের গুরু ছিলেন।

অধিকরণ কাহাকে বলে? আমরা পরের শ্লোকসূত্রে দেখিব যে একটী বিচারের, বিষয় সন্দেহ প্রভৃতি পাঁচটী অবয়ব আছে। সেই পাঁচটী অবয়বের সাহায্যে প্রত্যেক বিচারের যে একটী শরীর দাঁড়ায়, সেই শরীরের নামই অধিকরণ—অর্থাৎ যাহাতে সমস্ত বিচারটী অধিকৃত হইয়া থাকে।

বেদান্ত বাক্য অর্থাৎ উপনিষদ্ নিহিত শ্রুতিসমূহ। যে অধিকরণ বা বিচারাত্মক বাক্যের দ্বারা সেই শ্রুতিসমূহের অর্থ নির্ণীত হয়, তাহাই "ন্যায়" শব্দের বাচ্য।

তত্রৈকৈকমধিকরণং পঞ্চাবয়বং। বিষয়ঃ, সন্দেহঃ, সংগতিঃ, পূর্ব্বপক্ষঃ, সিদ্ধান্তশ্চেতি পঞ্চাবয়বাঃ। তেষাং সংগ্রহপ্রকারং দর্শয়তি।

অনুবাদ। উক্ত গ্রন্থে এক একটী অধিকরণ পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট। সেই পঞ্চাবয়ব হইতেছে বিষয়, সন্দেহ, সংগতি, পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত। সেই সকল অবয়বের সংগ্রহরীতি দেখান যাইতেছে।

তাৎপর্য্য। বিষয় হইতেছে বিচারের মেরুদণ্ড অথবা subject matter। সন্দেহ অর্থে উল্লিখিত বিষয়টী বিচারের মেরুদণ্ডস্বরূপে দাঁড়াইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে চিত্তের (pendulumএর ন্যায়) দোদুল্যমান ভাব (doubt)। সংগতি অর্থে সংক্ষেপে পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের সহিত পরবর্ত্তী বিষয়ের সম্বন্ধ। সংগতির শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ হইতেছে—"অনন্তরাভিধানপ্রয়োজকজিজ্ঞাসাজনকজ্ঞানবিষয়ো-

* কোন কোন পুস্তকে গ্রন্থের আদিতে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত শ্লোক দৃষ্ট হয়।

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননং ॥

হ্যর্থঃ সংগতিঃ অর্থাৎ কোন কিছু উক্ত হইবার পর যাহা কিছু উল্লিখিত হয়, সেই পরবর্ত্তী কালীন উক্তির প্রেরক যে জিজ্ঞাসা, সেই জিজ্ঞাসার মূল জ্ঞানের অবলম্বনীয় বিষয়ের নাম সংগতি। প্রচলিত ভাষায় একটী বিচারস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের সহিত পরবর্ত্তী বিষয়ের সম্বন্ধের নাম সংগতি বলা যাইতে পারে।

"সন্দেহ"-বাদী স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া যে প্রতিজ্ঞা স্থাপন করেন, তাহাই পূর্ব্বপক্ষ। আমি বলিলাম ঈশ্বর আছেন। এখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচারের বিষয়। তুমি বলিলে যে ঈশ্বর আছেন কিনা ইহা বিচার্য্য—এইটী হইল সন্দেহ। তৎপরে তুমি তোমার জ্ঞানমত যুক্তি দেখাইয়া প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিলে যে ঈশ্বর নাই—এই প্রতিজ্ঞাই হইল পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্তের অর্থে বিচারের শেষ-ফল। উপরোক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে গেলে বলা যায় যে প্রথমে যিনি বলিয়াছেন যে ঈশ্বর আছেন, তিনি প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রভৃতি নিরাকৃত করিয়া যখন স্বীয় প্রতিজ্ঞাটী দাঁড় করাইতে পারিবেন, তখন সেই প্রতিজ্ঞাটী (এখানে ঈশ্বর আছেন এই প্রতিজ্ঞাটী) বিচারের শেষ ফল বা সিদ্ধান্ত হইবে।

একো বিষয়সন্দেহপূর্ব্বপক্ষাবভাসকঃ।
শ্লোকোঽপরস্তু সিদ্ধান্তবাদী সংগতয়ঃ স্ফুটাঃ। ২।

তত্রৈকৈকস্যাধিকরণস্য সংগ্রাহকৌদ্বৌদ্বৌশ্লোকৌ। তয়োরাদ্যশ্লোকস্য পূর্ব্বার্দ্ধেন দ্বাবয়বৌসংগৃহ্যেতে। উত্তরার্দ্ধেনৈকঃ। দ্বিতীয়শ্লোকেনচৈকঃ। যদ্যপি সংগত্যাখ্য একোঽবয়বঃ শিষ্যতে, তথাপি—প্রত্যধিকরণং ন পৃথক্ সংগ্রহীতব্যোভবতি। সকৃদ্‌ব্যুৎপন্নস্য পুরুষস্যাস্বয়মেবোহিতুং শক্যত্বাৎ॥

শ্লোকার্থ। একটী শ্লোকে বিষয়, সন্দেহ এবং পূর্ব্বপক্ষ, বিচারের এই তিনটি অবয়ব সূচিত হইবে। দ্বিতীয় শ্লোকে সিদ্ধান্ত পরিব্যক্ত হইবে। সংগতিগুলি সহজেই বোধগম্য হইবে।

টীকার্থ—বর্ত্তমান গ্রন্থে এক একটি অধিকরণকে দুই দুইটী শ্লোকের দ্বারা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা বিচারের দুইটী অবয়ব (বিষয় ও সন্দেহ), উত্তরার্দ্ধের দ্বারা একটী অবয়ব (পূর্ব্বপক্ষ), এবং দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা একটী অবয়ব (সিদ্ধান্ত) বিবৃত হইয়াছে। যদিও সংগতি নামক অপর একটী অবয়ব অবশিষ্ট আছে, তথাপি প্রত্যেক অধিকরণে উহা পৃথকভাবে প্রদর্শিত হইবে না, কারণ যে ব্যক্তি একবার সংগতি ভালরূপ বুঝিয়া লইবেন, তিনি অধিকরণ মাত্রেরই সংগতিসমূহ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

তাৎপর্য্য নিষ্প্রয়োজন।

সংগতিং বিভজ্য ব্যুৎপাদয়তি—
শাস্ত্রেঽধ্যায়ে তথা পাদে ন্যায়সংগতয়স্ত্রিধা।
শাস্ত্রাদিবিষয়ে জ্ঞাতে তত্তৎসংগতিরূহ্যতাং॥ ৩॥

শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং, অধ্যায়প্রতিপাদ্যং, পাদপ্রতিপাদ্যং চার্থমবগম্য শাস্ত্রসংগতিঃ, অধ্যায়সংগতিঃ, পাদসংগতিশ্চ—ইতি তিস্রঃ সংগতয়ঃ উহিতুং শক্যন্তে।

অনুবাদ। সংগতিকে বিভাগ করিয়া তাহার বিভিন্ন প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে—

শ্লোকার্থ। ন্যায়সংগতি তিন প্রকার—শাস্ত্রবিষয়ক, অধ্যায়বিষয়ক এবং পাদবিষয়ক। শাস্ত্র, অধ্যায় ও পাদ এই তিনটী বুঝিতে পারিলেই সেই সকলের সংগতিও সহজেই বুঝা যাইবে।

টীকার্থ। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য, অধ্যায়প্রতিপাদ্য ও পাদপ্রতিপাদ্য অর্থ অবগত হইলেই শাস্ত্রসংগতি, অধ্যায়সংগতি এবং পাদসংগতি, এই তিনপ্রকার সংগতিই বুঝা যাইবে।

তাৎপর্য্য। আমরা ইতিপূর্ব্বে সংগতির অর্থ বুঝাইয়া আসিয়াছি। সেই সংগতি অবলম্বনভেদে তিনপ্রকার। এক শাস্ত্রের সহিত অপর শাস্ত্রের সম্বন্ধের নাম শাস্ত্রসংগতি। বর্ত্তমান গ্রন্থের মূল হইতেছে বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর মীমাংসা। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে জৈমিনি ঋষি বেদের কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বমীমাংসা নামক একটী শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিচারস্থলে এই উভয় মীমাংসাশাস্ত্রের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইলে তাহাই শাস্ত্রসংগতি বলিয়া অভিহিত হইবে। সেইরূপ কোন একটী শাস্ত্রের কোন এক অধ্যায়ের সহিত তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সম্বন্ধের নাম অধ্যায়সংগতি। বেদব্যাস উত্তরমীমাংসার প্রত্যেক অধ্যায়কে চারিটী ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটী ভাগকে পাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই

প্রকার একটী পাদের সহিত পরবর্ত্তী পাদের সম্বন্ধকে পাদসংগতি বলা যায়।

আমার জীবন-স্মৃতি।*

অথবা

আমার স্বামী (গোবিন্দরাম রাণাডে) সম্বন্ধে স্মৃতি-কথা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পবিত্র হইব ওই চরিত্র উচ্চারে,
ফুটে যাহা সুন্দর রূপের আধারে।
হীনবুদ্ধি আমি অতি, নাহি পুণ্যবল,
চরণ ধরিয়া, মুখ হেরিব কেবল।
গাইব ওবিয়া-ছন্দে শিষ্ট-অভিমত,
জীবন যাপিব তব ধ্যানে অবিরত।
তুকারাম ভণে, তব নাম নারায়ণ,
তোমাতেই করিবে সে মন সমর্পণ॥

তুকারাম

পূর্ব্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত ও আমার স্বামীর বাল্যকাল।

আমার স্বামীর পূর্ব্বপুরুষদিগের ("রাণাডে"-দিগের) মূল-নিবাস,—রত্নাগিরী জেলার অন্তর্ভূত, "চিপলুন" তালুকে "গুহাগরাণজী মোভার পায়েরী", ওর্ফে "পাচেরিসড়া"—এই স্থানে ছিল। উক্ত বংশের উত্তরাধিকারী হওয়ায়, এখনো পর্য্যন্ত ঐ গ্রামের "খোতি" ভূমির উৎপন্ন আয়, আমার স্বামীই পাইয়া আসিতেছেন। সেখানকার ভগবন্ত রাও নামে এক ব্যক্তি (আমার স্বামীর পিতামহের পিতামহ) কোকণ প্রদেশে এই গ্রামে পণ্ঢরপুরের নিকটবর্ত্তী "কসরে-করকম্ব" হইতে এই গ্রামে আসিয়া ছিলেন। ইনি গৃহস্থ হইলেও, জ্যোতিষে বেশ পারদর্শী ছিলেন। কথিত আছে,—তিনি একদা নানা ফর্ণবিস সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল। ভগবন্ত-রাওর পুত্র ভাস্কর-রাও—ওর্ফে অপ্পাজি, স্বীয় জননীর বহু সন্তানের মধ্যে একমাত্র ইনিই বাঁচিয়াছিলেন। ইনি যে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন সে কেবল ইহাঁর মাতার (কৃষ্ণাবাইর) বার বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক কঠোর ব্রতাচরণের ফলে। কৃষ্ণাবাইর সন্তানাদি বাঁচিত না বলিয়া তিনি বার বৎসর ধরিয়া অশ্বত্থবৃক্ষ ও গাভী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন; এবং তিনি সেই সময়ে গোমূত্রে চাপাটি করিয়া আহার করিতেন; তিনি আর কিছুই আহার করিতেন না। তিনি ভক্তিমান ও সাত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতিথি অভ্যাগত যে কোন সময়েই তাঁর গৃহে আসুক না কেন, তিনি আগে উঠিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে, স্বয়ং পাক করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতেন, এবং অশ্বত্থবৃক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করিতেন, "আমার পুত্র জন্মিলে তাহার পুত্রপৌত্রাদি যেন তোমার মত গভীরভাবে বদ্ধমূল হয় এবং তোমারই ন্যায় তাহারা যেন বহুল বিস্তার লাভ করিয়া অনেককে ছায়াদান করে।" এই প্রার্থনানুসারে, দেবতারা ভাস্কর-রাও আপ্পাকে পূর্ণায়ু, ভাগ্যবান ও পরাক্রমী করিয়াছিলেন, এবং "এক হইতে একবিংশ" এই কথা অনুসারে, শাখা-প্রশাখায় বহু বিস্তৃত হইয়া, রাণাডে বংশের সকল পুরুষই বুদ্ধিমান শূর, পরাক্রমী, উদ্যোগী, দীর্ঘকায় বলবান ও উদারচিত্ত হইয়াছেন। ইহা সেই মহাসাধ্বীর পুণ্যের ফল বলিতে হইবে।

আপ্পাজী ভগবন্ত—ইনি উপরি-উক্ত সাধ্বীর একমাত্র পুত্র ও আমার স্বামীর আপনার প্রপিতামহ ছিলেন। সাঙ্গলী-রাষ্ট্রের (সংস্থানের) অধিপতি প্রখ্যাত চিন্তামণ-রাও ওর্ফে,—আপ্পাসাহেব পটবর্দ্ধন,—ইহাঁর তিনি প্রধান "কারকুন" ছিলেন। পটবর্দ্ধনী সৈন্যের একভাগের সেনাধ্যক্ষের পদও তিনি একই সময়ে পাইয়াছিলেন। তিনি একদা মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া এক কেল্লা জয় করেন ও সেই সময় যে লুটের মাল পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে তিনি কিছুই স্পর্শ করেন নাই—এইরূপ কথিত আছে। কিন্তু নিজের যোগ্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায়, আপ্পাসাহেবের নিকট ইংরেজ সরকারের তরফে ওয়কীল (প্রতিনিধি কার্য্যকারক) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোন বিষয়েই তিনি ভীত হইতেন না, নিজ বুদ্ধিতে যাহা ভাল ও ঠিক মনে করিতেন, সেইরূপই তিনি নিজ প্রভুকে পরামর্শ দিতেন। সেই সম্বন্ধে প্রভুর কিঞ্চিৎ অসন্তোষ

---

* বোম্বাই প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব বিচারক গোবিন্দরাম রাণাডের স্মৃতি কথা—তাহার পত্নী রমাবাই রাণাডে লিখিত এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে অনুবাদিত।

হইলেও তিনি ভয় করিতেন না। খাঁটি ব্যবহার ও বুদ্ধিমত্তা, এই দুইগুণের জন্য পটবর্দ্ধন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। তিনি বংশপরম্পরাক্রমে যে চাকরাণ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি সাঙ্গলী-রাষ্ট্রে আমাদের বংশেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রীচিদম্বর স্বামী নামক একব্যক্তি, যিনি কর্ণাটক প্রদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের অপ্পার গুরু ছিলেন। অপ্পা আপনিই আপনার মরণকাল জানিতে পারিয়াছিলেন এইরূপ কথিত আছে। মৃত্যুর ৬ মাস পূর্ব্বেও তিনি বড় ঘোড়ার উপর দৃঢ়াসন হইয়া বসিতেন। তাঁর দন্ত ও শরীরের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় ও সবল ছিল। ঈশ্বরারাধনা ও ঈশ্বর চিন্তাতেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। এবং মুখেও তিনি নামস্মরণ করিতেন। তাঁহার ৯৫ বৎসর বয়সে, ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে তিনি কৈলাসবাসী হইলেন। দেহাবসান হইবার পূর্ব্বে, তিনি স্বীয় পুত্রের নিকট আপনার মৃত্যুকাল বলিয়া রাখিয়াছিলেন, এইরূপ কথিত আছে।

অপ্পার জ্যেষ্ঠ পুত্র, অর্থাৎ আমার স্বামীর আপনার পিতামহ, অমৃত রাও-তাত্যা, ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভে প্রথমে, "করকম্ব" হইতে নগর-জিলাতে চাকুরী করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি শিরস্তাদার হইয়া পরে, মামলেদার পদে নিযুক্ত হন, এবং নগর জিলা হইতে পুণা-জিলায় আসেন। পুণাতে ও "অম্বেগাঁও"-এ বহু বৎসর মামলেদারের কাজ করিবার পর, "পাবল" তালুকে তিনি বদলী হইলেন এবং সেইখানেই "পেন্‌শন" লইলেন। আমার শ্বশুর মহাশয়কে ধরিয়া "তাত্যার" চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ বলবন্ত-রাও-দাদা, মধ্যম গোবিন্দ-রাও-ভাট, সেজ গোপাল-রাও-আনে ও চতুর্থ বিষ্ণুপন্ত-আন্না। এই চারি জনের মধ্যে গোবিন্দ-র‍্যাও ও বিষ্ণুপন্ত, "নিফাড়া"য় চাকুরী করিয়া, পরে ১৮৪১।৪২ অব্দে কোল্‌হাপুরে "জবাব-নিশী"র কাজে নিযুক্ত হন, আর দুই জন তাত্যার নিকট "পাবলে"তেই রহিলেন। ত্যাত্যা আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের মতই দীর্ঘকায় ও বলবান ছিলেন। ইনি খুব ভাল ঘোড়-সওয়ার ছিলেন। সংস্কৃত ও জ্যোতিষে তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি উহা ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন।

বহু সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া, তিনি স্বহস্তে কতকগুলি পুঁথির নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন। "পুরুষ সূক্ত"-এর উপর ইনি টীকা ও মারাঠীতে উহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবং উহা ছাপাইবার জন্য আপনার নিকটেই রাখিয়াছিলেন এইরূপ শুনা যায়। তাত্যা খুব ভাল কথকতা করিতে পারিতেন; তাছাড়া জ্যোতিষের গণনাও উত্তমরূপ করিতে পারিতেন, জন্মকোষ্ঠী দেখিতেন ও প্রস্তুত করিতেন।

আমাদের শ্বশুর মহাশয়ের ফড়নীতে অবস্থিতি কালে ১৮ জানুয়ারী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে আমার স্বামীর জন্ম হয়। সেই সময় তাত্যা জন্মের দিন ক্ষণ টুকিয়া রাখিয়া নিজ হস্তে আমার স্বামীর জন্মপত্রিকা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

তাত্যা এই প্রকারে, যেমন পূর্ব্ব বয়সে তেমনি উত্তর বয়সে, আয়ুঃক্রম কাল উত্তম রাখিয়া, ৮০ বৎসর বয়সে, অর্থাৎ ১৮৬৮ অব্দে, কোল্‌হাপুরে আমার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট আসিয়া, জীবনযাত্রা শেষ করিলেন। শ্বশুর মহাশয় কোল্‌হাপুরে আসিবার পর কিয়দ্দিবস "জবাব নিশী"র কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরে, সেইখানেই তিনি মামলেদার হন। ভূধরগড়, পঙ্গাড়া, গড়-হিঙ্গ্‌লজ প্রভৃতি বিভিন্ন জিলায় মামলেদারি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি কোলহাপুরে বদলী হওয়ায়, ১৮৬২।৬৩ অব্দে খাস-কার্য্যাধক্ষ-পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি ২৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন।

১৮৪২ অব্দে তিনি "করবিরা"য় একলা আসিয়াছিলেন, ছেলেপিলেদের সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমার ননদের ("দুর্গা আক্কা"র) জন্ম হইবার ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত, "নিফাড়ে" আমার দিদিশাশুড়ীর নিকট ছিলেন। যখন আমার ননদের জন্ম হয় তখন আমার স্বামীর বয়স আড়াই বৎসর ছিল। তাত্যা তখন আম্বেগাঁয়ে মামলেদারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার নিকট সপ্তাহ খানেক থাকিয়া, তাহার পর শ্বশুর মহাশয়ের নিকট কোলহাপুরে যাইবার জন্য আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ আমার স্বামীকে ও আমার ননদকে লইয়া বয়েল-গাড়ীতে যাত্রা করিলেন। এই প্রবাসযাত্রা কালে আমার স্বামী ঈশ্বরকৃপায় একটা সঙ্কট

হইতে রক্ষা পান। তাহার বিবরণ এই :—শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ "নিফাড়" হইতে প্রথম বাহির হইয়া আম্বে গাঁয়ে আসিবার সময় তাঁহাকে আহ্বান করিবার জন্য আগত আম্বেগাঁ হইতে এক সিপাহি ও আমার স্বামীর দূর সম্পর্কের কাকা বিঠ্ঠল-বাবাজি-রাণাডে এই দুইজন সঙ্গে ছিলেন। বিঠু কাকা ঘোড়ায় চড়িয়া গাড়ীর পিছনে পিছনে আসিতেছিলেন। দিনের বেলাটা খুব গরম হওয়ায়, সন্ধ্যাকালে ঠাণ্ডার সময় গাড়ী জুড়িয়া সমস্ত রাত চালান হইত। ঐ দিন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ছিল। প্রায় রাত্রি দুইটার সময় গাড়ীর সকল লোকই (শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ ও দুই শিশু) গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। ছোট মেয়েটিকে কোলের কাছে নিয়ে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ ঘুমাইতেছিলেন এবং আমার ননদের ও-পাশে আর একটা আলাদা বিছানায় আমার স্বামীকে ঘুম পাড়াইয়াছিলেন। সময়টা ঠাণ্ডা হওয়ায় ও রাত্রি ১১।১২ টা অতীত হওয়ায়, যে সিপাহি গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল সে এই সময় সামনের দিকে, গাড়োয়ানের পাশে গিয়া বসিল; তার পর, স্বল্প কালের মধ্যেই গাড়ীওয়ালা ও সিপাহি দুজনেই ঢুলিতে লাগিল। বয়েল দ্রুত চলিতেছিল এবং বিঠুকাকা অনেক পিছনে ছিলেন। এই সময় একটা রাস্তার বাঁক আসিল। বয়েলটা সেখান হইতে গাড়ী সজোরে লইয়া বাহির হইয়া গেল। এই সময়ে আমার স্বামী ঘুমে লুটিয়া পড়িয়াছিলেন; এবং একেবারে গাড়ীর কোণে আসিয়া পড়ায়, রাস্তার বাঁকে দেয়ালের কোণে জোরে ধাক্কা লাগিবার দরুন, বিছানা চাদর সমেত শিশু ছিট্‌কাইয়া রাস্তার উপর পড়িল। শাশুড়ী ঠাকরুণ তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। কিন্তু গাড়ী যখন ছুটিয়া চলিতেছিল, তখন সিপাহী ও গাড়ীওয়ালা জাগিয়াছিল; তথাপি গাড়ীর দ্রুত গমনশব্দে, পিছনে কিছু পড়িয়া গিয়াছে তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। এইরূপে গাড়ী দেড় মাইল আগে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরে আধঘণ্টা পোয়া ঘণ্টার মধ্যে আমার স্বামী বিঠুকাকার ঘোড়ার পায়ের টপাটপ শব্দ শুনিয়া 'বিঠুকাকা' বলিয়া হাঁক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এইখানে আমি পড়িয়া গিয়াছি।' সেই হাঁক শুনিবামাত্র বিঠুকাকা আমার স্বামীর গলার আওয়াজ চিনিতে পারিয়া, তখনি ঘোড়াকে দাঁড় করাইলেন ও নীচে নামিয়া আমার স্বামীকে তুলিয়া কোলে লইলেন এবং উহার হিমাঙ্গ শরীর কাপড়ে জড়াইয়া ক্রোড়দেশে আঁটিয়া ধরিয়া ঘোড়ার উপর বসিলেন। এবং শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের গাড়ীর নিকট আসিয়াই শ্বাশুড়ী ঠাকরুণকে বলিলেন,—'গোপিকা-ভগিনী, জেগে আছ ত? ছেলেরা বিছানায় ঠিক আছে ত?' তিনি ঘুমাইতে ঘুমাইতে বলিয়া উঠিলেন—'হাঁ, সব ঠিক আছে,' এই কথা শুনিয়া বিঠুকাকা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি এখনো ঘুমিয়ে আছ? দুটি শিশুই তোমার কাছে আছে ত? ঠিক করে দেখ।' এই কথা বলিবামাত্রই তিনি ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং গাড়ীর ভিতর চারিদিকে হাতড়াইতে লাগিলেন। এবং যখন দেখিলেন, মেয়েটি আছে কিন্তু ছেলেটি নাই, তখন অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন বিঠুকাকা জড়ানো কাপড় হইতে আমার স্বামীকে বাহির করিয়া শ্বাশুড়ী ঠাকরুণকে দিলেন এবং এই কথা বলিলেন,—'আজ পরমেশ্বর খুব রক্ষা করেছেন'।

বিঠুকাকার মুখে আমি এই গল্পটা শুনিয়াছি। এখনো পর্য্যন্ত এই গল্প করিবার সময় তাঁর চোখ জলে ভরিয়া আসে। এইরূপে আম্বেগাঁয়ে আসিবার পর, কিছু দিবস সেখানে থাকিয়া, শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ দুই শিশুকেই লইয়া কোলহাপুরে শ্বশুর মহাশয়ের নিকট আসিলেন। আমার স্বামীর তিন বৎসর হইতে তের বৎসর পর্য্যন্ত শৈশবের অধিকাংশকাল কোলহাপুরেই কাটিয়া ছিল। ৬।৭ বৎসর বয়সে, আমার স্বামীকে পাণ্ডোবা-তাত্যা বিবেকয়ের পাঠশালায় দেওয়া হয়। এই সময়কার, আমার স্বামীর স্বভাব চরিত্র ও অভ্যাসাদির সমস্ত বিবরণ আমার খুড় শ্বাশুড়ীর মুখের কথা হইতে দেওয়া যাইতেছে—তাঁহার ব্যবহৃত শব্দগুলিও ঠিক রাখা হইয়াছে। কেননা তাহা হইলে আমার স্বামীর স্বভাব চরিত্র তখন কিরূপ ছিল তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সম্রাট অশোক।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের কথা সকলেই অবগত আছেন। খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দের

জুনমাসে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়। মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত এই সময়ে মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করেন। চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশীয় জারজ পুত্র ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্যের নিয়ন্তৃত্বে রাজা নন্দকে সিংহাসনচ্যুত ও পরে হত্যা করেন, এবং পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ২৪ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করেন। তিনি মেসিডোনিয়নগণকে বিতাড়িত করিয়া নর্ম্মদানদ পর্য্যন্ত আপন রাজত্ব বিস্তার করেন। তাঁহার রাজত্ব সুদূর পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের প্রথম সম্রাট। সিলিউকস এই সময়ে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি আপনার বীর্য্যে বেবিলোন, বাক্‌ট্রিয়া ও সিরিয়া অধিকার করেন এবং ভারতে আসিয়া সিন্ধু নদী পার হইয়া আরও অগ্রসর হইয়া পড়েন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার অসংখ্য সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলে সিলিউকস পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সিলিউকশ ৫০০ মাত্র হস্তী লইয়া চন্দ্রগুপ্তকে আরিয়া, আরাযোসিয়া, জেড্রোসিয়া, পারোপানি ও সাভাই প্রদেশ অর্থাৎ কাবুল পর্য্যন্ত প্রদান করেন। ইহাতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের সীমা হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত আফগানিস্থান বেলুচিস্থান ও মাক্‌রাণ আপনার বশে আনিয়াছিলেন।

খৃঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে সিলিউকস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগস্থিনিস্‌কে দূতরূপে প্রেরণ করেন। শোননদী যেখানে গঙ্গার সহিত মিলিত হয়, ঐখানেই পাটলীপুত্র নগর ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত নগর ২০ ফুট নিম্নে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। মেগস্থিসিনিস বলেন যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন ব্যবস্থা অতীব সুন্দর ছিল। পাটলীপুত্রে সুপ্রকাণ্ড দুর্গ ছিল। ৬ লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ৩০ হাজার অশ্বারোহী, ৯ হাজার হস্তী, অসংখ্য রথ রাজব্যয়ে রক্ষিত হইত। যুদ্ধের সময়ে সৈন্যসংখ্যা ৬ ছয় লক্ষ হইয়া দাঁড়াইত। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বিন্দুসার অসীম সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া ২৮ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। সিলিউকসের মৃত্যুর সাত বৎসর পরে বিন্দুসারের পুত্র অশোক খৃঃ পূঃ ২৭৩ অব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। মৌর্য্যবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় বিন্দুসার এবং তৃতীয় অশোক। কথিত আছে রাজা হইবার পূর্ব্বে অশোক তক্ষশীল ও উজ্জয়িন দেশের শাসনকর্ত্তা থাকিয়া রাজ্যশাসন শিক্ষা করিয়াছিলেন। অশোক তাঁহার পিতৃ-পিতামহের ন্যায় "দেবানাম্ প্রিয়ঃ" এই আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যেরূপ "His Sacred Majesty" আছে, উহা তাহারই অনুরূপ। তাঁহাকে প্রিয়দর্শী বলিয়াও অভিহিত করা হইত।

অশোক প্রথম বয়সে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি মাংসাহারী ও মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতামহের সমগ্র সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াও রাজ্যের পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত করেন। খৃঃ পূঃ ২৬১ অব্দে তিনি কলিঙ্গদেশ জয় করেন। উক্ত কলিঙ্গদেশ মহানদী হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপকূল ভাগে বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গদেশ জয় করিতে প্রায় এক লক্ষ শত্রু নিহত হয়। বন্দীর সংখ্যাও প্রায় দেড় লক্ষ। এতদ্ব্যতীত কলিঙ্গের অসংখ্য লোক বিনষ্ট ও হতসর্ব্বস্ব হইয়া যায়। এই অগণন প্রাণীহত্যা দেখিয়া অশোকের অন্তরে দারুণ নির্ব্বেদ জাগ্রত হইয়া উঠে। অনুতাপানলে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। তিনি তাঁহার এই নববিজিত কলিঙ্গ দেশের শাসন সম্বন্ধে দুইটী অনুশাসন লিপিবদ্ধ করেন। ঐ দুইটী খোদিত অনুশাসন জৌগদ ও ধৌলিতে আজও সুরক্ষিত। কলিঙ্গদেশ অধিকৃত হইবার পরে উহা স্বতন্ত্র দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তোসালিতে থাকিয়া অশোকের আদেশে জনৈক রাজবংশধর কলিঙ্গের শাসনকার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। এই যে তোসালি কোথায় আজও তাহার প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ হয় নাই, সম্ভবতঃ উহা পুরীর নিকটে।

অশোকের অন্তরে যে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় তাহারই ফলে অশোক খৃঃ পূঃ ২৬১ বা ২৬০ সালে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই তিনি মৃগয়া পরিত্যাগ করেন এবং দেশভ্রমণ ও ধর্ম্মালাপে আপনাকে নিয়োগ করেন।

ধর্ম্ম বলিতে হইলে হিন্দুর জাতিগত নিয়মরক্ষা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সামাজিক ব্যবহার সবই বুঝায়। অশোক ধর্ম্মের সহিত জাতিগত ভাব যাহা মিশ্রিত ছিল, তাহা বিদূরিত করিয়া

দিয়া পিতৃমাতৃভক্তি, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর সমধিক ঝোঁক দেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে খোদিত লিপিতে অশোক এইরূপ ঘোষণা করেন যে—"পিতামাতার আদেশ শ্রবণ কর, সজীব প্রাণীবৃন্দকে রক্ষা কর, সত্য কথা কহ, গুরুকে ভক্তি কর, অন্তরঙ্গের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার কর।" আর এক স্থানে বলিয়াছেন "ধর্ম্মের অর্থ দয়া, দান, সত্য, পবিত্রতা, নম্রতা ও বৈরাগ্য। সর্ব্বজীবের শান্তি বর্দ্ধনই ধর্ম্ম।" ইহা সাধন করিবার জন্য অশোক সকলকেই চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। প্রজাগণকে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে "তোমাদের রাজা যাহা কিছু সাধন করিতেছেন, সমস্তই তাঁহার ভাবী জীবনের কল্যাণের জন্য। পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চেষ্টা চাই। বিশেষ ভাবে চেষ্টা ও সাধনা কর এবং অন্য সংকল্প পরিহার কর। মনুষ্য মাত্রেই চেষ্টা করিলে স্বর্গীয় আনন্দ পাইতে পারে।"

ব্রহ্মদেশেও এই আত্মসংবরণ ও সংযমের শিক্ষা প্রচারিত হয়। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ বলেন—"আমরা নিজেই নিজের জন্য দায়ী, আমরা নিজেই নিজেকে গড়িয়া তুলি। সৎচিন্তা ও সৎকার্য্যের প্রভাবে আমরা আপনার কল্যাণ সাধন করি। অসৎচিন্তা ও অসৎকার্য্যের দ্বারা আমরা আপনাকেই বিনষ্ট করি।" বৌদ্ধধর্ম্মের এই ভাব ষ্টোয়িক মতের অনুরূপ। খ্রীষ্টানগণ যেমন বলিয়া থাকেন যে মনুষ্যমাত্রেই পাপী, পাপী হইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করে, বৌদ্ধগণ সেরূপ মত আদৌ পোষণ করেন না।

অশোক একাধারে রাজা ও ঋষি উভয়ই ছিলেন। বৌদ্ধসংঘের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য তিনি সবিশেষ সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন। যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট না হয় ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া না যায়, সে দিকে সম্রাটের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সুন্দর সুন্দর শ্লোক সংগ্রহ করিয়া প্রজাবর্গের শিক্ষার উপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন। কেমন করিয়া সম্রাট যে রাজধর্ম্ম ও বৌদ্ধসন্ন্যাসীর ধর্ম্ম একত্র রক্ষা করিতেন, তাহা বলা বড় কঠিন। সপ্তম শতাব্দীতে ই, সিং ভারতে আসিয়া সম্রাটের প্রস্তর-মূর্ত্তি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর মত বেশ-পরিহিত দেখিয়াছিলেন।

অশোকাবদান গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে, সম্রাট তাহার গুরু উপগুপ্তের সঙ্গে লুম্বিনী উদ্যান (গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান) কপিলাবস্তু, গয়ার বোধি-বৃক্ষ, ঋষিপত্তন (সারনাথ), কুশিনগর (যেখানে বুদ্ধের মৃত্যু হয়), শ্রাবস্তীর অন্তর্গত জেতবন নামক বিহার এবং আনন্দের স্তূপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি দেশ দেশান্তরে বৌদ্ধ মত প্রচার করিবার জন্য এমন কি ইউরোপে উত্তর আফ্রিকায় এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে এবং সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করেন; অধিকন্তু ভারতের অন্তর্গত অসভ্য জাতিবর্গকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পান। অশোকের অদম্য চেষ্টায় উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম্ম কেবলমাত্র ভারতের বলি কেন, উহা ব্রহ্মদেশ, শ্যাম দেশ, কাম্বোজ, ভারতীয় আর্কিপেলগো, চীন, কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া ও তিব্বতের ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। মহেন্দ্র (মহিন্দ) সম্ভবতঃ অশোকের ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়। কেহ বা বলেন মহেন্দ্র অশোকের পুত্র ছিলেন।

খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে অশোক রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মপ্রচার এই উভয়বিধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য কয়েকটি পদের সৃষ্টি করেন। সর্ব্বোচ্চ পদের নাম "ধর্ম্ম মহামন্ত্র" (ধর্ম্ম মহামাত্র), তাহার নিম্নস্থ পদের নাম "ধর্ম্মযুক্ত"। খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে অশোক নগ্ন অজীবক সম্প্রদায়ের জন্য একটি পার্ব্বত্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

প্রথম বয়সে অশোক নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন, অনেকে এইরূপ বলিতে চান; কিন্তু তাহার বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। সম্রাট হইবার পরেও তাঁহার ভোজনাগারে আহার্য্য প্রস্তুত হইবার জন্য অসংখ্য প্রাণীবধ হইত; কিন্তু রাজপদে অভিষিক্ত হইবার এগার বৎসর পরে খাদ্যের জন্য কেবলমাত্র দুইটী ময়ূর ও একটি মৃগ বিনষ্ট হইত। ত্রয়োদশ বৎসর পরে মাংসাহার একেবারেই রহিত হইয়া যায়। ইহার দুই বৎসর পরে রাজা মৃগয়াযাত্রা রহিত করেন। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে প্রাণীবধ একেবারে রহিত হওয়া অসম্ভব দেখিয়া যে যে প্রাণী আদৌ বধ হইবে না, তিনি তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন। বৎসরের মধ্যে ৫৬ দিন মৎস্য একেবারে বধ বা বিক্রীত হইতে পারিবে না, প্রতিপদ তিথিতে কেহ অশ্বযান বা গো শকট চালিত করিতে পারিবে না এইরূপ আদেশ রাজ্যময় ঘোষণা করেন। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি অন্য ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা ছিলেন না এবং কাহাকেও অপরের ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতে দিতেন না। তিনি এই কথাই বলিতেন যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের আদেশ আংশিকরূপে প্রতিপালন করে। তিনি আরও বলিতেন, যে অপর ধর্ম্মকে নিন্দা করে সে নিজের ধর্ম্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাহার গৌরব হানি করে। তিনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধকে দান করিবার আদেশ দিতেন। জৈনগণের উপরও তাঁহার সদয় দৃষ্টি ছিল। কথিত আছে যে তিনি ব্রাহ্মণদিগের মন্দির নির্ম্মাণ ও সংস্কার উভয়ই করিয়া গিয়াছেন। বৈদান্তিক মায়াবাদের উপর অশোকের আস্থা ছিল না। পরজন্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। জীবের

প্রতি মৈত্রী ইহা তাঁহার উপদেশের অন্তর্ভূত হইলেও ধ্যান যে সমধিক ফলপ্রদ, ইহাতে তাঁহার সমধিক আস্থা ছিল। ধর্ম্মের নামে পশুহত্যার তিনি চিরবিরোধী ছিলেন। তিনি দানের ও পরোপকারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পশু ও মনুষ্যের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য রাজপথের পার্শ্বে ছায়াপ্রদ ও ফল-প্রদ বৃক্ষ রোপণ করেন, কূপ খনন করিয়া দেন এবং স্থানে স্থানে বিশ্রাম গৃহ ও জলাধার নির্ম্মাণ করেন। রুগ্ন মনুষ্য ও পশুর জন্য চিকিৎসা ও চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করেন। জাগ্রত ও জীবন্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার বিশ্বাস না থাকিলেও নৈতিক সাধনায় তিনি অতুল্য ছিলেন; পশুর প্রতিও তাঁর যে এই মৈত্রী ভাব, ইহার জন্য বৌদ্ধ-ধর্ম্ম জগতে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৭, জ্যৈষ্ঠ মাস।

১৮৩৮ শক।

আয় ...	৬৯৬৮৯
পূর্ব্বস্থিত ...	৪৫৬৮৵৩
সমষ্টি	১১৫৩॥৶০
ব্যয়	৬৯৬/৯
স্থিত	৪৫৭॥/৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদিব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ দুই কেতা গভর্ণমেণ্ট কাগজ	৪০০৲
সেভিংস ব্যাঙ্ক—	৪৯/০
নগদ	৮॥৩
	৪৫৭॥/৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ—

মাসিক দান	২০০৲
সাম্বৎসরিক দান	৮৲
আনুষ্ঠানিক দান	২৲
গচ্ছিত আদায়	২৫২॥/৩
হাওলাত আদায়	১৬৲
হাওলাত জমা	১৬১॥/৩
এককালীন দান	৫৲
গচ্ছিত	৪৲
	৬৪৯৵৯

তত্ত্ববোধিনী—

বকেয়া	১২॥৵০
হাল	১৪৲
মাশুল	৸৶৩
	২৭॥/০

পুস্তকালয়—

সমাজের পুস্তক	১০৸৵০
গচ্ছিত	৩॥৵০
কমিশন	৸/
মাশুল	৸০
	১৬/০

যন্ত্রালয়—

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৪৲
সমষ্টি	৬৯৬৮৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

পাথেয়	১০৲
কর্ম্মচারীদিগের বেতন	৪২।০
বিবিধ	৩।/০
বিজলীবাতি	৩৸৶০
গচ্ছিত	২১৭।৶
হাওলাত	১৩৲
	২৮৯৸৶০

তত্ত্ববোধিনী—

কাগজ	১৮৯॥৬
প্রবন্ধ	১৲
মাশুল	৪।/৬
কর্ম্মচারীদের বেতন	১৩৵০
বিবিধ	৫
	২১৭৩

পুস্তকালয়—

দপ্তরী	১০৶৩
গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	৩।০
মাশুল	৶৬
	১৩॥৵৯

যন্ত্রালয়—

কর্ম্মচারীদিগের বেতন	৯১৵০
ছাপার কাগজ ও কালী	৪॥৶০
প্রুফ কাগজ	৩৲
অক্ষর	৩০৲
দপ্তরী	৩৭।৶
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	৫৵০
মাশুল	৶০
পিরিষ প্রভৃতি সরঞ্জাম	১।৬
বিবিধ	১॥৶০
	১৭৫৶৬
সমষ্টি	৬৯৬/৯

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

প্রাণারামের জন্য প্রার্থনা।

হে প্রাণারাম পরমেশ্বর, এই শুভ পবিত্র সময়ে তোমার পবিত্র দর্শনলাভের জন্য এখানে আসিয়াছি। হৃদয়দেবতা তুমি, তুমি এস, তুমি এস—প্রাণের ভিতরে এস—আমাদের সমুদয় প্রাণ কাড়িয়া লইয়া তোমা দ্বারা সেই শূন্য স্থান পূর্ণ কর। তুমি আনন্দস্বরূপ, তুমি মঙ্গলময়, তুমি আমাদের পিতামাতা সকলই। তোমার মঙ্গলভাব সম্মুখে চিরবিরাজমান থাকিতে অমঙ্গলের কথা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় কেন? দয়াময় প্রভু, আমাদের প্রতি এতটুকু কৃপা কর—তোমার মঙ্গলভাব আমাদের নয়নের সম্মুখে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখ। আমাদিগকে তোমার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখ—প্রভু দয়া কর, আমাদিগকে তোমার সঙ্গে এক করিয়া দাও—তোমার বিরহের ব্যথা আর আমাদের সহ্য হয় না। তুমি জান যে আমরা সংসারে নিমগ্ন হইয়া কতবার ডুবিয়া যাই—অতল অন্ধকারের পাতালে ডুবিয়া যাই; কিন্তু যেখানেই যাই, সেইখানেই তোমার স্নিগ্ধ বিমল জ্যোতি ধ্রুবতারারূপে জাগ্রত দেখিতে পাই। তোমার সেই জ্যোতি অনুসরণ করিয়া যতই তোমার দিকে পুনরায় অগ্রসর হইতে থাকি, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ততই দূরে অপসৃত হইতে থাকে।

ইহা কথার কথা নহে যে তোমার সেই শীতল ক্রোড়ের শান্তিময় আশ্রয় পাইলে সংসারের জ্বালাতাপ কিছুই থাকে না। চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতি তোমার নিকট অপহৃত হইয়া যায়। তোমার সেই মধুর শান্তিপ্রদ জ্যোতি যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি আর কখনই তাহা ভুলিতে পারেন না। আমরা এখানে কি-ই বা মিষ্ট গান শুনিতেছি! ঐ সুনীল গগনের আশ্চর্য্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পরমদেবতা তুমি, আমাদের প্রাণের একমাত্র আরামস্থল পরমেশ্বর তুমি, তোমাকে ঘিরিয়া দেবতারা যে সুমিষ্ট গম্ভীর স্তুতিগানে বন্দনা করেন, সে গান যিনি শুনিয়াছেন, তিনি কি কখনো তাহা ভুলিতে পারেন? চেষ্টা থাকিলে মনুষ্যের ভাগ্যে এক আধবার সে গান তাহার কর্ণে পৌঁছিতে পারে, আর সেই জ্যোতি এক-আধবার তাহার নয়নে প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে মানুষ যদি প্রাণে তাহা না ধরিয়া রাখে, তবেই সে জ্যোতি সে গান অদৃশ্য ও অশ্রুত হইয়া যায়। তখন আমরা তাহার জন্য পাগল হইয়া যাই, পাগল হইয়াও যে আর তাহা ফিরিয়া পাই না।

করুণাময়ী মাতা, যখনই তোমার কথা ভাবি, তোমার স্নেহদয়া যখনই মনে পড়ে, তখন কি সংসারকে হৃদয়ে এতটুকুও স্থান দিতে ইচ্ছা হয়? কোথায় বা মর্ম্মরখচিত অট্টালিকা, কোথায় বা স্ত্রীপুত্র আত্মীয়স্বজনের বিন্দুপরিমিত ভালবাসা, সকলই তুচ্ছ অতি তুচ্ছ বলিয়া জানিতে পারি। তখন সকল সংসার ছাড়িয়া দিয়া, গিরিকন্দরে বৃক্ষতলে গিয়া তোমারই সঙ্গে নিয়ত বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

তোমারই সঙ্গে আহার বিহার, তোমারই সঙ্গে অভিন্ন থাকিয়া বিচরণ করিতে প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে।

আজ আমরা যে এখানে আসিয়াছি, হে বিশ্বজননি, তোমাকে না দেখিয়া ফিরিয়া যাইব? তাহা কখনই হইবে না। আমাদের মা তুমি, তুমি যে সকল স্থানেই আছ—যে দিকে প্রাণ খুলিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই যে তোমাকেই দেখিতে পাই। সংসারের কোলাহল পশ্চাতে পড়িয়া থাক—সংসারের কথা এখানে একেবারেই মনে স্থান দিব না। তুমি আমাদিগকে সুখশান্তি সকলই দিতেছ। তোমাকে একটীবার অনিমেষ নয়নে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতে চাই, তোমাকে হৃদয়ের সঙ্গী করিয়া লইতে চাই। তোমাকে দেখিয়া আমাদের প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাক। তোমারই কথা দিবানিশি শুনিতে চাই—অন্য কথা থামিয়া যাক। মাতা, তোমার চরণের তলে দাঁড়াইয়া কাতরপ্রাণে বলিতেছি—ছাড়িব না কভু চরণ তোমার। প্রাণমন সকলই তোমারই পদে সমর্পণ করিয়া দিতেছি। আমাদের প্রাণ হইতে দুঃখশোকের কঠোর ভার সমস্তই নামিয়া যাক।

হে প্রাণেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম, তুমি এস—ঐ অনন্ত আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমার করুণাধারায় আমাদের প্রাণমন সিক্ত ও কোমল করিয়া দাও, প্রেমের ডোরে তোমার সঙ্গে আমাদিগকে অবিচ্ছিন্নভাবে আবদ্ধ কর।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

তোমার এই একটি বিশাল সুরে
বাজবে যবে সকল প্রাণ
বাঁচবে তবে বাঁচবে তবে,
আমার এই বহুযুগের ব্যর্থ হওয়া
জীবন খানি
নাচবে তবে নাচবে তবে।
ঐ যে বাজে ঐ যে বাজে ঐ যে বাজে,
সন্ধ্যাতারায় বাজে, সিন্ধুদোলায় বাজে,
ঐ যে পাখীর গানে শাখীর তানে নদীর বাণে
ঐ যে বাজে গভীর রবে।
ওরে নাই রে ভয়, নাই রে ভয়, হবে রে জয়,—
ব্যর্থতার এই জীবনখানা শূন্য নয়;
ওরে আসবে রে দিন, আসবে রে দিন, বাজবে বাঁশী—
অন্তর তোর কাঁপবে তবে॥

আদিব্রাহ্মসমাজের সবলতা ও দুর্ব্বলতা।

আদিব্রাহ্মসমাজের সবলতা ও দুর্ব্বলতা লইয়া অনেক স্থলে অনেক প্রকারে আলোচনা হইয়া থাকে। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে যাঁহারা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই উপর উপর আলোচনা করিয়া যাহা হৌক একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, কাজেই তাঁহাদের সেই সকল সিদ্ধান্ত অনেক স্থলেই ভ্রমাত্মক হইয়া পড়ে। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে চাহেন না যে সত্য সত্য আদিসমাজ সবল বা দুর্ব্বল এবং তাহার সবলতাই বা কোথায়, আর কোথায়ই বা তাহার দুর্ব্বলতা।

যাঁহারা আদিসমাজকে দুর্ব্বল বলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই যুবক ও নব্যপন্থী। ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখে তাঁহারা আদিসমাজকে গণনারই মধ্যে আনিতে চাহেন না। আদিসমাজের কার্য্যে ধুমধাম কিছুই নাই, আড়ম্বর কোলাহল কিছুই নাই, বিজ্ঞাপনের ঘনঘটা কিছুই নাই, সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশের বিশেষ কোনই ব্যবস্থা নাই। তাই নব্যপন্থীগণ উপলব্ধি করিতেই পারেন না যে আদিসমাজে অন্তর্নিহিত একটা বল থাকিতে পারে। নীরব কার্য্যেও যে বলের পরিচয় পাওয়া যায় সে কথা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না বা বুঝিতে চাহেন না। তাঁহারা মুখে যাহাই বলুন, তাঁহাদের অন্তরের কথা এই যে, যেখানে হৈচৈ, যেখানে কোলাহল কলরব, সেই খানেই প্রকৃত বল আছে, সেই খানেই প্রকৃত কার্য্য হইতেছে। ধর্ম্মসমাজের কার্য্যে নীরব সাধনা দ্বারা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়াতেই যে প্রকৃত বলসঞ্চয় হয় সে কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান।

এদিকে যাঁহারা আদিসমাজকে সবল বলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই বৃদ্ধ ও প্রাচীনপন্থী। তাঁহারা

আবার ব্রাহ্মসমাজ বলিতে আদিসমাজকেই ধরিতে চাহেন, ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখাকে ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াই ধরিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কার প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কারের মোহঘূর্ণায় পড়িয়া নিজেদের বল এতই বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে এবং স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে এতই দূরে সরিয়া গিয়াছে যে সেই সকল ব্রাহ্মসমাজকে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচারের উপযোগী ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া আর চিনিতে পারা যায় না, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উপযুক্ত বল উহাদিগের আর নাই, এবং সেই সকল ব্রাহ্মসমাজের কোলাহলকলরবের মধ্যে নীরব সাধনার অবসরই পাওয়া যায় না। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা হয় তো ভুলিয়া যান যে সংসারে নীরব সাধনাও যেমন আবশ্যক, তেমনি সংসার একটী কর্ম্মক্ষেত্র, এখানে কর্ম্মসূত্রে কিছু গোলযোগ কোলাহল হইবেই।

উপরে যে দুই শ্রেণীর মত বলিয়া আসিলাম, ঐ উভয় মতেরই ভিতরে একটু পক্ষপাতদোষ লক্ষিত হয়। নিরপেক্ষভাবে বলিলে আমরা বলিতে পারি যে আদিসমাজ দুর্ব্বলও বটে, সবলও বটে। সংসারে লোকের অভাব হইলে অর্থের অভাব হইলে যে অর্থে সাধারণত লোকে দুর্ব্বল বলিয়া ধরে, সে অর্থে আদিসমাজ যে দুর্ব্বল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই দুর্ব্বলতার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা এমন এক স্থানে উপনীত হই, যেখানে আমরা আদিসমাজের অন্তর্নিহিত বল দেখিতে পাই এবং দেখি যে সেই বলের কারণেই, সেই বল হইতেই আদিসমাজের দুর্ব্বলতার উৎপত্তি। পুরাকালে যেমন অগ্নিহোত্রীগণ শত বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও নিজেদের অগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করিতেন, আদিসমাজও সেইরূপ শত বাধা শত বিবাদবিসম্বাদের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্মকে আদিম বিশুদ্ধ আকারে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যে আদিসমাজ সবল বিশ্বজয়ী উদারতার আকর ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিশুদ্ধ আকারে এতকাল ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহার সবলতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অন্য কোন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বিশ্বজয়ী উদারতা অক্ষত আকারে রক্ষা করাই আদিসমাজের দুর্ব্বলতার কারণ। আমরা সংক্ষেপে প্রহেলিকাপূর্ণ ভাষায় বলিতে পারি যে আদিসমাজের সবলতাতেই উহার দুর্ব্বলতা।

উদারতা যে ধর্ম্মের প্রাণ এবং ধর্ম্মসমাজে মতের বিশুদ্ধি রক্ষার সঙ্গে যে বিশ্বজয়ী সবল উদারতা রক্ষা করা যাইতে পারে, আদিসমাজের পূর্ব্বে একথা কোন ধর্ম্মসমাজ উপলব্ধি করিতেই পারে নাই। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই বিশাল উদারতা সংসারে আনয়ন করিয়াছে এবং আদিসমাজ তাহা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সেই বিশাল উদারতার ভিত্তি দুইটী—আদিসমাজের ট্রষ্টডীড * এবং ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ †। এই উভয়ই আবার একটী অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্যের উপর গ্রথিত। সেই সত্যটী হইতেছে—জগতের স্রষ্টা পাতা ও নির্ব্বহিতা পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেই তাঁহার উপাসনা নিষ্পাদন। এই সত্য যে পূর্ব্বে ঘোষিত হয় নাই তাহা নহে। ভারতের শাস্ত্রসিন্ধুর মধ্যে অপর পাঁচটী বিক্ষিপ্ত সত্যের মধ্যে এই সত্যটীও নিহিত আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সত্যকে বাছিয়া লইয়া সংহত আকারে আমাদের সম্মুখে ধারণ

* ট্রষ্টডীডের কয়েকটী মূল কথা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

(ক) যে পুরুষ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় এবং যাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না, যিনি এই জগতের স্রষ্টা ও পাতা, তাঁহার উপাসনা ও আরাধনার জন্য যে সকল ব্যক্তি ভক্তিভাবে আসিবেন এবং কোন গোলযোগ করিবেন না, তাঁহাদিগের সাধারণ মিলনস্থলরূপে এই সমাজগৃহ ব্যবহৃত হইবে, কিন্তু কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত উপাধি সেই নিত্যপুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারিবে না।

(খ) কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি ছবি বা খোদিত কাষ্ঠফলক, চিত্র প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারিবে না।

(গ) কোন প্রকার বলিদান বা আহুতি প্রদান হইবে না। ধর্ম্মের বা আহারের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণীহত্যা হইবে না।

(ঙ) কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক পূজিত কোন পদার্থের প্রতি উপাসনাকালে কোন নিন্দাসূচক বাক্য প্রযুক্ত হইবে না।

(চ) স্রষ্টা ও পাতা পুরুষের ধ্যানপ্রবর্ত্তক এবং দয়া, নীতি বদান্যতা ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে মিলনসাধক ব্যতীত অন্য কোন প্রকার উপদেশ, প্রার্থনা বা সঙ্গীত হইতে পারিবে না।

[টীকা—পাঠকগণ দেখিবেন যে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজকে সাম্প্রদায়িকতার অতীত করিবার জন্য কত না প্রয়াস পাইয়াছেন।]

† ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন ; অন্য আর কিছুই ছিল না ; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

করিয়াছে এবং এই কারণেই ইহাকে বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের আবিষ্কৃত সত্য বলিয়া বলা যায়। আবার, ইহার আবিষ্কার অবধি আদিসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায়, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভিত্তি এই সত্যটীকেও আদিম বিশুদ্ধ আকারে রক্ষা করিয়া ইহার উদারতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আদিসমাজের ট্রষ্টডীড এবং ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ, এই উভয়ের ভিতর সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি অন্য কোন বিষয়ের এমন কোন কথা প্রবেশ করানো হয় নাই, যাহা স্থানে বা কালে সীমাবদ্ধ, সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যাহার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর, অথবা ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের মতামতের উপর যাহার জীবন নির্ভর করে—এক কথায়, যাহাতে এতটুকুও সঙ্কীর্ণতা আসিতে পারে। যে চিরন্তন সত্যমূলক ট্রষ্টডীড ও ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের উপর আদিসমাজ দাঁড়াইয়া আছে, যে সত্যের মূলসূত্র দ্বারা আদিসমাজের কার্য্যসমূহ নিয়মিত হইতেছে, শত বিপ্লবেও সেই সত্যের তিলার্দ্ধও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। আদিসমাজ সেই সত্যকে একবিন্দু পরিমাণেও সঙ্কীর্ণ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে নাই। শুনিতে প্রহেলিকা বোধ হয় বটে যে এই অসঙ্কীর্ণ উদারতাই আদিসমাজের দুর্ব্বলতার কারণ।

ভগবৎপ্রতিষ্ঠিত সত্যমাত্রেরই উদারতা অপ্রতিহত—তাহা স্থান ও কালনির্ব্বিশেষে কার্য্য করিয়া থাকে। পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেই তাঁহার উপাসনা নিষ্পাদন, এই আধ্যাত্মিক সত্যটীও ভগবৎপ্রতিষ্ঠিত—ইহার উপর কেবল আদিসমাজ কেন, সমগ্র মানবসমাজ দণ্ডায়মান। বলা বাহুল্য যে এই সত্যেরও উদারতা অপ্রতিহত। জাতিনির্ব্বিশেষে, স্থানকালনির্ব্বিশেষে, ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবাত্মাই এই সত্যের কর্ম্মক্ষেত্র। কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, কি সাকারবাদী, কি নিরাকারবাদী, কি রাজতন্ত্রবাদী, কি প্রজাতন্ত্রবাদী, কি শ্রদ্ধাবান্, কি সংশয়বাদী, কোন ব্যক্তিই এই সত্যকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। কাজেই আদিসমাজও কোন ব্যক্তিকেই স্বসম্প্রদায়ের বহির্ভূত বলিয়া হেয়জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে পারে না; প্রত্যুত, কি সরল ব্রহ্মপথের পথিক, কি বিপথগামী, সকল মানবকেই আত্মক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া ব্রহ্মোপাসনার পথে প্রবর্ত্তিত করা এবং প্রত্যেক মানবের প্রত্যেক কার্য্যকে ব্রহ্মকেন্দ্রক করিয়া তোলাই আদিসমাজের কার্য্য। ভক্তিভাজন আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন যে "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মন্তব্য কথা এই যে, যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কেবল সেই সকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা সমূলে উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে ব্রহ্মোপাসনা অধিরূঢ় হউক, তাহা হইলেই ব্রহ্মোপাসক ভক্তজনগণের বিশুদ্ধ ধর্ম্মব্রত অব্যাহত থাকিবে।"

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থকে একই পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে না। যাবতীয় পদার্থ যদি একই পদার্থে পরিণত হইত, তাহা হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বই থাকিত না। সেইরূপ সকল মানবও কখনই এক বিশ্বমানবে পরিণত হইতে পারে না, এবং সকল জাতিও কখনই এক বিশ্বজাতিতে পরিণত হইতে পারে না। যতদিন মানুষেরা পৃথক পৃথক অবস্থার ভিতরে জন্মগ্রহণ করিবে, যতদিন প্রত্যেক মনুষ্য শত শত যুগের ঘটনাবলীর ফলে অভিব্যক্ত পৃথক পৃথক স্বভাব ও মানসিক গতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, ততদিন বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন কুলের, বিভিন্ন পরিবারের এবং বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রথা ও অনুষ্ঠান, বিভিন্ন কার্য্য ও চিন্তা থাকিবেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নদীর গতি কি একমুখী করা সম্ভব, অথবা একমুখী করিতে পারিলেই কি মঙ্গলজনক হইত? কখনই নহে। কিন্তু নদীসমূহের গতি বিভিন্নমুখী হইলেও প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে পরিণামে সমুদ্রের অভিমুখী না হইয়া যাইতে পারে না। তেমনি, আদিসমাজের মতে, সকল জাতির সকল ব্যক্তির সকল প্রথা ও অনুষ্ঠানকে, সকল কার্য্য ও চিন্তাকে একেতে পরিণত করিবার চেষ্টা কেবল বৃথা নহে, কিন্তু বোধ হয় কুফলপ্রসূও বটে। তাই আদিসমাজ বলে যে জগতের সমস্ত প্রথা ও অনুষ্ঠানকে, সমস্ত কার্য্য ও চিন্তাকে একেতে পরিণত করিবার পরিবর্ত্তে, প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক কুলের, প্রত্যেক পরিবারের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক প্রথা, প্রত্যেক অনুষ্ঠান, প্রত্যেক

কার্য্য ও প্রত্যেক চিন্তাকে ব্রহ্মকেন্দ্রক করিয়া তোলা হউক। সেই সকলকে ব্রহ্মকেন্দ্রক করিতে পারিলেই তাহাদের উন্নতিবাধক পরিত্যজ্য অংশ সকল আপনাপনিই খসিয়া যাইবে; জনসাধারণের মতিগতি ব্রহ্মের অভিমুখী হইলে যে সকল প্রথা ও অনুষ্ঠান, যে সকল কর্ম্ম ও চিন্তা, অথবা তাহাদের যে সকল অংশ পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগের বিরোধী দৃষ্ট হইবে, সেগুলি স্বভাবতই অবিলম্বে পরিত্যক্ত হইবে। এই সত্যের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া আদিসমাজ দেশবিদেশের সর্ব্বত্র ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তনেরই এত পক্ষপাতী। জগতে প্রথা প্রভৃতির পার্থক্য লইয়া, ছোটখাটো মতামতের পার্থক্য লইয়া যথেষ্ট বিবাদবিসম্বাদ, মারামারি ও রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। আদিসমাজ সমুদয় প্রথাকে সমুদয় চিন্তাকে একেতে পরিণত করিতে গিয়া, সকল মানবকে এক সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করিতে গিয়া এবং সুতরাং প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়া পুনরায় সংসারে নূতন করিয়া বৃথা বিবাদ বিসম্বাদ আনয়ন করিতে প্রস্তুত নহে। আদিসমাজ সকল প্রথা ও সকল কর্ম্ম ও সকল চিন্তাকে কেবলমাত্র ব্রহ্মকেন্দ্রক করিতে চাহে—তদ্ভিন্ন, বিভিন্ন প্রথা ও অনুষ্ঠানকে, বিভিন্ন চিন্তা ও কর্ম্মকে প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক কুলের, প্রত্যেক পরিবারের ও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ স্থান, কাল ও অবস্থার ভিতর দিয়া উন্নতির অভিমুখে অভিব্যক্ত করাইতে, ফুটাইয়া তুলিতে চাহে। আদিসমাজ কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি, কাহারই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কীর্ণ করিতে চাহে না। ইহাই আদিসমাজের উদারতা এবং ইহাই আদিসমাজের মজ্জাগত বল বিধান করিতেছে। আদিসমাজের এই উদারতা বিশ্বজয়ী,কারণ ইহার বলে আদিসমাজ সমগ্র মানবসমাজকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত নহে। আদিসমাজ নিজেকে সম্প্রদায়বদ্ধ করিয়া একথা বলিতে পারে না যে "অমুক ব্যক্তি আমার প্রচারিত প্রথা অনুসরণ করে না, আমার বিঘোষিত সত্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই, অতএব সে আমার সম্প্রদায়ের বহির্ভূত—আমি তাহাকে আমার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।" আদিসমাজ যেদিন একথা বলিবে, আমরা জানিব যে তাহার বহু পূর্ব্বেই আদিসমাজের মূল ভিত্তি বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আদিসমাজের প্রাণ উদারতা চলিয়া গিয়াছে—আদিসমাজ মরিয়া গিয়াছে। যতদিন আদিসমাজ মানবের ব্যক্তিত্ব সঙ্কীর্ণ করিয়া আপনাকে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত না করিবে, যতদিন আদিসমাজ রাজা রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীড এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ব্যক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের মূলসত্যের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে, ততদিন উহার উদারতা বিশ্বজয়ী থাকিবে এবং ততদিন সেই উদারতার উপরেই উহার সবলতা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

এইখানেই কিন্তু আমরা সেই প্রহেলিকা পুনরুক্ত করিতেছি যে আদিসমাজের সবলতাতেই উহার দুর্ব্বলতা। ইহা শুনিতে আশ্চর্য্য কথা বটে যে আদিসমাজের ঐ সবল বিশ্বজয়ী উদারতার ফলেই উহার লোকবলের এবং সুতরাং অর্থবলেরও অভাব—কিন্তু ইহা খুবই সত্য। হিমাচল হইতে স্রোতস্বিনী নদী যখন সবল উদারতা লইয়া নামিতে থাকে, তখন তাহার কি বল, কি বেগ! সেই বেগবলে নদী কত কূল ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং কত কূল গড়িয়া তোলে—ভাঙ্গন গড়ন লইয়া যেন খেলা করিতে থাকে। তখন তাহার উভয়কূলবর্ত্তী জীবজন্তুগণ সেই নদীর বল প্রতিপদেই অনুভব করিতে থাকে। কিন্তু যখন সেই আদিম উদারতার বেগবলে নদী সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সেই নদীর বল আর পূর্ব্বের মত অনুভূত হয় না—তাহা যেন মহাসমুদ্রের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যাইতে চাহে; তখন সেই নদীতে তালেতালে মহাসমুদ্রেরই জোয়ারভাঁটা খেলিতে থাকে এবং তাহার ভাঙ্গনের বেগ চলিয়া গিয়া তাহাতে যেন একটা অন্তঃসলিল গঠনের ভাব আসিয়া পড়ে—নূতন নূতন ভূমি অভিব্যক্ত করাইবার দিকেই যেন নদীর সমস্ত ঝোঁক পড়িয়া যায়। এখন ঐ হিমাচলপ্রসূত নদীর সে বেগবলই বা কোথায়, আর সে নির্ম্মলতাই বা কোথায়! সেই আদিম বল বিক্ষিপ্ত করিয়া, নদী বলহীন হইয়া, কর্দ্দমাবিল হইয়াই অগণিত জীবজন্তুর আশ্রয়স্থান গড়িয়া তুলিবার এবং দিগদিগন্ত স্বীয় প্রেমধারায় সিক্ত রাখিবার উপযোগিতা লাভ করিল। কিন্তু তাই বলিয়া নদীর প্রকৃত বলের অভাব হয় নাই।

উহার সমুদ্রমুখী গতি রুদ্ধ করিয়া দেখ, দেখিবে যে কি ভয়ঙ্কর বলের সহিত উহা সেই বাধা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া পুনরায় সাগরের অভিমুখে ধাবিত হইবে।

সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের সবল উদারতা যখন ভগবৎ-চরণের উচ্চভূমি হইতে নামিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহা কিরূপ নির্ম্মল এবং তাহার কি আশ্চর্য্য বেগবল ছিল। সেই বেগবলে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশবিদেশ ভাসাইয়া দিয়া কত মানবাত্মার অন্তরে উপধর্ম্মের পাহাড় ভাঙ্গিয়া সত্যধর্ম্মের আস্থান গড়িয়া তুলিয়াছিল। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মধর্ম্মের সবল উদারভাব বিস্তৃত হইতে হইতে বিশ্বজগতকে ছাইয়া ফেলিয়া বিশ্বপ্রেমের মহাসমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইতে চলিয়াছে। তাই আমরা দেখিতেছি যে ব্রাহ্মসমাজে তালেতালে সেই বিশ্বপ্রেমের জোয়ারভাঁটা খেলিতেছে। এখন যেন ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভাঙ্গনের বেগ সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়া একটা অন্তর্নিগূঢ় গঠনের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত মিলাইয়া নূতন নূতন ভাব ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই যেন বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় ঝোঁক পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মসমাজের সেই প্রথম বেগ, সেই আদিম নির্ম্মলতা চলিয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের দুঃখ কবিবার বড় বেশী কিছু নাই। ব্রাহ্মসমাজপ্রচারিত ব্রহ্মভাব জগতের ভাবে কর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তত্তৎস্থানের ও তত্তৎ-কালের ভাবাবিল হইয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু তাহার ফলে জগতের উপধর্ম্মসমূহ অল্পে অল্পে স্বীয় উপ-ত্ব পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্মে পরিণত হইবার দিকে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাবকালে স্থূল মূর্ত্তিপূজা খুবই প্রচলিত ছিল—জনসাধারণ শিলা প্রভৃতিকেই ঈশ্বরবোধে আরাধনা করিত। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারের ফলে সে ভাব সকলে না হউক, অন্তত শিক্ষিত সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইয়াছে। এখন অনেকেই বলেন যে তাঁহারা তো শিলা প্রভৃতিকে ঈশ্বরবোধে পূজা করেন না, শিলামূর্ত্তি প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরেরই আরাধনা করেন। আদিসমাজ বলে যে আমরা তো ইহাই চাহি যে এইরূপে জগতের সমস্ত উপধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক। এইপ্রকার ধীরে ধীরে সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা দেখিবার ইচ্ছার কারণেই আদিসমাজ জনসাধারণের নিকট দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কারণ অধিকাংশ লোকেই নিজ নিজ সমাজের মণ্ডলীভুক্ত থাকিয়াই ধীরে ধীরে ও বক্রগতিতে ব্রহ্মপথের পথিক হইতে চাহে, এবং অতি অল্প লোকেই আদিসমাজের মণ্ডলীভুক্ত থাকিয়া দ্রুতপদে ও সরল পথে ব্রহ্মপথের পথিক হইতে ইচ্ছুক হয়। আদিসমাজ নিজের জীবনের বিনিময়েও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদিম উদারতা রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আদিসমাজের প্রদর্শিত সরল পথে ব্রহ্মধামের প্রতি অগ্রসর হইবার অনিচ্ছার সর্ব্বপ্রধান কারণ সংসারী ব্যক্তিদিগের সংসারে আসক্তি। গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে মনুষ্যসহস্রের মধ্যে একজন হয়তো সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করে এবং দশসহস্রের মধ্যে যদি একজন ভগবানকে প্রাপ্ত হয় তো তাহাই যথেষ্ট। সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নই বল, আর ভগবানকে পাওয়াই বল, এই উভয়েরই প্রধানতম বিঘ্ন হইল সংসারে আসক্তি। সংসারে থাকিয়া যে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না, এমন কথা আমরা বলি না। তবে একথা আমরা চিরকাল বলিব যে সংসারে আসক্তি থাকিলে ঈশ্বরপ্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত। সংসারের লোকেরা যাহাতে তোমাকে মান দেয়, পূজা করে; সংসারে বড়লোক হইবার সর্ব্বপ্রধান উপায় অর্থ যাহাতে তোমার সর্ব্বতোভাবে হস্তগত হয়; সংসারের সুখসমৃদ্ধি যাহাতে পূর্ণ মাত্রায় তোমার হস্তগত হয়, সংসারে থাকিয়া তাহারই উপায় সাধনে যদি তুমি ব্যস্ত থাক, তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদীদিগের কথায় তোমাকে বলিতে পারি যে তোমার ভগবানকে পাইবার চেষ্টা বৃথা, তোমার উপাসনা বৃথা; তুমি বৃথাই বল যে তুমি ঈশ্বরকে প্রীতি কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নবান। অথচ সংসারে এই প্রকার আসক্তিবিশিষ্ট লোকেরই সংখ্যা বড় বেশী। যতক্ষণ তাঁহাদের সাংসারিক সুখে ব্যাঘাত না হয়, ততক্ষণ তাঁহারা ধর্ম্মের উপদেশ শুনিতে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে যথেষ্ট তৎপর থাকিবেন। আর, এইভাবে ধর্ম্মাচরণ করাওতো সংসারে খ্যাতিপ্রতিপত্তি বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। কিন্তু যখন তাঁহারা সংসারের সহিত ধর্ম্মের বিরোধ ঘটিতে দেখেন; যখন দেখেন যে ধর্ম্মকে অব-

লম্বন করিয়া থাকিলে সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের হানি হয়, খ্যাতিপ্রতিপত্তির হ্রাস হয়, বন্ধুবান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে,তখন তাঁহারা বিনা দ্বিধায় ধর্ম্মকে ছাড়িয়া সংসারকে প্রাণের সহিত জড়াইয়া ধরেন। তাঁহারা যখন দেখেন যে নিজেদের চিন্তা, নিজেদের কাজকর্ম্ম, নিজেদের গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়কে ব্রহ্মকেন্দ্রক করিলে তাঁহাদের সাংসারিক নানাবিধ সুখে ব্যাঘাত পড়িবার সম্ভাবনা, তখনই তাঁহাদের সংসারে আসক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে—তখন তাঁহারা যতটুকু ধর্ম্মাচরণ করিলে সংসারটী পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে ততটুকুই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে সম্মত থাকেন, তাহার অধিক অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহেন। তখন তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ, তাঁহাদের চিন্তারাজ্য হইতে প্রাণের বলপ্রদ, মুক্তির একমাত্র সোপান ব্রহ্মোপাসনার ভাব স্বভাবতই নির্ব্বাসিত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই বাস করিতে সুখ প্রাপ্ত হয়েন। তখন তাঁহারা সকল সুখের মূলাধার ব্রহ্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন। সুন্দরবনের আবাদ-অঞ্চলবাসী লোকেরা তথাকার প্রশস্ত অপ্রশস্ত খালবিলেরই মাহাত্ম্যকীর্ত্তনেই তৃপ্তিলাভ করে, কারণ সেই সকলের সাহায্যেই তাহাদের যতকিছু সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি লাভ হয়। যখন সেই সকল খালবিলের লবণাক্ত ও কর্দ্দমাবিল জলে তাহাদের পিপাসা নিবৃত্ত হয় না, তখন তাহারা নিজেদের প্রয়োজনসাধনের উপযোগী ছোটখাটো পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহারই জল ব্যবহার করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন সেই জলের মূল উৎসের প্রতি কৃতজ্ঞতা-দৃষ্টি উত্তোলিত করে, কয়জনই বা সেই মূল উৎসের পবিত্র বারিসেবনে উৎসুক হয়, এবং কয়জনই বা চিন্তা করিয়া দেখে যে সেই মূল উৎস না থাকিলে তাহাদের পুষ্করিণীতেও সুমিষ্ট জল পাওয়া যাইত না? কিন্তু আদিসমাজ জানে যে ঐ সকল সংসারাসক্ত ব্যক্তিও সময়ে আপনাদের অন্তরে সত্যধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভা অভিব্যক্ত দেখিয়া সরল ব্রহ্মপথের পথিক হইবেন। তাই আদিসমাজ তাঁহাদিগকেও স্বীয় বিশাল উদারতার ছায়া প্রদান করিতে এবং আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে বিরত হয় নাই। এমন সময় আসিয়াছিল, যে সময়ে আদিসমাজ নিজেকে সাম্প্রদায়িকতার দাসত্বে আপনাকে আবদ্ধ করিলে তাহার লোকবল ও অর্থবল প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আদিসমাজ নিজের জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্মপ্রচারক ব্রহ্মোপাসনাপ্রচারক সমাজের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছে। আদিসমাজ জানে যে ধর্ম্মের উদারতা রক্ষাতেই প্রকৃত জীবন এবং সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনেই প্রকৃত মৃত্যু। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই যে আদিসমাজের বিশ্বজয়ী উদারতার সবলতাই উহার দুর্ব্বলতার কারণ হইয়া পড়িয়াছে।

তবে কি আদিসমাজের এই সবল বিশ্বজয়ী উদারতা রক্ষা করিয়া দুর্ব্বলতা পরিহারের কোনই উপায় নাই? আছে। যাঁহারা যে কোন কারণে হৌক, আদিসমাজের মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি একজনও সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মোপাসনা সাধন করেন, জীবনের প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক অনুষ্ঠান প্রত্যেক চিন্তাকে ব্রহ্মকেন্দ্রক করিয়া তুলেন, তাহা হইলেই আমরা দেখিব যে আদিসমাজের দুর্ব্বলতা কোথায় পলায়ন করিয়াছে। আমরা এটা যেন মনে রাখি যে প্রত্যেক মানবাত্মা সেই সর্ব্বাধিপতি বিশ্বাত্মা হইতে বিনিঃসৃত এক একটী বিস্ফুলিঙ্গ। সেই বিস্ফুলিঙ্গ মানবাত্মা যদি বিশ্বাত্মার মহাগ্নির সহিত একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করে তবে কে তাহাকে পরাভূত করিতে পারে? তখন যে লোকবল অর্থবল আদিসমাজের পদতলে গড়াইয়া আসিয়া পড়িবে। যিশুখৃষ্টের নামে যে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে—তাঁহারই বা লোকবল কত ছিল? বলিতে গেলে, বারজনের অতিরিক্ত তাঁহার লোকবল ছিল না। ধর্ম্মের ইতিহাসে, অধিকাংশ ধর্ম্মসমাজ সংস্থাপনের আদিম অবস্থায় লোকবলের ও অর্থবলের কত-না অভাব দেখা যায়। লোকবলের অভাবের জন্য ভীত হইবার কোনই কারণ নাই, যদি ভগবানের চরণে আমরা আত্মবলি প্রদান করিতে পারি।

ব্রহ্মোপাসনা সাধন করিতে গেলে আমাদিগকে যেমন ঈশ্বরে প্রীতি করিয়া নীরব সাধনার দ্বারা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, তেমনি সংসা-

রের রণক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের দ্বারাও আর এক দিক দিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। একেবারেই কোলাহল কলরব সহ্য করিতে পারিব না, একথা বলিলে চলিবে না। নীরব সাধনার নামে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলে চলিবে না। তাহা হইলে আমাদের উপাসনা অঙ্গহীন হইবে। আমাদিগকে ঈশ্বরে প্রীতিমূলক নীরব সাধনার সহিত তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনমূলক সর্ব্বপ্রকার শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। সংসারের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে যখন আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং আমাদের ইচ্ছা থাক বা না-ই থাক, সেই রণক্ষেত্রেরই চারিদিকে আমাদিগকে যখন অহর্নিশি বিচরণ করিতে হইবে, তখন ইহা আমাদের স্থির জানা উচিত যে আমরা সেই সংসারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিব না। সেই সংসার যখন সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত, তখন যাহাতে আমরা নীরব সাধনা দ্বারা আমাদের নিজেদের উন্নতি সাধনের সঙ্গে কর্ম্মসাধনা দ্বারা সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি সংসারের সকল বিভাগেরই কার্য্যকে ব্রহ্মকেন্দ্রক ও জগতের মঙ্গলসাধক করিতে পারি তাহারই বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সংসারের কার্য্য করিতে গিয়া তাহার কোলাহল কলরবের মধ্যে আমরা আত্মহারা হইয়া না পড়ি, অথবা বৃথা কোলাহল কলরব বৃদ্ধি করিতে উদ্যত না হই। আমাদের কর্ত্তব্য যে ব্রহ্মকে কেন্দ্রে রাখিয়া সকল কর্ম্ম করিবার জন্য আমরা স্থিরদৃষ্টি থাকি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজয়ী উদারতা সংরক্ষণ যেমন আদিসমাজের অন্তর্নিহিত মজ্জাগত বলবিধান করিতেছে, তেমনি আজ যদি আদিসমাজের মণ্ডলী সংসারের আসক্তি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্মে অগ্রসর হয়েন এবং সকল কর্ম্ম সকল চিন্তা সকল অনুষ্ঠানকে ব্রহ্মকেন্দ্রক করেন, তাহা হইলে বাহিরেও যে আদিসমাজের অনির্ব্বচনীয় প্রভাব অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যাঁহার কৃপায় তুমি মানবজন্ম লাভ করিয়া কত সুখসৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছ, তাঁহাকে ডাকিবার উচ্চতম অধিকার লাভ করিয়াছে, তোমার জীবনে তাঁহাকে বসাইতে পশ্চাৎপদ হইবে? তোমার যদি ইচ্ছা থাকে যে তুমি তোমার সকল কর্ম্ম ব্রহ্মকেন্দ্রক করিয়া তোমার জীবনকে ধন্য করিবে, তবে কাহার সাধ্য যে তোমাকে তাহা হইতে কেহ নিরস্ত করিতে পারে? এই বিশ্বরাজ্যের অধিপতি পরমেশ্বর যে স্বয়ং তোমার বলবিধান করিবেন। আর যদি তোমার সে বিষয়ে শুভমতি না হয়, সংসারসুখের নিকট যদি তুমি তোমার মস্তক অবনত করিতে চাও, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখিও যে তুমি কি ভয়ঙ্কর দৈন্যের আশ্রয় গ্রহণে উদ্যত হইতেছ। এরূপ মস্তক অবনত করিবার সপক্ষে অবশ্য তোমার যুক্তির অসদ্ভাব হইবে না। তুমি তোমার কার্য্যের কতপ্রকার সঙ্গতি খুঁজিয়া বাহির করিবে, তোমার কার্য্যের ফলে সংসারের কত উপকার দেখাইতে পারিবে—তুমি কত শত যে যুক্তি দেখাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে ব্রহ্মকেন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট হইলে তোমার দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে যাইবার পথ প্রশস্ত হইবে। পরমেশ্বর অবশ্য তোমায় পরিত্যাগ করিবেন না—তিনি মৃত্যুর ভিতর দিয়াও তোমাকে জীবন দান করিবেন, অমৃতে লইয়া যাইবেন। কিন্তু আমাদের কথা এই যে আমরা সেই মৃত্যুর কঠোর আঘাতের ভিতর দিয়া জীবনলাভ করিতে যাইব কেন?

বন্ধুগণ! আমরা যতই দেখিতেছি, যতই আলোচনা করিতেছি, ততই এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় হইতেছি যে আমাদের প্রত্যেক কর্ম্ম ও অনুষ্ঠানে ব্রহ্মোপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত না করিলে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তাকে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে ব্রহ্মকেন্দ্রক না করিলে কিছুতেই প্রকৃত মঙ্গল নাই। আইস, আমরা যদি ঈশ্বরকে সত্যই প্রাণের সহিত ভালবাসি তবে আমরা সংসারের সুখসম্পদের প্রলোভনে প্রমুগ্ধ না হইয়া, সংসারের শত দুঃখলাঞ্ছনার মৃত্যুদণ্ডে ভীত না হইয়া ব্রহ্মপথে অগ্রসর হই; ধর্ম্মের উদারতা রক্ষা করিয়া আমাদের সমস্ত জীবনকে ব্রহ্মকেন্দ্রক করিয়া তুলি, ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনের অণুতে অণুতে মিশাইয়া লই। তাহা হইলেই আমরা দেখিব যে আমাদের জীবনের প্রতি তারে সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলধ্বনি ঝঙ্কার দিতেছে, আমাদের সন্তানসন্ততি

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়াছে; আবার আমাদের এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি ব্রহ্মনামের পতাকা লইয়া জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে সকল বিষয়ে বিশ্বজয়ী রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে পারিবে।

আমিই জীবন।

(শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ)

জীবন, আমিই জীবন।
বিশ্বকুঞ্জে আমি যে দখিনা পবন—
আমিই জীবন।
অচেতনে আমি চেতনা করি যে দান,
শক্তির সুরা আমিই করাই পান;
নিদ্রা ছুটাই তন্দ্রা ঘুচাই, জাগাই যে জাগরণ—
আমিই জীবন।
মুদিত কলিকা আমারি পরশে ফুটে,—
বুকের সুরভি আমারি তাড়নে ছুটে,—
তুলি রূপতরঙ্গ আলোকে ভরি গগন।
আমিই জীবন।
খুলে দেই আমি শতেক রুদ্ধ দ্বার,
কুঞ্জভবনে কা'রা করে অভিসার,
বাঁশরী বাজাই ভকতে নাচাই তালে-তালে সারাক্ষণ—
আমিই জীবন।
মরমে মরমে করাই যে পরিচয়—
অচেনার সনে অচেনার পরিণয়;
পাতি বিশ্বভুবনে পুষ্পসজ্জা শয়ন—
আমিই জীবন।
অচেনা চিনাই,—করি যে সুপরিচিত,
হৃদয়ে হৃদয়ে তুলি মিলনের গীত;
হেরি আনন্দ মাঝে আনন্দ নিমগন—
আমিই জীবন॥

বেদান্ত ও ভক্তিধর্ম্ম।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন শাস্ত্রী)

ভক্তিধর্ম্ম ভারতের আদি ধর্ম্ম। ভারতের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ বেদেও এই ভক্তিধর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেও ভগবানের নানা প্রকারের স্তুতি ও নানা প্রকারের পূজার ব্যবস্থা রহিয়াছে। সকাম নিষ্কাম পূজা সমস্তই ভক্তির উপরেই নির্ভর করে। ভগবানকে পূজা করিতে হইবে না, ভক্তি করিতে হইবে না, স্তুতি করিতে হইবে না, আমিই ভগবান এই প্রকারের জ্ঞানের উদয় হইলেই মানব মুক্তিলাভ করিবে এবং ইহাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এরূপ উপদেশ ঋগ্বেদে কেন, তাহার বহু পরে প্রণীত গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের পরে সামও মধুর কণ্ঠে সেই ভগবানের প্রেমসংগীতই গাহিয়াছিল। যে উপনিষৎ অবলম্বনে দার্শনিকগণ পূজ্য ও পূজককে একীভূত করিয়া উপরোক্ত শুষ্ক জ্ঞানের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন সেই উপনিষদেও ভগবানের পূজা, ভগবানের স্তুতি, তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রেমবিষয়ক উক্তির অভাব নাই। পুরাণগুলি যে ভক্তিধর্ম্মই আগাগোড়া সমর্থন করিয়াছে একথা বাহুল্য করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্‌ভাগবত এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করে।

এই ভক্তিপ্লাবিত ভারতে উপরোক্ত শুষ্ক জ্ঞানের পন্থা কোথা হইতে এবং কি প্রকারে আসিল? উপনিষৎ অবলম্বনে বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাস, যিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও প্রণেতা *। সাধারণের বিশ্বাস যে বেদান্তদর্শনই উপরোক্ত শুষ্ক জ্ঞানপন্থার প্রবর্ত্তক।

যে মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্‌ভাগবত লিখিয়া ভক্তিস্রোতে ভারতভূমি প্লাবিত করিয়াছেন তিনি যে এরূপ একটা অদ্ভুত রকমের শুষ্ক পন্থার পক্ষপাতী হইয়া দর্শন লিখিবেন তাহা তো আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ধারণা হয় না। বেদান্ত দর্শন তিনি লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি তাহা আমরা তাঁহার নিকট শুনিবার সুবিধা পাই নাই। তাঁহার সেই সূত্রগুলি স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত। সে গুলিকে লইয়া নানাজনে নানা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেইরূপ একটী ব্যাখ্যার ফলে ঐরূপ একটা মতেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস দায়ী

* এবিষয়ে মতভেদ আছে। তং সং

নহেন, ভাষ্যকারগণ দায়ী। তাই শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন।

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল।
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া,
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান,
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন।
উপনিষৎ শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়,
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাসসূত্রে সব কয়।
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা।

* * *

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ,
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে কর আচ্ছাদন।

চৈতন্য চরিতামৃত।

বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যই প্রধান। বলা বাহুল্য যে শাঙ্কর ভাষ্য হইতেই উপরোক্ত শুষ্ক জ্ঞানের পন্থার উৎপত্তি হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বিবর্ত্তবাদী। বিবর্ত্তবাদের মতে জগতের উৎপত্তি বিবর্ত্তনের দ্বারা হইয়াছে—অর্থাৎ জগৎ নাই, ব্রহ্ম আছেন,—ব্রহ্মে জগতের ভান হইতেছে। আমি, তুমি সকলেই ব্রহ্ম কিন্তু ব্রহ্ম হইলেও ভ্রমবশতঃ ব্রহ্ম মনে না করিয়া আমি তুমি মনে করিতেছি। এই ভ্রম দূর হইয়া গেলে আমি তুমি আর থাকিবে না সব ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। তখন আমরা পরমানন্দময় হইয়া যাইব। এই ভ্রম দূর করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং তাহা করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হয়। জ্ঞানই মুক্তি।

আচার্য্য শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যাতে যেমন বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিয়াছেন তেমনি অন্যান্য ভাষ্যকারগণ পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্বপ্রকাশিত "বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধে তাহা দেখান হইয়াছে। বিবর্ত্তবাদের মতে ভক্তি উড়িয়া যায়, আর পরিণামবাদে ভক্তিই একমাত্র অবলম্বন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শাঙ্কর ভাষ্যের সময় হইতেই ভারতে ভক্তিধর্ম্মের আধিপত্য কতকটা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বাধা প্রাপ্ত হইলেও লোপ হয় নাই। তাহার পর গুরু নানক, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য তুকারাম প্রভৃতি ভক্তগণ আবার ভক্তিধর্ম্মের দুন্দুভি নির্ঘোষিত করিয়া উহাকে আবার জাগাইয়া তুলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করাচার্য্য যে ভক্তিধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিলেন তাহা নহে—তিনি নিজেই একজন মহাভক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এবং তাঁহার রচিত স্তব স্তোত্রাদি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ভক্তিই তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল। তাঁহার ভক্তি পরা ভক্তি। সে ভক্তি ও জ্ঞান একই বস্তু। তবে তিনি বেদান্তের ব্যাখ্যা এরূপ করিলেন কেন?

একটা কথা আছে "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্"—পায়ে কাঁটা ফুটিলে কাঁটা দিয়াই তাহা বাহির করিতে হয়। শূন্যবাদী বৌদ্ধদের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। সেই সংগ্রামে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। শূন্যবাদীদের মতে জগতের পরে আর কিছুই নাই—শূন্য। জগতের মূল কেহই নাই; জগতই মূল—অনাদি অনন্তকাল আছে। এই মতে ঈশ্বর ব্রহ্ম কিছুই থাকে না। জগত লোপ হইয়া গেলে আর কিছুই থাকে না। আচার্য্য সেই মত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে জগতই মিথ্যা—জগতের মূল যে ব্রহ্ম তিনিই সত্য; জগত লোপ হইয়া গেলে ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইবে—শূন্যময় হইবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শূন্য নহে, ইহা এক অনাদি অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপর প্রতিভাসিত হইতেছে; বিশ্ব লোপ হইয়া যাইবে কিন্তু তাহার আধার ব্রহ্ম চিরকাল থাকিবে। এইরূপ বিচারে তিনি বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন এবং বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যাতে বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিয়া অকাট্য যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। তৎকালে এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছিল। নাস্তিক বৌদ্ধদিগকে আস্তিকতার তর্কের দ্বারা পরাজয় করা সহজ হইত না। যে, যে পথে চলে, সেই পথ অনুসরণ করিয়া তাহাকে নিজ পথে আনাই পাণ্ডিত্যের পরিচয়। আচার্য্য তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি কেবল বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া নিরস্ত থাকেন নাই; বৌদ্ধ শ্রমণদের অনুকরণে একদল হিন্দু সন্ন্যাসী সৃষ্টি করিয়া ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ সংস্থাপন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বহুল প্রচারের

ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ ভারত হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। বেদান্তের ঐরূপ ব্যাখ্যা তৎকালে আবশ্যক হইয়াছিল। উহা বৌদ্ধ পরাজয়ের জন্য যতটা, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ততটা আবশ্যক হয় নাই। যাঁহারা বিশ্বাসী ভক্ত, তাঁহাদের জন্য এ ব্যাখ্যা নহে। যাঁহারা ভক্তিহীন বিশ্বাসহীন তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের পথে আনিবার ইহা এক অমোঘ অস্ত্র সন্দেহ নাই। ভক্ত এ ব্যাখ্যা চাহে না। এ কঠোর মত ভক্তের প্রাণে বড়ই আঘাত করে। তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার সখা, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা এ অতি সুন্দর ভাব। আমিই তুমি, "শিবো-ঽহং" এ কথা শুনিতে যেন প্রাণে একটা ভীতির সঞ্চার হয়, হৃদয়ের কোমলত্ব কাঠিন্যে পরিণত হইয়া যায়। প্রভো, এ জ্ঞান আমরা চাহি না।

বিলাসভীতি।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এ বিপুল বিলাসের মাঝে
তাঁহার সঙ্গীত নাহি বাজে।
কি মোহে ভুলেছো বিশ্বরাজে—
কি মোহে ভুলেছো তাঁর কাজে ?
এখন বিলাস-কুতূহলে
তোমার আমোদ বেশ চলে—
স্ফূর্ত্তি বেশ বিলাসের বলে ;
পরে ফাঁস পড়িবে গো গলে।
এ বিলাস বৃথা, দাও ছাড়ি—
জান না এর নক্ষত্র নাড়ী ;
এরে যদি না ফেল উপাড়ি,
এ তোমার সব লবে কাড়ি—
এ বিলাসমোহ ফেল ঝাড়ি।

দেবতার সাড়া।

(শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত এম-এ,)

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, অন্ধকারের পরপারস্থিত গভীর রহস্যময় সেই অবাঙ্মনসগোচর পরম পুরুষের স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে এমন মানব জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই এবং করিবেও না। তাই ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনে মানবের শাস্ত্র অসম্পূর্ণ, ভাষা মূক। বহু পাণ্ডিত্য বা মেধা দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না—নমেধয়া ন শ্রুতেন। ক্ষুদ্র কূপমণ্ডুক আমরা সেই অনন্ত মহাসাগরের বার্ত্তা কি প্রকারে পাইব ? ভরসা এই যে সেই কূপস্থিত বারি অবলম্বনে যদি বিশাল বারিধির দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারি।

তাঁহার পূর্ণস্বরূপ আমাদের নিকটে চিরদিনের জন্য অজ্ঞেয় থাকিলেও জগতে তাঁহার অস্তিত্ব ও ইচ্ছাপ্রকাশের আয়োজনের অভাব নাই। আমাদের কাছে কাছে থাকিয়া আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই ধরা দিবার জন্য সেই অনন্তদেব প্রস্তুত রহিয়াছেন। বহির্জ্জগতও তাঁহার সঙ্গে নিত্যই আমাদের সাক্ষাৎকারের উপায় করিয়া দিতেছে, আবার আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে আত্মা আছে সেই আত্মাও নিত্যই তাঁহার পরিচয় দিতেছে। সূর্য্য তাঁহারই শক্তি প্রকাশ করিতেছে, মকরন্দবাহী সমীরণ তাঁহারই গন্ধ বহন করিয়া আনিতেছে, বিকশিত কুসুমে তাঁহারই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে। যে মহাশক্তি জ্ঞানময় পুরুষ এই ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছেন, জীবগণকে পালন করিতেছেন, যাঁহার আদেশে গ্রহগণ শূন্য পথে স্বীয় নির্দ্দিষ্টকক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, বায়ু বিদ্যুৎ যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান, তাঁহার পরিচয়ের অভাব কোথায় ? ঊর্দ্ধে নীল নভোমণ্ডল, পদতলে শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা, সম্মুখে পত্রপুষ্পসজ্জিত বৃক্ষরাজি, এ সকলই সেই ভুবনমোহনের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। বিহগকূজিত ঊষা, প্রভাতের অরুণকিরণরঞ্জিত কনকতপন, শরতের পৌর্ণমাসী রজনীর বিমল জ্যোৎস্না, অমানিশির গভীর অন্ধকার, এ সকলেতেই তিনি অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগতে কেবলই আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। বসন্তের কুসুমরাশি সেই আনন্দময়েরই হাসি ; পাহাড় পর্ব্বতের বক্ষ ভেদ করিয়া এই যে অগণিত নদনদী প্রবাহিত হইতেছে, এ সকল সেই অখিলজননীরই বক্ষনিঃসৃত ক্ষীরধারা। যাঁহারা কবি, তাঁহারা নদীর প্রতি তরঙ্গে সেই অনন্তপুরুষের ছায়া দেখিয়া তন্ময় হইয়া যান। বৈশাখের প্রবল ঝটিকায় যখন প্রকৃতি প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন

ভক্ত সেই মহাশক্তি পুরুষের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত থাকেন। এই প্রকারে ভগবানকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলে আমাদের জ্ঞানগরিমা শিক্ষার অহঙ্কার সকলই চূর্ণ হইয়া যায়। তখনই আমরা "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" এই বাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করি। জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা কে সেই পূর্ণপুরুষকে দেখিতে পাইবে? সূর্য্য গগনে উদিত হইলেই মানুষ তাহাকে দেখিতে পায়—প্রদীপের সাহায্যে কে কবে তাহার সন্ধান পাইয়াছে? "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং" যে সাধক তাঁহাকে পাইবার জন্য সাধনা করেন, ভগবান তাঁহারই নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। উপনিষদের এই কথা সেই সময়ের কথা, যখন এদেশ জ্ঞানে গরীয়ান ছিল এবং যখন এদেশ ধর্ম্মজগতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিত। ইহা সেই সময়ের কথা, যখন প্রাণের ভিতরে ভগবানের সাড়া পাইয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অসংখ্য ঋষি তাঁহার অন্বেষণে গিরিকন্দরে জীবন অতিবাহিত করিতেন।

ভগবানের সাড়া পাইয়া মানুষের তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইবার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। বিভিন্ন মানবের হৃদয়ে বিভিন্ন উপায়ে ভগবান সাড়া দিয়া মানবকে মুক্তিপথের অধিকারী করেন।

দস্যু রত্নাকর যখন ছদ্মবেশী নারদকে হত্যা করিয়া তাঁহার বস্ত্রাদি লুণ্ঠন করিতে উদ্যত হইল দেবর্ষি নারদ তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! নিত্য নিত্য কুকর্ম্ম করিয়া যে এত পাপ সঞ্চয় করিতেছ ইহা কাহার জন্য? এ পাপরাশি কাহার মস্তকে অর্পণ করিবে? তোমার এ পাপের ভাগী হইবে কে?" রত্নাকর তখন বলিল "কেন ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের উদরান্নের জন্য আমি এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাঁহারাই আমার অর্জ্জিত এই পাপ রাশিও বাঁটিয়া লইবেন।" নারদ তখন বলিলেন "আচ্ছা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস দেখি, আমি ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করি।" দস্যু নারদকে বৃক্ষশাখায় উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক পিতামাতা ও স্ত্রীকে একে একে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিল, এবং প্রত্যেকেরই নিকট একই উত্তর লাভ করিল যে সে তাহাদের প্রত্যেককে ভরণপোষণ করিতে ধর্ম্মত ও ন্যায়ত বাধ্য; সে উহা কিপ্রকারে করে তাহা জানা তাহাদের কাহারো আবশ্যক নাই এবং তাহার কৃত পাপও কোনও প্রকারে তাহাদের কাহাকেও স্পর্শ করিবে না। তখন রত্নাকর প্রাণের মধ্যে রুদ্রদেবের সাড়া পাইল, ভগবানের ন্যায়দণ্ড প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ে স্পষ্টতর উপলব্ধ হইতে লাগিল। এই একটি ঘটনায় তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দস্যু রত্নাকর তখন ঋষি নারদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল এবং তাঁহার পদযুগল স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া বলিল "ব্রাহ্মণ! আপনি দেবতা, আমাকে মুক্তির পথ বলিয়া দিউন।" অবশেষে সেই নারদ মুনির উপদেশে দস্যু রত্নাকর উত্তরকালে জগৎপূজ্য ভগবদ্ভক্ত ঋষি বাল্মীকি হইলেন।

ইহা পৌরাণিক যুগের কথা। কিন্তু পরলোকগত প্রসিদ্ধ জমীদার লালাবাবুর আকস্মিক পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান যুগের ঘটনা। একদিন তিনি সায়াহ্নের প্রাক্কালে শিবিকারোহণে কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন পথিপার্শ্বস্থিত কোন গৃহে এক বালিকা তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে "বেলা যে যায়"; শুভক্ষণে এই শব্দ তিনটি বালিকার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। উহা তাহার "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল" আর তাঁহার প্রাণ সেই ভবসিন্ধুর কর্ণধারের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার করুণ আহ্বান শুনিতে পাইলেন, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহারই দিকে ছুটিলেন। তাঁহার বিলাস বাসনা কোথায় ভাসিয়া গেল।

কখন কখন ক্ষমার মধ্য দিয়া ভগবানের এই বাণী পাপীর হৃদয়ে পৌঁছায়। প্রভু নিত্যানন্দ যখন ভগ্ন কলসীখণ্ডে স্বীয় কপাল দেশে আহত ও রক্তাক্ত হইয়াও প্রহারকের প্রতি "মেরেছ মেরেছ কলসীর কাণা তাই ব'লে কি প্রেম দিব না" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তখন সেই ক্ষমার বাণী পাষণ্ড জগাই মাধাইয়ের প্রাণে অমৃতের ধারা ঢালিয়া দিল। তাহাদের সমক্ষে এক নূতন জগৎ খুলিয়া গেল। নিত্যানন্দের প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনে তাহারা অমৃতের সন্ধান লাভ করিল। নিত্যানন্দের

বাণীই এখানে ভগবানের সাড়া, তাঁহার ক্ষমা নিমিত্ত মাত্র।

কখন বা তাঁহার এই সাড়া ভৎর্সনার ভিতর দিয়াও আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। কাব্যে পতিতার মৃদু ভৎর্সনায় বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তনের কাহিনী পড়িয়াছি। কিন্তু ভক্ত কবি তুলসীদাসের ভক্তিলাভ বর্ত্তমান যুগের ঘটনা। তিনি অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি পত্নীবিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। অতএব সেই রমণীর অদৃষ্টে পিত্রালয় দর্শনের সুখ ঘটিয়া উঠিত না। একদিন তুলসীদাস কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন, এই অবসরে তাঁহার শ্যালক তুলসীদাসের পত্নীকে লইয়া স্বীয় আলয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল পরেই তুলসীদাস আপন আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পত্নীপরিত্যক্ত শূন্য গৃহ দেখিয়া তুলসীদাস অধীর হইয়া উঠিলেন। পত্নী ও শ্যালকের কৌশল বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। বিরহব্যথায় কাতর তুলসীদাস ঊর্দ্ধমুখে শ্বশুরালয়ের দিকে ছুটিলেন। অবশেষে পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া নির্লজ্জের ন্যায় একেবারে শিবিকার আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনীকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রীড়ান্বিতা রমণী স্বামীর উন্মত্ততা দর্শনে অতিশয় দুঃখ ও ঘৃণার সহিত বলিয়া ফেলিলেন "তোমাকে ধিক্, অনুক্ষণ পত্নীর রূপরাশি দর্শন করিবার জন্য তোমার যে উন্মত্ততা, ভগবান রামচন্দ্রকে লাভ করিবার জন্য যদি তোমাতে ইহার শতাংশের এক অংশও দেখিতে পাইতাম তবে আরও সুখী হইতাম ও তোমার জীবনও ধন্য হইয়া যাইত"। পত্নীর এই মৃদু ভৎর্সনা তুলসীদাসের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত স্ত্রৈণতারূপ বিষপাদপকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি জাগিয়া উঠিল। এই ভৎর্সনার মধ্যে তিনি ভগবানের আহ্বান শুনিতে পাইলেন; তাই আজ জগতের ভক্তদিগের মধ্যে তুলসীদাসের নাম শীর্ষস্থানীয়।

সময়ে সময়ে কঠোর শাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও উচ্ছৃঙ্খল মানব ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়। এইরূপ ঘটনা জগতে অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়। নীতিবিগর্হিত কর্ম্মের স্রোতে কোনও ব্যক্তি হয়তো আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছে, সত্যের দিকে, ন্যায়ের দিকে, আপন কর্ত্তব্যের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিতেছে না, অকস্মাৎ একদিন তাহার বংশোজ্জ্বলকারী একমাত্র ও উপযুক্ত পুত্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিল। গৃহে গভীর বিষাদের ছায়া পড়িল। পত্নীর ক্রন্দনে, পুত্রবধূর কাতর আর্ত্তনাদে তাহার বক্ষের অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল "এতো আমার পাপেরই ফল"। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। পাপী অমনি বলিয়া উঠিল—"ভগবন্! বুঝিয়াছি, আর না, আর পাপে মন দিব না। আমার পাপের উপযুক্ত দণ্ডই হইয়াছে। এখন প্রায়শ্চিত্ত—জ্যোতির্ম্ময়! দয়া করিয়া পথ দেখাও"। এই একটি ঘটনায় তাহার প্রাণে ভগবান প্রকাশিত হইলেন। সেই ভীষণ মৃত্যুদণ্ডের ভিতর দিয়া পাপী সেই রুদ্রদেবের বজ্র উপলব্ধি করিয়া পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথের পথিক হইল।

চেয়ো না অর্থ।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ,)

মাগো! আমার কাছে চেয়ো না তুমি অর্থ;
অর্থ জানি—সে কেবল ঘটায় অনর্থ,
মনের মাঝারে জাগায় মলিন স্বার্থ ;
হীন করি তার সম, ভুলায় পরমার্থ।

করতে আমায় চেয়ো না মা ধনীর মাঝে ধনী,
ভাই সে আমার করবে উপায় অনেক রতনমণি ;
অনেক বিদ্যা শিখে আমি হব না মা জ্ঞানী,
ধুলায় মাগো থাকবো লুটে, জীবন ধন্য মানি।

নাইবা দশে বল্‌লে গো মা ছেলেটী বড় ভালো,
নাইবা ঘরে জ্বল্‌লো আমার অতি উজ্জ্বল আলো।
ওমা মোটা কাপড় পরবো আমি বাঁধবো মাঠে বাস,
রাখাল যেথা চরায় ধেনু, ফোটে ফুলের রাশ।

আমি তোমায় শুনিয়ে যাব এমনিতর গান,
কাঁপবে আকাশ নাচবে বাতাস তুলবে নদী তান ;
সেই গানেরই মাল্যখানি উড়বে শূন্য মাঝে,
বিশ্ব জুড়ে শুনবে তোমার পুত্রেরি গান বাজে।

আর কি তোমায় বলবো গো মা, কিই বা আমি জানি;
দীনহীনের ক্ষুদ্র বুদ্ধি লও মা সত্য মানি ;
এই যে স্নিগ্ধ নীলিমাময় স্নিগ্ধ আকাশখানি—
শেষে, এরই মাঝে মিলিয়ে যাব রাখি' সত্য-বাণী।

বর্ত্তমান সংস্কৃত শিক্ষা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য বেদান্ততীর্থ)

বর্ত্তমান সময় যে প্রণালীতে এই দেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা চলিতেছে এই প্রণালী সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রকৃষ্ট কিনা তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

প্রাচীন সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ যে সকল পরম সত্যের আবিষ্কার করিয়া গ্রন্থবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না কেন? আমাদের মনে হয় তাঁহারা যে প্রণালীতে এবং যে প্রকার অধিকারীকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন সে প্রণালীতে সে প্রকার অধিকারী দ্বারা শাস্ত্র অধীত হইতেছে না, তাই অনেক স্থলে অক্ষরার্থ পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতে বর্ত্তমান অধ্যাপকগণ অসমর্থ হয়েন। ঋষিদের অনুশাসন এই যে ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে; তাঁহারা বলিয়াছেন প্রকৃত মুমুক্ষু ব্যক্তিকে মোক্ষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে, কিন্তু এখন আর ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনও করা নাই এবং মুমুক্ষু অমুমুক্ষু নির্ব্বিচারে সকল অবস্থায় সকলেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। প্রত্যেক শাস্ত্রের অধিকারী বিষয়ে গ্রন্থকারগণ কি নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা এস্থানে বলিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

পূর্ব্বে গর্ভাষ্টমে উপনয়ন হইলেই গুরুগৃহে মানবক চলিয়া যাইত, দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তথায় গুরুর নিকট বিদ্যা অভ্যাস করিয়া সমাবর্ত্তন করিত এবং পরে বিবাহাদি করিয়া সংসারী হইত। ইহা হইল অতি প্রাচীনকালের কথা; মধ্যযুগেও যে ভাবে এদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হইয়াছিল তাহাও এখন হইতেছে না। যে উচ্চ আদর্শকে ভিত্তি করিয়া মধ্যযুগে অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা করিতেন সে আদর্শ এখন আর নাই। যদিও এখন কোন কোন স্থানে অধ্যাপকগণ ছাত্রকে অন্ন দান করিয়া অধ্যয়ন করাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন আর সেই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে নাই। কেবল অধ্যাপকদিগের উপরই এবিষয়ে আমরা দোষারোপ করিতে চাহি না। বর্ত্তমান যুগের কাল-ধর্ম্মই ইহার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। বর্ত্তমান সময় উদরান্নের জন্য সকলেই প্রায় হাহাকার করিতেছে। তাহার পর মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোক বলিয়া পরিচয় দিতে হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি আবশ্যক। বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তি নিজেকে ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিলে সর্ব্বদা তাহাকে অর্থের জন্যই ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহার শাস্ত্রচিন্তা করিবার অবসর থাকে না; শাস্ত্রে তন্ময় না হইলেও শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধার করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পূর্ব্বে অতি দীনভাবে থাকিলেও শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকদিগকে লোকে দেবতার মত সম্মান করিত; এখন আর সে সম্মান নাই—দৈন্যগ্রস্ত অধ্যাপককে সকলে ঘৃণা করে। কাজেই অর্থের জন্য তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা অস্বা-ভাবিক নহে। তবেই দেখা যাইতেছে যে নির্জ্জনবাসী না হইলে শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের লোক সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ লোকদিগকে অর্থসাহায্য এবং সম্মান প্রদর্শন না করিলে প্রকৃত শাস্ত্রালোচনার উন্নতিসাধন অসম্ভব। অবশ্য মহামান্য গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর শাস্ত্রা-লোচনার উন্নতিসাধনার্থে কতকগুলি বৃত্তির নির্দ্ধা-রণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বে নিঃস্বার্থভাবে যে সকল পণ্ডিত ছাত্র অধ্যাপনা করিতেন তাঁহাদিগকে সমর্থ হিন্দুর সকল কার্য্য উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হইত; এবং বিশেষ সম্মানের সহিত, যিনি যে শাস্ত্রে যেরূপ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাকে তদনুরূপ বিদায় দেওয়া হইত। ইহা দ্বারাই পণ্ডিতগণের অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এখন আর লোকের সে ভাব নাই;

এইরূপে অধ্যাপকদিগকে দান করিলে যে কোন পুণ্য হয় এ ধারণা অনেকের নাই। যাঁহাদের এইরূপ একটা ধারণা আছেও যে পিতৃশ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান করিলে পুণ্য হইবে, সেই সকল ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের বাটীতেও সভাপণ্ডিতদিগের স্বার্থসন্ধানের ফলে প্রকৃত শাস্ত্রানুশীলনকারী হয়ত নিমন্ত্রণ পাইবেন না। আবার প্রকৃত পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ হইলেও সাধারণ একজন ব্রাহ্মণকেও যেরূপ বিদায় দেওয়া হইবে একজন শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতকেও হয়তো সেইরূপ বিদায় দেওয়া হইবে। এই সকল কারণে বঙ্গদেশের গৌরবস্বরূপ যে ন্যায় শাস্ত্র, তাহা অধ্যয়ন করিতে বহু পরিশ্রম করিতে হয় এবং সেই পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার নাই বলিয়া কোন ছাত্রই আর সহজে এই কুলিশকঠোর তর্ক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে চাহে না—ফলে, ভবিষ্যতে এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা এখনও যে ভাবে আছে এভাবে আর থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। এই তর্কশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের দ্বারস্বরূপ—এই শাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে কোন শাস্ত্রেই বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় না, অথচ এই শাস্ত্র রক্ষার জন্য কাহারই ব্যাকুলতা নাই। প্রাচ্য সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এখন পর্য্যন্ত এই শাস্ত্রের রহস্য সম্যক অবগত হইতে পারেন নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস যে সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের কোন ইতিহাস এপর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিক্ষার প্রাবল্যে অধিকাংশ মেধাবী ছাত্রই ইংরাজী পড়িতে যায় এবং তাহাদের মাতা পিতারও ইচ্ছা থাকে যে তাহাদের পুত্রগণ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া রাজকীয় বা কোন ব্যবসায়ীর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তথাপি ভারতের সৌভাগ্য যে এখন পর্য্যন্ত ন্যায়দর্শন প্রভৃতি শিখিবার ছাত্রের অভাব হয় নাই। ভবিষ্যতে হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা যে না আছে তাহা বলা যায় না। মাননীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার টোলের বিবরণে বলিয়া গিয়াছেন—"যেরূপ ইংরাজী শিক্ষার স্রোত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ইহাতে দেশে আর সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্র ভবিষ্যতে থাকিবে কি না সন্দেহ"। এই আশঙ্কার কারণেই তিনি টোলের অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য মহামান্য গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের দৃষ্টি ঐ দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পরই উপাধি পরীক্ষার সৃষ্টি এবং ছাত্র ও অধ্যাপকগণের বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাঁহার এই চেষ্টার ফলেই বোধ হয় সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রের এখনও অভাব হয় নাই এবং অনেক লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ও আলোচনা চলিতেছে।

আরও কতকগুলি দোষ আসিয়া শাস্ত্রালোচনার গভীরতা নষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বে কেহ কোন শাস্ত্রই গুরুর নিকট অধ্যয়ন না করিয়া তাহার অধ্যাপনা করিত না বা সেই শাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতে সাহসী হইত না। এখন আর গুরুমুখী বিদ্যার প্রয়োজন হয় না, যে কোন শাস্ত্র পড়িলেই শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যায়। যিনি হয়ত সাধারণ কাব্য কি ব্যাকরণের কিয়দংশ পড়িয়া কাব্যতীর্থ বা ব্যাকরণতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিও সুকঠিন দর্শন শাস্ত্রের দু একটী গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। আবার অনেকে সাহিত্যের এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও দর্শন শাস্ত্রের গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। শাস্ত্রগুলি এত সহজ হইয়াছে যে কেহ ইচ্ছা করিলেই বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি সুকঠিন শাস্ত্র সমূহের সম্যক্ সমালোচনা করিয়া ফেলেন! একটু ইংরাজী জানা থাকিলেত আর কথাই নাই; বৈদেশিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বাধীনভাবে তাঁহাদের ভাষায় যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অধ্যয়ন করিলেই সেই সকল শাস্ত্রে পল্লবগ্রাহিত্ব জন্মে, তাহার পর সেই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কথাই ভাষান্তরিত করিয়া স্থান বিশেষে সময় বিশেষে বলিয়া এক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করত অনেকে বড় বড় প্রত্নতত্ত্ববিদ হইয়া পড়েন! আমরা জানি অনেক প্রাত্নতত্ত্বিক শাস্ত্রে অতি সামান্য জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সুগভীর শাস্ত্রতত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিতেছেন। এই ভাব আসিল কেন? তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সকলেই নূতন কিছু চায়, পুরাতন গতানুগতিকতায় আর কেহ সন্তুষ্ট নহে, কাজেই বর্ত্তমানে বিশেষজ্ঞ হইবার ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন না; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাহার ফলে অনেক সময় অনুসন্ধানে তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চর্ব্বিতচর্ব্বণ

একথা বাহির হইয়া পড়ে। কেবল যে মেধাবী ছাত্রই বর্ত্তমান সময়ে হ্রাস হইয়াছে তাহা নহে, বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকও বর্ত্তমান সময়ে খুব অল্পই আছেন। তাহার উপর ছাত্র এবং অধ্যাপক কেহই প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু নহেন—সকলেই যে কোনরূপে পল্লবগ্রাহিতা জন্মাইতে পারিলেই কৃতার্থ; বহু বিষয়ে পল্লবগ্রাহিতা থাকিলেই সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ হওয়া যায়। এই সকল কারণেই শাস্ত্র-জ্ঞানের গভীরতা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এখনও যাহা আছে ভবিষ্যতে ইহাও থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। আমাকে একজন শিক্ষাবিভাগীয় রাজপুরুষ বলিয়াছিলেন "দেখুন এখন সকল শাস্ত্রে-রই আলোচনা বাঙ্গালাদেশে হইতেছে, পূর্ব্বে কেবল ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচ-নাই এই দেশে পর্য্যাপ্ত ছিল; এখন আমাদের সুব্যব-স্থায় সকল শাস্ত্রেরই পণ্ডিত বঙ্গদেশে দেখা যাই-তেছে ইহা সুখের বিষয় নহে কি"? আমি বলিলাম "সুখের বিষয় বটে কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে যাহা ছিল তাহাও বা যায়; যে ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতির আলোচনা এদেশে ছিল এবং তাহার যে গভীরতা ছিল তাহা এখন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না অতএব আমরা ইহাতে বড় সুখী নই।" ইহা দ্বারা এই প্রমাণিত হইতেছে যে শিক্ষিত এবং অৰ্দ্ধ শিক্ষিত বহু লোকেরই ধারণা যে এইরূপ পল্লবগ্রাহিত্বই প্রকৃত পাণ্ডিত্য।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পল্লবগ্রাহিত্বই প্রকৃত পাণ্ডিত্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশ কাল পাত্র অনুসারে লোকের যে রুচি জন্মি-যাছে তাহার পরিবর্ত্তন সাধন সহজ নহে সেই কারণে টোলের সংস্কৃত শিক্ষাও একটু রূপান্তরিত করা আবশ্যক মনে হয়; পূর্ব্বেকার মত কেবল অক্ষ-রার্থমাত্র জানিলেই চলিবেনা। শাস্ত্রাদির আলো-চনাতে ঐতিহাসিকতত্ত্ববিচার বা বিশ্লেষণ প্রণালীর অবলম্বন করিতে হইবে, অন্যথা বর্ত্তমান যুগে পণ্ডিত মহাশয়গণ আদর পাইবেন না। গতানু-গতিকতা রক্ষা করা আজ কাল প্রতীচ্য সংস্কৃ-তজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিতান্ত বালকোচিত মনে করেন। কেবল টীকা টিপ্পনির সাহায্যে অক্ষরার্থমাত্র গ্রহণ করিয়াই টোলের অধ্যাপকগণ সন্তুষ্ট হয়েন; প্রতীচ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, যেগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহাতে কেবল গতানুগতিকতার পরিবর্ত্তে কিছু স্বাধীন চিন্তা দেওয়া উচিত, কেবল অক্ষরার্থ-মাত্র জানিলেই গ্রন্থ জানা হইল না; গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে গ্রন্থকর্ত্তার কাল, গ্রন্থকর্ত্তার যুগ, এবং গ্রন্থ যে নৈতিক বা সামাজিক অবস্থা সমূ-হের অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ সেই সকলেরই অল্লাধিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাঁহারা আরও বলেন যে শাস্ত্রের অক্ষরার্থজ্ঞান অপেক্ষা ঐতিহাসিক প্রণালী বা বিশ্লেষণ প্রণালীর সাহায্যে গ্রন্থকারের কাল যুগ প্রভৃতির নির্ণয় প্রথমত করা আবশ্যক, অক্ষরার্থ পরে জানিলেও চলিতে পারে। কিন্তু অক্ষরার্থমাত্র জানিয়া গ্রন্থকারের কাল যুগ প্রভৃতি না জানিলে সেই গ্রন্থের প্রকৃত তত্ত্ব জানা হইল না। এই কথা আমাদের দেশে টোলের সংস্কৃত শিক্ষা যেভাবে চলিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইলেও বর্ত্তমান সময়ে ইহার কতকটা সার্থকতা আমরা উপলব্ধি করিতেছি। প্রাচীন শাস্ত্ররাশিকে জীবিত করিতে হইলে বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, স্বাধীন গবেষণা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের মতে বিশ্লেষণ প্রণালীর জন্য গতানুগতিক প্রণালীতে অক্ষরার্থ একেবারে ত্যাগ করিলেও চলিবে না—তাহাও বিশেষ আবশ্যক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান জন্মাইবার পক্ষে অক্ষরার্থ সর্ব্বপ্রান সহায় এবং শাস্ত্রের গভীরজ্ঞানই বিশ্লেষণ প্রণালীরও অবলম্বন। আমাদের মতে নানাশাস্ত্রে পল্লবগ্রাহী জ্ঞান, ঐতি-হাসিক জ্ঞান প্রভৃতি অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞানের গভী-রতা অধিকতর আবশ্যক। তাহার পর পাশ্চাত্য প্রণালীর আলোচনারও প্রয়োজন আছে বটে। তবেই দেখা যাইতেছে যে ঐতিহাসিক প্রণালী, বিশ্লেষণ প্রণালী এবং শাস্ত্রার্থ জ্ঞানের গভীরতা এই কয়টাকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিলেই প্রকৃত শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিবার সুযোগ হইবে। তবে মাননীয় গভর্ণ-মেণ্ট বাহাদুর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এই দেশের ছাত্রদিগকে বিদেশে পাঠাইবার যে বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহা দ্বারা সংস্কৃতশিক্ষার্থী ভারতীয় ছাত্রগণের কতদূর উপকার হইবে তাহা আমরা বুঝি না। কারণ প্রতীচ্য বিশ্লেষণ প্রণালী এবং এই দেশের শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতার সমবায় ব্যতীত

সংস্কৃত শাস্ত্রের মর্ম্ম ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে কোন পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত পণ্ডিত "আসমুদ্রক্ষিতীশানাং" এই পদ অবলম্বনে সমুদ্রগুপ্ত যখন রাজা ছিল সেই সময়ই রঘুবংশ প্রণেতা কালিদাসের কাল, ইহা স্থির করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা না থাকিলে, কেবল পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে ভিন্ন দেশে গিয়াও পাছে এইরূপ শিক্ষা হয়, ইহাই আমাদের আশঙ্কা। এইরূপ করা নিতান্তই হাস্যজনক। ইহা অপেক্ষা বরং শ্রীযুক্ত ডেনিসিন্ রস্‌সাহেব কলিকাতায় এক প্রাচ্য বিদ্যালয় (Oriental Institute) স্থাপনের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা মন্দ নহে। তাহাতে দুই জন ইয়ুরোপীয় অধ্যাপক এবং তাঁহাদের সহযোগী দুই জন হিন্দু অধ্যাপক ও এক জন মৌলবী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব ছিল। রস্‌সাহেব বহুদিন পূর্ব্বে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন—ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে এই দেশের সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এবিষয়ে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

অসতো মা সদ্গময়।

(শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম-এ)

সত্যের সে শুভ্র জ্যোতি, কিরণে যাহার
হৃদয় কন্দরে ফোটে সুস্নিগ্ধ মন্দার,
নয়নের পথে খোলে দেববীথিকার
বিপণির মাঝে মাঝে অমৃত ভাণ্ডার।
দূরে যায় অন্ধকার, হেরি সে ভাস্কর
জীর্ণ বেশ লয়ে তার পলায় তস্কর
তেয়াগি গোপন গৃহ মানব অন্তর—
লভে মুক্তি, খুলি নর বন্ধন নিগড়;
উন্মুক্ত এ বিশ্ব মাঝে লভি দিব্যজ্ঞান,
ধ্রুব পথ চিনে লয় করিয়া সন্ধান।
যাহা সত্য, যাহা পুণ্য, যাহা গরীয়ান,
সার্থক জীবন করে পেয়ে পুণ্যবান।
নশ্বর প্রকৃতি মাঝে সেই চিরন্তন,
পরিবর্ত্তনের মাঝে এক পুরাতন,
সুষুপ্তির মাঝে যার সদা জাগরণ,
লভুক সে চিরসত্য মানবজীবন।
অসত্যের মাঝে হ'ক তাহার প্রকাশ
ধন্য হই হেরি তার পূর্ণ সে বিকাশ।

আমার জীবন-স্মৃতি।

অথবা

আমার স্বামী (মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে) * সম্বন্ধে স্মৃতি-কথা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খুড়শাশুড়ী একবার ক্রুদ্ধ হইয়া, আমার স্বামীর ছোট বেলাকার এই গল্পটি করিয়াছিলেন:—

"আমি কোল্‌হাপুরে সরকারী কুঠিতে যখন ছিলাম, তখন "কীর্ত্তনে" উপর তলায় এবং আমি নীচের তলায় থাকিতাম। দুই ঘরেই বহু পরিবার। আমাদের ঘরে বয়স্ক লোকই বেশী, ছেলে পিলে কম; এবং "কীর্ত্তনে"র ঘরে ছেলেমেয়ে অনেক। সেইজন্য আমরা দুই ঘর লোক এত বড় বাড়ীতে থাকি; কিন্তু বাড়ীটা বড়ই কোলাহলময়। "কীর্ত্তনে" কর্‌হাড়ে ও আমরা কোকনস্থ, একথা কাউকে জিজ্ঞাসা না কর্‌লে জান্‌বার উপায় ছিল না। দুই পরিবারের অন্তর্গত আমরা ছেলেবুড়ো সবাই মিলে এক পরিবারের মতই ছিলাম ও "নাত্যা" আত্মীয়ের মতই ব্যবহার কর্‌তেন। কেননা, আমার দেবর ও আবা সাহেব কীর্ত্তনের মধ্যে ভেদাভেদ মূলেই ছিল না। ছেলে বুড়ো সকলের মধ্যেই যে এইরূপ ধারণা ছিল তাহা তাহাদের ব্যবহারেই দেখা যাইত। আমাদের দুই পরিবারের কোন এক পরিবারের মধ্যে কিছু একটা ঘট্‌লে, সকলেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ত। দুই উনান জ্বালানো হ'ত না। প্রত্যেক উৎসবে, কে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করবে বোলে আমাদের ঝগড়া হ'ত; কিন্তু পরে এইরূপ স্থির হ'ল, কুলধর্ম্ম স্থলে, উৎসবের অনুষ্ঠান পৃথক পৃথক হবে। বাকী উৎসবের অনুষ্ঠানগুলি আধাআধি বণ্টন করে দুই পরিবারের মধ্যে পালা করে হবে। তদনুসারে আমরা উৎসব করে আস্‌ছিলেম। "কীর্ত্তনে"র ছেলে শৈশবকাল হইতেই খুব চালাক চতুর ছিল। কিন্তু আমাদের এই ছেলেটি বড়ই ঠাণ্ডা ও "ম্যাদা" ছিল। সে কিছুই বুঝ্‌ত না। তাকে দিয়ে কারো নিকট কোন কথা বলে পাঠালে সে ঠিক করে বল্‌তে পার্‌ত না। স্কুলের পরীক্ষা হয়ে গেলে পর, অন্য ছেলেরা "আমরা পাস হয়েছি, আমাদের পরীক্ষক এই এই কথা বলেছিলেন" ইত্যাদি কত কথাই বাড়ী এসে বল্‌ত। কিন্তু এর সে সব কিছুই না। আপনা হইতে, "আমি পাস হয়েছি," এ কথাটি পর্য্যন্ত বল্‌ত না। আমাদের ছেলেটি পাস হয়েছে—কীর্ত্তনের ছেলেদের মুখে শুনে, আমি জিজ্ঞাসা করলেম:— "ওরে মাধা (মাধব) তুই পাস হয়েছিস, আমাদের কেন বলিস নি? তোর এই বিষয়ে দেখছি কোন আগ্রহ নেই। ঐ "বিনায়ক"কে দেখ দিকিন। ও কেমন হুঁসিয়ার।"

তখন সে বলিল, "এর আর বল্‌বার কি আছে? রোজ স্কুলে গিয়ে আমরা পড়া অভ্যাস করতুম, তাতেত

* গত মাসের পত্রিকায় ভ্রমক্রমে "মহাদেব গোবিন্দ" না লিখিয়া "গোবিন্দরাম" লিখিত হইয়াছিল। ভঃ সং

পাস হবারই কথা, বেশী আর কি হয়েছে?" এই কথা বোলে সে নীরবে চলে গেল।

তবু, মায়ের সর্ব্বদাই ভাবনা হ'ত,—'পরে এই মাধবের দশা না-জানি কি হবে। ও ১০৲ টাকা রোজকার করে স্ত্রীর ভরণ পোষণ করতে পারবে, এটুকু বুদ্ধিও কি ওর হবে?'—এই রকম তিনি আমাকে প্রায়ই বলিতেন। "ঐ দুর্গাকে দেখনা!—মাধবের ঠিক উল্টো; অতিশয় বাচাল, ও চালাক চতুর। দুর্গা এখনো সেই রকমই আছে। বাপ ও ভায়ের আদর পেয়ে, আর ওকে বুদ্ধিমতী বলায় ও অত্যন্ত কঠোরভাষী হয়ে পড়েছে। আর, ও "অক্কাসাহেব" হওয়া অবধি, মাধবের চেয়ে আরও চালাক চতুর হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলা থেকেই ও এই রকম আততায়ী হওয়ায়, যা' তা' বলে ও আপনার কথাই সাত কাহন মনে করে; আর এই ছেলে দেখ-দিকি কেমন ভাল, কথার বাধ্য, দৃঢ়নিষ্ঠ ও সরল। ঘোর প্যাঁচ কিছুই জানে না,—বুঝতেই পারে না। একবার কোন বিষয় আরম্ভ করলে, যতক্ষণ না শেষ হয়, সেটা নিয়মিত করতে থাকে, তার জন্য ওকে আবার বলতে হয় না। কিন্তু তাতে কোন বাধা দিলেই ও গোঁ ধরে কাঁদতে বসে যায়। শীঘ্র ওকে বোঝানো যায় না। প্রথমে "ধুলো অক্ষরে"র পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেওয়ায়, পাঠশালা থেকে আসতে না আসতেই ঘরে সারাদিন আপনা-আপনি বিড়-বিড় করে অক্ষর আওড়াতো ও আঙ্গুল দিয়ে মেজের উপর অক্ষর লিখত। এই ওর খেলা—এই ওর আমোদ ছিল! এমন একরোখা ছিল যে, যা করত একেবারে পাকা হত। যখন পৈতে হল তখন ওর বয়স খুব কম এবং সকাল বেলায় মারাঠি পাঠশালার দেরীতে অর্থাৎ ১০টা বাজলে ছুটি হত। তখন খুব ক্ষিদে পেত বলে, মা চাপাটি করে রাখতেন ও ছেলে স্কুল থেকে এলে তার উপর ঘি ঢেলে তাকে দিতেন। একদিন কেবল ঘোল করে রেখেছিলেন। মাখন জ্বাল দিয়ে ঘি করা হয়নি, তাই মা চাপাটির উপর মাখন দিয়ে দিলেন। কিন্তু ছেলে আপনার জেদ ধরে বসল, "রোজ যেমন হয়, সেই রকম পাতলা ঘি ঢেলে দেও।" "মাখন থেকে ঘি বের করা হয়নি, কাল ঘি দেব"—এই রকম করে তিনি অনেক বল্লেন, কিন্তু তাতে কিছু হল না। তখন মা ঘিয়ের কড়ায়ে এক-চামচ জল দিয়ে তাই উননে গরম করলেন ও তাই চাপাটির উপর ঢেলে দিলেন। তাতে সে শান্ত হয়ে নীরবে চাপাটি খেতে লাগল। "দুর্গে" সেখানে কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করায় খুব হেসে উঠল ও হাত তালি দিয়ে তাকে টিট্‌কারী করতে লাগল:—"দাদা, তোর মা, ঘি বলে' তোকে জল দিয়েছে।" কিন্তু ছেলে ও-কথায় মোটেই লক্ষ্য করলে না। নীচের দিকে তাকিয়ে "চাপাটি" খাওয়া শেষ করে উঠে গেল।"

প্রায় প্রতিদিন সকালে পাঠশালা হতে এসে ও চাপাটি খেয়ে দুর্গার সঙ্গে "সাগর-গুটির" খেলা খেল্‌ত, পরে স্নান করত। যেই ওর মাথায় প্রথম ঘড়ার জল ঢালা হয়েছে অমনি ও "পুরুষ সূক্ত" বল্‌তে আরম্ভ করত; এবং তার মধ্যে কেউ কথা বলায় সে যদি ভুলে যেত ত ভারি বিরক্ত হয়ে উঠত। একদিন সন্ধ্যা আহ্নিক করবার সময় বিঠু কাকা এসে তাকে থামিয়ে "সন্ধ্যার" ভিতর থেকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশ্নটার উত্তর দিয়েই সে এই জেদ ধরে বস্‌ল যে, "আমি গোড়ার থেকে আর "সন্ধ্যা" করব না। যেখানে আমাকে থামিয়েছিলে সেই জায়গাটা আমাকে এনে দেও, তার পর আমি "সন্ধ্যা" পুরাপুরি করব।" অনেকক্ষণ এই রকম গোঁ ধরে' বসে রইল। সন্ধ্যাও করবে না, উঠেও যাবে না। শেষে বিঠুকাকা অর্দ্ধেক "সন্ধ্যা" করে' বল্লেন,—"এইবার বাকীটুকু শেষ কর,—এইখানে তোকে আমি থামিয়েছিলুম। এই রকম বলার পর, সমস্ত "সন্ধ্যা" শেষ করে উঠে গেল।

ছুটির দিন,—গলায় হার অলঙ্কার বালা ও আংটি, খুব আদর করে মা ছেলের গায়ে পরিয়ে দিলেন; তবু কণ্ঠী হার পরিয়ে দেওয়ায় সে হারটা ধুতির কাপড়ে ঢেকে রাখ্‌ল, জামার আস্তিনটা সামনের দিকে টেনে, বালাটা তার মধ্যে ঢেকে রাখ্‌ল, আর হাত বাঁকিয়ে আংটির পাথরটা মুঠোর ভিতর রাখ্‌ল। ও এই রকম নীরস প্রকৃতির লোক ছিল। আমি একবার রাগ করে' বলেছিলুম,—"দেখ্ মাধব, তোর মা এত যত্ন করে গহনা পরায়, তুই কেন পরাতে দিস্‌নে বল্ দিকি? আর তা পরিয়ে দিলেও তুই পাগলের মত ঢেকে রাখিস।" তখন ঐ বালক বল্লে কি শোনো। "আমাদের বাড়ী রোজ ভিখারী আসে, তাদের কোথায় গহনা থাকে?" এই রকম ওর প্রকৃতি ছিল। বেচারী মা ওর জন্য ভেবে ভেবেই মারা গেল! ওর বুদ্ধিশুদ্ধি কোথায়? কপালে দু-চারটে শুভ রেখা থাকাতেই দু-চার পয়সা যা হচ্চে—তা বৈ আর কি?

কোল্‌হাপুরে অবস্থিতি কালে, আমাদের গৃহে ও "কীর্ত্তনে"দের গৃহে, কোজাগর উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ ও মিত্রমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করে দুগ্ধ দান করবার রীতি ছিল। এবং সকল স্কুলের ছাত্রেরা সেই দিন পর্য্যন্ত জেগে পাশা খেল্‌বার অনুমতি পেত। তদনুসারে দুই পরিবারের সকল ছেলেই একত্র হয়ে পাশা খেল্‌ত। মার মৃত্যুর প্রথম বৎসরে, মাধবের দশ বৎসর বয়স মাত্র ছিল। "কোজাগর" এল। তখন কীর্ত্তনের মণ্ডলী কোন কারণে "রাজুরী"তে গিয়েছিল। এই জন্য এই সময়ে কোন ছেলেই ঘরে ছিল না। দুর্গা ছিল, কিন্তু সে ৮।৯ টা বাজ্‌লেই শুতে যেত। তাই খেলবার কেউই ছিল না; তবু রাত্রে, আমার দেবরের আহার হয়ে গেলে, মাধব আমার নিকট পাশার ছক্ চাইলে। আমি বল্লেম, দুর্গা পর্য্যন্ত শুয়েছে; এখন তুই কার সঙ্গে পাশা খেলবি'। সে বল্লে, মা "আমি আমাদের কারো-না-কারো সঙ্গে খেলব। তুই দে না।" আমি পাশার ছক্‌টা দিলুম। তা নিয়ে সে বারাণ্ডায় গেল। এবং একটা থামের সম্মুখে বসে, পাশা খেলতে লাগল। এবং এক হাত নিজের ও এক হাত থামের এই বলে' খেলা সুরু করে দিলে। দুজনের বেলাতেই থামের খেলাই ভাল হতে লাগল। তাই আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম, এক জনেরই কেবল খারাপ দান পড়চে। কাঠের থাম পর্য্যন্ত তোকে হারিয়ে দিয়ে অপমান করচে? তখন বিরক্ত না হয়ে, সে বল্লে, "তাতে কি? যা সত্যি তা সত্যি। থামের দান পড়ায়

তার ঘুঁটি আগে উঠে গেছে; আমার পড়ে নি বলে' আমার ওঠে নি। ওতে অপমানটা কিসে হল? ও আপনার থামের হাত বলে' ডান হাতে খেলছিল। ঐ হাতে খেলবার অভ্যাস থাকায় খেলা ভাল হচ্ছিল। কিন্তু বাঁ হাতে খেলবার অভ্যাস না থাকায় ঠিক খেলা হচ্ছিল না। ওরকম করে' খেলা কি করে' হবে? আর কোন ছেলে হলে থামের কাছে হার মান্‌ত কি? কিন্তু ওর ছেলেবেলা থেকেই সরল স্বভাব। যে কোন কাজ করত তাতে প্রতারণা করতে জানত না। একবার মা বর্ফী দিয়াছিলেন; এবং ওর অন্য হাতে ছোট এক টুক্‌রো দিয়ে বল্লেন—"এইটে তুই খা" আর ওটা ঐ ছেলেকে দে।" মাধব ছোট টুকরোটা আপনার মুখে দিয়ে বড়টা চাকরাণীর ছেলেকে দিলে। ঐ ছেলের হাতে বড় টুকরোটা দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন—"ওরে, ওকে ছোট টুক্‌রোটা দেবার কথা ছিল, তুই ওকে বড়টা দিলি, আর তুই ছোটটা নিলি"? মাধব বল্লে, তুই এই হাতের-টা যে ওকে দিতে বলিছিলি। তাই ওটা দিয়েছি। তখন "ঐ-হাতের টুকরা টা দে" বলায় নিজেরই ভুল হয়েছিল, মা জানতে পারলেন।" (ক্রমশঃ)

সামাজিক বিষয়ে যুদ্ধের প্রভাব।

(শ্রীসত্যকাম শর্ম্মা)

আমাদের দেশে আবহমানকাল দেখিয়া আসিতেছি যে বিবাহে কন্যাদান প্রথা প্রচলিত আছে। এদেশে কন্যাপক্ষ হইতেই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং প্রতীচ্য ভূখণ্ডে সাধারণত বর নিজেই বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে অথবা বরপক্ষ হইতেই প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে একটা কথা উঠিয়াছে যে কন্যার বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা অথবা কন্যাপক্ষ হইতে প্রস্তাব উত্থাপিত করা বিষয়ে কোন প্রকার লজ্জা করা উচিত নয়। আমরা দেখিতেছি যে পরিণামে কন্যাদান প্রথাই সম্ভবত প্রতীচ্য ভূখণ্ডেও প্রচলিত হইয়া পড়িবে এবং কন্যার বিবাহ আমাদের দেশের ন্যায় একপ্রকার অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। সম্ভবত আমাদের দেশেও কোন অলিখিত যুদ্ধের ফলে লোকক্ষয়ের কারণেই কন্যাদান ও বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের শাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছে যে পুত্রোৎপাদনের নিমিত্তই রমণীগণ পূজার্হ। এতদিন পাশ্চাত্যপক্ষপাতী স্বদেশবাসীগণ এই মতের উপর কত-না উপহাস প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্ভবত কোন ভয়াবহ যুদ্ধের ফলে লোকক্ষয় প্রত্যক্ষ করিয়া ঋষিরা এই মতে উপনীত হইয়াছিলেন। আমরা দেখি, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এখন এই যুদ্ধের ফলে অর্থলোভ দেখাইয়া প্রজাগণকে সন্তানোৎপাদনে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা হইতেছে। ফ্রান্সে তো প্রজাগণের গৃহে সন্তান-জন্ম হ্রাস হইবার কারণে যুদ্ধের পূর্ব্বাবধিই প্রতি সন্তানের জন্য ট্যাক্স কমাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া লোভ দেখান হইয়াছিল। সে দিন সংবাদ পত্রে দেখি যে ইংলণ্ডেও প্রতি সন্তানের জন্মে ইনকমটেক্স কমাইবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু হায়! এরূপ অর্থের প্রলোভনের ফলে মানবচরিত্র ও নীতি কতদূর পরিবর্ত্তিত হইবে বলা যায় না। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের নীতিপ্রবর্ত্তকগণ আমাদের ঋষি মনুর মত অনুসরণ করিয়া ঘোষণা করুন দিকিন যে "প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ", গৃহলক্ষ্মীগণ সন্তানোৎপাদনের কারণেই ভাগ্যবতী ও পূজার্হ, এবং এইটাই প্রজাসাধারণের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিন দিকিন, তাহা হইলেই অবিলম্বে দেখা যাইবে যে পাশ্চাত্যগণের চরিত্র ও নীতি কত অগ্রসর হয়। তখন সন্তানোৎপাদনের জন্য আর অর্থের প্রলোভন দেখাইতে হইবে না।

আমাদের দেশে অতি অল্পপরিমিত বস্ত্রের উপর দিয়াই জীবন নির্ব্বাহ চলিয়া থাকে। সাধারণত আমাদের দেশের লোকেরা বস্ত্র বিষয়ে নূতন নূতন ফ্যাযন বা ঢঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়া চলে না। সম্ভবত কোন সুবৃহৎ সংগ্রামের কারণে ব্যয়সঙ্কোচের (economy) প্রস্তাবের ফলেই দু একটী বস্ত্রের উপর দিয়াই জীবন নির্ব্বাহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও এই প্রকার ব্যয়সঙ্কোচের কথা ওঠাতেই ফ্যাযনের উপর বড়ই আঘাত পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে যে বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিণামে ফ্যাযন নামক অর্থপিশাচ জীব পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইবে না?

গার্হস্থ্য সম্বাদ।

৺ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রার্থনা।

বিগত ৮ই শ্রাবণ সোমবার শ্রীমতী মনীষা দেবী তাঁহার পরলোকগত স্বামীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে যে প্রার্থনা করিরাছিলেন, তাহা আমাদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। আমরা তাহা পত্রিকাস্থ করিলাম।

হে পবিত্রস্বরূপ প্রভু পরমেশ্বর! তুমি ইহলোক পরলোক, অনন্ত আনন্দ লোকের দেবতা। আজকের এই পবিত্র স্মৃতির দিনে এক বৎসর হইল আমার স্বামী পরলোকে তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া কি আনন্দই না উপভোগ করিতেছেন! তাঁর পৃথিবীর সকল দুঃখের অবসান করিয়াছ, এমন ধামে লইয়া গিয়াছ যেখানে চিরানন্দ। আমার আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ কৃত-

জ্ঞতা গ্রহণ কর। তাঁর ইহলোকের গুণ সকল আমার হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া রাখুক, তাঁর সুমহৎ চরিত্র আমার পথপ্রদর্শক হউক। তাঁর সেই আত্মা আরও জ্ঞানে প্রেমে বর্দ্ধিত হইয়া তোমার পুণ্যজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উন্নত হইতে উন্নততর লোকে যাউক। তাঁর সেই আত্মা তোমার পুণ্যলোকের পুণ্যচ্ছায়ায় সুখশান্তি লাভ করুক। তোমার কাছে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

তুমি মৃত্যুর ভিতর দিয়া তোমার সেই চিরন্তন নিত্য সত্য অমৃতরূপ দেখাইলে! তোমার অভয় মূর্ত্তিতে শোক তাপ দূরে চলিয়া যায়। আমরা সংসারের মোহমায়ায় বদ্ধ থাকিয়া তোমার মহিমা অনেক সময় বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না, দেখিয়াও দেখি না: তুমিই এই মিলন ঘটাইয়াছিলে, তুমিই আবার ভাঙ্গিলে সকলই তোমার মঙ্গল ইচ্ছা। নত মস্তকে সকলই বহন করিতে যেন সমর্থ হই। আমার উপর বিষম কর্ত্তব্যভার দিয়া আমাকে কি প্রকার আত্মনির্ভর করিতে শিখাইতেছ! তোমার করুণা দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। তুমি আমার সকল কাজে সহায় হও। তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তোমার মঙ্গলময় প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হই। ভগবান! আমার মনে শান্তি দাও। আমার এ ক্ষুদ্র জীবনকে তোমার প্রিয়কার্য্যে ও তোমার প্রীতি সম্পাদনে উৎসর্গীকৃত করিতে শিখাও। আমায় বল দাও, উৎসাহ দাও। আমার ছেলেমেয়েরা পিতৃহীন হইয়া অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছে। তুমি ইহাদের ভার লও। ইহাদের অন্তরেও তোমার অনিন্দ্য, পবিত্র শুভ্র আলোক প্রতিভাত করিয়া দাও। তুমি আমার গৃহদেবতা, হৃদয়দেবতা সকলি হও। পৃথিবীর ক্ষুদ্র সুখে যেন আর ডুবিয়া না যাই। তুমি আমার অন্তরদেবতা হইয়া আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দাও। তুমি আমার জীবনের নূতনপথে একমাত্র সঙ্গী ও অবলম্বন হও। তোমার সেই চিরনবীন শিবসুন্দর মূর্ত্তি পূজা করিতে শিখাইয়া আমার প্রণাম গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।

বিগত ১লা আগষ্ট (মঙ্গলবার) দিবসে আন্দুল আত্মোন্নতি সভার অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা কটকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের মাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ দিবসে কয়েকটী মহাজনোক্তি পঠিত হইয়াছিল। সেগুলি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) যে জীবনে উপাসনা নাই, তাহাতে আধ্যাত্মিকতা জন্মিতে পারে না।

(২) সত্য বস্তুকে অবলম্বন না করিলে মনে সত্যভাবের উদয় হয় না।

(৩) কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া সত্য কখনও দণ্ডায়মান হইতে পারে না।

(৪) যেখানে বিশ্বাস হৃদয়ে জন্মায় নাই, সেখানে উপাসনা অনেক পরিমাণে মৌখিক ব্যাপার।

(৫) ঈশ্বর কেবল সত্তা নহেন, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের ভাব জানেন।

(৬) ঐহিক ধন মানই যাহার সর্ব্বস্ব এবং সেই চিন্তাই যাহার শয়নে স্বপনে সঙ্গী, সে পরমাত্ম ভাব গ্রহণে সমর্থ হয় না।

(৭) ঈশ্বরে বিশ্বাস কর এবং সৎ কার্য্য কর, তাহা হইলে জগতে তুমি সুখ ও শান্তি পাইবে।

(৮) ঈশ্বরে আনন্দিত হও, তিনি তোমার হৃদয়ের সকল কামনা পূর্ণ করিবেন।

(৯) ঈশ্বর আদেশের অনুবর্ত্তী হও; তাঁহাতে নির্ভর কর; তিনি আশা সম্পন্ন করিবেন।

(১০) ধার্ম্মিকের অনেক বিপদ কিন্তু ঈশ্বর তাহার সহায়।

(১১) মন্দ কথা হইতে জিহ্বাকে এবং প্রবঞ্চনা হইতে ওষ্ঠদ্বয়কে সাবধান কর। পাপ হইতে দূরে থাক, শান্তি অন্বেষণ কর এবং তাঁহারই অনুগামী হও।

(১২) ঈশ্বরে নির্ভর কর এবং ধৈর্য্যসহকারে তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা কর।

(১৩) আমি বাক্য দ্বারা কোন পাপাচরণ না করি, এইজন্য আমি সতর্ক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইব।

(১৪) ঈশ্বর আমাদিগের আশ্রয়, বল এবং বিপদ কালের সহায়।

(১৫) ঈশ্বরই আমার মুক্তি ও মহত্ত্বের নিদান; এবং আমার বল ও নির্ভরের অটল ভূমি।

(১৬) যতদিন বাঁচিব আমার প্রভুর গুণগান করিব; যতদিন জীবন আছে, আমার ঈশ্বরের কথা ঘোষণা করিব।

(১৭) তাঁহার ধ্যান আমার নিকট মধুর হইবে; আমি ঈশ্বরে আনন্দিত হইব।

(১৮) অন্নপান যেমন শারীরিক অভাব মোচন করে, শরীরকে নবজীবন প্রদান করে; ধর্ম্ম সেইপ্রকার আত্মার সকল অভাব দূর করে।

(১৯) শুক্তির মধ্যে মুক্তা আছে বলিয়া শুক্তির আদর। মানব হৃদয়ের সত্যনিষ্ঠা সরলতা ও পবিত্রতা আছে বলিয়াই মনুষ্যের সম্মান।

(২০) এক একটা মিথ্যা কথা অসাধু ব্যবহার আমাদের জীবনে কলঙ্কের দাগ কাটিয়া দেয়, আবার সৎব্যবহার, পুণ্যাচরণ হৃদয়কে স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ করে। পাপে লিপ্ত থাকিয়া যেখানে কেবল অন্ধকার দেখি, পুণ্যের একটী মাত্র কণা হৃদয়ে আসিলে সে স্থান আলোকিত দেখিতে পাই। যেখানে দ্বেষ ছিল, সেখানে প্রেম দেখি; যেখানে অবিশ্বাস ও সংশয় ছিল, সেখানে ঈশ্বরের কৃপার অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়া পুলকিত হই।

(২১) পাপী নামামৃত পান করিল; নামামৃত ভক্তি রসে পরিণত হইল; ভক্তিরস শান্তি রসে পরিণত হইল; শান্তিরস পুণ্যস্রোতে তাহার হৃদয়কে প্লাবিত করিল।

(২২) যতক্ষণ ব্রহ্ম নাম সম্বল রহিয়াছে, ততক্ষণ আমাদের কোন ভয় নাই। যদি এই নামকবচে সজ্জিত থাকি এবং এই নামধনে ধনী হই, তবে কোন্ রিপুর সাধ্য যে আমাদিগকে আক্রমণ করে? রোগের সময় এই নাম আমার ঔষধ।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

অভয় হও।

ভারতের বৈদিক ঋষিরা উপনিষদের মন্ত্রে ভগবানের অভয়বাণী ঘোষণা করিয়া আমাদিগকে অভয়দান করিতেছেন। তাঁহারা বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছেন যে ঐ আকাশের সুবিস্তৃত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নিরাকার পরব্রহ্মকে ধরিয়া থাক, এই আমাদের প্রত্যেকের আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত নিরাকার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি কর, আর সঙ্গে সঙ্গে অভয় হইয়া যাও। যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি—যখন সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয় ও নিরাধার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখনই তিনি অভয়ং গতো ভবতি—অভয় হইয়া যান। উপনিষদের ঋষি নানা প্রকারে নানা বিশেষণের দ্বারা বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে নিরাকার এবং সুতরাং সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে অবলম্বন না করিলে প্রকৃতপক্ষে নির্ভীক হইতে পারিবে না—পিতামাতার নিকটে থাকিলে সন্তান যেমন অভয় হইয়া যায়, তেমনি সেই "অদৃশ্য অথচ সকলের দ্রষ্টা নিরাধার অথচ বিশ্বের আধার, সর্ব্বাশ্রয়" ও নিরাকার পরমেশ্বরকে পরম পিতামাতা বলিয়া জান, তাঁহাকেই একমাত্র সুহৃৎ ও সহায় বলিয়া জান, আর সঙ্গে সঙ্গে অভয় হইয়া যাও। সেই পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ কর, আর হৃদয়ের যত কিছু ভয় সকলই ভস্মীভূত করিয়া ফেল। তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলে সংসার তোমাকে তিলার্দ্ধও ভয় দেখাইতে পারিবে না—তুমি যে তখন সকল ভয়ের যিনি ভয় তাঁহারই সহচর হইয়া থাকিবে। সংসার তো তাঁহারই সৃষ্টি—অভয়ের সন্তান তুমি—তোমাকে সংসার কিসের ভয় দেখাইতে পারে? ইহা যে সত্য, অতীব সত্য, তাহারই যেন সাক্ষ্য দিবার জন্য এক সন্ন্যাসী এই কলিকাতা নগরে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে একটী সংক্ষিপ্ত মন্ত্র ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেন—ওঙ্কারে নিরাকারে নির্ব্বিঘ্নং। অন্ধকারেই ভয় হয়, যেখানে অজ্ঞান, নিজের পদক্ষেপ দেখিতে পাই না, বুঝিতে পারি না সেইখানেই ভয়। কিন্তু যখন সেই প্রাণারামকে আমাদের আশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ করিব, যখন দেখিব যে তাঁহার অনিমেষ নয়ন আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের উপর জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, যখন জানিব যে আমাদের জীবনের চতুর্দ্দিক তাঁহারই আলোকে আলোকিত, তখন আমাদের ভয় কোথায়? তখন আমরা "অভয় তো হয়ে গেছি।" আমরা নির্ভীক হৃদয়ে আমাদের কর্ত্তব্য করিয়া চলিব—ফল সেই ফলদাতার হস্তে রাখিব—ফলের বিষয় চিন্তাই করিব না। ফলের বিষয় চিন্তা করিলেই তাহার মধ্যে "আমি" থাকিবে, সুতরাং ভয়ের কারণও থাকিবে। তাঁহার কার্য্য করিয়া যাইতেছি এই কথাটাই মন্ত্রের ন্যায় হৃদয়ে ধরিয়া রাখিব, তাহাতে "আমি" যদি না থাকে, তাহা হইলে

ভয়েরও কোন কারণ থাকিবে না—আমিই যখন নাই তখন আমার ভয় কোথায় ? আমরা আমাদের দিক হইতে দেখিলেই সকল বিষয়কে সঙ্কীর্ণ চক্ষে দেখি, সময়কেও বিভক্ত করিয়া কোন অংশকে ভূত, কোন অংশকে ভবিষ্যৎ বলিয়া দেখি—আমাদের নিকটে বর্ত্তমান তো এক মুহূর্ত্ত মাত্র। কিন্তু সেই জগৎস্রষ্টার দিক হইতে দেখিলে দেখি যে তাঁহার নিকটে সকল মুহূর্ত্তই বর্ত্তমান—বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ, তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বকালই বর্ত্তমানরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—তখন আমাদের কিসের ভয় ? সেই মঙ্গলময় পুরুষ যখন প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের নিত্য সঙ্গী হইয়া আছেন তখন আমাদের কিসের ভয় ? সত্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে আমাদের কিসের ভয় ? তাঁহার করুণার প্রত্যক্ষ পরিচয়ই তো এই ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই ব্রাহ্মসমাজ। কত লোকে এই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—আবার সময়ে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের থমথমে ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা ইহা বুঝিলেন না যে ব্রাহ্মসমাজের এই প্রকার নিশ্চেষ্টভাব ব্রাহ্মধর্ম্মের দোষে আসে নাই—ইহা তাঁহাদেরই প্রত্যেকের নিজের দোষ। তাঁহারা সাংসারিক নানা বিষয়ে হয়তো ফল কামনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং সময়ে সেই সকল বিষয়ে তাঁহাদের আশা বিফল হওয়াতে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের উপর হতাশ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যদি ব্রহ্মকাম হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ের সহিত অবলম্বন করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের নিশ্চেষ্টভাব আসিতেই পারিত না। ঈশ্বরের মঙ্গল চক্ষুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া আছি। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা প্রত্যেকে সেই চিরআশ্রয় পরমেশ্বরের সত্তা হৃদয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ের সঙ্গে অবলম্বন করুন। শত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও যেন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিত্যাগ না করি। হৃদয় ভয়ে আচ্ছন্ন হইলে বুদ্ধিও আবিল হইয়া পড়ে। তাই নির্ভীক হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া, ঈশ্বরকে সকলের অগ্রে আসন প্রদান করিয়া আমাদিগকে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ যে উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে, তাহাই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে—অন্য কথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেশের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে বৃথা হাস্যে, বৃথা কথায় সময় নষ্ট করিয়া আত্মহত্যা করিবার আর অবসর নাই। আমাদের সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত—আমাদের কার্য্য পর্ব্বতের সমান উচ্চ এবং সমুদ্রের ন্যায় গভীর। এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পাইও না। ভগবানের মাভৈ মাভৈ রব দিবানিশি আকাশ হইতে পৃথিবীতে, পৃথিবী হইতে আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহাকে জীবনের—ইহ জীবনের এবং অনন্তকালের জীবনের নিত্য সঙ্গী, প্রতিমুহূর্ত্তের সঙ্গী জানিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হও—তাঁহারই কর্ম্ম জানিয়া নির্ভয়ে প্রত্যেক শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠানে অগ্রসর হও। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহারই প্রেরিত ধর্ম্ম জানিয়া অবলম্বন কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাহা জীবনে সাধন কর। দেশের মুখ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হইবে, সন্তানসন্ততিগণ নিশ্চয়ই উন্নতির শিখরে আরোহণ করিবে, দেশের দুঃখদারিদ্র্য নিশ্চয়ই বিদূরিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনে পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন।

কি ভয় ?

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

তুমি আছ প্রভু চির আশ্রয়
কি ভয় কি ভাবনা
যেথানেই যাব তব কোলে রব
কি ভয় কি ভাবনা ?

তব পদরেণু তুলিয়াছি মাথে
সকল কলঙ্ক গেছে সাথে সাথে
এখনো যা আছে ধুয়ে দিবে জানি
কি ভয় কি ভাবনা ?

সংসারে ফিরিব তোমারি কাজে
তুমি যাহা দিবে তাই লয়ে রব
আনন্দে আমি গাহি যাব গান
কি ভয় কি ভাবনা।

অন্তরতর তুমি অন্তরতম
তোমারে জানিলে ঘুচে যায় তম
(প্রভু) মন প্রাণ সব সঁপিনু তোমারে
কি ভয় কি ভাবনা ॥

বাল গঙ্গাধর তিলক-প্রণীত—

গীতা-রহস্য

অথবা

কর্ম্মযোগ শাস্ত্র।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

প্রস্তাবনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উপর অনেক সংস্কৃত ভাষ্য, টীকা কিংবা প্রাকৃত ভাষান্তর, অথবা বিস্তৃত সর্ব্বমান্য ব্যাখ্যা যখন রহিয়াছে, তখন এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার কারণ কি, ইহা যদিও গ্রন্থের আরম্ভেই বলিয়াছি, তথাপি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে, যে-সব কথা বলা হয় নাই তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য, প্রস্তাবনা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। উহার মধ্যে, প্রথম কথাটি স্বয়ং গ্রন্থকার-সম্বন্ধে। ভগবদ্‌গীতার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, প্রায় ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পিতৃদেব অন্তিমকালের পীড়ায় শয্যাগত হওয়ায়, "ভগবদ্‌গীতার ভাষা বিবৃতি" নামক প্রাকৃত টীকা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইবার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। তখন, অর্থাৎ আমার ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে, গীতার ভাবার্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে আমি অসমর্থ ছিলাম। তথাপি, অল্প বয়সে মনের উপর যে সংস্কারের ছাপ পড়ে, তাহা অনেক দিন টিকিয়া থাকে; এই জন্য, ভগবদ্‌গীতার উপর সেই সময়ে আমার যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহা স্থায়ী হইয়াছিল। পরে সংস্কৃত ও ইংরাজি অধিক শিক্ষা করিবার পর, গীতার সংস্কৃত ভাষ্য ও টীকাদি এবং ইংরাজী ও মারাঠী ভাষায় লিখিত অনেক পণ্ডিতের বিচার আলোচনা সময়ে সময়ে পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের সহিত যুদ্ধ করা বড়ই কুকর্ম্ম এই মনে করিয়া যখন অর্জ্জুন খিন্ন হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য, ব্রহ্মজ্ঞান কিংবা ভক্তিযোগে কি করিয়া মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ কেবল মোক্ষমার্গের বিচারের কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি, এইরূপ সংশয় মনের মধ্যে উদয় হইয়া উত্তরোত্তর উহা বলবৎ হইয়া উঠিল। কারণ, গীতার কোন টীকা হইতেই ইহার যোগ্য উত্তর পাওয়া গেল না। আমার ন্যায় অন্য কাহারও যে সংশয় হয় নাই এরূপ নহে। কিন্তু টীকার মধ্যেই আবদ্ধ থাকার দরুন, টীকাকারের উত্তর সন্তোষজনক বলিয়া মনে না করিলেও, টীকার অতিরিক্ত অন্য উত্তর তাঁহাদের জ্ঞানে আসে নাই। তাই আমি টীকা ও ভাষ্য দূরে রাখিয়া, কেবল গীতারই স্বতন্ত্র বিচার করিয়া গীতাখানি অনেকবার পাঠ করিলাম। তখন টীকাকারের ব্যাখ্যা হইতে মুক্ত হইয়া, মূল-গীতা নিবৃত্তিপর নহে, পরন্তু কর্ম্মযোগপর, এমন কি, গীতার মধ্যে "যোগ" এই শব্দ "কর্ম্মযোগ" অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ আমার ধারণা হইল।

মহাভারত, বেদান্তসূত্র, উপনিষদ্ এবং বেদান্তশাস্ত্রসংক্রান্ত সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থের অধ্যয়নেও এই মতটাই দৃঢ় হওয়ায়, ইহা লোকের মধ্যে প্রচার করিলে এই বিষয়ের আরো অধিক আলোচনা ও সত্যনির্ণয়ের সুবিধা হইবে, ইহা মনে করিয়া এই বিষয় সম্বন্ধে চার পাঁচ স্থানে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে এক বক্তৃতা নাগপুরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে এবং একটী বক্তৃতা জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মঠ "করবীরে" ও সঙ্কেশ্বরের আজ্ঞানুসারে, তাঁহারই সম্মুখে, সঙ্কেশ্বর-মঠে ১৯০৪ সালের আগষ্ট মাসে করিয়াছিলাম। নাগপুরে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সেই সময় সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত অবকাশ অনুসারে কোন কোন বিদ্বান বন্ধুর সহিত অপ্রকাশ্যভাবে সময়ে সময়ে এই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলাম। এই মিত্রমণ্ডলীর মধ্যে ৺শ্রীপতি বুবা ভিঙ্গারকর একজন। ইহাঁর সহবাসে ভাগবত সম্প্রদায়ের কোন চলিত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচর হওয়ায়, গীতারহস্যে বর্ণিত অল্প স্বল্প বিষয়, বুবা ও আমার মধ্যে যে তর্কবিতর্ক হয়, সেই তর্কবিতর্কেই সর্ব্বপ্রথমে নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয়। আমার এই গ্রন্থ বুবা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না;

ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যাক্ সে কথা। এই-রূপে, গীতাপ্রতিপাদ্য বিষয় যে প্রবৃত্তি-পর এই মতটি স্থায়ী হওয়ায় বহু বৎসর পূর্ব্বে ইহা লিখিয়া ফেলিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এই গীতা-তাৎপর্য্যে, নবীনতর ভাষ্যাদি টীকা কিংবা ভাষান্তরাদিকে স্বীকার না করিলেও, কেন আমি কেবল পূর্ব্বেকার টীকাকারদিগের নির্দ্ধারিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করি নাই ইহার কারণ না দেখাইয়া ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে অনেক বিষয়ে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল। এবং সমস্ত টীকাকারদিগের মত সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অপূর্ণতা ও অপূর্ণতার কারণ প্রদর্শন করা এবং অন্য ধর্ম্মের সহিত, অন্য তত্ত্বজ্ঞানের সহিত গীতাধর্ম্মের তুলনা করা অতীব প্রয়াস সাধ্য বলিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে উহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাই, গীতা সম্বন্ধে এক নূতন গ্রন্থ আমি প্রকাশ করিতেছি, এই কথা আমার মিত্র রা, রা, দাজী সাহেব-খরে ও দাদা সাহেব খাপ্‌ড়ে, একটু বেশী শীঘ্র প্রকাশ করিয়া দিলেও, আমার উপকরণ সামগ্রী এখনো সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই মনে করিয়া গ্রন্থ রচনার কাজটা মন্থরগতিতে চলিতেছিল। পরে ১৯০৮ সালে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মন্দলে সহরে যখন আমার জীবনযাপন করিতে হয়, সেই সময় এই গ্রন্থ লিখিবার সম্ভাবনা অনেকটা দৃঢ় হইয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থ লিখিবার জন্য আবশ্যক পুস্তকাদি পুনা হইতে আনিবার সানুগ্রহ অনুমতি কিছুকাল পরে সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে পাইবার পর, সন ১৯১০-১১ এর শীতকালে এই গ্রন্থের খস্‌ড়া মন্দলের জেলখানায় প্রথম লিখিয়া ফেলি; এবং পরে সময়ে সময়ে চিন্তা করিয়া যাহা মনে আসিয়াছিল তদনুসারে সংশোধন করিয়াছিলাম। তখন সমস্ত পুস্তকগুলি নিকটে না থাকায় কোন কোন স্থলে যে অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছিল, তাহা কারাগার হইতে মুক্ত হইবার পর, পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলাম। তথাপি এখনো এই গ্রন্থ সর্ব্বাংশে পূর্ণ হইয়াছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ মোক্ষ ও নীতি ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল অতীব গভীর হওয়ায়, সেই সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন ও নবীন পণ্ডিতগণ এরূপ বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়াছেন যে, অতিবাহুল্য বর্জ্জন করিয়া তাহা হইতে কোন্ কোন্ বিষয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে গ্রহণ করা যাইবে ইহা ঠিক নির্দ্ধারণ করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু মহারাষ্ট্র কবিবরের বর্ণনা অনুসারে—

কৃতান্ত কটকাংমল-ধ্বজ-জরা দিসোঁ লাগলী।
পুরঃসর-গদাঁ সবেঁ ঝগড়তাঁ তনূ ভাগলী॥

সসৈন্য যম-রাজা লয়ে শুক্ল জরা-ধ্বজা
দেখা দিল এসে।
নর হয়ে অগ্রসর গদাযুদ্ধে তৎপর,
পলাইল শেষে॥

মোরো পন্থ।

এইরূপ অবস্থা এক্ষণে আমারও হইয়াছে এবং আমার সংসার-সহচরীও আগেই চলিয়া গিয়াছেন। এই জন্য আমার উপলব্ধ তথ্যাদি আলোচনা ও আমার বিচার আলোচনা যাহা আমি লোকের নিকট প্রকাশ করিতে চাহি, আমার কোন "সমান ধর্ম্মা" এক্ষণে কিংবা পরে বাহির হইয়া তৎসম্বন্ধীয় ত্রুটিগুলি পূরণ করিয়া দিবেন, এই ধারণায় এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শান্তিকুটীর।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি এ)

আমরা প্রত্যেকে আমাদের অন্তরে একটি একটি শান্তিকুটীর খুলিয়া বসিয়া আছি। সেই কুটীরে যিনি আমাদের নিভৃত প্রাণের দেবতা তিনিই কেবল জাগিবেন। এই জন্যই আমাদের এই আয়োজন। এই জন্যই শান্তিকুটীরখানি অতি গোপনে রাখা হইয়াছে, কারণ সেখানে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। সেখানে মানুষের বা বাহিরের কোলাহল একেবারেই পৌঁছায় না—ধনমানের গণ্ডগোল থাকিবে না—লোভ, মোহ, অভাব, বিষয়সুখলিপ্সা কিছুই স্পর্শ করিবে না—কারণ তাহা দেবালয়—সেখানে দেবতা ও ভক্তেরই কেবলমাত্র অধিকার। ইহা যদি না হয় তাহা হইলে আমাদের শান্তিকুটীর নামমাত্রই রহিল—উহাকে

সত্য করা হইল না। বাস্তবিক সংসারের হলাহল নিশিদিন পান করিয়া আমাদের জীবন এতই জর্জ্জরিত হয় যে আমাদের এই শান্তিকুটীর সহজে সত্য হইয়া উঠে না, হৃদয়বীণার তন্ত্রীগুলি নবনব সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে না, সুপ্ত হৃদয়কমলটীও ফোটে না, সমস্ত আনন্দ প্রেমের উৎস একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। আমরা তাঁকে আহ্বান করি, কিন্তু সেই শুষ্ক আহ্বান আমাদের কুটীরেই ফিরিয়া আসে—তাঁর দ্বারে আর পৌঁছায় না—আমাদের প্রার্থনা সফল হয় না, কারণ ভক্তির উৎস খুলিয়া যায় না।

এই ভক্তির উৎস উৎসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবনে কেবলই অভাবের সৃষ্টি হয়—মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না—একটা অজানা করুণ বেদনা আমাদের অন্তরে অন্তরে দহন করে, কিন্তু সহজে আমরা বুঝিতেই পারি না যে তাহা কিসের বেদনা। এই যে অন্তরের গুপ্ত বেদনা—ইহা সহজে পরিস্ফুট হয় না। আমরা একটা অস্বচ্ছন্দতা লইয়াই চলিয়া যাই—একবার ইহা ধরি একবার উহা ধরি—এইরূপে অশান্তির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াই। কিন্তু হৃদয়কে ভগবস্তক্তিতে পূর্ণ রাখিলে সকল অশান্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় এবং সেই ভক্তির অগ্নি হইতে স্বর্ণ-কমল বিকশিত হয় এবং হৃদয়মরুতে বসন্তোৎসব আরম্ভ হয়। ভক্তির অভাবেই, প্রেমের অভাবেই এই যে বেদনার উৎপত্তি ইহা সহজে লোকের বোধগম্য হয় না, তাই তাঁহাদের মনে স্থির ধারণা হয় যে জীবনটা দুঃখময়, মনে হয় যে জীবনের অন্তরে অন্তরে একটি বেদনার স্রোত রাত্রিদিন অবিরত চলিয়া থাকে—ইহার অন্ত নাই শেষ নাই। কিন্তু এই বেদনাই যে আমাদিগকে সত্য করিয়া তুলিবে,জীবনের নির্ব্বাপিত প্রদীপখানি দীপ্ত করিয়া জ্বালাইয়া তুলিবে, প্রাণের শতদলটীকে বিকশিত করিবে—একথা সাধারণ লোকে একেবারেই ভুলিয়া যায়। এই জন্যই লোকের এত দুর্দ্দশা। তাহারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে না, তাঁহার মঙ্গলদান তাহারা উপলব্ধি করে না।

আমাদের সমগ্র ধর্ম্মজীবনের মূলে এই বিশ্বাসটুকু চাই যে তিনি মঙ্গলময়—আমাদের প্রাণ ভরিয়া বলিতে হইবে

তুমি সত্য তুমি সুন্দর মঙ্গলময় হে
তোমারি করুণা ঝরে ঝরঝর
সকল ভুবনময় হে।

তাঁর যে করুণার দান, তাহা প্রিয় হউক বা অপ্রিয় হউক, আমাদের শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে—আমাদের হৃদয় প্রাণ মন তাঁহারি চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে—জীবনের পথে সত্যের পথে ক্রমাগতই অগ্রসর হইতে হইবে।

এই যে বিশ্বাস ইহা সহজে স্থাপিত হয় না; ইহার জন্য বহুকাল ধরিয়া সাধনা করিতে হয়। ইহার মূলে নিষ্ঠা চাই,উপাসনার আসনে প্রতিদিন বসা চাই—প্রতিদিন তাঁহাকে মুক্ত হৃদয়ে সমস্ত নিবেদন করা চাই। যেমন সঙ্গীতশিক্ষার্থী গান গাহিবার পূর্ব্বে অনেক দিন স্বরসাধনা করিতে বাধ্য হয়, তাহাকে নীরস কণ্ঠসাধনে বহুদিন কালক্ষেপ করিতে হয়, এবং সেই স্বরসাধনা করিতে করিতে সেই শিক্ষার্থী পরে একজন সুগায়ক হইয়া উঠে; তেমনি আমাদের জীবনবীণার যথার্থ সুর বাজিবার পূর্ব্বে বহুদিন তন্ত্রীগুলিকে ঠিকভাবে বাঁধিবার প্রয়োজন হয়, সমস্ত বেসুরো ভাব দূর করিতে হয়, মনকে ধৌত করিতে হয়। এইরূপ হৃদয়কে ধৌত করিলে আমরা তাঁহাকে জানিবার অধিকারী হই—তবে আমাদের প্রাণে তাঁহার প্রকাশ সত্য হয়। আমরা প্রতিদিন যেন সেই জীবনদেবতার চরণতলে পূজা দিতে পারি; প্রতিদিন যেন অন্ততঃ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আমাদের প্রাণের প্রদীপখানি আকাশের তপনতারার মত তুলিয়া ধরিতে পারি—সংসারের সমস্ত কোলাহল একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া যেন আমরা আমাদের করুণ প্রাণের বাঁশীতে তাঁহার নামটী বাজাইতে পারি। তিনিই আমাদের প্রাণকে সেইভাবে জাগ্রত করিয়া তুলুন। সেই করুণাময় চিরদিন আমাদিগকে তাঁহার সমস্ত দান মস্তক নত করিয়া গ্রহণ করিবার শিক্ষা প্রদান করুন।

হে প্রাণের দেবতা, আমাদের এই শান্তিকুটীরের দুয়ার তুমি উদ্ঘাটিত করিয়া দাও—আকাশের আলোক সেথায় প্রবেশ করুক—বাতাস খেলা করুক—আমাদের হৃদয় পবিত্র হউক—প্রেমে পূর্ণ হউক।

ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন।

ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন একটী সুমহান কার্য্য সন্দেহ নাই। মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতির মিলিত হইয়া উপাসনা করিবার একটী প্রণালী আছে, কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে মিলিত ভাবে উপাসনার করিবার প্রণালী দেখা যায় না। হিন্দুদিগের মধ্যে আরতি প্রভৃতি কয়েকটী কার্য্য মিলিতভাবে হইতে দেখা যায়, কিন্তু মিলিত ভাবে সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনার প্রণালী আছে বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রত্যেকের নিজে নিজে আপনার গৃহে অথবা অন্য কোন পবিত্র স্থানে বসিয়া ভগবানে চিত্ত-সমাধান করিবার প্রথা আছে। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ব্রহ্মোপাসকগণ যখন ব্রাহ্মসমাজে একত্র মিলিত হইতেন, তখন সহজেই তাঁহাদিগের হৃদয়ে ভগবানকে মিলিতভাবে আরাধনা করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইত। মিলিতভাব আরাধনা করিতে গেলেই তাহার একটী প্রণালী আবশ্যক—বিনা প্রণালীতে প্রত্যেকে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে আরাধনা করিতে গেলে গোলযোগ আসিয়া পড়ে। অভাব আসিলেই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা হয়। রাজা রামমোহন রায়ও এই অভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিবেচনামত একটী প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাহার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই প্রণালীটী বিস্তৃত করিয়া উহাকে একটী বৃহৎ মণ্ডলীর উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন। দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত এই প্রণালীই বর্ত্তমানে ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মসমাজের প্রকাশ্য উপাসনার আদর্শ প্রণালী হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আর্য্যসমাজ প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসক নবীনপন্থী সমাজ বল, অথবা হরিসভা প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী সমাজই বল, এই সকল সমাজের উপাসনাবিষয়ক কার্য্যপ্রণালী যে ব্রাহ্মসমাজেরই প্রণালী অবলম্বনে গঠিত, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীর অভিব্যক্তি সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি।

রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনা নামে একটী পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তিকাতে তিনি ব্রহ্মোপাসনাকে ঈশ্বরে নিষ্ঠা ও পরোপকার এই দুই লক্ষণে বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মোপাসনার একটী প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই প্রণালীটী কি তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি। *

রামমোহন রায়ের পরে দেবেন্দ্রনাথেরও মনে মিলিতভাবে ব্রহ্মোপাসনার একটী সুগঠিত প্রণালীর অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। তিনি কিরূপে ধীরে ধীরে বর্ত্তমান প্রচলিত উপাসনাপদ্ধতিটী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তিনি আত্মজীবনীতে বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। "পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান কবিতে গেলে একটা শব্দের অবলম্বন অতি প্রশস্ত উপায়। সে শব্দ প্রাচীন ও প্রচলিত, সহজ ও সুবোধ্য হইলে তাহা উপাসনার পক্ষে আশু উপকারী হয়।" † রামমোহন রায়ের "অবতরণিকা" পুস্তিকাতেও আমরা এই কথার খুবই সায় পাই। তিনি বলেন "শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন।" দেবেন্দ্রনাথ বহু অনুসন্ধানে উপনিষৎ হইতে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত "সমাধান মন্ত্র" সংগ্রহ করিয়া তাহাই তাঁহার উপাসনাপদ্ধতির মূল কেন্দ্র রূপে সংস্থাপিত করিলেন। এই সমাধান মন্ত্র প্রতি ব্রাহ্মের নির্জ্জনে বসিয়া ব্রহ্মে আত্মসমাধান করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইলেও কেবলমাত্র সেইটুকু ব্রাহ্মসমাজে মিলিতভাবে উপাসনা করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন। তাই তিনি উপনিষৎ হইতে "সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়" প্রভৃতি মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া সমাধান মন্ত্রে সংযুক্ত করিয়া দিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি রচনা করিবার সময়ে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং বিশেষভাবে তদন্তর্গত "অবতরণিকা" ও "ব্রহ্মোপাসনার" আলোচনায় রত ছিলেন। রামমোহন রায় তাঁহার "অবতরণিকাতে" বলিয়াছেন "অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইহাঁদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে * * * সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থ-

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০৮ শক শ্রাবণ দেখ।

† মহর্ষিদেবের আত্মজীবনী দেখ।

প্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে দৃঢ় করিবেন।" সম্ভবত এই ভাবের অনুসরণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ "সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়" প্রভৃতি মন্ত্রের সহিত "এতস্মাজ্জায়তে" প্রভৃতি পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্র সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ ব্রহ্মোপাসনাতে মন্দিরে আরতির ন্যায় সকলের মিলিতভাবে পাঠ করিবার উপযুক্ত একটী স্তোত্র সন্নিবিষ্ট হইলে উপাসনাটী সুশোভন হয়, ইহা ভাবিয়া তিনি মনের মত একটী স্তোত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ের "ব্রহ্মোপাসনাতে" উদ্ধৃত সেই মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রটীতে অদ্বৈতভাবের অনেক কথা থাকাতে সেটী প্রথমে তাঁহার মনোমত হয় নাই। অবশেষে উপনিষৎ প্রভৃতি অন্য কোথায়ও নিজের মনোমত স্তোত্রের সন্ধান না পাইয়া দ্বারকানাথ ঠাকুরের সভাপণ্ডিত কমলাকান্ত চূড়ামণির পুত্র শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও যখন সেই মহানির্ব্বাণতন্ত্রেরই স্তোত্রকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ অগত্যা তাহাই গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তন্মধ্য হইতে অদ্বৈতবাদ-পরিপোষক অংশগুলিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেন। নবপ্রাপ্ত হীরক অপেক্ষা সুমার্জ্জিত হীরকের ন্যায় পরিবর্ত্তিত স্তোত্রটী মূল স্তোত্র অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই স্তোত্রের শেষে দেবেন্দ্রনাথ স্বরচিত একটী প্রার্থনা সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার উপাসনাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ করিলেন। ১৭৬৭ শকে (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজে এই প্রণালী প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ১৭৭০ শক (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ) অবধি উপরোক্ত স্তোত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ আরম্ভ হয়। এই উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর ক্রমে ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ "গায়ত্রী মন্ত্র", "অসতোমা সদগময়", স্বাধ্যায়, উপসংহার প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়া পদ্ধতিটীকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আদিব্রাহ্মসমাজে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে প্রণালীতে উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করা হয় তাহা আমরা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

প্রথমত বেদীর সম্মুখে আচার্য্য গায়ক ও উপাসকমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইলে আচার্য্য অর্চ্চনা মন্ত্রের একটী একটী চরণ আবৃত্তি করিয়া ভাষাতে তাহার ব্যাখ্যা করেন। শেষ চরণ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইবার পর, সকলে মিলিতভাবে সমস্বরে অর্চ্চনামন্ত্র পাঠ করিয়া অবনতমস্তকে ঈশ্বরকে প্রণাম করেন। তৎপরে আচার্য্য বেদী গ্রহণ করেন এবং গায়ক ও উপাসকগণ স্বস্ব স্থানে উপবেশন করেন। তৎপরে একটী সঙ্গীত হয়। সঙ্গীতের পর, আচার্য্য একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দ্বারা উপাসকগণকে উপাসনা কার্য্যে মনঃসমাধান বিষয়ে উদ্বোধিত করেন। তাহার পর আর একটী সঙ্গীত হইলে এবং উপাসকদিগের মন একাগ্র হইলে আচার্য্য "প্রণাম" অবধি "প্রার্থনা" পর্য্যন্ত মন্ত্রগুলি যথাস্বরে ও যথারীতিতে অনুবাদ সহ পাঠ করেন। এই সঙ্গে শ্রুতি সঙ্কলিত স্বাধ্যায়টীও পাঠ করিবার কথা। কিন্তু যেমন উপনয়নকালে ন্যূন সংখ্যা তিন বৎসর গুরুগৃহে বাসের স্থলে বর্ত্তমানে তিন দিন দাঁড়াইয়াছে, সেইরূপ উপাসনা দীর্ঘ হইবার কারণে উপাসকদিগের বিরক্তি উৎপাদনের ভয়ে সমস্ত স্বাধ্যায়টীর পরিবর্ত্তে তাহার শেষাংশ মাত্র পঠিত হয়। তৎপরে একটী সঙ্গীত হইলে, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক কোন গ্রন্থ হইতে হউক বা আচার্য্যের স্বরচিত হউক, একটী উপদেশ দেওয়া হয়। উপদেশের শেষে একটী শ্রুতিমন্ত্রের দ্বারা উপাসনা কার্য্যের উপসংহার করা হয়। উপসংহারের পর দুই তিনটী সঙ্গীত হয় এবং সর্ব্বশেষে "জয়দেব জয়দেব" বন্দনা গীতটী বেদীর সম্মুখে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গান করিয়া ঈশ্বরকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিলে পর সভার কার্য্য শেষ হয়। ১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রামমোহন রায়ের সময় অবধি প্রচলিত প্রথা অনুসারে উপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পর অবধি উহার প্রথম অধ্যায়ে সঙ্কলিত শ্রুতি সমূহই স্বাধ্যায় স্বরূপে পঠিত হইতে লাগিল। *

---

* বর্ত্তমানে আদিব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত সমগ্র ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতিটী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ উদ্ধৃত হইল।

অর্চ্চনা।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত এই উপাসনা পদ্ধতির উপযোগিতা সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা হইয়া থাকে। সেই সকল আলোচনা মন্থন করিয়া আমরা চারিটী মীমাংসার উপযুক্ত বিষয় প্রাপ্ত হই—(১) হিন্দু প্রকৃতির সহিত সামাজিক উপাসনার অনুপযোগিতা, (২) সংস্কৃত ভাষায় উপাসনাপদ্ধতির অনুপযোগিতা, (৩) নির্দ্দিষ্ট উপাসনাপদ্ধতির অনুপযোগিতা এবং (৪) দীর্ঘতার কারণে আলোচ্য পদ্ধতির অনুপযোগিতা। আমরা এই চারিটী বিচার্য্য বিষয়ের উপর সংক্ষেপে দুই চারিটী বক্তব্য বলিয়া উপসংহার করিব।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার। আমাকে মোহপাপ হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না। হে দেব, হে পিতা, পাপ সকল মার্জ্জনা কর। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখকল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

প্রণামঃ।

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

সমাধান।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং॥

যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্বসুখদাতা; যিনি আমাদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর; আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর মন, যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধিবল, যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি; যিনি আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম। তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি শান্ত, মঙ্গল ও অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপে সমাধান করি।

ওঁ স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা। তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ। তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। ইঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইঁহার ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ধ্যানং।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

সর্ব্বলোকপ্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই পূর্ণমঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

স্তোত্রং।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাং ভজামো বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়। তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ। তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ নিশ্চল ও বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক, তুমিই প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাবন। তুমিই মহোচ্চপদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগেরও রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্ব-রহিত, সংসারসাগরের তরণী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্মপালনে আমাদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা ও পরম মঙ্গলস্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাসজনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং॥

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

স্বাধ্যায়ঃ।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি॥ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি॥ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥ রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥ কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি॥ যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি॥ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ॥

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

ব্রহ্মবাদীরা বলেন। যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়-

অনেক প্রাচীন হিন্দুর একটী ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে সামাজিক উপাসনা হিন্দু প্রকৃতির বিরোধী। আমরা তাঁহাদের একথার সঙ্গতি বুঝিতে পারি না। একথা বলিলে হিন্দু প্রকৃতিকে মানব প্রকৃতির বহির্ভূত করিয়া বলা হয়। কিন্তু হিন্দু প্রকৃতি তো বাস্তবিক মানবপ্রকৃতির বহির্ভূত হইতে পারে না। নির্জ্জনে পরমাত্মাতে আত্মসমাধান যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা কেহই অস্বীকার করে না এবং শাস্ত্রেও ইহার মাহাত্ম্য শতমুখে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সামাজিক উপাসনা অথবা অপর পাঁচজনের সহিত একত্র মিলিতভাবে ভগবানকে আহ্বান করা হিন্দুপ্রকৃতির অনুপযোগী কিছুতেই বলা যায় না কারণ মানব প্রকৃতিতে ইহার অভিব্যক্তি দেখা যায়। দেবতার আরতি স্তোত্র প্রভৃতিকে সামাজিক উপাসনার প্রথম সোপান ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। মানবপ্রকৃতির প্রয়োজন পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে স্তোত্রের অতিরিক্ত আরও কয়েকটী বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। নির্জনোপাসনার এক প্রকার আনন্দ, সজনোপাসনায় আর একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। সজনোপাসনার একটী বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে। যখন প্রাতঃকালের নির্মল সমীরণে পবিত্রতোয়া জাহ্নবীর তীরে দাঁড়াইয়া শত শত হিন্দুসন্তান জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের অভিমুখীন হইয়া সেই জ্যোতির জ্যোতি পরমদেবের জপস্তুতি করিতে থাকে, হৃদয়ে তখন কি এক অব্যক্ত আনন্দধারা বহিতে থাকে। হৃদয় তখন শত হৃদয়ে মিলিত হইয়া জাহ্নবীস্রোতের ন্যায় সেই অপার আনন্দসাগরের অভিমুখে স্বতই ধাবিত হইতে চাহে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সমস্বরে ঈশ্বরের স্তব, দেবমন্দিরে সমস্বরে আরতি প্রভৃতি যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই সজনোপাসনার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মানবপ্রকৃতির যাহা উপযোগী, যাহা আবশ্যক, তাহা মানবপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হিন্দুপ্রকৃতির অনুপযোগী কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? সামাজিক উপাসনার একটী বিশেষ ফল এই যে সমাজের লোকদিগের মতিগতি ধর্ম্মভাবের দিকে সহজে অগ্রসর হয় এবং তাহাদিগের অন্তরে ধর্ম্মভাবটী ভালরূপে মুদ্রিত হইয়া যায়।

একদিকে যেমন পরিবর্ত্তন মাত্রেরই বিরোধী প্রাচীনপন্থীগণ ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনাকে হিন্দুপ্রকৃতির অনুপযোগী মনে করিয়া সম্পূর্ণ হৃদয়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগদান করিতে পারেন নাই, সেইরূপ সামাজিক উপাসনা সংস্কৃত ভাষায় করিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ও প্রচলিত ভাষামাত্রে উপাসনা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া অক্ষয়কুমার দত্ত, কানাইলাল পাইন প্রমুখ কতিপয় নব্যপন্থী ব্রাহ্ম এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে মহা গোলযোগ তুলিয়াছিলেন। ভারতবাসী হিন্দুদিগের উপাসনা-পদ্ধতিতে সংস্কৃতভাষার উপযোগিতা বিচার করিতে গেলে সাধকদিগের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় দেখি না। ভারতবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন, এবিষয়ে তাঁহাদিগেরই কথা সমধিক গ্রাহ্য। ভারতের হিন্দু সাধকমাত্রেরই উপদেশ এই যে গায়ত্রী জপ করিবে, নিত্য উপনিষদাদি আলোচনা করিবে—তবে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া সহজ হইবে। শত সহস্র বর্ষের পরমার্থচিন্তার ফলে প্রাপ্ত উপনিষদাদির প্রাচীন ও প্রচলিত, সহজ ও সুবোধ্য শব্দবিশিষ্ট মন্ত্রগুলি স্বল্পাক্ষর এবং গভীর ভাবরাশির ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ বলিয়া তদবলম্বনে ব্রহ্মধ্যানের বড়ই সুবিধা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলিতে পারি যে বহুযুগের সাধনা-

---

কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। কে বা শরীরচেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনিই লোকসকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন। মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয়প্রাপ্ত হন না। ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম লোক, ইনি ইহার পরম সম্পৎ, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্যান্য জীব সকল উপভোগ করে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ ॥

উপসংহারঃ।

ওঁ য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কামাবস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

লব্ধ একমাত্র ওঁকার অবলম্বনে ব্রহ্মধ্যান করিলে আমাদের সমস্ত জীবন কাটিয়া যাইবে। সংস্কৃত ভাষায় উক্ত প্রাচীন ঋষিদিগের মন্ত্র অবলম্বনে উপাসনা আশ্চর্য্য সহজ হয় বলিয়াই রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের প্রচারিত পদ্ধতিতে সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই।

কেহ কেহ আবার একটী নির্দ্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতির উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ব্যক্তিগত উপাসনায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন উপায়ে পরমাত্মাতে আত্ম-সমাধান করিতে পারে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে যখন দশব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা করিতে হইবে, তখন একটী নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি বড়ই উপযোগী হয়। দশ জনের সঙ্গে আহার বিহারের ন্যায় সামাজিক উপাসনাতেও নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির বড়ই উপযোগিতা আছে। সকল দিন উপাসকগণেরও মনের অবস্থা সমান থাকে না, এবং আচার্য্যগণ কি ভাবে উপাসনা করিবেন, কি বলিবেন, বক্তৃতা শুনিবার ন্যায় তাহার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হইলে সূক্ষ্মদর্শী ধীরেরা বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃত উপাসনা করিবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। প্রত্যুত, নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি থাকিলে আচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে উপাসকগণও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মনের স্থৈর্য্য আনয়ন পূর্ব্বক আত্মসমাধানের জন্য সহজেই প্রস্তুত হইতে সমর্থ হয়েন। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিয়মিত উপাসনার উপকারিতা বুঝাইয়াছিলেন, সেই দৃষ্টান্ত নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে উপাসনা করিবার উপকারিতা সম্বন্ধেও সুন্দর প্রযুক্ত হইতে পারে। পশ্চিমাঞ্চলে দেখা যায় যে গ্রীষ্মকালে স্রোতস্বিনী সকল শুকাইয়া যায়, কিন্তু সেই সকল স্রোতস্বিনীর নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনে অতি ক্ষীণকায় জলপ্রবাহ বহিতে থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া শতলাভের প্রলোভন সত্বেও সেই জলপ্রবাহের পথগুলি ভরাট করিয়া বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে বা সেই পথগুলি কাটিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জমীগুলির সহিত সমান করা উচিত নহে, কারণ বর্ষাকালে যখন পর্ব্বত হইতে ভীষণ বেগে জলস্রোত সকল নামিতে থাকে, তখন সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথগুলির অভাব হইলে সমস্ত দেশপল্লী ভাসিয়া যাইবে এবং মৃত্যুর নানাবিধ কারণ হইয়া উঠিবে; আর যদি সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথগুলি উন্মুক্ত থাকে, তবে বর্ষার বারিধারা শতধারে নামিলেও সমস্ত দেশপল্লীর আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া সেই সকল পথ ধরিয়া মহাসাগরের সহিত মিলিত হইবে। এখানে উপাসনাকে উপদেশ হইতে পৃথক ধরা হইয়াছে।

অন্যান্য দিক দিয়া দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত উপাসনাপদ্ধতির উপযোগিতা স্বীকার করিলেও কেহ কেহ ইহার দৈর্ঘ্যকারণে তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। পুরাকালে ভারতবাসীদিগের, বিশেষত ভারতের ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ সোয়াস্তি ছিল, বর্ত্তমানে তাহার কিছুই নাই। এখন সকলকেই সমানভাবে খাটিয়া খাইতে হয়—কাজেই এখন চতুর্দ্দিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বেষহিংসা। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমানে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে জ্ঞানপিপাসু অনেকেই পূর্ব্বাবধি শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রসমূহ ও তাহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অবগত থাকেন। তাঁহারা নির্জ্জনে ধ্যানধারণা করিতেই ভাল বাসেন। কাজেই সামাজিক উপাসনাতে দীর্ঘপদ্ধতি তাঁহারা অনুমোদন করেন না। তাঁহাদের মতে নবীন উৎসাহে উৎসাহী ব্রাহ্মদিগের হয়তো উক্ত পদ্ধতি দীর্ঘতার কারণেই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, কিন্তু পদ্ধতি এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহা সেই নবীন উৎসাহের অভাবেও লোকের চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হয়, দৈর্ঘ্যের কারণে না বিরক্তিকর হইয়া উঠে। আমাদের মতে দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত একটী আদর্শ পদ্ধতি—ইহা মানবের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও অভাবের উপরে গঠিত। প্রকৃত সাধক যিনি, যিনি প্রকৃতই ব্রহ্মসাধনে সিদ্ধ হইতে চাহেন, উপাসনার গভীরতা যিনি প্রার্থনা করেন, তাঁহার পক্ষে এই পদ্ধতিটী বড়ই সহায় হইবে। কিন্তু সামাজিক উপাসনায় আচার্য্য উপাসকমণ্ডলীর মনের ভাব বুঝিয়া, সময় ও স্থানের অবস্থা বুঝিয়া ইহার কোন কোন অংশ বাদ দিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের মনে হয় যে অবস্থাবিশেষে অর্চ্চনা, সমাধান, স্তোত্র এবং প্রার্থনা (অসতোমাসদগময়) এই কয়টীর

সাহায্যেই উপাসনাকার্য্য সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। আমাদের উপাসনাপদ্ধতির দৈর্ঘ্যবিষয়ে আলোচনা করিবার একটী কারণ এই যে আমরা উৎসব প্রভৃতির কালে পদ্ধতির দীর্ঘতার কারণে শ্রোতৃমণ্ডলীর বিরক্তি ও তজ্জন্য চঞ্চলতা বৎসরের পর বৎসর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি।

স্বরলিপি।

সারঙ্গ—ঢিমে তেতালা।

ডাকোরে তাঁরে প্রাণ ভরি ;
তিনি অনাথ-নাথ শোক-সন্তাপহারী।
বন্ধু আর কে সঙ্কট কালে,
অকূলে আর কে কাণ্ডারী।
আজনম রহিলে যাঁর পদ-ছায়ে,
কাল-রজনী যবে আসিবে ঘনায়ে,
পাইবে তাঁরি কৃপা-তরী॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[-া -া]
II পা র্সা -া ণপা। ণমা পা না র্সা। র্রা র্সা -া -া। -না -র্সা র্সনা র্সা I
ডা কো ০রে০ তাঁ০ রে, প্রা ণ ভ রি ০ ০ ০ ০ তি০ নি

I -া -া -া -া। ণা র্সা -ণধা -ণধা। -ণা -পা -া পা। পা -া -া মা I
০ ০ ০ ০ অ না ০০ ০০ ০ ০ ০ থ না ০ ০ থ

I মপা -ণা পমা পমা। রা -া -া -জ্ঞা। রসা রা সন্া -সা। -া -া -া -া I
শো০ ০ ক০ সন্ তা ০ ০ ০ প০ হা রী০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া { রমা -রা মা। মা মা পা -া। পণা -পা পা পা। পা -মা পা (-মা I
০ ব০ ০ ন্ধু আ র কে ০ সং ০ ক ট কা ০ লে ০

I -রা) } -া I -া মপা না -া। র্সা র্সা ণা -পা। মপা -নর্সা -র্রা -র্মর্গর্মা।
০ ০ ০অ কূ লে ০ আ র কে ০ কা০ ০০ ০ ০০০

। র্রর্সা ণধা -ণমা -পা II
ণ্ডা০ রী০ ০০ ০

II { মা পা না র্সা। র্রা র্সা না -র্সা। -া -া -া -া। -া -া -া -া I
আ জ ন ম র হি লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I না র্সা র্রর্সা র্রা। র্রা -া -া -া। -া -র্জ্ঞর্রা র্সনা -র্সা। -া -া -া -া } I
যাঁ র, প০ দ ছা ০ ০ ০ ০ ০০ য়ে০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া নর্সা র্রা র্মা। র্গর্মা র্গর্মা র্রা র্সা; র্সর্রা র্সা ণপা -না। না না র্সা -া I
• কা• ল, র জ নী, ব বে আ সি বে• • • ঘ না য়ে •

I -া পা না র্সা। র্রা র্সা ধণা পা। মপা -নর্সা -র্রা -র্মর্গর্মা। র্রর্সা -ণধা -ণমা -পা II II
• পা ই বে তাঁ রি, কৃ পা ত• • • • • • রী• • • • • •

—— • ——

রাণাডের স্মৃতিকথা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বোম্বাইনগরে বিদ্যাভ্যাস ও চাকরী আরম্ভ।

আমার স্বামীর বয়স যখন ১১ বৎসর, সেই সময় আমার ননদের বয়স ৯ বৎসর মাত্র ছিল। এই বৎসরেই ননদের বিবাহ হয়। তাকে "আজরী"র পড়নিসের ঘরে দেওয়া হইয়াছিল। এক বৎসর পরেই আমার স্বামীর বয়স ১১ বৎসর পূর্ণ হইবে, ঠিক সেই সময়ে আমার শাশুড়ীঠাকরুণ অষ্টম গর্ভের একটি সন্তান প্রসব করিয়া তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। তাহার পর, আমার স্বামীকে ও কীর্ত্তনের ছেলেকে কোহলাপুরের ইংরাজী স্কুলে দেওয়া হইল। সেই সময়ে কৃষ্ণাজী চাকাজী ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন।

প্রায় এই সময়েই আমার শ্বশুরমহাশয়ের দ্বিতীয় বিবাহ হয় এবং আমার স্বামী ১৩ বৎসরে পড়িবামাত্রই "ওয়াই" প্রদেশের মেরোপন্ত দাণ্ডেকর নামক বৃহৎপরিবার এক সদ্‌গৃহস্থের কন্যা সখু-বাঈর সহিত ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমার স্বামীর বিবাহ হয়।

এই দাণ্ডেকরের বড় মেয়েকে তাত্যাসাহেব "ঘোর পড়ে ইচল করঞ্জিকর"এর হস্তে সমর্পণ করা হয়। শ্রীযশোদা বাঈ ওর্ফে বহিনী-সাহেব ঘোরপড়ে, অনুমান ১৯০৩ অব্দে মারা যান। ইহার মেজো মেয়েকে কোহলাপুরের জোশীরাওকে সম্প্রদান করা হয়। সেজো মেয়েকে আজরেকর ফড়নীসের হস্তে সমর্পণ করা হয় এবং আমার স্বামী, চতুর্থ মেয়ে সখুবাঈর পাণিগ্রহণ করেন।

আমার স্বামীর বিবাহ হইয়া গেলে, কীর্ত্তনে, চারি ভাই ও আমার স্বামী, এই কয় জন, শিক্ষার জন্য বোম্বাই নগরে গেলেন।

কোহলাপুরের বিদ্যালয়ে দুই বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত শিক্ষা হইবার পর, "এখন শিক্ষার জন্য আমাদিগকে বোম্বায়ে পাঠাও" এই বলিয়া প্রতিদিন কীর্ত্তনের নিকট আমার স্বামী তাগিদা করিতে লাগিলেন। আমার শ্বশুরমহাশয় আমার স্বামীর প্রতি কখনো কঠোর ব্যবহার করিতেন না কিংবা রাগ করিতেন না। তথাপি আমার স্বামী আপনি নিজে গিয়া তাঁহার নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না কিংবা কোন প্রার্থনা জানাইতেন না; ছোট বেলা হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার স্বামীর এইরূপ অভ্যাস ছিল। আবশ্যক হইলে অন্যকে দিয়া তাহা জানাইতেন।

কচিৎ কখন সাক্ষাতে বলিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি অতি অল্প কথায় ভক্তিনম্রভাবে বলিতেন। খাইবার সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে শ্বশুরমহাশয়ের সম্মুখে তিনি বসিতেন না। সম্মুখে কিছু বলিবার দরকার হইলে, দাঁড়াইয়া থাকিয়া কথাটি বলিয়াই নিজের কাজে চলিয়া যাইতেন ছেলেবেলা হইতেই এইরূপ অভ্যাস থাকায়, শিক্ষার জন্য বোম্বায়ে যাইবার খুব আগ্রহ থাকিলেও ভীরু স্বভাবপ্রযুক্ত শ্বশুরমহাশয়ের সম্মুখে গিয়া এই কথা বলিতে তাঁহার কখন সাহস হয় নাই। তাই, প্রতিদিন শীঘ্র নিদ্রা হইতে উঠিয়া তিনি আবাসাহেব কীর্ত্তনের নীচের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং কীর্ত্তনে উঠিয়া বাহিরে আসিলেই তাঁহাকে বলিতেন, "আবা সাহেব, বোম্বায়ে আমাদের কখন পাঠান হবে? ভাউ সাহেবকে বোলে' আমাদের সবাইকে শিক্ষার জন্য বোম্বায়ে পাঠিয়ে দিন।" এইরূপ দুই তিন মাস নিত্য আবাসাহেবকে বলিয়া তবে তাঁহার অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেন। পরে, তিনি ও শ্বশুর মহাশয় পরামর্শ করিয়া, বিনায়ক রাও, বলবন্ত রাও, নীলকণ্ঠ রাও, ত্রিম্বক রাও ও আমার স্বামী—এই পাঁচ জনকে, এক চাকর ও ব্রাহ্মণ সঙ্গে দিয়া, ১৮৫৬ অব্দে শিক্ষার জন্য বোম্বায়ে পাঠাইলেন।

আমার স্বামী সেইখানে যাইবার পর, তিন বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৫৯ অব্দে বোম্বাই য়ুনিভার্সিটির "ম্যাট্রিক্যুলেশন" পরীক্ষা দিলেন ও তৎপূর্ব্বে এলফিন্‌ষ্টন

ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রথম ১০, পরে ১৫,ও তাহার পর ২০ টাকার ছাত্রবৃত্তি পাইতেছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইবার পর, প্রথম তিন বৎসর জুনিয়ার ও তাহার পর তিন বৎসর সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি য়ুনিভর্সিটি হইতে প্রদত্ত হয়। সেই সময়, আমার স্বামী প্রথম ৬০ টাকা ও তাহার পর ১২০ টাকা মাসে মাসে "ফেলোশিপের" বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৬১ অব্দে আমার স্বামী "লিট্‌ল্‌-গো"-র পরীক্ষা দিয়া ১৮৬২ অব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ও সেই বৎসরেই ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে অনার-পরীক্ষা দিয়া স্বর্ণপদক ও ২০০ টাকার পুস্তক পুরস্কার পাইলেন। ১৮৬৪ অব্দে এম-এ ডিগ্রী পাইলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬২ অব্দে বোম্বায়ের ইন্দুপ্রকাশ-পত্র বাহির হইয়াছিল, এবং তাহার পরিচালকেরা ইংরাজি অংশের সম্পাদনের ভার আমার স্বামীর প্রতি অর্পণ করিলেন। তিনিও পরীক্ষার অধ্যয়নক্রমের ব্যাঘাত না করিয়া এই কাজ উত্তমরূপে চালাইয়াছিলেন। প্রথম বৎসরেই, "পানিপতের যুদ্ধের শতসাম্বৎসরিক দিবস" এই বিষয়ের উপর একটা অগ্রলেখ (leader) লিখিয়াছিলেন। এই লেখায় যে ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও দেশপ্রীতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল, তাহার দরুণ সকলের দৃষ্টি ঐ পত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এম-এ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন অভ্যাস যখন চলিতেছিল তখনই কালেজে "ক্লাস্ পড়াইবার" ভার তাঁর উপর ছিল। কোন কাজেই ত্রুটি না হয় এই জন্য তিনি শিক্ষাদান সম্বন্ধে গ্রন্থাদি খুব পাঠ করিতেন। এই সমস্তের ফলে, ১৮৬৪ অব্দে চোখ বিগড়াইয়া যাওয়ায়, একেবারেই দেখিতে পাইতেন না। তিনি ছয় মাস পর্য্যন্ত সবুজ রঙের পটি দিয়া চোখ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। ডাক্তার ভাউদাজী "চোখ খুলিয়া আদপে দেখিবে না" আমার স্বামীকে এইরূপ দৃঢ়ভাবে আদেশ করিতেন। প্রতিদিন সকালে, কোন-না-কোন বন্ধু আমার স্বামীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে ভাউদাজীর বাড়ী লইয়া যাইতেন, এবং সেখানে ডাক্তার নিজ হাতে চোখের পটি খুলিয়া, চোখ ধুইয়া, ঔষধ দিয়া আবার পটি বাঁধিয়া দিতেন। এইরূপে ছয় মাস পর্য্যন্ত আমার স্বামী চোখের জন্য এত কষ্ট পাইতেছিলেন, তবু পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন ছাড়েন নাই। চক্ষুপীড়ার সময়, সহাধ্যায়ী মিত্রমণ্ডলীর মধ্যে এক একজন পালা করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন আর তিনি শুনিতেন। অধ্যয়নের এইরূপ প্রণালী ছিল। তাঁর এই চক্ষুপীড়া কমবেশী পরিমাণে শেষ পর্য্যন্ত ছিল। পরে আমার স্বামী "এল্‌-এল্‌-বি" পরীক্ষায় অনর সমেত উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। ইহার পূর্ব্বে, এল্‌ফিন্‌ষ্টন্ কালেজে ইংরেজি শিখাইবার যে কাজ তাঁহার ছিল, তাহার দরুণ তখনকার কালেজের প্রিন্‌সিপ্যাল মিঃ চট্‌ফীল্‌ড্, অন্যান্য অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ সকলে মিলিয়া ৩০০ টাকা মূল্যের এক সোনার ঘড়ী তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

১৮৬৬ অব্দে, পুনার শিক্ষাবিভাগের 'অ্যাক্টিং' মরাঠী অনুবাদকের পদে আমার স্বামী ২০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। পরে অক্কলকোটায় কিছু দিন ম্যানেজারের কাজ ও কোহ্লাপুরে বিচারপতির কাজ করিয়া পুনর্ব্বার ১৮৬৮ হইতে ১৮৭১ পর্য্যন্ত বোম্বায়ের এল্‌ফিনষ্টন কালেজে ৪০০ টাকা বেতনে ইংরাজী অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এই কাজে থাকিতে থাকিতেই হাইকোর্টে 'টর্ম' রক্ষা করিয়া অ্যাডভোকেটের পরীক্ষা দিলেন এবং তাহাতে বেশ সফলতা লাভ করিলেন। মধ্যে যখন কোহ্লাপুরে আমার স্বামী বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন, সেই সময় আমার শ্বশুর মহাশয় খাস্-ম্যানেজারের পদে ছিলেন। আমার স্বামী কোহ্লাপুরে যখন বদলী হইলেন তখনও তাঁর ছেলেবেলাকার সেই ভীরুতা, সেই ভক্তিনম্রতা সমানই ছিল। ছাত্রাবস্থার সময়ে যেরূপ, এ সময়েও সেইরূপ; তিনি কাহারও উপর রাগ করিতেন না, কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিতেন না; সেইরূপ নীরবে আপনার কাজ করিতেন, ও অন্যের দ্বারা করাইয়া লইতেন। এইরূপ তাঁহার কাজের ধরণ ছিল।

কোহ্লাপুরে আমার শ্বশুর মহাশয় অনেক দিন বাস করায়, অনেক ভালো ভালো লোক তাঁহার বন্ধু হইয়াছিলেন। ঘরের লোক ছাড়া সেখানে পরকীয় অন্য লোকেরও অনুরোধ উপরোধ করিবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। তথাপি আমার স্বামীর কাজকর্ম্মে সর্ব্বপ্রকারে নিস্পৃহতা ও সতর্কতা থাকাতে, তিনি কাহারও অনুরোধ উপরোধ রাখিতেন না—একথা আমার শ্বশুর মহাশয় বিলক্ষণ জানিতেন; তাই কাজ সম্বন্ধে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে, তিনি একটি কথাও মুখ হইতে বাহির করিতেন না। আমার স্বামী কোহ্লাপুরে যাইয়া যখন বিচারপতির কাজ করিতেছিলেন, একমাস সওয়া মাসের পর, একদিন আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল সেই মোকদ্দমার প্রতিবাদী একটা বড় বংশের গৃহস্থ হওয়ায়, শ্বশুর মহাশয়ের বিশেষ পরিচিত ছিলেন; তাহা ছাড়া তাঁহার সহিত নিতান্ত দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয় সম্বন্ধও ছিল। সেই ব্যক্তি বাড়ী আসিয়া শ্বশুরমহাশয়কে এইরূপ অনুরোধ করিলেন যে, "আমার হইয়া আপনি দুই এক কথা

মাধব রাওকে বলিবেন। আপনার ইহা ভাল লাগে না, তা আমি বুঝি। কিন্তু আপনার যাতে সঙ্কোচ হয় এমন কোন কথা বলিতে আমি বলিতেছি না। আমার সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিবেন যে, ফুরসতের সময় আমার সমস্ত কাগজপত্র তিনি পড়ে দেখবেন ও ধীরেসুস্থে আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে নেবেন। এ ছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই। একবার এই সমস্ত শুনলে পর যদি কোন বেরো-বার রাস্তা আছে বলে তাঁর মনে হয়, তবে আমি সেই রাস্তা ধরে চলব। এইটুকু মাত্র আপনি আমার হয়ে বলবেন।" এইরকম করিয়া খুব ধরিয়া পড়ায়, শ্বশুর মহাশয় স্বীকৃত হইলেন এবং আমার স্বামী যেখানে বসিতেন, বাড়ীর সেই উপর-তলায় শ্বশুরমহাশয় সেই লোকটিকে লইয়া গেলেন। শ্বশুরমহাশয়কে দেখিবামাত্র আমার স্বামী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহারা দুজনে বসিলে পর, আমার স্বামী বসিলেন। শ্বশুরমহাশয় বলি-লেন,—"ইনি একটা কথা বলবেন বোলে এসেছেন এঁর কথাটা শুনে নেও।" আমার স্বামী কোন উত্তর দিলেন না। ইহা দেখিয়া সেই ভদ্রলোকটি বলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এই কথা বলিলেন—"আমি আজ কোন কাগজপত্র আনিনি, আপনার ফুরসৎ হলে নিয়ে আসব।" তখন আমার স্বামী বলিলেন:—"আজ আমার অনেক লেখবার কাজ আছে, ফুরসৎ পেলে আপনাকে জানাব।" এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তা বেশ। ফুর-সৎ হলে আমাকে জানালেই আমি আবার আসব। এখন যাই।" এই বলিয়া তিনি নমস্কার করিলেন ও উঠিয়া গেলেন। তাহার পর শ্বশুরমহাশয় নীচে যাইবার জন্য উঠিলেন। তখন আমার স্বামীও উঠিয়া তাঁহাকে খুব নরম ভাবে অথচ স্পষ্ট কথায় এইরূপ বলিলেন যে, "এখানে আমি কাজের জন্য এসেছি। সমস্ত কোল্হাপুরই আপনার; এবং যে-সে লোক এসেই নিজের কাজের জন্য অনুরোধ উপরোধ করবে। এরকম না হলেই ভাল হয়। নইলে আপনার কষ্ট হবে। তাহলে আমাকে এখান থেকে বদলী করে দিতে হবে। মোকদ্দমার কোন পক্ষেরই কাজ আমি বাড়ীতে দেখব না কিংবা তার কথা আদালতের বাহিরে শুনব না,—এই রকম আমার নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা আপনি চালাবেন।" এইরূপ বলিবার পর, তিন চারি মাস কোল্হাপুরেই কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ ঘটনা আর ঘটে নাই।

পরে, পুনায় আসিবার পর অবধি এল্‌ফিনষ্টোন কালেজে অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৭১এর নবেম্বর মাসে পুনায় ৮০০্ টাকা বেতনে সদর আমীনের (ফার্ষ্ট ক্লাস সব-জজ) পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৭৩ অব্দে আমার স্বামীর প্রথম স্ত্রী মারা গেলেন। তিনি পুনায় আসিবার পর হইতে কয়েক মাস ধরিয়া পুরাতন জ্বরে ভুগিতেছিলেন। গণেশ শাস্ত্রী সাকুর্দে-করের ঔষধ ও পাচন সুরু হইয়াছিল। তবুও তাঁর পীড়াটা দিন দিন কমিয়া না যাওয়ায়, প্রথম চারি পাঁচ মাস সামান্য পীড়া বলিয়া যাহা মনে হইয়াছিল, এখন ডাক্তার ও বৈদ্যেরা তাহাকে ক্ষয়রোগ বলিলেন। এই রোগভোগের সময়, স্বামীর অত্যন্ত উদ্বেগ ও রাত্রিজাগ-রণ হইত। আদালতের কাজ সমাপন করিয়া দিবসে ও সমস্ত রাত্রি ঠিক সময়মত নিজের হাতে ঔষধ দেওয়া ও রাত্রিজাগা কত কঠিন তা যে ভুক্তভোগী সেই জানে। সৌভাগ্যবতী রমাবাঈর * স্বভাব অতিশয় নম্র ও মন মমতাপূর্ণ হওয়ায়, তাঁহার প্রতি আমার স্বামীর অত্যন্ত ভালবাসা জন্মিয়াছিল। সেইজন্য, তাঁহার পীড়ার সময় যত কাজই হোক না কেন, তিনি তাহা নিজে করিবেন এইরূপ তাহার সঙ্কল্প ছিল। বিস্তর ঔষধ উপচার করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল না হওয়ায়, কার্ত্তিক ৬ তারিখে ও ১৮৫৪ শকে অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর, এক বৎসর পর্য্যন্ত আমার স্বামীর অত্যন্ত শোক হইয়াছিল। বিনা অশ্রুপাতে একদিনও যায় নাই। রাত্রিতে আহারের পর যতক্ষণ না ঘুম আসিত, তিনি তুকারামের অভঙ্গ পাঠ করিতেন। কোন অভঙ্গ করুণ ও প্রেমপূর্ণ হইলে, তিনি তাহা দুই তিনবার আওড়া-ইতেন ও ভাবে অভিভূত হইতেন। কিন্তু আমার বিবাহ হইলে পর, সন্ধ্যাকালে আমাকে শিক্ষা দিতে তাঁর ঘণ্টা দেড়েক যাইত। আমার বিবাহের ও তাহার পরবর্তী বৃত্তান্ত আমি সবিস্তার লিখিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার মাতৃবংশের স্বল্প বৃত্তান্ত দিলে কিছু অশোভন হইবে না এইরূপ মনে করিয়া আমি এইখানে খুব সংক্ষেপে তাহা লিখিতেছি। (ক্রমশঃ)

কি দিব তোমারে।

(শ্রীহিরন্ময়ী চৌধুরাণী)

আমার যা ছিল সকলি
কেড়ে নেছ তুমি
আর তো কিছুই নাই।
তোমার চরণের তলে
ঢালিবারে আজি
কি দিব ভাবিছি তাই।

---

* বিবাহের পূর্ব্বে ইঁহার নাম ছিল সগু-বাই। বিবাহের পরে মহারাষ্ট্রী রমণীদের নাম বদল হইয়া যায়। ইঁহার সহিত এই স্মৃতি-কথার লেখিকা রমাবাইকে পাঠকবর্গ যেন না মিলাইয়া ফেলেন।

অনুবাদক।

কত যে উঠিছে জাগিয়া
অকথিত বাণী
নাহি তার ভাব ভাষা ;
তোমায় কি দিয়ে বোঝাব
কি যে মোর মনে
আনিছে কুহকী আশা ॥
মোর ব্যর্থ অভিলাষ
গুমরি কাঁদিছে
ছুটে বাহিরিতে নারে ;
আমি পাই না ভাবিয়া
আপনার বলি
কি দিব আনি তোমারে ॥

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক।

(শ্রীলালবিহারী বড়াল)

জান ভাই জগতের সুখ নহে সার—
নির্ভর করহ তাঁয় যিনি সত্য সার।
এ সংসারে কখনও করোনা নির্ভর
পালন প্রথমে করে, শেষে নাশকর।
রহ তৃণশয্যায় বা রাজসিংহাসনে,
মৃত্যু লবে সমভাবে আপন সদনে।
ক্ষণিক সুখের লোভে ভুলিও না তাঁরে—
সভক্তি স্মরহ পরব্রহ্ম পরাৎপরে ॥

মেণ্ডেল-মত ও পরিবর্ত্তবাদ

(Mendelism and Mutation)

(ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী)

অষ্ট্রীয়ার সিলিসিয়া প্রদেশে সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারে গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল (Gregor Johann Mendel), ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ অব্দে তিনি ক্যাথলিক পৌরোহিত্য ব্রত গ্রহণ করেন এবং ১৮৫১ খৃঃ হইতে ১৮৫৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ভিয়েনাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রূণের (Brunn) মঠের স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। এই ব্রূণ মঠের বাগানে তিনি মটর প্রভৃতি শস্য লইয়া সঙ্কর-নিয়োগ (Hybridisation) প্রথায় নানারূপ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। কালে এই মঠের তিনি প্রধান মোহন্ত (Abbot) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আট বৎসর ধরিয়া নানারূপ বিভিন্ন রকমের মটর প্রভৃতি শস্য লইয়া সঙ্কর-নিয়োগে যে সব সিদ্ধান্তে মেণ্ডেল উপনীত হইয়াছিলেন সম্প্রতি সেগুলি 'মেণ্ডেলের নিয়ম' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার গবেষণা সম্বলিত ৪০ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি, ব্রূণের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত সমিতির (Natural History Society) মুখপত্রে সুদীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাহিত ছিল। মেণ্ডেলের জীবদ্দশায় তাঁহার লিখিত এই সব অনুসন্ধান, গবেষণা ও নির্দ্ধারণের প্রতি কেহই বড় একটা মনোযোগ বা আস্থা প্রদান করেন নাই। পক্ষান্তরে এই সব নির্দ্ধারণের উপর অনেকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর এইরূপ অবজ্ঞার জন্যই সম্ভবত জীবনের শেষভাগে মেণ্ডেল এই সব পরীক্ষা ও গবেষণা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রোগযন্ত্রণার কষ্ট ও তাঁহার মঠ-সংক্রান্ত অধিকারবিশেষ লইয়া গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ, এই উভয়বিধ অশান্তিতে তাঁহার জীবনের সায়াহ্ন কাল দুর্বিবহ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৮৪ খৃঃ অঃ ব্রাইট রোগে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দুই এক সপ্তাহের অগ্রপশ্চাতে মেণ্ডেলের এই লুপ্তপ্রায় প্রবন্ধটির সারাংশ স্বতন্ত্ররূপে প্রথিতনামা বৈজ্ঞানিক Hugo de Vries, Correns এবং Tschermak স্ব স্ব দেশে প্রকাশ করেন। ইহাঁরা প্রত্যেকেই মেণ্ডেলের অনুষ্ঠিত প্রণালী পুনঃ পরীক্ষা করিয়া একই রূপ ফল পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা মেণ্ডেলের অবলম্বিত দৃষ্টান্ত ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদেও একই রূপ নির্দ্ধারণে উপনীত হওয়াতে মেণ্ডেলের মত বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়াছিল।

মেণ্ডেলের মতের আলোচনা করিতে গেলে বংশ (species), প্রকারভেদ (variety), প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে হয়। মূল বিষয় আরম্ভ করিবার আগে কাজেই ঐ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে। মানুষের ব্যবহার ও ব্যবসায়ের মধ্যে আসিয়া পড়ার দরুণ প্রয়োজনীয় শস্য, ফল ও ফুল প্রভৃতির বংশগুলির (species) মধ্যে বহুপ্রকারের রকমওয়ারি প্রকারভেদের (variety) উৎপত্তি হইয়াছে। কোন এক জাতীয় শস্য, কোন এক জাতীয় ফল বা কোনও

একজাতীয় ফুল—মূলত একটি মাত্র বংশ (species) হইলেও ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনেক রকমের (variety) প্রকারভেদের অবতারণা ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে ধান, মটর কলাই, সর্ষপ আম ও গোলাপের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধান (*Oriza sativa*) ঘাস (Gramineae) পর্য্যায়ের (Order) একটি বংশ (species), মটর (*Pisum sativum*) লেগুমিনোসি (Leguminosae) পর্য্যায়ের (Order) একটি বংশ (species); আম (*Mangifera indicum*) এনাকার্ডিএসি (Anadcardiaceae) পর্য্যায়ের (Order) অন্তর্গত একটি বংশ। সর্ষপ (*sinapis dichotoma*) ক্রুসিফেরি পর্য্যায়ের একটি বংশ (species)। কাঠগোলাপ, গোলাপ-পর্য্যায়ের (Order Rosaceae) একটি বংশ। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে নানারূপ প্রকারভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, আর মানুষের চেষ্টায় ইহার অনেক রকম প্রকারভেদের (varieties) বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা আমরা অনেকেই জানি। এক এক প্রকারভেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি ঠিক রাখিতে পারিলে উহাদের পার্থক্য ঠিক থাকিয়া যায়, আর পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির আমূল পরিবর্ত্তন করিলে ঐ সব প্রকারভেদ মৌলিক বংশে পরিণত হইতে পারে। বাগানের মনোহারী সুগন্ধ গোলাপের প্রকারভেদের পারিপার্শ্বিক রক্ষণকারী অবস্থার অভাব ঘটিলে কালে উহা বনজ কাঠ গোলাপের মত হইয়া যাইতে পারে। সংক্ষেপত বংশ (species) ও প্রকারভেদের (variety) ইহাই প্রধান বিশেষত্ব।

আর একটা পার্থক্য হইতেছে জননপ্রণালীমূলক। দুইটি প্রকারভেদের মিশ্রণে যে সঙ্করগুলির উৎপত্তি হয় তাহারা অপত্যোৎপাদনক্ষম (fertile)। আর দুইটি নিকটসাদৃশ্যসম্পন্ন বিভিন্ন বংশের (species) মধ্যে যৌন সম্বন্ধ হইয়া অপত্যোৎপাদন হইলেও সেই অপত্যগুলি বন্ধ্য বা উষর (sterile) অর্থাৎ অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইয়া থাকে। ইহার কারণ সম্বন্ধে এখন কোনও আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। এরূপ স্থলে আমরা যে সব দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই তাহার দুই একটি উল্লেখ করিলেই অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে। ঘোড়া (*Equus Caballus*) ও গাধা (*Equus asinus*) এই দুইটি একই জাতির (genus) অন্তর্গত দুইটি স্বতন্ত্র বংশ (Species)। ঘোড়ার ভিতর অনেক রকম প্রকারভেদ আছে,—যেমন আরব, অষ্ট্রেলির, দেশী প্রভৃতি। পুরুষ-পরম্পরায় এই সব প্রকারভেদ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। আর ইহাদের মিশ্রণে যে সব মিশ্রিত প্রকারভেদের সঙ্করের (hybrid) উদ্ভব হইয়াছে তাহারাও বংশ রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই সব সঙ্করকে স্বভাব-সঙ্কর বলা যাইতে পারে। ঘোড়া ও গাধা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বংশ হইলেও তাহাদের যৌনসম্বন্ধে অপত্যোৎপাদন হইয়া থাকে। ইহারাই খচ্চর (Mule)। সকলেই জানেন খচ্চর সন্তানোৎপাদনে অক্ষম (sterile)। খচ্চরও একটি সঙ্কর, তবে বন্ধ্য (sterile) বলিয়া ইহাকে অভাব-সঙ্কর নাম দেওয়া যাইতে পারে।

মানুষ বিভিন্ন প্রকারভেদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে যৌন সম্বন্ধ ঘটাইয়া নানারূপ স্বভাব ও অভাব-সঙ্করের সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিতেছে। এই সমস্ত সাঙ্কর্য্যিক প্রকারভেদের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া মেণ্ডেল ইহাদের মধ্যে বংশানুক্রমের (inheritance) একটা ধারা বা প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে মটরকলাইয়ের প্রকারভেদ লইয়া তিনি নানারূপ পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মটর কলাইএর ফুল মানবিক চেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদের মধ্যে সঙ্কর উৎপাদন করাইবার বিশেষ উপযোগী। সময়ান্তরে মটরকলাইয়ের ফুলের বিশেষ বিবরণ দিয়া ইহাদের মধ্যে সঙ্কর উৎপাদনের প্রণালী আলোচনা করা যাইবে। আপাতত মেণ্ডেল যেরূপে সঙ্করতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক।

মটরকলাইয়ের ২২ রকম প্রকারভেদ লইয়া মেণ্ডেল তাঁহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই ২২শ রকম প্রকারভেদের মধ্যে সাতটি বিশিষ্ট লক্ষণ লইয়া তাঁহার গবেষণা চালাইয়াছিলেন। সেই সাতটি লক্ষণ নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) কলাইএর মধ্যস্থ ডা'লের বর্ণ। ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদে ফেকাসে হরিদ্রা বর্ণ, ঘোরাল হরিদ্রা বর্ণ, কমলা লেবুর বর্ণ বা সবুজ বর্ণ হইতে পারে। ডা'লের বর্ণের এই বৈচিত্র্য, প্রকারভেদগুলির এক একটি লক্ষণ।

(২) পাকা কলাইয়ের বিচির আকৃতি। অর্থাৎ কলাই নিটোল গোলাকৃতি, অথবা উপরে ভাসা ভাসা কুঞ্চিত-আকৃতি, বা দীর্ঘাকৃতি ও উপরে গভীরভাবে খাঁজ কাটা ইত্যাদি বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত।

(৩) কলাইয়ের পাকা ছেঁইএর রং। উহা সাদা, ধূসর, মেটে, চামড়ার ন্যায় লালমেটে, বা বেগুনী রংয়ের ফোটাফুটিওয়ালা ইত্যাদি রকমে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত।

(৪) পাকা ছেঁইএর গঠন বা আকৃতি। ছেঁই ফোলা, বা মাঝে মাঝে খাঁজ কাটা বা কোঁকড়ান।

(৫) কাঁচা (অপক্ক) ছেঁইএরবর্ণ বা রং। উহা উজ্জ্বল বা ঘোয়াল, সবুজ বা হরিদ্রা এবং উহার বর্ণের সঙ্গে বোঁটার রং, পাতার শিরার বর্ণ বা ফুলের রংয়ের বিভিন্নতা।

(৬) শাখার বা ডালের সঙ্গে ফুলের অবস্থান-সম্বন্ধ। ফুলটি ডালের শিরোদেশে বা ডালের পাশেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই দুই ভিন্ন লক্ষণা-ক্রান্ত প্রকারভেদ।

(৭) কাণ্ডের দীর্ঘতা (length) অর্থাৎ কাণ্ড খুব লম্বা বা একেবারে খর্ব্বাকৃতি। এই দুইটি বিরুদ্ধ লক্ষণযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ।

মেণ্ডেল এইরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন জোড়া জোড়া লক্ষণাক্রান্ত প্রকারভেদের কৃত্রিম যৌন সম্বন্ধ ঘটাইয়া সঙ্করসন্ততিদের মধ্যে এই এক-এক জোড়া বিরুদ্ধভাবাপন্ন লক্ষণের অভাব ও বিকাশের তারতম্য হিসাব করিয়া বংশানুক্রমের ধারা বা নিয়ম স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মটরের এক প্রকারভেদ বেশ উচ্চ বা লম্বা হয়। ইহারা সাধারণত ৬।৭ ফুট লম্বা হইয়া থাকে। এই প্রকারভেদের কাণ্ড লম্বা হওয়া একটি বিশেষ লক্ষণ। অন্য আর একটি প্রকারভেদ, এই দীর্ঘকাণ্ড প্রকারভেদের বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত খর্ব্বা-কৃতি কাণ্ডবিশিষ্ট প্রকারভেদ। ইহাদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য মাত্র ৭।৮ ইঞ্চি হইয়া থাকে এবং কখনও ১৮ ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না।

মেণ্ডেল একটি লম্বা এবং একটি খাটো এইরূপ এক জোড়া মটরের প্রকারভেদ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লওয়া হইয়াছিল, যে কাণ্ডের দীর্ঘতা সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট ধর্ম্মাক্রান্ত গুণটি প্রত্যেক প্রকারভেদের বংশানুগত। অর্থাৎ লম্বা জাতের বিশুদ্ধ প্রকারভেদ হইতে ঠিক লম্বা জাতীয় চারাই উৎপন্ন হয় এবং বিশুদ্ধ খাটো জাতের প্রকারভেদ হইতে কেবল খাটো জাতের চারারই উৎপত্তি হইয়া থাকে। মেণ্ডেল একটি লম্বা জাতের প্রকারভেদ ও আর একটি খাটো জাতের প্রকারভেদ লইয়া কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের যৌন সম্বন্ধ ঘটাইয়া সঙ্করের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মটর ফুলে এইরূপ সঙ্কর সংঘটন অতি সহজ ব্যাপার। মটরের ফুল যুগ্মপরাগবিশিষ্ট (Hermaphrodite বা bisexual)। অর্থাৎ একই ফুলে ডিম্বকেশর ও পুংকেশর বিদ্যমান। যে ফুলের পুংকেশরদণ্ড (Anther) ফুটিয়া বাহির হয় নাই এইরূপ ফুল হইতে অফুটন্ত পুংকেশরদণ্ড অর্থাৎ এনথারগুলিকে একটি সূক্ষ্ম চিমটার সাহায্যে খুঁটিয়া ফেলিতে হয় এবং অন্য প্রকারভেদের একটি ফোটা ফুলের এনথার (Anther) হইতে উহার কেশর (Pollen grain) আনিয়া প্রথমোক্ত হৃত-পুংকেশর (emasculate) পুষ্পের ডিম্বনালীশীর্ষে (stigma) প্রয়োগ করিলেই উহা গর্ভকেশরে গিয়া স্ত্রীপরাগের সহিত মিশ্রিত হইলে ফলিত (fertilized) পরাগ হইতে সঙ্কর বিচির * উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রথম বারের উৎপন্ন সঙ্কর বিচি হইতে যে সব সঙ্কর তরুর (plant) উদ্ভব হয়, তাহাদের সকলকেই লম্বা প্রকারভেদের অন্তর্গত হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ ইহাদের সকলেরই কাণ্ড (stem) ৫।৭ ফুট লম্বা হইয়া থাকে। কাজেই লম্বা প্রকারভেদের সঙ্গে এই প্রথম বারের তরু-সন্ততিগুলির কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এই সঙ্করনিয়োগ প্রক্রিয়াতে পুংকেশর বা গর্ভকেশর যে কোনও প্রকারভেদ হইতেই লওয়া হউক না কেন, প্রথমবারের সব তরুসন্তানগুলিই লম্বা প্রকারভেদের মত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পুংকেশর যদি লম্বা প্রকার-ভেদ হইতে লওয়া হয় তাহা হইলে যেরূপ প্রথম বারের সব সন্তান-তরুগুলি লম্বা প্রকারভেদের হইবে, সেইরূপ আবার যদি পুংকেশর খর্ব্বাকৃতি প্রকার-

* বিচি বা বীজ (seed), সপুষ্প তরুর ফলের মধ্যে থাকে। উহা লুপ্তচেতন তরু-শিশু ও তাহার ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয় খাদ্যের সম্ভারযুক্ত উপাদান সম্বলিত এবং রক্ষাকারী বেষ্টনে আচ্ছাদিত।

ভেদ হইতে লওয়া হয় তাহা হইলেও প্রথমবারের বিচি হইতে উৎপন্ন সব তরু-সন্তানগুলিই লম্বা প্রকারভেদের মত হইবে। (ক্রমশঃ)

কুড়ানো গান।

(১)

আমার মন কররে কেন মিছে ভাবনা?
মরণকালে সঙ্গে দিবে ছেঁড়া চ্যাটা বিছানা।
গয়া যাও আর কাশী যাও
মথুরাতে পাবি না—
দেখ তোর হৃদ্‌মাঝারে বিরাজ করে
তারেও চিনতে পার না!
এক তারেতে তার মিশায়ে তারেও কেন ডাক না?
পাঁচ তারেতে তার মিশালে হরির দর্শন পাবে না।
যারে বল আপন আপন, সঙ্গেতে কেউ যাবে না—
মরণকালে তোমাকে কেউ এক গণ্ডুষ জল দিবে না॥

(মহেন্দ্র ক্ষ্যাপা)

(২)

কত উঠছে আজব কারখানা দিলদরিয়ার মাঝে—
ডুবলে পরে রত্ন পাবি, ভাসলে পরে পাবিনে।
দিলের মাঝে জাহাজ আছে,
ন'জনা তার গুণ টানিছে,
ছ'জনা তার দাঁড় টানিছে,
হাল ধরেছে একজনা।
দিলের ভিতর বাগান আছে,
(তাতে) নানা জাতির ফুল ফুটেছে,
সৌরভে জগত মেতেছে,
আমার গোঁসাই মাতল না।
দিলের ভিতর কমল আছে,
(তাতে) ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রয়েছে,
(সেই) তিনকে যে এক করেছে
তার বা কিসের ভাবনা?

(মহেন্দ্র ক্ষ্যাপা)

(৩)

কবে যেতে হবে এসব ফেলে
হরি বলে কাল কাটাও মন হেসে খেলে।
(তোমার) কোথা রবে কোঠা
কোথা রবে বেটা
রবির বেটা যখন ধরবে চুলে?
(তখন) ভাই বন্ধু সুত
যত অনুগত
চাঁদমুখে দেবে আগুন—
(তোমার) কোথা রবে দেহ
দারাপুত্রস্নেহ—
কেহ না ডাকিবে আপন বলে।
(তখন) বিদায় করে মড়া
দেবে গোময় ছড়া,
বলবে ছোঁড়া মলো অল্পকালে।
(তোমার) কোথা রবে ধন
এ রূপ যৌবন
প্রাণপ্রিয়, তোমার মরণকালে
(ও ভাই) কহে পঞ্চানন
ওরে অবোধ মন
কেন আছ আপন তত্ত্ব ভুলে?

[এই শেষ গানটী হুগলী নিবাসী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। তিনি গভর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতে সেই পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আজও তিনি এইরূপ সঙ্গীত রচনা করিয়া অনেককে সেগুলি গাহিতে শিক্ষা দেন শুনা যায়।]

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

মূল। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং অধ্যায়প্রতিপাদ্যং চ দর্শয়তি—

শাস্ত্রং ব্রহ্মবিচারাখ্য মধ্যায়াঃ স্যুশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
সমন্বয়াবিরোধৌ দ্বৌ সাধনং চ ফলং তথা॥ ৪॥

সর্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যেন পর্য্যবসানং প্রথমেনাধ্যায়েন প্রতিপাদ্যতে। দ্বিতীয়েন সম্ভাবিতবিরোধঃ পরিহ্রিয়তে। তৃতীয়েন বিদ্যাসাধননির্ণয়ঃ। চতুর্থেন বিদ্যাফলনির্ণয়ঃ। ইত্যেতেঽধ্যায়ানামর্থাঃ।

অনুবাদ। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য এবং অধ্যায়প্রতিপাদ্য বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। শাস্ত্রের নাম ব্রহ্মবিচার; ইহার চারিটি অধ্যায়ে চারিটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে—সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল।

সকল বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেতেই পর্য্য-

বসিত, ইহাই প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরোধের সম্ভাবনা নিরাকৃত হইয়াছে; তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার সাধননির্ণয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার ফলনির্ণয় উক্ত হইয়াছে। এই গুলি হইল অধ্যায়ের বিষয়।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অর্থ অবগত হইলে শাস্ত্রসংগতি বুঝা সহজ হয়। এক্ষণে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহাই বলা হইতেছে। এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মবিচার বা ব্রহ্মতত্ত্বের নিরূপণ, অতএব এই শাস্ত্রের নাম "ব্রহ্মবিচার"।

সমন্বয় কি? সমগ্র বেদান্ত বা উপনিষদের একমাত্র ব্রহ্মাই যে প্রতিপাদ্য, তাহাই সম্যক্ পরিস্ফুট করার নাম সমন্বয়।

অবিরোধ কি? অবিরোধ বুঝিবার পূর্ব্বে বিরোধের বিষয় জানা উচিত। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণু জগতের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বেদান্তে চেতন ব্রহ্মাই একমাত্র কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এইখানে জগতের কারণত্ব লইয়া বিরোধের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ব্যাসকৃত ব্রহ্মবিচারবিষয়ক ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই বিরুদ্ধাভাস উক্তিসমূহের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অবিরোধ বা বিরোধের অভাব প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যালাভের ফল সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে।

মূল। তত্র প্রথমাধ্যায়গতপদার্থান্ বিভজতে—

সমন্বয়ে স্পষ্টলিঙ্গমস্পষ্টত্বেঽপ্যুপাস্যগম্।
জ্ঞেয়গং পদমাত্রং চ চিন্ত্যং পাদেষ্বনুক্রমাৎ॥ ৫॥

স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্তং বাক্যজাতং প্রথমপাদে চিন্ত্যং তদ্‌যথা "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" [ব্রং সূং ১।১।২০] ইত্যত্র সার্ব্বজ্ঞ্য সার্ব্বাত্ম্য সর্ব্বপাপবিরহাদিকং ব্রহ্মণোঽসাধারণতয়া স্পষ্টং লিঙ্গং। অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গত্বে সত্যুপাস্যবিষয়বাক্যজাতং দ্বিতীয় পাদে চিন্ত্যং। তদ্‌যথা প্রথমাধিকরণবিষয়ে শাণ্ডিল্যোপাস্তিবাক্যে মনোময়ত্বপ্রাণশরীরত্বাদিকং সোপাধিকব্রহ্মণো জীবস্য চ সাধারণত্বাদস্পষ্টং ব্রহ্মলিঙ্গং। তৃতীয় পাদেত্বস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গত্বে সতি জ্ঞেয়ব্রহ্মবিষয়ং বাক্যজাতং চিন্ত্যং। তদ্‌যথা প্রথমাধিকরণে মুণ্ডকগত ব্রহ্মাত্মতত্ত্ববাক্যে দ্যুপৃথিব্যন্তরিক্ষপ্রোতত্বং সূত্রাত্মনঃ পরব্রহ্মণশ্চ সাধারণত্বাদস্পষ্টং ব্রহ্মলিঙ্গং। যদ্যপি দ্বিতীয় পাদে কঠবল্ল্যাদিগত ব্রহ্মবাক্যানি বিচারিতানি তৃতীয় পাদেচ দহরোপাসনবাক্যং বিচারিতং। তথাপ্যঽবান্তরসঙ্গতিলোভেন তদ্বিচারস্য প্রাসঙ্গিকত্বান্ন পাদার্থয়োঃ সাঙ্কর্য্যাপত্তিঃ। ইত্থং পাদত্রয়েন বাক্যবিচারঃ সমাপিতঃ। চতুর্থপাদেনাব্যক্তপদমজাপদঞ্চেত্যেবমাদিসন্দিগ্ধং পদং চিন্ত্যং।

অনুবাদ। এই গ্রন্থে প্রথমাধ্যায়ের চারিপাদের বিষয়গুলিকে বিভক্ত করা হইতেছে—

সমন্বয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞাপক অনন্যসাধারণ সুস্পষ্ট লক্ষণসমূহ, অস্পষ্ট অর্থাৎ জীবব্রহ্মসাধারণ এবং উপাসনার অবলম্বনীয় বাক্যসমূহ, জ্ঞেয় ব্রহ্মের বোধক বাক্যসমূহ এবং পদসমূহ যথাক্রমে চারিটী পাদে আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের স্পষ্ট স্বরূপবোধক বাক্যসমূহ (সমন্বয় অধ্যায়ে) প্রথমপাদে আলোচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—"অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" এই সূত্র দ্বারা অনুসূচিত অধিকরণে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বপাপরহিত প্রভৃতি বাক্যগুলি ব্রহ্মের অনন্যসাধারণ সুতরাং সুস্পষ্ট পরিচায়ক লক্ষণ। যাহা দ্বারা ব্রহ্মের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না অথচ যাহা উপাসনার অবলম্বন, এরূপ বাক্যসমূহ দ্বিতীয় পাদে আলোচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—এই পাদের প্রথম অধিকরণের বিষয় শাণ্ডিল্যোপাসনাবাক্যে উল্লিখিত মনোময়ত্ব, প্রাণশরীরত্বাদি লক্ষণগুলি উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং জীব এই উভয়সাধারণ হওয়াতে অস্পষ্ট ব্রহ্মলক্ষণ বলিয়া উক্ত হয়। তৃতীয় পাদে জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক যে সকল বাক্য অস্পষ্ট ব্রহ্মলক্ষণবিশিষ্ট, সেই সকল বাক্যই আলোচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—তৃতীয় পাদের প্রথম অধিকরণে ধৃত মুণ্ডকোপনিষদোক্ত ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব বিষয়ক বাক্যে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষে ওতপ্রোতত্ব সূত্রাত্মা এবং পরব্রহ্ম এই উভয়ের সাধারণ, সুতরাং অস্পষ্ট ব্রহ্মলক্ষণ উক্ত হইয়াছে। যদিও দ্বিতীয় পাদে কঠবল্লীকথিত ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক বাক্যসকল বিচার করা হইয়াছে এবং তৃতীয় পাদে "দহরোপাসনা" বিষয়ক বাক্যসকল আলোচিত হইয়াছে, তথাপি অবান্তরসঙ্গতি রক্ষার জন্য দ্বিতীয় পাদে আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গক্রমে তৃতীয়

পাদে উপস্থিত হইলেও উভয় পাদোক্ত মুখ্যবিষয়ের সংমিশ্রণের আপত্তি হইতে পারে না। এই তিনটী পাদের দ্বারা উপনিষদোক্ত বাক্যবিষয়ক বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। চতুর্থ পাদের দ্বারা "অব্যক্ত পদ এবং অজাপদ" প্রভৃতি সন্দেহাত্মক পদসমূহ আলোচিত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বেদব্যাস তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া এক একটী অধ্যায় চারি চারি পাদে বিভক্ত করিয়াছেন। এখন প্রথম অধ্যায়ের চারিটী পাদের বক্তব্য বিষয়গুলিকে পৃথকভাবে বলা হইতেছে। প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসান বা সমন্বয় করা হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম সমন্বয় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মের এপ্রকার লক্ষণগুলি আলোচিত হইয়াছে যেগুলি ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন পদার্থের প্রতি প্রযুক্ত হইতেই পারে না। সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বাত্মতা প্রভৃতি লক্ষণগুলি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন পদার্থেরই হইতে পারে না, তাই এই প্রকার লক্ষণগুলিকে ব্রহ্মের স্পষ্ট লক্ষণ বলিয়া বলা হইয়াছে। এই স্পষ্ট লক্ষণগুলি প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" এই সূত্র ধরিয়া সম্যক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এখন দ্বিতীয় পাদের কথা। দ্বিতীয় পাদে সোপাধিক ব্রহ্মেরই লক্ষণগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে শাণ্ডিল্যবিদ্যা বিবৃত হইয়াছে। উক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে মনোময়ত্ব ও প্রাণশরীরত্ব জীবেরই ধর্ম্ম এবং ভারূপত্ব ব্রহ্মের ধর্ম্ম, সেই কারণে উক্ত শব্দগুলি জীব অথবা ব্রহ্ম কাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে সন্দেহ হওয়াতে সমন্বয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে সমন্বয় করা হইয়াছে যে উক্ত শব্দগুলির দ্বারা প্রকাশিত লক্ষণ জীব এবং সোপাধিক ব্রহ্মের সাধারণ, সুতরাং সেগুলিকে সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মের স্পষ্ট লক্ষণ বলিয়া বলা যায় না; কাজেই সেগুলিকে অস্পষ্ট লক্ষণ বলা হইয়াছে। এই সকল অস্পষ্ট লক্ষণের মধ্যে যে সকল অবলম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা উপনিষৎ সমূহে বিধান করা হইয়াছে সেইগুলিই দ্বিতীয় পাদে সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আবার, সেই সকল অস্পষ্ট লক্ষণপ্রকাশক শব্দের মধ্যে যেগুলি দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার কথা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মকে জ্ঞেয়ত্বের সীমায় মধ্যে আনা হইয়াছে, সেই শব্দগুলিই তৃতীয়পাদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—'দ্যুলোক ভূলোক প্রভৃতি যাঁহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে, অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই জান।' এখানে দ্যুলোক প্রভৃতির ওতপ্রোতত্ব, হিরণ্যগর্ভ এবং ব্রহ্ম এই উভয়ের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া উহাকে ব্রহ্মের অস্পষ্ট লক্ষণ বলা হইয়াছে। এই সকল ব্রহ্মের অস্পষ্ট লক্ষণপ্রকাশক বাক্যসমূহের মধ্যে যেগুলি দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার জন্য অনুশাসন করা হইয়াছে, সেই গুলিই তৃতীয় পাদে বিবৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী কথা হইতেছে এই যে তৃতীয় পাদে মাত্র জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসমূহ আলোচ্য থাকিলেও উহাতে দ্বিতীয়পাদের আলোচ্য উপাসনাবিষয়ক "দহরোপাসনা" শব্দটী আলোচিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পাদে উপাসনাবিষয়ক বাক্যগুলি মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইলেও তাহাতে তৃতীয় পাদের আলোচ্য বিষয় জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্ব সকল আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার একটী পাদের আলোচ্য বিষয় অপর পাদে মুখ্যভাবে আলোচিত না হইয়া মাত্র প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া উহাতে পরস্পরসংমিশ্রণ বা সাঙ্কর্য্য দোষের কথা আসিতে পারে না। উক্ত দুইটী পাদে আলোচ্য মুখ্য বিষয়দ্বয়ের পৃথকভাবে আলোচনার কোন প্রকার ব্যাঘাত আনয়ন করা হয় নাই। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে উপনিষদুক্ত বাক্যসমূহের বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি পদের সমষ্টিকে বাক্য বলে। চতুর্থ পাদে 'অব্যক্ত' 'অজা' প্রভৃতি পদের আলোচনা হইয়াছে। এই পদগুলিকে সন্দিগ্ধ বা সন্দেহাত্মক বলিয়া বলা হইয়াছে, কারণ "অব্যক্ত" শব্দ ব্রহ্ম, প্রকৃতি প্রভৃতি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সেইরূপ "অজা" প্রভৃতি আরও কতকগুলি শব্দ বা পদ নানা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই সন্দেহ আসে যে সেই পদগুলি ব্রহ্ম অর্থে বা অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে এই সন্দেহাত্মক পদসকলকে বিচারের দ্বারা ব্রহ্ম অর্থে দাঁড় করানো হইয়াছে।

নানা কথা।

পুরুষোত্তম ও শক্তি।

সেদিন এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মুখপত্রে দেখিলাম যে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব বা পুরুষত্ব (Personal God) স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ পদার্থ ও শক্তি অবিনশ্বর এবং অনন্তকালস্থায়ী। "With the conception of Indestructibility and hence Eternity of Matter and Force and their inseparable connection and the appearance and disappearance of all beings of Nature by their action and reaction, the Personal God myth is sure to be given up by all rational minds * * *." ইহার প্রতিবাদে অনেক লেখালেখি হইয়া গিয়াছে। যথা-সময়ে আমরাও এ বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিবার চেষ্টা করিব। তবে সোজাসুজিভাবে এই বিষয়টা দেখিয়া এখানে আমরা দুই চারিটি কথা বলিব। আমরা যে বিষয়ই আলোচনা করি না কেন, প্রকৃতিকে ছাড়িয়া আলোচনা করিলেই ভ্রমে পড়িব, কারণ আমরা প্রকৃতিরই অন্তরঙ্গ। সেই প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে শক্তির স্থায়িত্বের সঙ্গে পুরুষের পুরুষত্বের বিরোধ ঘটে না। পুরুষের পুরুষত্বের অর্থে আমরা জ্ঞানময়ত্ব ইচ্ছাময়ত্ব প্রভৃতি গুণ বুঝি। মনে কর দুই আর দুই-এ চার হয়। অঙ্কশাস্ত্রের এই একটি শক্তি অন্ততপক্ষে আমার জীবনের প্রথমাবধি অব্যক্ত আকারে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমি সজ্ঞান ও ইচ্ছাময় পুরুষ—আমারই ইচ্ছাতে তাহা ব্যক্ত আকার ধারণ করিল। সেইরূপ শক্তির Eternityও "মহান বৈপুরুষঃ" সেই পুরুষোত্তমকে অস্বীকার করিবার একটা অপরিহার্য্য কারণ হইতে পারে না। ঈশ্বরবাদীগণ বলেন যে শক্তির Eternity ঈশ্বরেরই Eternity হইতে উৎপন্ন। এই কথাটি লোকেরা সাধারণত ধারণা করিতে পারে না, এইজন্যই যত গোলযোগের উৎপত্তি।

আদর্শ।

মানুষ মানুষকে আদর্শ করে কেন? মানুষ ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারে না বলিয়া। তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। ইহা তো ভগবানেরই বিধান। তাহা না হইলে তিনি পিতামাতা দেন কেন? যখন পিতামাতার স্নেহে তাঁহার স্নেহের ছায়া অনুভব করি, যখন স্বামীস্ত্রীর প্রেমের মধ্যে তাঁহারই অকাতর প্রীতির নিদর্শন পাই, তখন মানুষের শ্রেষ্ঠতার ভিতর দিয়া, মানুষের আদর্শের ভিতর দিয়া মানুষ যদি ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহাতে দোষের কিছুই নাই। তাহাতে ইহা বুঝায় না যে ঈশ্বরের আদর্শ মানুষকে শান্তি দিতে পারে নাই। বরঞ্চ ইহাই বুঝায় যে মানুষ যতদিন কেবলমাত্র মানুষকে আদর্শস্থানে রাখিবে, ততদিন শান্তি পাইবে না—একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের শান্তির নিদান।

সমাজ সংস্কার।

হিন্দুসমাজের সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুসমাজ প্রাচীন বটবৃক্ষের ন্যায় এমন একটা বৃহৎ ব্যাপার যে স্বভাবতই তাহার মধ্যে নানাবিধ আবর্জ্জনা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এত বড় সমাজের একদিক পরিষ্কার করিতে না করিতে অপরদিক আবর্জ্জনাময় হইয়া পড়ে। সকলদিক পরিষ্কৃত করিতে গেলে আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে—চারিদিকে সত্য-ধর্ম্মের, ভগবৎ নামের আগুন জ্বালাইয়া দিতে হইবে। এইটার সংস্কার করিব, ঐটার সংস্কার করিব, এমন কথা বলিলে চলিবে না। সমাজের যাহা কিছু, সকলই ধর্ম্মের আগুনে ফেলিয়া দিতে হইবে—যাহা খাঁটী যাহা প্রাণময় তাহাই থাকুক, অবশিষ্ট যাহা কিছু সকলই ভস্ম হইয়া যাক। এই ভাবে চলিলে সমাজসংস্কার বল, আর রাজনীতিসংস্কার বল, অথবা অন্য যে কোন বিষয়ক সংস্কার বল, সকল সংস্কারই অত্যন্ত সহজ হইয়া যাইবে।

ক্যানসার সম্বন্ধে পরীক্ষা।

গত বৎসর ইংলণ্ডের উলউইচ (Woolwich) নগরে ক্যানসর রোগে যাহারা মরিয়াছে, তন্মধ্যে ১৩৫ পুরুষ ও ৭৭ স্ত্রীলোকের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সন্ধান লইয়া দেখা গিয়াছে যে উহাদিগের মধ্যে শতকরা ৩২ জন অতিরিক্ত সুরাপান এবং শতকরা ৪১ জন অতিরিক্ত ধূমপানের কারণে উক্ত

ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। সাধারণত যত লোক ক্যানসার রোগগ্রস্ত হয়, সুরাপায়ী ধূমপানরত লোকেরা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। মুখ ও গলার ভিতর যে ৬৪ জনের ক্যানসার রোগ দেখা গিয়াছিল, তন্মধ্যে অতিরিক্ত চা-পায়ীর সংখ্যা ছিল শতকরা ২৮। পাকস্থলীর ক্যানসার রোগী পরীক্ষিত ৪২ জনের মধ্যে ১৫ জন (শতকরা ৩৬ জন) অতিরিক্ত সুরাপায়ী ছিল, ১৬ জন (শতকরা ৩৮ জন) অতিভোজী ছিল এবং ১১ জন (শতকরা ২৬ জন) অতিরিক্ত মাংসভোজী ছিল।

(ষ্টেটসম্যান, ৪ঠা অক্টোবর ১৯১৬)

কোন্ ধর্ম্ম চাই ?

ষ্টেপনির বিশপ বলেন—"আমাদের এখন আবশ্যক—সরল ধর্ম্ম, সবল ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে মূর্খ করিয়া গড়িবে না এবং যে ধর্ম্মের সহিত আমাদেরও লুকোচুরি খেলা চলিবে না; এমন ধর্ম্ম চাই, যে ধর্ম্ম মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশে সহায় হয় এবং যে ধর্ম্ম মানবের একতাসাধন করিবে"। ব্রাহ্মধর্ম্মই একমাত্র এই সমুদয় প্রয়োজন সাধন করিতে পারে এবং এই কারণে আমরা বলের সহিত বলিতে চাহি যে ব্রাহ্মধর্ম্মই বর্ত্তমানের একমাত্র উপযোগী ধর্ম্ম।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৯শে কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ ও সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পরে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। বন্ধুগণ যথাসময়ে উৎসবে যোগ দিয়া সুখী করিবেন।

বেহালা,
১৮৩৮ শক,
২০শে কার্ত্তিক।

শ্রীনীলকান্ত মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

৮৮০ সংখ্যা ১৮৩৮ শক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

করেছ ক্ষমা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজিকে নির্ম্মল নূতন শারদ প্রাতে
করিয়াছ ক্ষমা—জেনেছি জেনেছি আমি—
যতেক ক্ষুদ্রতা, পাপতাপ যাহা কিছু।
প্রণতি করিগো তোমারি চরণে স্বামি ॥ ১ ॥

দুঃখ মোর আজি—আশীর্ব্বাদ করি তারে—
ধন্য হোক সে-ও—গভীর দুঃখের মাঝে
তোমারে পেয়েছি—তুমি যে তখনি দেখা
মাতৃ-রূপ ধরে দিয়েছ সকালে সাঁঝে ॥ ২ ॥

সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ দুঃখ পাপতাপে ভরা
অতীতের পরে, তোমারি করুণাধারা
অবিরল ধারে নামিয়া, দিয়াছে ধুয়ে
শত স্রোতে ঝরা হৃদয়ের রক্তধারা ॥ ৩ ॥

তোমারি অতল দিয়াছি প্রেমের মাঝে
হে মোর দয়িত আকুল প্রাণের ঝাঁপ—
সুখ দুখ যাহা দিতে হয় দিও তুমি—
দিও নাকো শুধু তোমারি বিরহ শাপ ॥ ৪ ॥

ওগো প্রিয়তম ক্ষমা তো করেছ তুমি—
অপরাধ যত সবি তো লয়েছ মম
তব নিজ হাতে; ভিন্ন আর নাহি কিছু
জীবনে মরণে—সকলি অমৃত সম ॥ ৫ ॥

আমি ক্ষুদ্র কীট—মোরেও করেছ ক্ষমা;
তুমি যে মহান শিব সত্য সুন্দর হে—
তোমারি সমান কে গো মম প্রিয়তম—
শান্তি কোথা, বিনা তোমা পরে নির্ভর হে ॥৬॥

লভি' তব ক্ষমা প্রাণের পাষাণ ভার
গিয়াছে নামিয়া—প্রেমের আশ্রয়ে তব
রয়েছি নির্ভয়ে; জেনেছি জেনেছি আমি
তুমি মোর স্বামী, প্রাণের কাংক্ষিত সব ॥ ৭ ॥

শ্রদ্ধা।

(গত ২৯শে কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রপঠিত।)

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

গীতা ৪র্থ—৩৯

শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ ও সংযতেন্দ্রিয় হইলে জ্ঞানলাভ করেন এবং জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে পরম শান্তি অধিগত করেন। ইহাকে ঘুরাইয়া বলিলে আমরা বলিতে পারি যে ঈশ্বরপরায়ণ ও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পরম শান্তিপ্রদ জ্ঞান লাভ করিতে গেলে শ্রদ্ধাবান হওয়া আবশ্যক। এখানে শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, উভয়ই ভগবদ্‌বিষয়ক। ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই যে পরম শান্তিপ্রদ জ্ঞানলাভ করেন, আধ্যাত্মিক রাজ্যের এই একটী গভীর সত্য

ঋষিরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মসাধনে শ্রদ্ধার উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়াছেন। তাঁহারা একদিকে, যে সাধক শ্রদ্ধাবান হইয়া ভগবানের ভজনা করেন তাঁহাকেই যোগীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন (গীতা, ৬ষ্ঠ, ৪৭), অপরদিকে অশ্রদ্ধাবান লোকের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তি নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয় (গীতা ৪র্থ-৪০)।

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং—শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন, এই স্বল্পাক্ষর ও সারবান উক্তিতে আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটা সুমহান ও সুগভীর সত্য উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে আমরা প্রকৃত সাধনের পথে পশ্চাদ্‌গামী হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নিতান্ত ছোটখাটো কথাকেও ফেনাইয়া ফেনাইয়া যেরূপ বৃহদাকারে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে শিক্ষা করিয়াছি, ভারতের পূর্ব্বতন ঋষিরা সেরূপ করিতে মোটেই ভাল বাসিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা ও সাধনালব্ধ গুরুতর সত্যসকলও স্বল্পাক্ষর ও সারবান ভাষায় প্রকাশ করিতে যত্নবান হইতেন। এই প্রকার একটা মহান সত্য শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং এই একটী ছোটখাটো উক্তিতে উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

ভগবান তাঁহার রাজ্যে যে সকল সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, প্রকৃতিতে সেই সকল সত্যের পরিচয় পাইবারও ব্যবস্থা তিনিই করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতিতে সেই সকল সত্যের পরিচয় না পাইলে আমরা তাহা উপলব্ধিই করিতে পারিতাম না। এই যে পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার একটী নিগূঢ় আকর্ষণ আছে এবং হইতে পারে—ইহা তখনই বুঝিতে পারি, যখন প্রকৃতিতে এক আত্মার সঙ্গে আর একটী আত্মার নিগূঢ় আকর্ষণের পরিচয় প্রাপ্ত হই। বধির ব্যক্তি সঙ্গীতের মিষ্টতার পরিচয় প্রাপ্তির অভাবেই তাহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারে না। অন্ধ ব্যক্তিও সেই কারণে প্রভাতের সূর্য্যোদয়ের গম্ভীর মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, প্রকৃতির মধ্যে এই সত্যের পরিচয় না পাইলে আমরা তাহা উপলব্ধি করিতেই পারিতাম না। আমরা দেখি যে আমরা পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে শ্রদ্ধা করি এবং সেই শ্রদ্ধার ফলে তাঁহাদের গুণগ্রাম আলোচনা করিয়া ও তাঁহাদের কার্য্যকলাপ অনুকরণ করিয়া আমরা আমাদেরও জীবনকে ক্রমশ জ্ঞানোন্নত, কর্ম্মোন্নত ও ধর্ম্মোন্নত করিয়া তুলি। এইরূপে শ্রদ্ধার ফলে জ্ঞানলাভরূপ সত্যের পরিচয় প্রকৃতিতে পাই বলিয়াই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি পরমশান্তিপ্রদ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, উভয়ই সমধর্ম্মী, তাই আমরা এক শ্রদ্ধা অবলম্বনে অপর শ্রদ্ধা উপলব্ধি করিতে পারি। বস্তুত মানুষের প্রতি মানুষের যে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা সম্প্রসারিত হইতে হইতে পরিণামে সেই মহান পুরুষের চরণে অর্পিত না হইলে চরিতার্থ হয় না।

এই শ্রদ্ধা পদার্থটী কি? শ্রদ্ধাভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিলে মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে ইহা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য। শ্রদ্ধার ভিতরে এই তিনটীই অন্তর্নিহিত। শ্রদ্ধার ভিতরে জ্ঞান যে অন্তর্নিহিত তাহা একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের মধ্যে একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। কেবল তাহাই নহে, জ্ঞানের অভাবে শ্রদ্ধার অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধার পাত্রকে না জানিলে শ্রদ্ধা মনে জাগিতেই পারে না—এইখানেই সর্ব্বপ্রথম শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাহার পর, শ্রদ্ধার পাত্রকে যে কোন বিষয়ে হৌক, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া জানিতে হইবে, তবে আমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা আসিবে। এই কারণে পুত্রকন্যা, সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় না, কিন্তু পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি স্বভাবতই শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত হয়। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধার ভিতরে যেমন শ্রেষ্ঠতার একটী ভাব লুক্কায়িত আছে, সেইরূপ তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রতি আস্থা এবং তাঁহাকে নির্ভরস্থল বলিয়া গ্রহণ করিবার ভাবও তাহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। ঈশ্বরের চরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে গেলেও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম, মঙ্গলময় ও জগতের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিতে হইবে এবং

সেইভাবে তাঁহাকে জানিয়া শ্রদ্ধা করিলে তবে আমরা পরম শান্তিপ্রদ জ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে পারি। ঋষিরা পরমেশ্বরকে ঐভাবে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা বলের সহিত বলিতে সক্ষম হইয়াছেন যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই পরম শান্তিপ্রদ জ্ঞানলাভের অধিকারী হয়েন।

ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করিবার জন্য যে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ঈশ্বর অনন্তস্বরূপ পূর্ণ পুরুষ। সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে হইলে আমাদিগকেও এক একটী অনন্তস্বরূপ পূর্ণপুরুষ হইতে হয়। কিন্তু তাহা তো আর সম্ভব নহে। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম ও মঙ্গলময় পুরুষ এবং জগতের একমাত্র আশ্রয়স্থল বলিয়া জানিলেই আমাদের শ্রদ্ধা তাঁহার চরণে অর্পিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। ঐ অনন্ত গ্রহনক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশে যাঁহার সিংহাসন, তিনি যদি শ্রেষ্ঠতম পুরুষ না হয়েন, তবে আর কে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ? দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ যাঁহার এক ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে এবং প্রকাশ পাইয়া যাঁহার প্রশাসনে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, তিনি ব্যতীত আর কে এই বিশ্বচরাচরের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইতে পারেন? সেই পূর্ণ পুরুষ পুরুষোত্তম অনন্তস্বরূপ হইয়াও যে ক্ষুদ্র মানব আমাদের সম্মুখে নানা উপায়ে স্বপ্রকাশ হইতেছেন এবং তাঁহাকে জানিবার অধিকার যে আমাদিগকে দিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার মঙ্গলভাবের অধিকতর পরিচয় আর কোথায় পাইবে? ঈশ্বরকে এইরূপ শ্রেষ্ঠতম ও মঙ্গলময় পুরুষ এবং জগতের একমাত্র আশ্রয়স্থল জানিলে শ্রদ্ধা আপনা হইতেই তাঁহার চরণের অভিমুখে ধাবিত হইয়া চরিতার্থ হয়।

প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের এই সকল ভাবের পরিচয় লইতে গেলেই আমাদিগকে কত-না জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে হয়। এক দিকে বহির্জগতে নানাবিধ বিজ্ঞানের সাহায্যে বহির্দ্দশনের দ্বারা তাঁহার অনন্ত মহিমার যৎকিঞ্চিৎ আমরা আমাদের সাধ্যমত হৃদয়ে ধারণ করি। আবার অন্তর্জ্জগতে অন্তর্দ্দশনের দ্বারা তাঁহার স্বপ্রকাশ-রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সহিত এক আশ্চর্য্য প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হই। কিন্তু কি অন্তর্জ্জগত, কি বহির্জ্জগত, সকলই সেই জ্ঞানময় ইচ্ছাময় পুরুষের জ্ঞানের ও ইচ্ছার অভিব্যক্তি। তাই, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি আমরা যতই আলোচনা করি না কেন, যতক্ষণ না এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারি, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই শান্তি পাই না। যাবতীয় জ্ঞান তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত বলিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলেই আমাদের সকল জানার পরিসমাপ্তি হয়। তাই ঋষিরা ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাই মহামতি ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই পরম শান্তিপ্রদ জ্ঞানলাভের অধিকারী হয়েন। আজ কত যুগযুগান্তর পরে আমরাও সেই একই সত্য নূতন বলে নূতন ভাষায় ঘোষণা করিতেছি।

শ্রদ্ধাভাবের মধ্যে যেমন জ্ঞান অন্তর্নিহিত, সেইরূপ উহার মধ্যে কর্ম্মও অন্তর্নিহিত। সাধারণ লোকে শ্রদ্ধার প্রকৃত তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখে না বলিয়াই শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধের ন্যায় উহার সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধটী তাহাদের স্পষ্ট অনুভূত হয় না। কিন্তু প্রকৃতি অবলম্বনে এই বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্মের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পিতামাতাকে আমরা শ্রদ্ধা করি বলিলেই কি সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বুঝায় না যে আমরা তাঁহাদের গুণ সকল অনুকরণ করি এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপের অনুসরণ করি? সেই সঙ্গে এইটুকুও বুঝায় যে আমাদের সকল কর্ম্মে সকল অনুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া সেগুলি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে নিবেদন করিব। এখন, গুরুজনের গুণসকল অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপ অনুসরণ করিতে গেলে আমাদিগকে যে কিপ্রকার শুভ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিতে হয়, তাহা হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাস্তবিক শ্রদ্ধা থাকিলে তাঁহার গুণ সকল অনুকরণ করিয়া একদিকে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে হইবে, অপরদিকে আমাদিগের সকল কার্য্য

সকল শুভ অনুষ্ঠান সর্ব্বাগ্রে তাঁহার চরণে নিবেদন করিতে হইবে। আমরা যদি তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নবান না হই অথবা আমাদের গার্হস্থ্য অগার্হস্থ্য সকল কার্য্য সকল অনুষ্ঠান যদি সেই অনন্তপুরুষের চরণে নিবেদন না করিয়া অপর কাহারও চরণে নিবেদন করি, তবে আমাদের বলা বৃথা যে আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। ইহা নিশ্চয় যে এরূপ অবস্থায় আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা কখনই দিই না; তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি একথা মুখে বলিলেও নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয়ের এক কোণে তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রতি বা তাঁহার জগতের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইবার প্রতি অথবা অন্য কোন না কোন বিষয়ে সংশয় জাগিয়া আছে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাতে যদি এতটুকুও সংশয় থাকে, তবে সে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা নামেরই উপযুক্ত নহে। ঈশ্বরকে যদি আমরা সত্যসত্যই শ্রদ্ধা করি, তবে এ ভয় আমাদের হৃদয়ে আসিতেই পারে না যে তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, আমাদের সকল কার্য্য তাঁহাকে নিবেদন করিলে আমাদের অমঙ্গল হইবে, আমাদের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য থাকিবে না। তাঁহার প্রতি সত্য সত্য শ্রদ্ধা জাগ্রত হইলে, শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গেই মাভৈ মাভৈ রবের দামামা বাজিয়া উঠে এবং আমরাও "অভয় তো হয়ে যাই।" সত্য কথা বলিতে কি, যেমন ঈশ্বরে শ্রদ্ধা জাগিলে আমাদের সকল জ্ঞানদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়, এবং সেই শ্রদ্ধাতেই আমাদের সকল জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে ও আমাদের সকল কার্য্য তাঁহার নামে নিবেদন করিতে স্বভাবতই আমাদের ভাল লাগে এবং সেই শ্রদ্ধাতেই আমাদের সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়। তখন, যেমন শ্রদ্ধাতে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইলে শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান চলিতে থাকে, সেইরূপ শ্রদ্ধাতে কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইলে শ্রদ্ধা ও কর্ম্মেরও মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান চলিতে থাকে।

কি প্রকার কর্ম্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বরে শ্রদ্ধা সহজে জাগ্রত হইতে পারে, কোন্ শ্রেণীর কার্য্য সকল তাঁহার প্রিয়কার্য্য, তিনি স্বয়ং এবিষয়ের জ্ঞান আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা আমাদের চিত্তকে সে বিষয় হইতে অনেক সময়েই বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখি, তাই সকল সময়ে আমরা তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। জ্ঞানকে সুনির্ম্মল না রাখিলে কর্ম্মও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জ্ঞানের বিকাশই কর্ম্মে এবং কর্ম্মেরও পরিসমাপ্তি প্রকৃত জ্ঞানে। আমরা জ্ঞানের পথে যতই অগ্রসর হইতে থাকিব, আমাদের কর্ম্মেরও পথ ততই উন্মুক্ত হইয়া যাইবে—আমাদের জ্ঞান অনুসারে কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। আবার, জ্ঞানের অনুমোদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে জ্ঞানেরও নূতন নূতন পথ সকল আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে।

জ্ঞানকে সুনির্ম্মল রাখিতে গেলে কি ভাবে আমাদিগকে চলিতে হইবে, মহামতি ব্যাসদেব দুইটী কথায় তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন—একটী হইতেছে ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল হওয়া এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে ইন্দ্রিয়সংযম। সেই বিশ্বাধিপতি পরমেশ্বরে আমরা যতটুকু নির্ভর করিতে পারিব, ততটুকুই তো অভয় হইব, ততটুকুই তো সংসারের ভয়কে অতিক্রম করিতে পারিব। তাঁহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ নির্ভয়ও হইতে পারিব। তখন সংসারের ভয় আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারিবে না; তখন সংসারের ভয়ে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যকে অপ্রিয় কার্য্য বলিয়া এবং তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যকে প্রিয় কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না; তখন আমাদের সকল অনুষ্ঠানে তাঁহাকে বসাইতে, সকল কার্য্য তাঁহাকে নিবেদন করিতে সাহসের অভাব হইবে না। এই কারণে শ্রদ্ধাবান সাধক পরমশান্তিপ্রদ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল হইয়া সংসারভয়ের অতীত হইতে হইবে, ঈশ্বরকেই সকল ভয়ের ভয় জানিয়া নির্ভয় হইতে হইবে এবং নির্ভীক হৃদয়ে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে নিরত থাকিতে হইবে ও তাঁহারই চরণে সকল কার্য্য নিবেদন করিতে হইবে।

জ্ঞানকে সুনির্ম্মল রাখিবার দ্বিতীয় উপায় হইতেছে ইন্দ্রিয়সংযম। ইন্দ্রিয়সংযম যে চিত্তবিক্ষেপ

নিবারিত করিয়া জ্ঞানকে সুনির্ম্মল রাখিবার কিরূপ অব্যর্থ উপায়, তাহা যিনি একবারও ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন তাঁহাকে তাহা বোঝানো অসম্ভব। ইন্দ্রিয়সংযমে জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তি হয়, যদি কেহ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল রিপুই সংযত হইয়া আসিবে। তখন সেই সংযতেন্দ্রিয় পুরুষ নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবেন যে তাঁহার অন্তরে জ্ঞানের এরূপ আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তি আসিল কি প্রকারে? এই ইন্দ্রিয়সংযমে সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না—আমাদিগকে নানাবিধ শুভকর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠানে নিরত থাকিতে হইবে। মানুষের মন কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, কাজেই ভাল বিষয়ে রত না থাকিলেই আমরা মন্দ বিষয়ে ধাবিত হই ও সংযমভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। আর যদি আমরা মনকে ভাল বিষয়ে নিযুক্ত রাখি, তাহা হইলে সেই মনই আমাদের ইন্দ্রিয়সংযম সহজ করিয়া দেয়। আবার, ঈশ্বরে একান্ত নির্ভর মনকে ভাল বিষয়ে নিযুক্ত রাখিবার বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায় হয়। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই যে যেমন জ্ঞানের ভিতর দিয়া শ্রদ্ধা বিকশিত হয়, তেমনি কর্ম্মের ভিতর দিয়াও শ্রদ্ধা দৃঢ়তা লাভ করে, স্থায়ী হয়। জড়রাজ্যে যেমন পদার্থসমূহের পৃথক পৃথক অবস্থিতি সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভাবসমূহের সেরূপ পৃথক অবস্থিতি সম্ভব নহে। এখানে পরস্পরের আশ্চর্য্য মিলন, আশ্চর্য্য আদান-প্রদান। জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের, কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের, শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানের, শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্মের আদানপ্রদানের এক আশ্চর্য্য খেলা চলিয়া থাকে।

শ্রদ্ধার তৃতীয় উপকরণ হইতেছে ভক্তি। আকারে প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধার এত নিকটে যায় যে সাধারণ লোকে ভক্তিকে অনেক সময়ে শ্রদ্ধা বলিয়া ভ্রম করে। ভক্তিকে শ্রদ্ধার সহিত মিশাইয়া ফেলাতেই ভক্তিপন্থী লোকেরা "ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর" প্রভৃতি প্রবচনের উল্লেখ করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের সাহচর্য্য ব্যতীত কেবলমাত্র ভক্তিপথ অবলম্বন করেন এবং ব্রহ্মলাভ হইতে বহুদূরে গিয়া পড়েন। তাঁহারা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই প্রবচনোক্ত ভক্তি শ্রদ্ধারই নামান্তর এবং তর্ক ভক্তিকর্ম্মবিহীন বৃথা তর্কেরই নামান্তর, প্রকৃত জ্ঞানের নহে। ঈশ্বরকে যখন জগতের স্রষ্টা পাতা ও নির্ব্বাহিতা এবং একমাত্র আশ্রয়স্থল জানিয়া ভক্তি করিতে উদ্যত হই এবং সেই ভক্তির পরিচয়স্বরূপে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে ব্রতী হই, সেই ভক্তিই প্রকৃত শ্রদ্ধা। সুমিষ্ট গান, সুচারুবিন্যস্ত দুই চারিটি পদ বা বক্তৃতা শুনিয়া চক্ষে জল আসিলেই যে প্রকৃত শ্রদ্ধা আসিল তাহা নহে। এইরূপ অবস্থায় অনেক সময়ে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেও চক্ষে জল আসে। আমরা বারম্বার বলিতে চাহি যে জ্ঞানের সাধনা ব্যতীত, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতীত বিশুদ্ধ ভক্তি আসিতেই পারে না। আমাদের দেশে অহেতুকী ভক্তি বলিয়া একটি কথা আছে, কিন্তু প্রকৃত অহেতুকী ভক্তি আছে কিনা সন্দেহ—কি প্রকার জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনার ফলে যে সেই ভক্তি আসিয়াছে তাহা আমাদের জানা না থাকাতেই আমাদের নিকট তাহা অহেতুকীরূপে প্রতীয়মান হয়। শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ যেমন প্রত্যক্ষ, ভক্তিরও সম্বন্ধ তেমনি প্রত্যক্ষ। জ্ঞান ব্যতীত যেমন শ্রদ্ধার অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, সেইরূপ ভক্তি ছাড়িয়াও শ্রদ্ধার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। জ্ঞানকর্ম্মবিহীন ভক্তি অন্ধ, জ্ঞানকর্ম্মসহচর শ্রদ্ধা চক্ষুষ্মান। শ্রদ্ধার এপারে জ্ঞান, ওপারে ভক্তি, মধ্যে এপার ওপারের সংযোগের নৌকা হইল কর্ম্ম। অন্ধ ভক্তি আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইলেও যাইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধা কখনই আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইবে না। ভারতের ঋষিরাও ভক্তিকে শ্রদ্ধা হইতে পৃথকভাবে দেখিয়া শ্রদ্ধাকেই উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। শ্রদ্ধাতেই জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য সাধিত হয় বলিয়াই তাঁহারা সাধকের শ্রদ্ধাবান হওয়াকেই ব্রহ্মসাধনের বিশেষ সহায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গীতাতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, সকল প্রকার যোগযুক্ত সাধকগণের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান হইয়া ভগবদগত আত্মা

দ্বারা পরমেশ্বরকে ভজনা করেন, তিনিই যুক্ততম বলিয়া বিবেচিত হয়েন। *

শ্রদ্ধাভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া যেমন আমরা উহার তিনটী উপকরণ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি পাইলাম, সেইরূপ উহার মধ্যে আর একটী বিষয় অন্তঃসলিলভাবে বর্ত্তমান দেখি। সেটী হইতেছে আমার আত্মার সহিত আমার শ্রদ্ধার পাত্রের আত্মার সমধর্ম্মিত্ব। জড়পদার্থকে আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারি না; পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তুগণকেও আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারি না। কিন্তু আমার আত্মার সমধর্ম্মী গুরুজনের আত্মাতে যখন শ্রেষ্ঠতা দেখি এবং সেই আত্মার বলের উপর যখন আশ্রয়স্থল বলিয়া নির্ভর স্থাপন করিতে পারি, তখনই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা উত্থিত হয়। সেইরূপ পরমাত্মার সহিত আমার আত্মার সমধর্ম্মিত্ব আছে বলিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি, তাঁহার সহিত শ্রদ্ধার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি।

এই শ্রদ্ধা একটী মহাশক্তি। যে শ্রদ্ধা এই বিশ্বচরাচরের অধিপতি পরমেশ্বরকে আমাদের নিকটে আনিয়া দেয়, আমাদের পিতা বলিয়া জানাইয়া দেয়, সে শ্রদ্ধা যে একটী মহাশক্তি হইবে তাহা কি কিছু আশ্চর্য্য? অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক শ্রদ্ধাভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাকে স্বার্থপরতা ও কল্পনার মিশ্রণে সমুদ্ভূত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। আমরা কিন্তু সন্দেহ করি যে, আমরা যাহাকে শ্রদ্ধা বলি, পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রেই বল আর দর্শনশাস্ত্রেই বল, সেই শ্রদ্ধার কোন প্রতিশব্দ আছে কিনা। যাঁহারা শ্রদ্ধাভাবের অভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট ইহা নিতান্ত সত্য পদার্থ। ইহা সত্যপদার্থ ও মহাশক্তি বলিয়াই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি রোগশোকে কাতর হন না, দুঃখদারিদ্র্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। এই শ্রদ্ধাভাবের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সাধক সংসারের পাপতাপ জ্বালাযন্ত্রণা সকলই অনায়াসে অতিক্রম করেন। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিলে তাহা কখনও চরিতার্থ হয় না। আমরা সেই বিশ্বাত্মার মহাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ, আমরা সেই অনন্তপুরুষের সন্তান, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অর্পিত হইলেই তাহা চরিতার্থ হয়। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটী নদীর সঙ্গমের কারণে প্রয়াগসঙ্গম যেমন তীর্থে পরিণত হইয়া ভক্তগণের আশ্চর্য্য পবিত্রতা সাধন করে, সেইরূপ ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিধারা মিলিত হইয়া শ্রদ্ধাভাবকে এক আশ্চর্য্য শক্তিতে পরিণত করিয়াছে। শ্রদ্ধাবিরহিত হইলে, সহস্র বিজ্ঞানদর্শন তোমার আয়ত্ত হইলেও তুমি নিজেকে স্বরচিত গর্ব্বকারাগারের অন্ধকারে নিমগ্ন রাখিবে। আর, শ্রদ্ধাবান হইয়া সমস্ত বিজ্ঞানদর্শনের প্রতিষ্ঠাভূমি ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা কর, তাহার শিখরদেশও দেখিতে পাইবে না, তাহার তলস্পর্শও করিতে পারিবে না—তখন তোমার সমুদয় গর্ব্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। শ্রদ্ধাভাব একদিকে তোমাকে অতুল বলশালী করিয়া তুলিবে, অপরদিকে তোমাকে তেমনি বিনয়নম্র করিয়া দিবে। শ্রদ্ধাবান হইয়া ব্রহ্মকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল বলিয়া অবলম্বন কর, তখনই তোমার সমুদয় দুঃখকষ্ট শান্ত হইবে। তাঁহার সেই শান্তিসমুদ্রে একবার অবগাহন কর, একবার তাঁহার অনন্তসাগরে আত্মহারা হইয়া যাও—তুমি এক আশ্চর্য্য নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। এসো, আমরা শ্রদ্ধাবান হইয়া তাঁহাকেই প্রীতি করি, তাঁহারই প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত হই, এবং আমাদের সমুদয় কার্য্য, সমুদয় অনুষ্ঠান, জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিই। জগতের সমুদয় দুঃখ নিবৃত্ত হৌক, শান্তি অবতীর্ণ হৌক।

---

* যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। গীতা ৬—৪৭

কার্ত্তিকোৎসব।

(শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কার্ত্তিকমাস হিন্দুর চক্ষে পুণ্য মাস। এই সময়ে শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় হইয়া পুণ্য পথে থাকিবে ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ—

কার্ত্তিকং সকলং মাসং প্রাতঃস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপন্ হবিষ্যভুক্ দান্তঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

(বিষ্ণু)

সারা জীবনই তো পুণ্য আচরণের কাল, তবে কার্ত্তিক মাসে এই বিশেষ বিধান কেন? যেমন পথে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা থাকিলে পথিককে সতর্ক

করিয়া দিবার জন্য "সাবধান" লিখিয়া রাখা হয় এস্থলেও সেইরূপ। কার্ত্তিক মাস একটি সঙ্কটকাল বলিয়া ঋষিরা জীবনের হিতকর প্রাণপোষক ধর্ম্ম বা পুণ্যকার্য্য অনুষ্ঠানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সময়ে অতি সাবধানে সংযতচিত্তে না চলিলে সহজে জীবন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

সচরাচর দেখা যায় যে কালের প্রতি বিভাগের আদি ও অন্ত, শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্ম বা পুণ্যকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে দিবা ও নিশার অন্তভাগ ধ্যান ধারণা ও হোমাদি কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট; এই কারণে পক্ষান্ত পূর্ণিমা ও অমাবস্যা দৈব ও পিতৃ কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত; এই কারণে মাসান্ত সংক্রান্তিকৃত্য স্নানদানাদির কালরূপে পরিগণিত; এবং এই কারণেই অয়ন ও বৎসরের আদি ও অন্ত পুণ্যকার্য্যের প্রশস্ত কাল বলিয়া নিরূপিত। তাই আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস ষাণ্মাসিক উত্তরায়ণের শেষ এবং দক্ষিণায়ণের আদি হিসাবে ধর্ম্ম বা পুণ্যকার্য্যের প্রশস্ত কাল বলিয়া হিন্দুর নিকট পুণ্য মাস রূপে গণ্য। এই সময়ে হিন্দুরা গৃহে গৃহে পূজার্চ্চনা ও পার্ব্বণোপযোগী ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যাচরণে রত থাকেন।

হিন্দুদিগের সকল ক্রিয়াকর্ম্মই দৈব ও পিতৃকার্য্যের সহিত কোন না কোনরূপে সংশ্লিষ্ট। অগ্রে দেবগণের, পরে পিতৃগণের আসন—সেই কারণে পূর্ব্বাহ্নে দৈবকার্য্য এবং অপরাহ্নে পিতৃকার্য্য করিবার বিধি।

"পূর্ব্বাহ্নং বৈ দেবানাং অপরাহ্নং বৈ পিতৃণাং"

এই কারণে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের মধ্যে শেষাংশ কৃষ্ণপক্ষে এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের মধ্যে শেষার্দ্ধ দক্ষিণায়ণে পিতৃকার্য্যের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। হিন্দুরা তাই দক্ষিণায়নের প্রারম্ভেই তর্পণের দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিয়া পিতৃপক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। এই সময় হইতে পিতৃগণের সঙ্গে যেন আমাদের যোগাযোগ চলিতে থাকে। কার্ত্তিক মাসের আকাশপ্রদীপ দক্ষিণায়নে পিতৃগণের বিজয়ঘোষণা করিয়া দেয়। আকাশ ও দক্ষিণ দিকই পিতৃগণের স্থান বলিয়া উক্ত হয়।

"পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণাদিক্ তথৈবচ"

এক কথায়, দক্ষিণায়নকে পিতৃকাল বলা যাইতে পারে। এই পিতৃকালের সঙ্গে পিতৃভাবের বেশ সামঞ্জস্য আছে দেখা যায়। পিতা শব্দের উৎপত্তি পালনার্থ পা ধাতু হইতে—"পালনাচ্চ পিতাস্মৃতঃ", পিতা যেমন সন্তানবর্গের পরিপালক, সেইরূপ বৎসরের শেষ ভাগ দক্ষিণায়নও জীববর্গের পরিপালনের কাল। নানা শস্যাদি উৎপত্তি দ্বারা দক্ষিণায়নকাল জীবের পরিপালনে নিযুক্ত—পিতৃধর্ম্মী।

কিন্তু দক্ষিণায়নের অন্তর্ভুক্ত এই কার্ত্তিক মাসকে একদিকে যেমন পিতৃধর্ম্মী, পালনের কাল বলা যায়, অন্যদিকে সেইরূপ উহাকে সংহারধর্ম্মী পিতৃপতি যমেরও কাল বলা যাইতে পারে। এই মাসের অধিষ্ঠাত্রী নক্ষত্র, কৃত্তিকা নক্ষত্র। নামেই অর্থের পরিচয় পাইতে বিলম্ব হয় না। কৃত্তিকা নামের মূল কর্ত্তনার্থ কৃৎ ধাতু হইতে। একদিকে কার্ত্তিক মাসের নামে যেমন শস্যাদির কর্ত্তনের কাল বুঝায়, অন্যদিকে মনুষ্য কর্ত্তন বা মারা মড়কের কাল এই অর্থও সূচিত হইয়া থাকে। কালীপূজার মুণ্ডমালিনী কালীমূর্ত্তিতে এই সময়ের সেই চিত্র পরিব্যক্ত।

এই মাস মারীমড়কের কাল বলিয়া শাস্ত্রকারগণ এই সময়ে শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় ও হবিষ্যাশী হইয়া থাকিবার বিধান দিয়াছেন। "কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ"। বিশেষত কার্ত্তিকের শেষ ভাগ অতি ভয়ানক কাল। তাই আয়ুর্ব্বেদ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"কার্ত্তিকস্য দিনান্যষ্টৌ যমদংষ্ট্রা নিগদ্যতে"

"কার্ত্তিকের শেষ আট দিন যমদংষ্ট্রা বলিয়া কথিত"

আমাদের বাংলায় বলে "এ সময়ে যমের আট দোর খোলা।" ভাইদ্বিতীয়ার দিনে ভগ্নী ভ্রাতার কপালে ফোঁটা দিবার কালে যে "যমের দুয়ারে পড়ুক কাঁটা" বলিয়া আয়ুষ্কামনা করেন, তাহাতেও কার্ত্তিক মাসের ভীষণত্ব পরিব্যক্ত। এই মাসে ভগবানের পূজার্চ্চনা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম মানবের পক্ষে অতীব হিতকর। আজকাল বিজ্ঞানে একরূপ স্থির প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মনোবলের দ্বারা প্রধানত শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়মিত হয়। ভগবানের নামকীর্ত্তন তাঁহার পূজা-অর্চ্চনায় আমাদের যে মনোবল সঞ্চিত হয়, তাহা আমাদের আয়ু ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতজনক। সারা কার্ত্তিক মাস কঠোর সাত্ত্বিক ব্রত আচরণ করিয়া যে মনোবল সঞ্চিত

হয়, আজ সেই ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। কার্ত্তিকের শেষ দিনে তাই আজ কার্ত্তিকোৎসব।

এই কার্ত্তিকোৎসব আর একটি কারণে আমাদের স্মরণীয় দিন। এইদিন দেবসেনা কার্ত্তিকেয়ের পূজার দিন। যে দেবসেনা কার্ত্তিক এককালে অসুরগণকে পরাভূত করিয়া ভারতকে নিরাপদ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই স্মরণার্থে হিন্দুর এই উৎসব। পুরাকালের সেই ঐতিহাসিক কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা আধ্যাত্মিক ভাষায় বলিলে বলিতে পারি যে দেবাসুরসংগ্রাম পুণ্যপাপের ভীষণ যুদ্ধ আমাদের অন্তরে নিত্য চলিয়াছে। আমরা দেবসেনার নেতৃত্বে সেই মহাসমরে যাইবার জন্য সমাহূত। দেবভাবরূপ দেবসেনা আমাদের নেতা। চল আমরা নির্ভয়ে এই সমরে প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ হইব না। ভগবান আমাদের মধ্যে সেই শক্তি প্রদান করুন যে শক্তির বজ্রপ্রহারে অসুরগণ বিধ্বস্ত হইয়া পরাভূত হইবে। দেবসেনার নেতৃত্বে যে দিন পাপাসুরকে পরাজয় করিয়া বিজয়ীর গৌরবে গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারিব, সেই দিন কার্ত্তিকোৎসব নাম সার্থক হইবে। কার্ত্তিকোৎসব পাপাসুর কর্ত্তনের উৎসব। সেই দিন দেবসেনার নামে চারিদিকে জয়ধ্বনি উত্থিত হইবে; গৃহে গৃহে জয়পতাকা উড্ডীন হইবে। সেইদিন পিতৃগণের নামে বিমানে বিমানে আকাশপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইবে।*

বাল গঙ্গাধর তিলক-প্রণীত—

গীতা-রহস্য

(প্রস্তাবনার অনুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

সাংসারিক কর্ম্ম সমূহ গৌণ কিংবা ত্যাজ্য এইরূপ স্থির করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি কেবল নিবৃত্তিপর মোক্ষমার্গই গীতাতে নিরূপণ করা হইয়াছে, এই মত যদিও আমাদের মান্য নহে, তথাপি ভগবদ্গীতাতে মোক্ষপ্রাপ্তির মার্গ সম্বন্ধে আলোচনা আদৌ নাই ইহাও আমরা বলি না,—এ কথা গোড়াতেই বলা আবশ্যক। অধিক কি—প্রত্যেক মনুষ্য পরমেশ্বর-স্বরূপে জ্ঞানসম্পাদন করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় বুদ্ধিকে যতটা সম্ভব নির্ম্মল ও পবিত্র করা, ইহা গীতার উপদেশ অনুসারে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য,—এই কথা আমার এই গ্রন্থে স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু গীতার প্রকৃত মর্ম্ম ইহা নহে। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হইলেও উল্টা-পক্ষে কুলক্ষয়াদি ঘোরতর পাতকটাই যে যুদ্ধকাণ্ডে আত্ম-কল্যাণের উচ্ছেদসাধন করে, সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত কি উচিত নহে, যুদ্ধারম্ভে অর্জ্জুন এই সম্বন্ধে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই নিমিত্ত, অর্জ্জুনের সেই সংশয়মোহ দূর করিবার জন্য কেবল বেদান্ত শাস্ত্রের আধারে কর্ম্মাকর্ম্মের ও তদনুরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বিচার করা হইয়াছে এবং "কর্ম্ম কখনই আমাদিগকে ছাড়ে না, কর্ম্মকে ত্যাগ করা উচিতও নহে"—এইরূপ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক,—যে যুক্তির দ্বারা, কর্ম্ম করিলে কোন পাপ হয় না, বরং শেষে তাহাতেই মোক্ষ লাভ হয়, গীতায় সেই যুক্তিই—অর্থাৎ জ্ঞানমূলক ও ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগেরই যুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে—ইহাই আমার অভিপ্রায়। আধিভৌতিক-তত্ত্বজ্ঞ আধুনিক পণ্ডিত এই কর্ম্ম-অকর্ম্মের কিংবা ধর্ম্ম-অধর্ম্মের বিচার-আলোচনাকে নীতিশাস্ত্র বলিয়া থাকেন। এই বিচার আলোচনা গীতাতে কিরূপ প্রকারে করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে, শ্লোকানুক্রমে, গীতার টীকা করিয়া যে দেখান হয় নাই এরূপ নহে। কিন্তু বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, কর্ম্মবিপাক, কিংবা ভক্তি প্রভৃতি শাস্ত্রান্তর্ভূত অনেক তর্কবিতর্ক ও যথার্থতত্ত্বের আধারে, কর্ম্মযোগই যে গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা জানা না থাকিলে যাহার উল্লেখ কখন-কখন খুব সংক্ষিপ্তভাবেই করা হইয়া থাকে গোড়ায় সেই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিষয় জানা না থাকিলে, গীতার বিচার-আলোচনার পূর্ণ মর্ম্ম সহসা গ্রহণ করা যায় না। এইজন্য, গীতাতে যে-যে বিষয় কিংবা সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে, শাস্ত্রীয় রীতি-অনুসারে বিভিন্ন প্রকরণে তাহার বিভাগ করিয়া তদন্তর্ভূত প্রধান প্রধান যুক্তিবাদের সহিত তাহা গীতা-রহস্যের প্রথমেই সংক্ষেপে নিরূপণ করা হইয়াছে। এবং তাহার মধ্যেই, বর্ত্তমানকালসুলভ সর্ব্বদিক্-

* কার্ত্তিকের সংক্রান্তিতে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে পঠিত।

দর্শিনী পদ্ধতি অনুসারে গীতার মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি, অন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত ও অন্য তত্ত্বজ্ঞান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সহিত প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে তুলনা করিয়া দেখান হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রথমেই যে "গীতারহস্য" দেওয়া হইয়াছে, উপরি-উক্ত রীতি অনুসারে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে উহা একটি ক্ষুদ্র অথচ স্বতন্ত্র গ্রন্থ এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাই বলনা কেন, এ প্রকার সাধারণভাবের আলোচনায় প্রত্যেক শ্লোকের স্বতন্ত্র বিচার-আলোচনা করিতে আমি সমর্থ হই নাই। তাই, শেষে গীতার শ্লোকানুক্রমিক অনুবাদ দিয়া, পূর্ব্বাপর সন্দর্ভের প্রতি মনোযোগ দিবার জন্য, কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারেরা গীতান্তর্গত কোন কোন শ্লোককে টানিয়া-বুনিয়া কিরূপে নিজ সাম্প্রদায়িক অর্থে দাঁড় করাইয়াছেন তাহা স্পষ্ট দেখাইবার জন্য, অথবা গীতা-রহস্যে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে, গীতান্তর্গত কথোপকথনের পদ্ধতি অনুসারে, কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত গীতার কোথায়-কোথায় আসিয়াছে ও কিরূপ আসিয়াছে ইহা দেখাইবার জন্যও, টীকার আকারে ভাষান্তর জুড়িয়া দিয়া স্থানে স্থানে অনেক টিপ্পনী দেওয়া হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে, কোন কোন বিষয়ে পুনরুক্তি হইয়াছে সত্য কিন্তু গীতা-গ্রন্থের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সামান্য পাঠকদিগের এক্ষণে যে ভুল বুঝা হইয়াছে তাহা অন্য রীতি-অনুসারে সম্পূর্ণ দূর করা যাইতে পারে না, এইরূপ মনে করিয়া গীতারহস্যবিচারকে গীতার ভাষান্তর হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। এবং ইহার দরুণ বেদান্ত, মীমাংসা, ভক্তি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে গীতার যে-সব সিদ্ধান্ত আছে, তাহা ভারত, সাংখ্য শাস্ত্র, বেদান্তসূত্র, উপনিষদ্, মীমাংসা প্রভৃতি মূল-গ্রন্থ হইতে, কেমন করিয়া আসিয়াছে ও কোথায়-কোথায় আসিয়াছে তাহা পূর্ব্বইতিহাস ও প্রমাণ সমেত দেখাইবার পক্ষে, কিংবা সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গের মধ্যে কিরূপ ভেদ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার পক্ষে, অথবা অন্য ধর্ম্মমত ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত গীতার তুলনা করিয়া ব্যবহারিক কর্ম্মদৃষ্টিতে গীতার কিরূপ মহত্ত্ব তাহা ঠিক নিরূপণ করিবার পক্ষে বেশ সুবিধা হইয়াছে। গীতা সম্বন্ধে অনেক প্রকারের টীকা করিয়া, অনেকেই অনেক প্রকারে যদি গীতার্থ প্রতিপাদন না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের গ্রন্থ-প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের আধারভূত মূল সংস্কৃত বচন সকল যথাস্থানে দিবার কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু এখনকার কাল সেরূপ না হওয়ায়, আমাদের প্রতিপাদিত গীতাতাৎপর্য্য বা সিদ্ধান্ত ঠিক্ কিনা, তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও সংশয় হওয়া খুবই সম্ভব। তাই, আমাদের বলিবার প্রমাণ-আধার কি, সর্ব্বত্র তাহার স্থলনির্দ্দেশ করিয়া মুখ্য-মুখ্য স্থানে ভাষান্তরসহ মূল সংস্কৃত বচন সকল আনিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেক বচন বেদান্ত গ্রন্থাদি হইতে সামান্যত প্রমাণার্থ গৃহীত হওয়ায় সেই সকল বচন পাঠকদিগের সহজেই জ্ঞানগোচর হইয়া তৎসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত যাহাতে মনে রাখিবার সুবিধা হইতে পারে—এইরূপ সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিবার ইহা দ্বিতীয় গূঢ় হেতু। তথাপি সকল পাঠকই যে সংস্কৃতজ্ঞ হইবে এরূপ সম্ভাবনা না থাকায়, সমস্ত গ্রন্থের রচনা এরূপভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে, সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠক সংস্কৃত শ্লোক ছাড়িয়া দিয়া গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হইলে, তৎকালে যাহাতে কোথাও অর্থের খর্ব্বতা না ঘটে এইজন্য সংস্কৃত শ্লোকের শব্দশঃ-ভাষান্তর না দিয়া অনেক সময় তাহার সারাংশ দিয়াই কার্য্য-নির্ব্বাহ করা হইয়াছে। কিন্তু বরাবর মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিবার দরুণ এই পদ্ধতিতে কোন প্রকার ভুল বুঝিবার আশঙ্কা নাই।

কোহিনূর-হীরক সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, উহা হিন্দুস্থান হইতে বিলাতে লইয়া যাইবার পর, পুনর্ব্বার উহাতে নূতন করিয়া 'পল কাটা' হওয়ায় উহা আরো উজ্জ্বল দেখিতে হইয়াছিল। এই কথা সত্যরূপ রত্নের পক্ষেও খাটে। গীতার ধর্ম্ম সত্য ও অভয় একথা ঠিক; কিন্তু উহা যে-কালে ও যেরূপে বিবৃত হইয়াছিল সেই দেশকালের অবস্থাতে অনেক প্রভেদ থাকায়, উহার তেজ কাহারও কাহারও মাথায় পূর্ণভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কোন্ কর্ম্ম ভালো ও কোন্ কর্ম্ম মন্দ ইহা স্থির করিবার পূর্ব্বে, কর্ম্ম করিবে কি করিবে না এই সামান্য প্রশ্নকেও যে সময়ে লোকে একটা গুরুতর প্রশ্ন বলিয়া মনে করিত, সেই সময়ে গীতা প্রকাশিত হওয়ায়,

তাহার অনেক অংশই কেহ কেহ অনাবশ্যক মনে করে; এবং তাহার উপর আরো, নিবৃত্তিমার্গীয় টীকাকারদিগের একটা প্রলেপ পড়ায়, কর্ম্মযোগসংক্রান্ত গীতার বিচার-বিবেচনা আজকাল অনেকের নিকট দুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, অর্ব্বাচীন কালে পাশ্চাত্যদেশে যে আধিভৌতিক জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়াছে সেই আধিভৌতিক জ্ঞান-মূলক অধ্যাত্মশাস্ত্র অবলম্বন করিলে প্রাচীন কর্ম্মযোগের যে বিচার, তাহা এখনকার কালে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী হইতে পারে না— এপ্রকারও কতকগুলি নব্য-বিদ্বানদিগের ধারণা আছে। এরূপ ধারণা যে ঠিক্ নহে, ইহা দেখাইবার জন্য, গীতারহস্য গ্রন্থের বিচার-আলোচনার মধ্যে, গীতা-সিদ্ধান্তের অনুরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত আমরা স্থানে স্থানে সংক্ষেপে দিয়াছি। বাস্তবিক দেখিতে গেলে এই তুলনার দ্বারা গীতার ধর্ম্মাধর্ম্ম সংক্রান্ত আলোচনা যে বেশী বল পায় এরূপ নহে। তথাপি অর্ব্বাচীনকালের আধিভৌতিক শাস্ত্রের অশ্রুতপূর্ব্ব বৃদ্ধিতে যাঁহাদের দৃষ্টি ঝলসিয়া গিয়াছে কিংবা এখনকার একদিকদর্শী শিক্ষাপদ্ধতিমূলক নীতিশাস্ত্রের আধিভৌতিক দৃষ্টিতে, অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে, যাঁহারা বিচার করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা এই তুলনা দ্বারা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিবেন যে, মোক্ষধর্ম্ম ও নীতি এই দুই বিষয়ই আধিভৌতিক জ্ঞানের পরপারে থাকা প্রযুক্ত প্রাচীনকালে আমাদের শাস্ত্রকারেরা এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মানব-জ্ঞান অদ্যাপি তাহা ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই; শুধু তাহা নহে, পাশ্চাত্য দেশেও অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের আলোচনা অদ্যাপি চলিতেছে বলিয়া, বড় বড় আধ্যাত্মিক গ্রন্থকারদিগের বিচার আলোচনা গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন নহে। "গীতারহস্যের" বিভিন্ন প্রকরণের অন্তর্ভূত তুলনাত্মক আলোচনার দ্বারা এই বিষয় সুস্পষ্ট হইবে। কিন্তু এই বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক হওয়া প্রযুক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের যে সারাংশ আমি স্থানে স্থানে দিয়াছি, সে সম্বন্ধে এইখানে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, গীতার তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করাই আমার প্রধান কাজ হওয়ায়, গীতার সিদ্ধান্তের সহিত পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বা পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্তের কতটা মিল হয় তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা পাশ্চাত্য মতসমূহের অনুবাদ করিয়াছি। এবং তাহাও এরূপভাবে করা হইয়াছে যে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ সামান্য মারাঠী পাঠকের বুঝিতে কঠিন না হয়। তবে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ যিনি দেখিতে চাহেন— এবং সেরূপ ভেদও অনেক আছে— কিংবা এই সিদ্ধান্তের অঙ্কুর উদ্গম ও বিস্তার যিনি দেখিতে চাহেন, তাঁহার মূল গ্রন্থই দেখা আবশ্যক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কর্ম্মাকর্ম্মবিবেক কিংবা নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে পদ্ধতি-বদ্ধ প্রথম গ্রন্থ আরিষ্টটল নামক গ্রীক তত্ত্বজ্ঞানী লিখিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই কথা বলেন। কিন্তু আমাদের মতে, আরিষ্টটলের পূর্ব্বেও মহাভারত ও গীতায় তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যাপক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের বিচার করা হইয়াছিল বলিয়া অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে গীতা-প্রতিপাদিত নীতিতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র অন্য কোন নীতিতত্ত্ব অদ্যাপি বাহির হয় নাই। সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিয়া শান্তভাবে তত্ত্বজ্ঞানের বিচার আলোচনায় জীবন যাপন করা ভাল, কিংবা অনেক প্রকারের রাজকার্য্য জল্পনা-কল্পনা করা ভাল, এই বিষয় সম্বন্ধে আরিষ্টটলকৃত ব্যাখ্যা গীতাতে থাকা প্রযুক্ত, মনুষ্য যে কোন পাপ করে তাহা অজ্ঞানবশতই করে—এই যে সক্রেটিসের মত, তাহারও একপ্রকার সমাবেশ গীতাতে রহিয়াছে। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি সমতাপ্রাপ্ত হইলে, সেই বুদ্ধির দ্বারা কোন পাপ ঘটিতে পারে না, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত। যাঁহারা পূর্ণাবস্থায় পৌঁছিয়াছেন সেই পরম জ্ঞানী পুরুষদিগের যে আচরণ তাহাই নীতিদৃষ্টিতে সকল লোকের পক্ষেই কতকটা প্রমাণ, এপিক্যুরিয়ান ও ষ্টোয়িকপন্থী গ্রীক পণ্ডিতদিগের এই যে মত, এই মতও গীতার অভিমত হওয়ায়, এই সম্প্রদায়ভুক্ত পন্থাবলম্বী লোকদিগের কৃত পরম জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা, ও গীতার "স্থিতপ্রজ্ঞের" বর্ণনা এই দুই ই এক সমান। সেইরূপ, "প্রত্যেক ব্যক্তিই সমস্ত মানব-জাতির হিতার্থে কাজ করিবে" যাহা মিল, স্পেন্সর, কোঁৎ প্রভৃতি জড়বাদীদিগের মতে নীতির পরাকাষ্ঠা, তাহা ও গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞার "সর্ব্বভূত হিতেরত," এই কথা স্থিতপ্রজ্ঞার আচরণগত বাহ্য লক্ষণের কথা হওয়ায়, কাণ্ট ও গ্রীনের উপপত্তি ও ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য

সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তও, উপনিষদের অন্তর্গত জ্ঞানের আধারে, গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে। গীতায় যদি ইহা অপেক্ষা আর কিছু বেশী না থাকিত, তথাপি ইহা সর্ব্বজনমান্য হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পর্য্যন্ত না থামিয়া মোক্ষ, ভক্তি, নীতিধর্ম্ম—ইহাদের মধ্যে জড়বাদী গ্রন্থকারদিগের বাহ্যত-প্রতীয়মান বিরোধ, এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে সন্ন্যাস-পন্থীদিগের মতের বিরোধ সত্য না হওয়ায়, ব্রহ্মবিদ্যা ও ভক্তির যে মূলতত্ত্ব তাহাও নীতি ও সৎকর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত ইহা দেখাইয়া,—জ্ঞান সন্ন্যাস ও ভক্তি ইহাদের যথাযোগ্য সামঞ্জস্য সাধনের দ্বারা, ইহলোকে কোন্ মার্গ অবলম্বন করিয়া মনুষ্য জীবন যাপন করিবে, গীতা তাহারও নির্ণয় করিয়াছেন। এইরূপে গীতা-গ্রন্থ প্রধানতঃ কর্ম্মযোগের গ্রন্থ বলিয়াই "ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত (কর্ম্ম) যোগশাস্ত্র" এই নামে সমস্ত বৈদিক গ্রন্থে অগ্রস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ"—কেবল এক গীতার পূর্ণ অধ্যয়নই যথেষ্ট ; অবশিষ্ট অন্য শাস্ত্রের বৃথা আলোচনায় কি ফল ?—এই যে লোকে বলে তাহা কিছু মিথ্যা নহে ; এবং এই জন্যই হিন্দুধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র এই দুয়ের পরিচয় যাঁহারা করিতে চাহেন তাঁহারা প্রথমে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের এই সবিনয় ও সাগ্রহ নিবেদন। কারণ, সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা, উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি যাহাতে ক্ষরাক্ষর সৃষ্টির ও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের বিচার আছে, সেই সব প্রাচীন শাস্ত্র তৎকালে ঐরূপ পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইলে পর, বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে শেষে যে ভক্তিপ্রধান ও কর্ম্মযোগনিষ্ঠ স্বরূপটি আসিয়াছে এবং বর্ত্তমানকালে প্রচলিত বৈদিক ধর্ম্মের যে মূলটি রহিয়াছে তাহাও গীতাতে প্রতিপাদিত হওয়াপ্রযুক্ত সংক্ষেপে অথচ নিঃসন্দিগ্ধরূপে আজকালের হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারে, গীতার ন্যায় এরূপ আর একটি গ্রন্থ সমস্ত সংস্কৃত বাঙ্ময়ের (সাহিত্য) মধ্যে নাই বলিলেও চলে।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

শুনাও সেই দিব্য বাণী
কল্যাণী দুখ-হারিণী,
—যে বাণী শুনি
সর্ব্বত্যাগী কত ঋষিমুনি।
সেই শুভ বাণী অমৃতরসবাহিনী,
পাবনী, শান্তিসুখদায়িনী,
চিরনন্দিনী, চিরসঙ্গিনী,
—হে অন্তরযামী॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

II
[-া]

সা সা -দা I । দা -া । দা -পা ণা । দা -পা । মজ্ঞা -া মা I মণা -া ।
শু না ও সেই • দি • ব্য বা • ণী • ক ল্যা •

। দা -পা মজ্ঞা । মা জ্ঞা । ঋা সা ঋা I ণ্া সা । জ্ঞা মা মদা ।
ণী • দু খ, হা রি ণী, যে বা ণী শু নি, স

| -পা মজ্ঞা | -া মা জ্ঞা I সা -ণ্‌া | সা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জমজ্ঞঋা |
• র্ব • ত্যা গী ক • ত, ঋ ষি মু নি • •

| সা সা -দা II
"ও মা ও"

II { দা মা | দা -া ণা | র্সা -া | র্সা -া ণা I র্সা র্রা | র্জ্ঞা -া র্মা |
সে ই শু • ভ বা • ণী • অ মৃ ত র • স

| র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া -ণা } I দা -া | -পা -মা পা | মজ্ঞা -া |
বা হি নী • • পা • • • ব নী •

| ঋা -সা সা I র্মর্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা -া র্মা | র্সা -া | র্সা -া র্রা I { র্জ্ঞা -া |
শা • ন্তি সু খ দা • য়ি নী • চি • র ন •

| র্মা র্মা -া | -া -া | র্মর্দা -া র্দা I র্পা -র্মা | র্পা র্মর্জ্ঞা -া | (-া -া |
বি নী • • • চি • র স • ঙ্গি নী • • •

| র্সা -া র্রা) } I দা -া | দা -পা -া I পা -মা | পা মজ্ঞা -া |
চি • র হে • অ • • ন্ত র্ যা মী •

| -া -া | ঋা সা -দা II II
• • "ও মা ও"

রাণাডের স্মৃতিকথা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

রাণাডে-পত্নীর বংশ বিবরণ।

আমার মাতৃবংশ অর্থাৎ সাতারা জিলার অন্তর্গত খানাপুর তালুকের 'মৌজা দেবরাষ্ট্র—এইখানে কুর্লে'-কর ছিলেন। কুর্লে'কর গোড়ায় রত্নাগিরী জিলার অন্তর্গত "নেওরে"-গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মালভূমি দেশে আসিয়া প্রথম ঔধাঙ্কসন্নিকটে "রাজার কুর্লে" নামক গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং সেই গ্রাম হইতে তাঁহার কুর্লে'কর এই নাম হয়। "বালংভট চিপোলকর" ইহার আদি-পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। কুর্ল্যায়ে আসিয়া কিয়দ্দিবস পরে, এই দুই ছেলের সিপাহীর গুণ থাকায় উহারা ঘোড়ায় চড়া খুব অভ্যাস করিয়াছিল। এই দুই ভাইই উগ্রপ্রচণ্ডস্বভাব হওয়া প্রযুক্ত, একস্থানে বসিয়া থাকা তাহাদের ভাল লাগিত না। যে কোনখানেই হউক, ভালো দরবারে যাইয়া পরাক্রমের পরিচয় দিবে ও নিজের গুণে উন্নতিলাভ করিবে, এইরূপ সংকল্প করিয়া উহারা দুজনেই "লস্করের কল-বরার" আদেশ গ্রহণের মত [illegible] আবেশ

লইয়া পুনায় যাত্রা করিল। সেখানে তাহারা নিজ দৈহিক পরাক্রমগুণে আপনাদিগকে প্রথমে অশ্বসৈন্যদলভুক্ত করিয়া লইল; পরে এক বড় অশ্বদলসৈন্যের "অধিকারী" হইল।

আনুমানিক ১৮৩০—৩১ অব্দে এই অশ্বসৈন্যদলকে দেবরাষ্ট্র গ্রামেই রাখিয়া দেওয়া স্থির হইল এবং ঐ সমস্ত গ্রামটা তাঁহারা অশ্বসৈন্য সন্নিবেশের জন্য প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে দেবরাষ্ট্র গ্রামে প্রান্তপ্রতিনিধির অশ্বশালা ছিল; কিন্তু তাঁহার প্রতি পেশোয়া অসন্তুষ্ট হওয়ায়, প্রান্তপ্রতিনিধির অশ্বশালা উঠাইয়া দিলেন এবং ঐ গ্রাম অশ্বসৈন্যদলকে প্রদান করিলেন। এবং "মাধব রাও বল্লাল" কুর্লে'কর ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে বড় ভাইটির নামে সনন্দ লিখিয়া দিলেন। পরে এই অশ্বসৈন্যদল "পটবর্দ্ধন পথকের" সামিল হইল। মহীশূর ও কর্ণাটক প্রদেশে অশ্বারোহণে যাইবার কথা অনেকবার হওয়ায়, ঐ দুই ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাই বাজীপন্ত "কিতুরের" আক্রমণ কাজে নিযুক্ত হয়। এবং ছোট ভাই মাণকোপন্তও "শিরোল ঘুমটা"র কামানসজ্জিত বুরুজদেশে গুলি লাগিয়া মারা যায়। দুজনে আলাদা আলাদা জায়গায় নিজ পরাক্রমগুণে, পুরস্কারের যোগ্য বীরত্ব প্রকাশ করায়, অদ্যাপি কুর্লে'করমণ্ডলী বৃত্তি উপভোগ করিতেছেন। ইঁহারা গুজরাথে"গায়কবাড়ী" হইবার পর, বৃত্তি ও ইনাম পাইতেছিলেন, কিন্তু ঐ দুজন পরলোক গমন করিলে পর, সেখানকার উৎপন্ন আয় সম্বন্ধে চেষ্টা ও আন্দোলন করে এরূপ কেহ ছিল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বড় ভাই বাজীপন্ত কিতুরের আক্রমণকার্য্যে নিযুক্ত হয়; সেই সময় তাহার পত্নী গোপিকা বাঈ অন্তঃসত্বা ছিলেন। তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, তাহার নাম গণপৎ রাও ভাউ রাখা হইল। পরে এই ছেলের নাম পেশোয়ারের দরবারে দাখিল হইয়া বাজীপন্তের পূর্ব্ব-অর্জ্জিত ইনাম, বৃত্তি ও অশ্বসৈন্যের অধিকার এখন গণপত রাও-ভাউর নামে চালাইবার হুকুম হইল।

এই গণপত রাও-ভাউ আমার আপনার প্রপিতামহ ছিলেন—ইনি একজন মস্ত নামজাদা সিপাহী ছিলেন। ইনি শঙ্কর-উপাসক ও দৃঢ়নিশ্চয়ী ছিলেন। তথাপি ইঁহার চিত্ত ভক্তিরসে পূর্ণ ছিল। ইনি খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। পূর্ব্ব বয়সে একবার তাঁর মাতোশ্রীর প্রতি রাগের মাথায় কিছু দুরুত্তর করিয়াছিলেন। ইহার দরুণ ঘণ্টা খানেক ধরিয়া তাহার পশ্চাত্তাপ হওয়ায়, আমাদের গ্রামে সাগরেশ্বর নামে এক শিবালয় আছে সেখানে যাইয়া আপনার জিভের আগা কাটিয়া তিনি শিবলিঙ্গের উপর উৎসর্গ করিলেন। "মাতোশ্রীর প্রতি দুর্ব্বাক্য বলা অপেক্ষা আমাকে বোবা করিয়া দিলে ভাল হইত," এইরূপ বলিয়া তিনি শিবের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। এই ব্যাপারটা নিকটে হওয়ায় বৃদ্ধা মন্দিরপরিচারিকা দেখিবামাত্র তখনি সম্মুখে আসিয়া সে শিবলিঙ্গের উপর স্থাপিত জিভের টুকরাটা উঠাইয়া লইল ও উহা জলন্ত অঙ্গারের মধ্যে ডুবাইয়া গণপত-রাও-ভাউর জিহ্বায় লাগাইয়া দিল। এবং "আর কখন এরূপ করিও না, তুই কাছে থাকতে এ কাজ কেমন করে করতে দিলি, এই বলে' তোর মা আমাকে অভিশাপ কর্‌তেন না কি?" এই কথা সে বলিল। কেবল অঙ্গারে ডুবানো চট্‌চটে টুকরাটা জিভে বেশ আঁটিয়া বসিয়াছিল, এইরূপ লোকে বলে। যাক্‌। ইনি ও চিন্তামন-রাও অপ্পাসাহেব—এই দুই জনের মধ্যে ঋণজনিত বাধ্যবাধকতা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় পটবর্দ্ধন উহাঁকে নিজের ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছিলেন। গণপত-রাও-ভাউর মানিক-রাও-আবা নামে একমাত্র পুত্র ছিল। ইনিই আমার পিতামহ ছিলেন। "আবা"র চার পুত্র ও দুই কন্যা হয়; "আবা" উল্লেখযোগ্য কোন পরাক্রমের পরিচয় দেন নাই। সম্ভবত সেই ইনামের উৎপন্ন আদায় উসুল করিয়া, ইনি নিজের সমস্ত সময়টা দেবীর পূজা অর্চ্চনায় অতিবাহিত করিতেন। আমার পিতামহীই সংসারের সমস্ত কাজ দক্ষতার সহিত দেখিতেন।

চার ছেলের মধ্যে, বড় ছেলে মাধব-রাও-আবাসাহেবের উপরেই পিতামাতার ভালবাসা বেশী ছিল। কারণ তিনি স্বভাবত যদিও তেজীয়ান ও গরম-মেজাজী ছিলেন, তথাপি আপনার বংশের লৌকিক মর্য্যাদা ও প্রাধান্যের পক্ষে যাহা শোভা পায় সেইরূপ সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্য্যসহকারে চলিতেন এবং নিজ বংশ সম্বন্ধে তাঁহার খুব একটা অভিমান ছিল। তিনি উদারচিত্ত ও ধর্ম্মশীল ছিলেন। তাঁহার সমস্ত আশা ভরসা দেবতার উপর ন্যস্ত ছিল। আনন্দ বা দুঃখের সময় তাহার মন কখন চঞ্চল বা অস্থির হইত না। তিনি স্থিরচিত্ত ও দৃঢ়সংকল্পের সহিত দেবতার উপর নির্ভর করিয়া সকল অবস্থাতেই শান্তভাবে থাকিতেন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দীর্ঘপ্রযত্নী ছিলেন। যতই কষ্ট হোক না কেন, তিনি হতাশ হইয়া কখনই হাতের কাজ ছাড়িতেন না। তিনি "জ্ঞানেশ্বরী" ও "অমৃতানুভব" পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন। নিজ মিত্রমণ্ডলীর সহিত অদ্বৈত মত সম্বন্ধে বারংবার বিচার ও চর্চ্চা করিতেন। তিনি খুব মানী, চতুর ও পাকা হিসাবী ছিলেন। আমাকে ধরিয়া, তাঁর চার পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। আমার মায়ের সবশুদ্ধ ২০টি সন্তান হয়। কিন্তু তার মধ্যে আমরা ৭ জন মাত্র বাঁচিয়া রহিলাম।

আমার মা "মিরজে"র প্রসিদ্ধ রাজবৈদ্য "রাঘোপন্ত-

জাউ কবমকবের” কন্যা। ইঁহার পাঁচ ভগিনী ও তিন ভাই ছিল। আমার মায়ের স্বভাব অতিশয় মায়ালু, সহিষ্ণু ও লাজুক ছিল। তিনি প্রায়ই কোন-না-কোন কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে তাঁহার কখনই ভাল লাগিত না। ঘরের কাজে একটু রেহাই পাইলেই তিনি ঔষধ তৈয়ার করা, চাউল-ভাজা প্রভৃতি কোন-না-কোন কাজে সময় কাটাইতেন।

আমার মায়ের চিকিৎসার কাজটা বেশ আসিত। কত কত বৎসরের পুরাতন রোগ তিনি চট্ করিয়া সারাইয়া দিতেন। ইহার দরুণ আশপাশের দশ বারো গাঁয়ের লোক খুব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইঁহার নিকট ঔষধ লইতে আসিত। সকল রোগীকেই নিজের খরচায় ও নিজের হাতে সেই সকল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। রাত্রি দিন, সময়ে অসময়ে, রোগী আসিলে কখন কুণ্ঠিত হইতেন না; তিনি তখনই উঠিয়া ঔষধপত্র দিতেন; খুব গরীব হইলে তাহাকে ৫।৭ দিন দেউড়ীতে রাখিয়া দিয়া দুই বেলা নিজের হাতে পথ্য ও ঔষধ দিতেন। বায়ু রোগ ও উন্মাদ-রোগে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই সব কাজে আমার পিতার সম্মতি ও সাহায্য ছিল; কারণ এইরূপ পরোপকারের কাজ তাঁহার খুব ভাল লাগিত। “এতে যা লাগে স্বচ্ছন্দে খরচ কর। এই আসল ধর্ম্ম” এই বলিয়া তিনি মাকে প্রোৎসাহিত করিতেন।

আমার পিতা স্বভাবতঃ অতিশয় কর্ম্মিষ্ঠ ও জেদী ছিলেন। সেই দরুণ বাড়ীর লোকের মধ্যে কাহারও বিরুক্তি করিতে সাহস হইত না। আমার মা পূর্ব্ববয়সে অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজ মিতাচারিতা সহিষ্ণুতা ও শান্তস্বভাবের দরুণ তাঁহার মেজাজ সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকিত; তিনি এইরূপ বুঝিতেন যে, পতিই নারীদের দেবতা, গুরু, সর্ব্বস্ব। তাই তিনি গুরুমন্ত্রও আমার পিতার নিকট হইতেই লইয়াছিলেন। এবং সেই মন্ত্র তিনি খুব নিষ্ঠার সহিত জপ করিতেন। ১৭৭৩—৭৭ অব্দের দুর্ভিক্ষে, আমার মাতার বড় টানাটানি হইয়াছিল। সেই দরুণ, এত বৃহৎ পরিবারের সংসার চালানো দুই চারি বৎসর বড়ই কঠিন হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি খুব ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন। পুত্রকন্যাদিগকে কোনরকম দুঃখকষ্টের কথা জানিতে দিতেন না এবং দৈন্যের দরুণ আমার পিতার নিকট কোন রকম নালিস করিতেন না বলিয়া তিনি বেশ শান্তভাবে ও ধৈর্য্যসহকারে দিন কাটাইয়াছিলেন। আমাদের সকল ভাইবোনদের এখনো সে কথা বেশ মনে আছে। তিনি বেশ খোলাখুলিভাবে, স্নেহশীল বন্ধুর মত আমাদের সহিত ব্যবহার করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পুরাণ পাঠ শেষ হইলে পর, আমাদের সবাইকে ডাকিয়া খোলা উঠানে বসিতেন ও পুরাণ হইতে দেবদেবীর কথা ও কাহিনী বলিতেন। ইহা দেখিয়া আমার পিসিমা ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, “আমার উমা-ভগিনীর মনে হয় তাঁর ছেলেরা বড়ই বুদ্ধিমান। তিনি পুরাণ থেকে যে সব কথা বলেন এরা যেন সবই বোঝে। এই সব কথা ওদের কাছে কেন বলা? বয়স্ক লোকদেরও ওসব মনে রাখা কঠিন।” তখন আমার মা বলিতেন যে, “আমি কুকুর বিড়ালের গল্প ত জানিনে, তা আমি এখন কি করি। ঐ সব গল্প তুমি তবে বল। কিন্তু আমার মনে হয়, ভাল বীজ আমাদের ক্ষেতে বোনা আবশ্যক। যে রকম জমি মিলবে সেই রকম অঙ্কুর ধরবে। এইজন্য নিদেন নিজ মুখে দেবতাদের কথা উচ্চারিত হলে আমাদের পুণ্য হবে। আর আমাদের কি করবার আছে?” আমি এই কথা বল্‌তাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সেই সময় আমাদের ভাই বোনদের বয়স অনুক্রমে চার, সাত, আট, দশ এই রকম ছিল। তবু কিন্তু তাঁর বলা একটি গল্প শোনবামাত্রই আমাদের মনে থাক্‌ত। নূতনপড়া ও নূতন শোনা গল্প ভুলে যাই কিন্তু মার বলা এই সমস্ত গল্প একেবারে নূতনের মত আমাদের স্মরণে রয়েছে।

লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট প্রদেশে লিঙ্গায়ত নামক এক সম্প্রদায় আছে। ইহারা কণ্ঠদেশে শিবলিঙ্গ ঝুলাইয়া রাখে বলিয়া উক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। লিঙ্গায়তগণ এক প্রকার শৈব। শৈবগণ সাধারণত দুই শ্রেণীভুক্ত। প্রথম স্মার্ত্ত বা শাস্ত শৈব, দ্বিতীয় লিঙ্গায়ত বা যোদ্ধৃ শৈব।

লিঙ্গায়তগণের বিশ্বাস, তাহারা শিবের অঘোরা, ঈশানা, সজ্জ জাত, তৎপুরুষ ও বামদেব নামক পঞ্চ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের লিঙ্গধারণ প্রথা বাসব বা বাসাপ্পা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বাসব শিবের বৃষভ নন্দী, লিঙ্গপূজা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে শিবাজ্ঞায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিজাপুরের দক্ষিণপূর্ব্বে বাগবতী সন্নিকট হিঙ্গলেশ্বর গ্রামে মন্দেঙ্গা মর্দমাদ্রি নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম মাদেবী ছিল। ইঁহারা উভয়েই অতি নিষ্ঠাপরায়ণ শৈব

ছিলেন। ইঁহাদের ভক্তিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান শিব তাঁহার প্রিয়তম বাহন বৃষভ নন্দীকে ইঁহাদের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ করেন। নন্দীর নাম বাসব বা বাসাপ্পা রাখা হইয়াছিল।

স্থানীয় প্রথা অনুসারে অতি শৈশবকালে বাসবের উপনয়ন সংস্কার হয়। কিন্তু বাসব যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে অস্বীকার করেন। তাহার কারণ উপবীত ধারণ করিলে গায়ত্রী বা সূর্য্যের স্তব পাঠ করিতে হয়। শৈব বা একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসক হইয়া ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহারও অর্থাৎ সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্রাদির অথবা কোন সৃষ্ট পদার্থের পূজা করা অনুচিত। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন অপর কাহাকেও পূজা করিতে অথবা কাহাকে গুরু বা মধ্যবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

বাসবের পিতা, পুত্রের এবম্বিধ ব্যবহারে অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়েন এবং তাঁহাকে স্বপথে আনয়ন করিতে অপারক হইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বাসবের ভগিনী নাগম্মাও ভ্রাতার সহিত চলিয়া যান। নাগম্মার অপর নাম পদ্মাবতী ছিল। তাঁহারা উভয়ে নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া হায়দ্রাবাদের শত মাইল দূরে কল্যাণ নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। এই কল্যাণ নগর তখন হায়দ্রাবাদের রাজধানী ছিল এবং বীজলাল নামক কুলাচার্য্যবংশোদ্ভূত একজন জৈন রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন।

বাসবের মাতুল এই রাজ্যের একজন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাসব ও তাঁহার ভগিনীকে আশ্রয় দেন এবং কিছুদিন পরে রাজ-সরকারে বাসবকে চাকরি করিয়া দেন ও নিজ কন্যা গঙ্গাম্মার সহিত বাসবের বিবাহ দেন।

বাসব রাজ-সরকারে নিযুক্ত হইবার পর স্বীয় ভগিনী রাজাকে সম্প্রদান করিয়া ক্রমে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে পুরাতন রাজকর্ম্মচারীগণকে যথেচ্ছা কর্ম্মচ্যুত করিয়া আপন বন্ধুবান্ধব ও দলভুক্ত ব্যক্তিগণকে তাহাদের স্থানে নিযুক্ত করেন। তৎপরে রাজভাণ্ডার হইতে ধনরত্ন অকাতরে বিতরণ করিয়া প্রজাগণের প্রিয় হয়েন।

এইরূপে তিনি বহুলোক ও প্রজাগণকে বশীভূত করিয়া জৈন, স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবগণের বিপক্ষতাচরণ করিতে থাকেন, এবং এই সময় হইতে তিনি লিঙ্গধারণ প্রথা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, মাংস-মদ্যাদি গ্রহণ নিষেধ করিয়া জৈনগণকেও কিছু সন্তুষ্ট রাখিতে প্রয়াস পান।

অবশেষে তৎকর্তৃক নিপীড়িত জৈনাদি সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া রাজা বীজলাল বাসবকে ধৃত করিবার আদেশ প্রদান করেন। বাসব রাজাজ্ঞা অবগত হইয়া রাজধানী হইতে সদলবল পলায়ন করেন। পথিমধ্যে রাজা কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনাকে রাজার মন্ত্রী ও সেনাপতিপদে পুনর্নিয়োগ করিতে বাধ্য করেন।

জৈনগণ বলেন যে বাসব রাজকার্য্যে পুনর্নিযুক্ত হইয়া অবধি রাজাকে হত্যা করিতে মনস্থ করেন এবং কোলাপুরে রাজার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিবার সময় ভীমা নদীর তীরে রাজা বীজলালকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেন। রাজপুত্র রায় মুরারী পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বাসবকে আক্রমণ করেন। বাসব পলায়ন করিয়া দক্ষিণ কানারায় সূপা নামক স্থানের দক্ষিণে উলভি গ্রামে পলায়ন করেন এবং তথায় আত্মরক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া কূপমধ্যে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

লিঙ্গায়তগণ কিন্তু একথা স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে রাজা বীজলাল বাসবের আল্লায়া এবং মাধপ্পা নামক দুইজন প্রিয় শিষ্যের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার ও তাহাদের চক্ষু উৎপাটন করাতে বাসব অসন্তুষ্ট হইয়া আপন প্রিয়তম শিষ্য জগদ্দেবকে উক্ত নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাখিয়া স্বয়ং রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যান। কথিত আছে, যে দিবস বাসব রাজধানী পরিত্যাগ করেন, কল্যাণ নগরে দিবাভাগে শৃগাল ও রাত্রিকালে কাক ডাকিয়াছিল এবং ঘোর অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি, গ্রহণ, ভূমিকম্প প্রভৃতি নানা প্রকার অমঙ্গলসূচক ঘটনা সংঘটিত হয়। ইহাতে প্রজাগণ যারপরনাই ভীত ও ব্যাকুল হয়।

ইহার পর জগদ্দেব, মলায়া এবং বোমায়া নামক

দুইজন লিঙ্গায়ত সাধুর সাহায্যে রাজা বীজলালকে হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং তিন জনে সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে রাজ-ভবনে প্রবেশ করেন এবং তথায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজাকে হত্যা করেন। কথিত আছে যে, যখন তাঁহারা রাজাকে হত্যা করিতে গমন করেন, একটি অদ্ভুত বৃষ তাঁহাদের অগ্রে ভীষণ চীৎকার করিয়া লোকসকলকে ভীত ত্রস্ত এবং ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে ধাবিত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর রাজ্যে নানাপ্রকার অশান্তি সংঘটিত হয়। বাসব এ সময়ে সঙ্গমেশ্বরে বাস করিতেছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বাসবের মৃত্যু হয়।

লিঙ্গায়তগণ বলেন যে বাসবের অলৌকিক কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল। তিনি শস্যকে মুক্তায় পরিণত করিতে পারিতেন, যথাইচ্ছা ধন রত্ন পাইতেন, ক্ষুধিত ব্যক্তিগণকে যথাবশ্যক খাদ্য দ্রব্য দিতে পারিতেন, রুগ্ন ব্যক্তিকে নীরোগ করিতে পারিতেন এবং এমন কি মৃত ব্যক্তির জীবন দান করিতে পারিতেন।

বাসব রাজভাণ্ডার হইতে যদৃচ্ছা ধনরত্নাদি জঙ্গমগণকে (লিঙ্গায়ত ও সাধু) দান করিতেন। কোন রাজ-কর্ম্মচারী এই বিষয় রাজার কর্ণগোচর করিলে, তিনি রাজ-কোষ দেখিতে ইচ্ছা করেন। বাসব তৎক্ষণাৎ সহাস্য বদনে রাজাকে রাজকোষে লইয়া যান এবং দেখান যে রাজ-ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে।

আর এক সময় একজন জঙ্গম বাসবের স্ত্রী গঙ্গম্মার বহু-মূল্য বসনাদি দেখিয়া ঐ সকল প্রার্থনা করে। বাসব তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্ত্রীর অঙ্গ হইতে সমুদায় বসন ভূষণ খুলিয়া লইয়া জঙ্গমকে প্রদান করেন। নিমেষমাত্রে গঙ্গম্মা নব বস্ত্রভূষণে পূর্ব্ববৎ ভূষিত হন। বাসব পুনরায় উক্ত বসনভূষণাদি জঙ্গমকে দান করেন এবং পুনরায় পূর্ব্বমত গঙ্গম্মা নব বস্ত্র-ভূষণ প্রাপ্ত হয়েন।

কোন সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে সেই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক বলিয়া বাসব সম্বন্ধে উপরি উক্ত ঘটনাবলী লিখিত হইল। এগুলি কতদূর সত্য বা ইহাদের কোন অংশ বিশ্বাসযোগ্য কি না, সে সম্বন্ধে বিচার করা আবশ্যক বিবেচনা করি না।

লিঙ্গায়ত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিঙ্গায়ত ধর্ম্মের সারাংশ মাত্র বিবৃত করিতেছি।

লিঙ্গায়ত ধর্ম্মের সারাংশ।

১। একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর সকলকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

২। সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী লোকের বা গুরুর প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে পাইবার জন্য কোন প্রকার বলিদান, উপবাস, তীর্থপর্য্যটন, বা শারীরিক কষ্ট স্বীকার আবশ্যক নহে।

৩। লিঙ্গায়তগণ তাঁহাদের একেশ্বরবাদিত্বের চিহ্নস্বরূপ লিঙ্গ ধারণ করিবে। যাঁহারা লিঙ্গ ধারণ করেন, তাঁহারা সকলেই সত্যধর্ম্মাবলম্বী সুতরাং তাঁহাদের দেহ পবিত্র। তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ নাই। লিঙ্গ ধারণ করিবামাত্র জাতিভেদ উচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

৪। লিঙ্গধারী পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন প্রভেদ নাই। যৌবন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে স্ত্রীগণের বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। স্ত্রীগণের স্বামীনির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাহাদের মত গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫। জন্ম মৃত্যু প্রভৃতিতে লিঙ্গধারীগণের অশৌচ গ্রহণের আবশ্যকতা নাই, কারণ লিঙ্গায়তের দেহ কোন কারণেই অশুদ্ধ হইতে পারে না।

৬। মৃত্যুর পর সত্যবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ শিবলোকে গমন করেন, অর্থাৎ পরমাত্মায় লীন হন।

৭। শিব সর্ব্বভূতেশ্বর। সুতরাং সেই মঙ্গলময়ের উপাসকের কোনপ্রকার ভয়ের কারণ নাই।

লিঙ্গায়তগণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। সাধারণ লিঙ্গায়ত এবং জঙ্গম বা পুরোহিত। জঙ্গম দুই শ্রেণীভুক্ত, ধাতঃস্থল বা বিরক্ত এবং গুরুস্থল। যে সকল জঙ্গম বিবাহ করেন না, তাঁহাদিগকে ধাতঃস্থল বা বিরক্ত কহে; আর যাঁহারা বিবাহ করেন তাঁহাদিগের নাম গুরুস্থল।

সাধারণ লিঙ্গায়তগণ একত্রিংশ ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে চারি শ্রেণী প্রকৃত বা আদি লিঙ্গায়ত;

ষোড়শ শ্রেণী সংযুক্ত লিঙ্গায়ত এবং একাদশ শ্রেণী অর্দ্ধ লিঙ্গায়ত। ধূলপদ, শিলবন্ত, বনজিগ, এবং পঞ্চমাশালী এই চারি-শ্রেণী আদি লিঙ্গায়ত; তন্মধ্যে ধূলপদগণ বিশিষ্ঠ। ইহারা অতি নিষ্ঠা-পরায়ণ; পুরোহিত উপস্থিত না থাকিলে অপর কোন শ্রেণী-ভুক্ত লিঙ্গায়তের সহিত ভোজন করে না। এমন কি, ইহারা ঘুঁটে কাষ্ঠ প্রভৃতি ধৌত না করিয়া ব্যবহার করে না। পুষ্করিণী কূপ অথবা নদী হইতে জল আনয়ন করিবার সময় ইহারা ঘট-মুখ বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখে। শিলবন্তগণ ধার্ম্মিক বটে, কিন্তু ধূলপদের ন্যায় অত নিষ্ঠাপরায়ণ নহে। বনজিগগণ শিলবন্তগণের অপেক্ষা অল্পতর নিষ্ঠা-বান। ইহারা সাধারণত ব্যবসা করিয়া থাকে।

বুদাওঁ নগরে মহিলাসভা।

গত ১০ই অক্টোবর দিবসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বুদাওঁ নগরে আর্য্যসমাজের মহিলাসভার এক অধিবেশনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী শ্রীমতী শোভনা দেবী আহূত হইয়া সরল হিন্দী ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম।

প্রিয় বহিনোঁ,

আপ লোগোঁ নে মোঝকো ইহাঁ পর কুছ কহনেকে লিয়ে নিমন্ত্রণ কিয়া হৈ, ইস কারণ মৈঁ আপলোগোঁ কা পাস্ অত্যন্ত বাধিত হুঁ। মৈঁ হিন্দি ভাষা নহীঁ জানতী হুঁ, লেকিন হম্ আপলোগোঁকে নিমন্ত্রণকো ন-টাল্ সকী; আওর আপলোগোঁকী অনুরোধকা পালন করনা আপনা কর্ত্তব্য জান্, মৈঁ ইহাঁপর আপলোগোঁকী সেবামেঁ উপস্থিত হুই হুঁ। আজ মৈঁ আপলোগোঁকো "ওঁ পিতানোঽসি, ওঁ পিতানোঽসি" ("তুম হমারে পিতাহো", "তুম হমারে পিতা হো") ইস্ পবিত্র মন্ত্রকো সুনানা চাইতী হুঁ। "ওঁ পিতানোঽসি", "তুম হমারে পিতা হো" ইয়ে এক বহুত পুরাণী বেদমন্ত্র হৈ। ইয়ে যুগযুগান্তরকো মন্ত্র হৈ। হজারো বর্ষ গুজর গয়ে হৈঁ, কিসি বহুত পুরাণে সময়পর বৈদিক ঋষিগণোঁ সুন্দর তপোবনমে ভগবানকি স্তুতিপাঠ কিয়া করতে, আওর "ওঁ পিতানোঽসি, ওঁ পিতানোঽসি", "তুম হমারে পিতা হো", "তুম হমারে পিতা হো" ইস্ পবিত্র আওর প্রাণকে পিগলানে বাণী মন্ত্রসে ওই সমস্ত পুণ্য স্থাম গুঞ্জ উঠতা।

বহিনোঁ, আও আজ হমলোকোঁ সব মিলকর উন্‌হি ঋষিয়োঁকো সাথ উন্‌কা অনুসরণ করতে হুয়ে উসি পবিত্র মন্ত্রকো জী খোলকর পাঠ করেঁ, আওর উহ্ পরম দয়ালু পরম পিতা পরমেশ্বরকো দিল খোলকর পুকারেঁ। আও আজ হমলোকোঁ একত্র হোকর সমস্ত জগতকো গুঞ্জাতে হুয়ে "ওঁ পিতানোঽসি ওঁ পিতানোঽসি" কহ-কর হুঁকারে, তাকি হমারী আওয়াজ শত কোটি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আওর আকাশকো ভেদ করতাহুয়ে চলা যায়।

ভগ্নিয়োঁ, ইস্ বাত কা স্মরণ রহে কি ইয়ে পবিত্র মন্ত্র হামলোকোঁ পরম্পরা ঋষিয়োঁসে মিলা হৈ। আওর হামলোকোঁ ইসি বাত কি চেষ্টা করণী চাহিয়ে কি জিস্‌সে হমলোগ ইস পবিত্র মন্ত্রকো ন ভুলে। সুবে, শাম আর দোপহরকো বরাবর হমলোগোঁ ইস পবিত্র মন্ত্র "ওঁ পিতা-নোঽসি" কো উচ্চারণ করতে রহেঁ, আওর জগতপিতা জগদীশ্বরকো পুকারেঁ, আওর আপনে আত্মাকি তৃপ্তি ইসি প্রকার করেঁ। বহিনোঁ! দেখো ওঁ পিতানোঽসি ইস পবিত্র বেদমন্ত্রকা উচ্চারণ কর আওর পরমাত্মাকো পিতা কহকর পুকারো। হমারে বৈদিক ঋষিগণোঁ আপনে হৃদয়মেঁ কিস্ কদর বল্ প্রাপ্ত কিয়া করতে। আও আজ হামলোকোঁভী উনকো পিতা কহ পুকারেঁ আপনে হৃদয়োঁমে নয়ে শক্তিকা সঞ্চার করেঁ। হামলোগোঁ সব উস বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরকো সন্তান হৈঁ, আও হাম আজ বেদমন্ত্র "ওঁ পিতানোঽসি"কো উচ্চারণ কর উনকী পূজা ভলি করেঁ। জগৎপিতা জগদীশ্বরকা মহাপ্রেম সমস্ত জগতকে পদার্থোমে হরেক বস্তুমেঁ ফৈলা হুয়া হৈ। উনকো প্রেমহস্তকে স্পর্শ হামলোগ প্রতি সময় আপনে আপনে শির পর অনুভব কিয়া করতেহৈঁ। উনকে কোমল হস্তকে প্রেমস্পর্শ হামলোগ আপনে হরেক সাঁশো মে ভিতর লেতে হৈঁ, আপনে বক্ষকা ভিতর পাতে হৈঁ। পৃথিবী কো হরেক প্রাণোমে "ওঁ পিতা নোঽসি"কা শব্দ শুনাই পড়তাহৈ, আওর চতুষ্করমে উন-হিকী পূজাকী মঙ্গল শঙ্খধ্বনি শুনাই পড়তিহৈ।

বহিনোঁ, আও হামলোগোঁভী আজ ইয়ে মহামন্ত্র "ওঁ পিতানোঽসি" কো চিল্ল চিল্লাকর পুকারেঁ, আওর আপনে ভক্তি আওর শ্রদ্ধাকো উনকী চরণকমলোঁমে সমর্পণ কর কৃতার্থ বন জায়েঁ। জিনকো দয়া তথা স্নেহনে ইস কঠোর সংসারকো কোমল বনা রাখতা হৈ, জিন-হোঁনে আপনে প্রেমসূত্রমে সমস্ত জগৎকো আপনে সাথ বাঁধ রাখথাহৈ, আও বহিনোঁ, আও, আজ হামলোগোঁ উস্ দয়াময় পিতাকো "ওঁ পিতানোঽসি" কো বেদমন্ত্রসে উচ্চ শব্দসে পুকারেঁ আওর উনকো ভক্তিসে নমস্কার করেঁ।

আও, বহিনোঁ আও, হামলোগোঁ উস্ বিশ্বপিতা তথা

পিতা পরমেশ্বরকো ভক্তি আওর হৃদয়সে পুকারেঁ, আওর উনকি পূজা করেঁ, আওর সবলোগোঁ মিলকর গগনকো ভেদ করতে হুয়ে অতি উচ্চস্বরমে ইস্ পুরানে মন্ত্রকো "ওঁ পিতানোঽসি" কর উনকো পুকারেঁ—"তুমহী হমারে পিতা হো, তুমহী হমারে পিতা হো। হে পিতা। পিতাকে সমান তুম হামকো জ্ঞান প্রদান করো। হাম তোমারি চরণোঁ মে নমস্তে করতে হৈঁ।

গান।

(কোল-খৃষ্টানের গান অবলম্বনে)

সম্প্রতি আমরা রাঁচিতে যাইয়া দেখি যে তথাকার মুণ্ডা প্রভৃতি জাতীয় অধিবাসীদিগকে খৃষ্টান মিশনরিগণ নানা উপায়ে খৃষ্টান করিতেছেন। সেই সকল উপায়ের অন্যতর সঙ্গীত। আমরা খৃষ্টান মুণ্ডানীদিগের মুখে একটী গান শুনিয়া তদবলম্বনে (মাত্র দু'একটি শব্দ বদলাইয়া) নিম্নের গানটি প্রকাশ করিলাম। ভারতের সর্ব্বত্র এরূপ সহজ ভাষায় ও সহজ সুরে ব্রহ্মনামের গীত প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আগামীবারে তাহাদের গীত সুরে ইহার স্বরলিপি প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

(১)

তেরা নাম হ্যায় ত্রাণকর্ত্তা,
দিল্‌কো মো লেতা হ্যায়।
উস্‌কি যথার্থ্ প্রশংসা
সমর্থ্‌সে বাহার হ্যায়॥

ঈশ্বর নাম কি বড়াই
সারি পৃথ্বী করে।
উস্ মধুর নাম কি প্রীতি
রোজ রোজ বড়তি চলি॥ ধ্রু॥

(২)

হে বিভু মিষ্ট্ নাম তেরা,
মধুসে মিঠা হ্যায়।
জ্যোতি, সমর্থ, দিলাশা,
উস্‌সে প্রাপ্ত্ হোতা হ্যায়॥

ঈশ্বর নাম কি বড়াই
সারি পৃথ্বী করে।
উস্ মধুর নাম কি প্রীতি
রোজ রোজ বড়তি চলি॥ ধ্রু॥

Hindu, when he cease to be one ?

When does a Hindu cease to be a Hindu ? According to a decision which has just been delivered in the Chief Court of Burma, it is impossible to exclude from the pale of Hinduism anyone who was born a Hindu and who, in spite of occasional lapses from orthodoxy, still regards himself as a Hindu. The decision referred to related to the contested will of Maung Ohn Ghine, C. I. E. a prominent citizen of Rangoon, who died five years ago leaving property valued at about two lakhs of rupees. Trouble broke out among the relatives as to the disposal of the money. and the vital point governing this question was the religion of the deceased. The original Court held that he was neither a Hindu nor a Buddhist, and that his estate consequently fell to be administered under the Indian Succession Act, adopting the principle of "equity, justice, and good conscience." This judgment has now been reversed on appeal, Mr. Justice Ormond holding that "Ohn Ghine came of a Hindu stock and neither he nor his forefathers had ever given up Hinduism." The estate must therefore come under the Hindu law. Mr. Justice Twomey, concurring, said that "when the Court found a member of a dissenting sect, such as the Sikhs, included authoritatively within the term Hindu, even when the Sikh had gone a step further and had joined the Brahmo Samaj, it need have no compunction in applying the term Hindu to people like the Kalais who. in spite of their Buddhist leanings, were certainly of Hindu stock and worshipped the Hindu gods, and had never renounced the faith of their fathers."

Statesman 19. 9. 18.

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।

গত ২৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্থানটি মনঃসমাধানের বিশিষ্ট অনুকূল। পূর্ব্বরাত্রে হরিসেনার কতিপয় উৎসাহী যুবক আসিয়া উপস্থিত হন। অতি প্রত্যুষে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে প্রাতঃকালীন ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়। হরিসেনার যুবকগণ শ্রীযুক্ত তারাপদ চৌধুরী মহাশয়ের নেতৃত্বে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। মহেন্দ্র বাবুর উদ্বোধন ও দ্বারিক বাবুর বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "মঙ্গল" সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর প্রবন্ধ বেদীর নিম্ন হইতে শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন। বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় উপাসনা শেষ হয়। পরে অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার পর পারায়ণ আরম্ভ হয়। এইটীই বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের বিশেষত্ব। ভক্ত উপাসকমণ্ডলী সকলে একত্র সমাগত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে ৮ম অধ্যায় পর্য্যন্ত সমস্বরে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় প্রতি অধ্যায় পাঠান্তে বাঙ্গলা অর্থ ও স্থলবিশেষে তাৎপর্য্য পাঠ করেন। পরিশেষে তারাপদ বাবু হরিসেনাদলের যুবকগণের সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপরে চিন্তামণি বাবুর বাটীতে আলোচনা চলিয়াছিল। সায়ংকালে বিচিত্র লতাপত্রাদির দ্বারা সজ্জিত সমাজগৃহ যখন দীপালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তখনই দেখা গেল জনসমাগমে সকল স্থানই পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মসমাজের তিন সম্প্রদায়ের অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পাঁচশতাধিক ভক্তসজ্জনে গৃহ ও প্রাঙ্গন আচ্ছন্ন। আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সদলে সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা "অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি" গান করিলে পর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বেদী গ্রহণ করেন। নিম্ন হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া উদ্বোধনের বক্তৃতা করেন এবং উপাসনার পর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র বাবু উপদেশ করেন। তাঁহাদের সারবান বক্তৃতা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্রার্পিতের ন্যায় শ্রবণ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে সঙ্গীত হইয়া সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য শেষ হইয়া যায়। বলা বাহুল্য সুরেন বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ সঙ্গীত দ্বারা উৎসবের পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে যে আনুকূল্য করিয়াছিলেন তাহাতে সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। উপাসনান্তে প্রায় চারি শতাধিক গ্রামস্থ এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আহার করিয়া উৎসব সম্পূর্ণ করেন। বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে একটি যে বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায় তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। মফস্বলের কোন ব্রাহ্মসমাজে এমন আদর অভ্যর্থনা এবং এত শিক্ষিত লোকসমাগম অধিকন্তু হিন্দু সমাজের এত পূর্ণ সহানুভূতি এবং প্রবল নিষ্ঠার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সকলেই তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

নানা কথা।

নোবল পুরস্কার।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের সাহিত্যের জন্য ফরাসি উপন্যাসলেখক রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland) এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের সাহিত্যের জন্য সুইডীয় কবি হীডেনষ্টাম (Heidenstam) নোবল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বৃহত্তাপমান যন্ত্র।

এখানে বৃহৎ শব্দটী যন্ত্রের বিশেষণ নহে, তাপের বিশেষণ। এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা দ্বারা ৭২০০ ডিগ্রী (ফ্যারেনহীট) উত্তাপ পরিমাপ করা যাইতে পারে। ১২০০ ডিগ্রী উত্তাপ হইল সর্ব্বাপেক্ষা কম উত্তাপ যাহা ইহা দ্বারা মাপা যাইতে পারে। উত্তপ্ত পদার্থের আলোকের গভীরতা তাহার উত্তাপের সমানুপাতী, এই সহজ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা এই বৃহত্তাপমান যন্ত্রের কার্য্য নিয়মিত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে উত্তপ্ত চলৎ পদার্থ সকলেরও উত্তাপ মাপ করা যাইতে পারে।

ফরাসি সৈন্যের অদৃষ্টবাদ।

"দুইটীর মধ্যে একটী নিশ্চয়—হয় তুমি পরিচালিত (mobilised) হইয়াছ অথবা হও নাই। যদি না হইয়া থাক, তবে চিন্তার কোনই কারণ নাই। যদি হইয়া থাক, তবে দুইটীর মধ্যে একটী নিশ্চয়—হয় তুমি যুদ্ধরেখার পশ্চাতে অথবা তাহার সম্মুখে স্থাপিত। যদি পশ্চাতে স্থাপিত হও, তবে

চিন্তার কারণ নাই। যদি সম্মুখে গিয়া থাক, তবে দুইটার মধ্যে একটি নিশ্চয়—হয় তুমি নিরাপদ স্থানে আছ অথবা বিপদের মধ্যে আছ। যদি নিরাপদ স্থানে থাক, তবে চিন্তার কারণ নাই। যদি বিপদের মধ্যে থাক, তবে দুইটার মধ্যে একটী নিশ্চয়—হয় তুমি আহত অথবা অনাহত রহিয়াছ। যদি অনাহত থাক, তবে চিন্তার কারণ নাই। যদি আহত হও, তবে ইহা নিশ্চয় যে হয় তুমি স্বল্প আহত অথবা গুরুতর আহত। যদি স্বল্পাহত হও, তবে চিন্তার কারণ নাই। যদি গুরুতর আহত হও, তবে ইহা নিশ্চয় যে হয় তুমি বাঁচিয়া উঠিবে অথবা মরিবে। যদি বাঁচিয়া উঠ, তবে চিন্তার কোনই কারণ নাই, আর যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তবে তো চিন্তার অতীত হইয়া গেলে।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ফরাসিগণ কি ভাবে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া দেশের জন্য প্রাণত্যাগে অগ্রসর হইয়াছে।

(ষ্টেটসম্যান, ১০ই নভেম্বর ১৯১৬)

যুক্তরাজ্যের কংগ্রেসে স্ত্রীলোক সভ্য।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শ্রীমতী জেয়ানেট র‍্যাসকিন্স (Mrs Jeanette Ramkins) মণ্টানো প্রদেশের "স্বাধীন" দল হইতে কংগ্রেসের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমাদেব বিশ্বাস, দেশের শাসনসভায় বিবাহিত মহিলাগণ স্থান পাইলে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা হ্রাস হইবে।

শুচিতা ও ধর্ম্মভাব।

বর্ত্তমানে ইংরাজীতে দেখা যায় যে দুইটী শব্দ প্রায়ই একত্র ব্যবহৃত হয়—Cleanliness ও Godliness (শুচিতা ও ধর্ম্মভাব)। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মধ্যযুগে ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রথমাবস্থায় সন্ন্যাসীগণ অশুচি থাকাকে ধর্ম্মভাবের সহায় বলিয়া মনে করিতেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেও খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীগণকে অশুচি ব্যবহারে নিমগ্ন থাকিতে দেখা গিয়াছে। সেণ্টজেরোম সন্ন্যাসীগণের পক্ষে এই প্রকার ব্যবহারই অনুমোদন করিয়াছেন। এক জন মিসরবাসী সন্ন্যাসী বৎসরের মধ্যে একদিন ঈষ্টারের দিন চুল আঁচড়াইতেন এবং কখনও নিজের পা পর্য্যন্ত ধৌত করেন নাই। সেণ্টজেরোম তাঁহার বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেণ্টএণ্টনি কখনও স্বীয় পদ ধৌত করেন নাই। টমাস আবেকেট যখন নিহত হয়েন, তখন তাহার পরিহিত বস্ত্র অবর্ণনীয়রূপ নোংরা দেখা গিয়াছিল। ১৬৬৬ খৃঃ লণ্ডনে মহামারী ও তৎসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ অগ্নিকাণ্ড হইবার পর স্বাস্থ্য বিজ্ঞান্ অল্পে অল্পে লোকের মন অধিকার করিতে লাগিল। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লণ্ডনে মৃত্যুসংখ্যা ছিল হাজার করা ৮০, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুসংখ্যা হাজার করা ১৪.৭ হইয়াছিল।

(ষ্টেটসম্যান ৭ নবেম্বর ১৯১৬)

আমাদের দেশের ঋষিরা বেশ জানিতেন যে শুচিতার সহিত ধর্ম্মভাবের কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। তাঁহারা ধর্ম্মপিপাসুগণকে তাই সর্ব্বপ্রথম শুচি হইতে অনুশাসন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এদেশে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা অশুচিতাকেই ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করে এবং তাহার ফলে স্বভাবতই নানাবিধ অধর্ম্মের বিস্তার করিতে থাকে।

ফ্রান্সে সুরা নিষেধ।

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমরের ফলে একটী মহান উপকার সাধিত হইয়াছে—মদ্যের অপকারিতা জগতের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাসিয়ার সম্রাট স্বদেশে মদ্যের অপকারিতা সর্ব্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করিয়া এক আদেশে তাহাকে নিষিদ্ধ শ্রেণীভুক্ত করিলেন—তাঁহার জয় জয়কার হউক। এখন ফ্রান্সও রাসিয়ার পদানুসরণ করিয়া এ বিষয়ে আইন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। একটী ফরাসি লেখক বলেন—"যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশ সুরাতে ডুবিয়া না গেলে আমরা জর্ম্মনদিগকে শীঘ্রই পরাজয় করিতে পারিতাম।" তিনি আরও বলেন—"ফ্রান্সের আদর্শ, যাহা সমগ্র মানবের আদর্শ, তাহা স্থিরতর রাখিতে গেলে, ফরাসিজাতির শারীরিক ও নৈতিক অবনতির কারণ সুরাপ্রিয়তাকে সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে।" এখন সেখানে প্রস্তাব হইতেছে যে পরিচালিত (Mobilised) সৈন্য এবং আহত সৈন্যদিগকে মদ দেওয়া বন্ধ করিয়া এবিষয়ের কার্য্য এখনই আরম্ভ করিয়া দেওয়া হউক, এবং স্ত্রীলোক ও নাবালক বালকবালিকাদিগকে মদ্য বিক্রয় বেআইনী বলিয়া ঘোষিত করা হউক।

(Science Grounded Religion—August 1916.
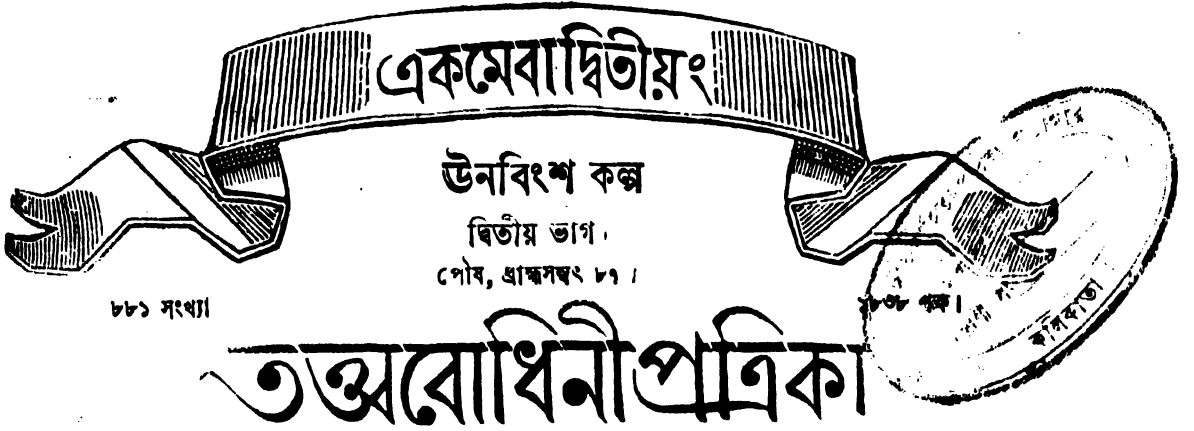
Tattwabodhini Patrika
Reg. No. C. 462.

একমেবাদ্বিতীয়ং
উনবিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৭।
৮৮১ সংখ্যা
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

বিজয় ঘোষণা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঈশ্বরের বিশ্বচরাচর মাঝে
সকলের কাজ নহেকো সমান—
জনে জনে ভিন্ন কাজের বিভাগ
দিয়াছেন রাখি দেব ভগবান।

ভাল যদি বাস তাঁরে, করে যাও
কাজ যাহা তিনি রেখেছেন স্থির
তোমারি লাগিয়া, হরষিত মনে—
ফলাফল তরে হয়োনা অস্থির।

উঠে পড় জেগে, থেকোনা ঘুমায়ে
আলস বালিশে—ডেকেছেন প্রভু
তাঁরি শুভ কাজে—যে যেমন পার,
করে যাও কাজ—পিছায়ো না কভু।

বলী হয়ে তাঁর অতুলন বলে
বিজয় ঘোষণা কর তাঁর নামে।
মরণে বিপদে করিওনা ভয়—
সবাই যে যাবে আনন্দেরি ধামে।

শুনি সে বারতা যে যেথায় আছে,
সবারি পরাণ উঠিবে মাতিয়া—
বৃদ্ধ নারী যুবা মলিন বা যারা
সবারি জীবন উঠিবে ভরিয়া।

নিরাশ হৃদয়ে জীর্ণ কুড়ে ঘরে
সারাদিন যারা ফেলে তপ্তশ্বাস,
শোনে নাকো বিশ্বে বাজিছে যে গান,
তারাও জাগিবে পেয়ে নব আশ।

সাধিলে তাঁহার যত শুভ কাজে
রাজরাজেশ্বর নিজ হাতে তবে
পরাবেন শিরে মুকুট উজ্জ্বল—
বিশ্ব তব পদে নতশির হবে।

মঙ্গল।

(শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সকলেই মঙ্গল মঙ্গল বলে—মঙ্গলের অর্থ কি? ঈশ্বর সর্ব্বাবস্থায় চৈতন্য স্বরূপ—জ্ঞানই তাঁহার রূপ। যখন সৃষ্টি ছিল না তখনও তিনি চৈতন্যরূপ ছিলেন, আবার যখন মহাকাশ সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ হইল তখনও তাঁহার চৈতন্যরূপের তিল মাত্র হ্রাস হয় নাই। তাহার চৈতন্যরূপ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মঙ্গলের বেলায় একথা খাটে না। মঙ্গল আপেক্ষিক শব্দ—সৃষ্টির অপেক্ষা রাখে। সৃষ্টি না থাকিলে মঙ্গল শব্দ তাঁহার প্রতি আরোপ করা যায় না। ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার মঙ্গল বিধান করিলেন, এইজন্য তিনি মঙ্গলময় বা মঙ্গলস্বরূপ। তাঁহার মঙ্গল বিধান বা মঙ্গল কার্য্যে

তিনি মঙ্গলস্বরূপ। সৃষ্টি না থাকিলে তাঁহার মঙ্গল কার্য্য থাকিত না, কাজে কাজেই মঙ্গলস্বরূপ এ কথাই আসিতে পারিত না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে তাঁহার মঙ্গলবিধান কি? তাহার অনন্ত মঙ্গলত্ব কোথায়? উপরেই বলিয়াছি যে সৃষ্টি না থাকিলে মঙ্গল এ কথাই আসিতে পারিত না; সেই জন্য এই অনন্ত মঙ্গলের কথা বুঝিবার পূর্ব্বে সৃষ্টির মূলে গিয়া দেখিতে হইবে। সৃষ্টির প্রারম্ভে কি ছিল? তিনি ত জাজ্বল্যমান পূর্ণ চৈতন্য-স্বরূপ, তবে এই সব অচেতনের সৃষ্টি কোথা হইতে আসে? তিনি ত পূর্ণপ্রকাশ, তবে এই অপ্রকাশ আসে কিরূপে? তিনি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, তবে এ অজ্ঞান জড়বস্তু ও সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট জীবজন্তু আসিল কি প্রকারে? সমস্ত আকাশ জড় পদার্থে আচ্ছন্ন হইল কিরূপে? এই রহস্যের আবরণ অপসারিত করিয়া ঋগ্বেদের অঘমর্ষণ ঋষি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততোরাত্রিরজায়ত" "প্রথমে ঋত ও সত্য অর্থাৎ অখণ্ড চৈতন্যরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন, তাঁহার তপস্যা প্রকাশ হইল; * তপস্যা হইতে রাত্রি বা মহাঅন্ধকার উৎপন্ন হইল।" পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্টির মানসে আপনাকে রাত্রি অর্থাৎ তম বা মহা-অন্ধকার দ্বারা আবৃত করিলেন। ভাবিয়া দেখ যে সে তমই বা কি ভীষণ! অনন্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য কি বিরাট তম আবশ্যক। মহর্ষি মনু সে অন্ধকারের পার না পাইয়া বলিতেছেন—"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্" সে ভীষণ অন্ধকারের ভাব কেহ কল্পনায় আনিতে পারে না—তাহা অপ্রজ্ঞাত ও লক্ষণবিহীন। এই তমই জড়ের উপাদান—জড়ের রূপ। † এই তমদ্বারা পরমেশ্বর সৃষ্টির ভিত্তি নির্ম্মাণ করিলেন এবং এই ভিত্তির উপরে ক্রমবিকাশের দ্বারা ক্রমে এই জীবজন্তু সমন্বিত বিশ্ব-অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই তমই বিশ্বচ্ছবির পৃষ্ঠভূমি (background) হইল, বলিতে পারা যায়।

কিন্তু এই তম বা অন্ধকার হইতে কি উদ্ধার নাই? আছে বৈ কি? তাঁহার মঙ্গল বিধান আমাদের উদ্ধারের জন্য, যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুকে আলোকে উন্নয়নের জন্য তিনি অনন্ত অন্ধকার হইতে চৈতন্যের অনন্ত আলোকে সকলকে লইয়া যাইতেছেন। বিশ্ব-অট্টালিকার ভিত্তি হইল তম—জড়তা, তাহার চূড়া হইল আলোক চৈতন্য। সৃষ্টির ভিত্তিরূপ অন্ধকার বা জড়তা হইতে সকলকে তিনি এক মহা-কর্ষণে তাঁহার স্বরূপ অনন্ত আলোক বা চৈতন্যের দিকে লইয়া যাইতেছেন। ইহাই তাঁহার মঙ্গলবিধান। সেই অনন্ত তম ভেদ করিয়া ক্রমাগতই চৈতন্যের আলোকের স্ফুরণ হইতেছে। অণুপরমাণু হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত, কীটানুকীট হইতে দেবাদিদেব পর্য্যন্ত সকলকেই সেই একটানে একগতিতে লইয়া যাইতেছেন—কেহই বাদ পড়িবার নহে। ইহাতেই অনন্ত জগৎ গতিশীল হইয়া চলিতেছে। অন্ধকার জড়তা হইতে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলকে চৈতন্যের আলোকাভিমুখে লইয়া যাইতেছেন, এইটীই তাঁহার অনন্ত মঙ্গলবিধান। সৃষ্টি প্রলয়, উত্থান পতন, জীবন মৃত্যু, সুখ দুঃখ এই সকলই সেই মঙ্গলবিধানে নিয়মিত। এই মঙ্গল বিধান সর্ব্বব্যাপী। সৃষ্টির তাবৎ পদার্থই চৈতন্যের পথে উন্নীত হইতেছে। তাঁহার মঙ্গল বিধান শুদ্ধ মনুষ্যে বদ্ধ নয়, সকল জীবজন্তুতে সকল পদার্থে অনন্ত কালে অনন্ত লোকে উহা সম্প্রসারিত। সৃষ্টির মানসে অনন্তস্বরূপ আপনাকে অন্ধকার দ্বারা আবৃত করিয়া আবার সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া অনন্ত দিকে আপনার আলোক চৈতন্যরূপকে প্রকাশ করিতেছেন। তাই তাঁহার সৃষ্টিতে আলোছায়ার খেলা নিত্য চলিতেছে—সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনি যদি তম দ্বারা আপনাকে আবৃত না করিতেন তাহা হইলে তিনি পূর্ণপ্রকাশ হইয়া নিজেই থাকিতেন, সৃষ্টি থাকিত না। অন্ধকারের মধ্যে আলো, অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞান এই অসম্পূর্ণতাতেই সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে। সম্পূর্ণ আলো বা সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে সৃষ্টি থাকিতে পারিত না। ঈশ্বর অন্ধকার বা অজ্ঞান দ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়া আছেন বলিয়াই সৃষ্ট জীবে কখনই জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নহে। সৃষ্ট জীব যতই কেন জ্ঞানবান হউক না, পূর্ণজ্ঞান হয় না—

---

* আমরা যাঁহাকে পরমেশ্বরের ইচ্ছা বলি, বৈদিক ঋষি তাহাকেই তপস্যা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপের ইচ্ছা অপেক্ষা তপস্যা বলাই সঙ্গত, কারণ ইচ্ছা অপেক্ষা জ্ঞানের সঙ্গে তপস্যার ঘনিষ্ঠতা অধিকতর।

† এই তমই বেদান্তের অবিদ্যা।

তাহার জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটিবার নহে। জীব মহাজ্ঞানী হইলেও অজ্ঞানতমসাবৃত।

এই পৃথিবীতে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব, কেননা মনুষ্য অন্যান্য জীব জন্তু অপেক্ষা চৈতন্যের পথে অধিক দূর অগ্রসর। মনুষ্য চৈতন্যপথের সেই উন্নত স্তরে আসিয়া উপনীত, যেখানে তাহার এমন একটী শক্তি লাভ হইয়াছে—যাহাকে ধীশক্তি বলা যায়—যাহাতে সে স্বেচ্ছায় জ্ঞান সহকারে চৈতন্য-পথের পথিক হইতে পারে। জড় বস্তুর ত কথাই নাই, নিম্ন স্তরের জীব জন্তুও পরমেশ্বরের বিধানে অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানে চৈতন্যের পথে চালিত হইতেছে। মনুষ্য চৈতন্য বা ধীশক্তির বলে বুঝিতে সমর্থ, কোন্‌টী চৈতন্যপথের অনুকূল এবং কোন্‌টী প্রতিকূল। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া চৈতন্যের পথকেই আলিঙ্গন করিয়াছেন। যাহাদের মধ্যে চৈতন্যের স্ফুরণ অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহারা তাহা পারে না; তাহারা জড়তার অন্ধকারে অনেক পরিমানে মগ্ন হইয়া থাকিতে চাহে। চৈতন্যপথের পথিক বলিয়া মহাপুরুষদিগের আচার ব্যবহার, তাঁহাদিগের উপদেশ মানব সমাজে শিরোধার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে গণ্য। তাই লোকে বলে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'। চৈতন্যের পথ শ্রেয়ের বা মঙ্গলের পথ এবং জড়তার পথ প্রেয়ের বা মঙ্গলের বিরোধী পথ। জড় বস্তু বা বিষয়ের আকর্ষণ, যাহা আমাদিগকে নিম্নে জড়তার অন্ধকারে লইয়া যায়, তাহা প্রেয় বা আপাতরম্য হইতে পারে কিন্তু তাহা মঙ্গলজনক নহে; আর চৈতন্যের আকর্ষণ যাহা আমাদিগকে ঊর্দ্ধে আলোকে লইয়া যায় তাহাই শ্রেয় বা মঙ্গলজনক। দান ধ্যান ব্রত, পুণ্যকর্ম্ম স্বার্থত্যাগ এই সকল আমাদিগকে জড়ের আকর্ষণ হইতে টানিয়া চৈতন্যের পথে লইয়া যায়, তাই এই সকল ধর্ম্মকার্য্য—শ্রেয়স্কর।

মনুষ্য ধীশক্তিবলে কোন্‌টী চৈতন্যের অনুকূল ও কোন্‌টী প্রতিকূল পথ তাহা চিনিতে পারিলেও অনেক সময়ে জড়ের আকর্ষণ বশতঃ স্বেচ্ছায় তাহার প্রতিকূলে যাইবারও চেষ্টা করে, কিন্তু তখন তাহার ক্ষুদ্র শক্তি বিফল হইয়া যায়। সামান্য বায়ুর বলে নদীতে যে লহরী উঠে সে কি নদীর স্রোত ফিরাইতে পারে? সেইরূপ বিষয়াসক্ত লোকে জড়ের আকর্ষণ বশতঃ চৈতন্যের বিরুদ্ধে তরঙ্গ তুলিলেও তাহাকেও মহামঙ্গল স্রোতে যাইতেই হইবে—সে স্রোতকে ঠেলিতে পারে না। এই মঙ্গলের স্রোতে সকলকেই ভাসিতে হইতেছে—কেহই ছাড় পায় নাই। যতই কেন উজানে যাওনা, যতই কেন বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা কর না, তাহা ক্ষণস্থায়ী—ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে চৈতন্যের পথে যাইতে হইবেই হইবে। যাহা চৈতন্যের পথ তাহাই মঙ্গলের পথ।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে সকলেই মঙ্গলে পরিণত হইবেই হইবে। তবে তুমি আমি ক্ষুদ্র প্রাণী বিরুদ্ধে যাইতে—অমঙ্গলপথে যাইতে উদ্যত হই কেন? মানুষ নিজকৃত কর্ম্মের জন্য দায়ী। এই দায়িত্ব সে চৈতন্য বা ধীশক্তিবলে লাভ করিয়াছে। নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারেই মানুষ দণ্ড পুরস্কারের ভাগী হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু মানুষ যদি মঙ্গলের বিরুদ্ধে যায়, অশুভ কর্ম্ম করে, তাহাও ঈশ্বরের রাজ্যে চিরকাল অশুভ হইয়া থাকিতে পারে না—তাহাও মঙ্গলে পরিণত হয়। কিন্তু তজ্জন্য দণ্ড পাইবে, যে অশুভ কর্ম্মকারী। জীবের দুঃখকষ্টভোগ ও মৃত্যুযন্ত্রণা এই গুলিই মঙ্গলের পথে প্রধান প্রহরী স্বরূপ। এই প্রহরীর দণ্ডভয়েই লোকে বিষয়াকর্ষণ হইতে চৈতন্যের, মঙ্গলের পথে চলিতে উদ্যত হয়। দু একটী ঘটনা উদাহরণ স্বরূপে দেখাইয়া আমাদের কথা বিশদরূপে বুঝান যাইতেছে। রামায়ণের আখ্যানে আমরা দেখিতে পাই রাজা দশরথ মৃগয়ার ব্যসনে এতটা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে শব্দবেধী বাণ দ্বারা পশুহিংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার সুখ বা স্বার্থের জন্য যে হিংসা তাহা চৈতন্যের বিরোধী পথ। দশরথের এই মৃগয়াও সুখের জন্য—ব্যসন মাত্র। শব্দবেধী বাণ কি? দূর হইতে প্রাণীকে না দেখিয়াও পদশব্দাদি শ্রবণে তাহার প্রতি বাণত্যাগ। যে শব্দ শ্রবণে দশরথ বাণ নিক্ষেপ করিলেন তাহা পশুকৃত নয়—ঋষির কমণ্ডলু জলপূর্ণ করিবার শব্দ। তিনি এই ব্যসনের ফলে কি করিলেন?—না, ঋষিহত্যারূপ মহাপাপ করিয়া বসিলেন। দশরথ কর্ত্তৃক এক মহা অকল্যাণকর কার্য্য সাধিত হইল। ইহার জন্য কে দায়ী—

ঈশ্বর না দশরথ? মনুষ্য ধী-শক্তির অধিকারী হওয়ায় তৎকৃত কর্ম্মের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করিতে পারা যায় না। সে যদি মঙ্গলের প্রতিকূলে বা অনুকূলে যায় তবে সে তাহা জড়ের বা অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় অতটা অজ্ঞান সহকারে যায় না। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের স্বাধীন-দায়িত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে। এইজন্য খুনী খুন করিলে তাহার জন্য সেই দায়ী। রাজা দশরথ নিজকৃত কর্ম্মের জন্য দায়ী বলিয়াই তিনি যে অকল্যাণ কার্য্য করিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকেই শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা পাইতে হইল। ঋষিশাপে পুত্রের বনবাস সহ্য করিতে না পারিয়া দশরথ মহা-কষ্টভোগ করিলেন—ইহাতে দশরথের কুকর্ম্মের দণ্ড হইল। এই দণ্ডলাভের পর তিনি চৈতন্যের পথে মঙ্গলের পথে উন্নীত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দশরথের দণ্ডলাভে তৎকৃত কার্য্যেরও অকল্যাণ ভাব পর্য্যবসিত হইয়া পরিশেষে ঈশ্বরের বিধানে এক মহা কল্যাণের মূল হইল। দশরথপুত্র রামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্যে বনবাসে কত যে মঙ্গল সাধিত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। রাবণের ন্যায় মহাদর্পী রাক্ষসের নিধন হইল। রাক্ষসদিগের চৈতন্যোদয় হইল। সমস্ত দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানবান সভ্য মানবের প্রবেশ হইল। এতদ্ব্যতীত রামের কাহিনী চিরস্থায়ী করিবার জন্য বাল্মীকির রামায়ণ জগতের কত না কল্যাণ সাধন করিল। এক রামায়ণ কত পাপী লোককে পাপ হইতে পুণ্যপথে চৈতন্যের পথে লইয়া যাইতেছে। রামের আদর্শ কত লোককে অসৎ হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইতেছে।

ঈশ্বরের রাজ্যে অমঙ্গল থাকিতেই পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমস্ত অমঙ্গলেরই মঙ্গলে পরিণতি অনিবার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া তুমিও যে যথেচ্ছাচারিতা সহকারে চৈতন্যের বিরুদ্ধে অমঙ্গল-পথে যাইতে পার, তাহা নহে—তাহার দণ্ড তোমাকে পাইতেই হইবে। কবিরাজীতে যেমন বিষ বা উপ-বিষকে নানা শোধক দ্রব্য সংযোগে মানবের ব্যবহারে উপকারে আনা হয়, ইহাও সেইরূপ। তুমি সহস্র অমঙ্গল কার্য্য কর না কেন, ঈশ্বর তাঁহার শোধক পদার্থ মঙ্গল নিয়মের দ্বারা তাহাকে মঙ্গলে পরিণত করিবেনই। কিন্তু তুমি যে অমঙ্গল করিলে তজ্জন্য তুমিও দণ্ডিত না হইয়া যাইবে না। ইহুদীরা ব্রহ্ম-পরায়ণ খৃষ্টকে হত্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত হইয়া যে অমঙ্গল কার্য্য করিল তাহার জন্য ইহুদীরা গৃহছাড়া হইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সেই খৃষ্টহত্যারূপ অমঙ্গল বিষময় কার্য্য ঈশ্বরের নিয়মে শোধিত হইয়া এক মহামঙ্গলে মহামৃতে পরিণত হইল। খৃষ্টহত্যার ফলে কত লোক যে খৃষ্টনামে জাগ্রত হইয়া উঠিল তাহার ইয়ত্তা নাই। খৃষ্টের প্রাণবিসর্জ্জন দেখিয়া শত শত লোক ধর্ম্মের নামে চৈতন্যের পথে যাইবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইল। এই-রূপে অমঙ্গল মহামঙ্গলে পরিণত হইল। তাই বলি-তেছি অমঙ্গল কার্য্যের মঙ্গলে পরিণতি ঈশ্বরের বিধানে হইবে বলিয়া মানুষ যে অমঙ্গল করিবে তাহা নহে। মানুষ যতই মঙ্গলের প্রসার করিয়া যাইবে ততই মঙ্গল।

মঙ্গল তোমার নাম
মঙ্গল তোমার ধাম
মঙ্গল তোমার কার্য্য তুমি মঙ্গলনিধান।

প্রসাদী-কথা।

(শ্রীঅতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

'কবিরঞ্জন রঞ্জিল পদ হৃদয়-রক্ত দানে।'

বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস নাই বলিয়া বিদেশীয় বহু অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকের অভিমত এবং সেই সঙ্গে কোন কোন ভারতবাসীও যোগদান করেন। (সূচনা।) রাজ্যসংস্থাপন, রাষ্ট্র-বিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহ এবং প্রতীচ্যের অনুকরণে মহা-পুরুষদের দৈনন্দিন লিপির বর্ণনার সমাবেশ বাঙ্গালার ইতিহাসে স্থান না পাইলেও এদেশের আদি গ্রন্থ বেদ-বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত ও মনুসংহিতা প্রভৃতি পুণ্যগ্রন্থের ভিতর যে লোকশিক্ষার জন্য সমাজ, সাহিত্য, নিয়ম ও ক্রিয়া-কাণ্ডের ইতিহাস জাজ্জ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ এই প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া থাকেন। এই অনুসন্ধান হইতেই আমাদের দেশে এখন বহু

সজ্জনের যত্নে প্রকৃত উপায়ে ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ বাঙ্গলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই শুভদিনে পর-লোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত, আই সি, এস্ সি আই ই, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই, ৺ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম এ, সি এস এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন প্রভৃতি মনীষিগণের সমবেত চেষ্টায় বিবিধ উপায়ে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতিসাধন জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় হইতে চারিদিকে প্রাচীন পুঁথি, কুলজী গ্রন্থ, প্রাচীন গীতি প্রভৃতির উদ্ধার ও সংকলনের কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। এইভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় যে বিপুল শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রভাবে বঙ্গসাহিত্য অপরাপর ভারতীয় ও বিদেশীয় সাহিত্যের সম্মুখে প্রাচীনতার গৌরব করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। এই পুণ্যকর্ম্মে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহারাই দেশ ও জাতির মুখোজ্জ্বল-কারী এবং আপামর জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা পাইবার উপযুক্ত পাত্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় দুই একটী অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির দৃষ্টি প্রাচীন ইতিহাস সংরক্ষণের দিকে পতিত হইয়াছিল। সাধকশিরোমণি শ্রীরামপ্রসা-দের শ্যামাবিষয়ক পদাবলী ও তাঁহার জীবনীর উপা-দানসংগ্রহ এই চেষ্টার অমৃতময় ফল। বাঙ্গালার গুপ্তকবি সর্ব্বপ্রথম রামপ্রসাদের জীবনী ও পদা-বলী সংগ্রহ করিয়া ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক 'প্রভাকরে' প্রকাশ করেন। তৎপরে পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। তিনি অনেক দিন ধরিয়া লোকপ্রশংসার অন্তরালে একাকী নীরবে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া প্রসা-দের ইতিহাস সংগ্রহে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালাদেশের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। তিনি স্বয়ং রামপ্রসাদের জন্মস্থান হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্টে গমন করিয়া প্রত্যেক বৃদ্ধের নিকট প্রসাদের জীবনী-কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রসাদের বংশধরদের নিকট হইতে অনেক উপাদান ও বংশাবলীর পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাহাই তিনি "প্রসাদ-প্রসঙ্গে" আলোচনা করিয়া প্রসাদ-জীবনীর একটা নূতন দিক অন্ধকার হইতে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার কেন্দ্রভূমি হালিসহরে গমন করিয়া এইভাবে মৌলিক অনুসন্ধান করা বড় সহজ ছিল না। চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত পদাবলীর মধুর তানে মুগ্ধ হইয়া দয়াল ঘোষের দৃষ্টি প্রসাদ-জীবনী-সংগ্রহে আকৃষ্ট হইয়া-ছিল; এই আদর্শ অনুসরণের ফলে ক্রমে দেশের বহু লুপ্তপ্রায় রত্ন আবিষ্কৃত ও লোক-চক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে।

সাধক রামপ্রসাদ বাঙ্গালীর গৌরব। মাতৃ-ভাবে শক্তি-সাধন-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালায় সাধক শ্রীরামপ্রসাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি শিশুর ন্যায় অভিমানপূর্ণ, ব্যাকুলতাময় ক্রন্দনের সাহায্যে 'মা-মা' বলিতে বলিতে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর উপা-সনায় তন্ময় হইতেন।

প্রসাদের উচ্চ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় অমৃতোপম পারমার্থিক পদাবলী * শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধনির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র—বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত—প্রত্যেকের হৃদয়ে শুদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ মহিমময় ধর্ম্মভাবের সন্ধান দিয়া মাতৃনাম সাধনের এক সুন্দর সরল পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছে। হিমাচলের অক্ষয় সৌন্দর্য্যভাণ্ডারের মধ্যে যেমন পতিতপাবনী জাহ্নবীর আবেগময়ী সলিল-রেখা, সাধকের ধ্যান-যোগের প্রবাহ মধ্যে সেইরূপ ভক্তিরসমিশ্রিত সঙ্গীতধারা। উভয়ই কোমলতা ও স্নিগ্ধতায় সন্তাপহারিণী, উভয়ই অনাবিলভাবে হৃদয়ে আনন্দদায়িনী। একটি সুশীতল সলিল-ধারায় পুণ্যভূমি প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, অপরটি শুষ্ক মানব-হৃদয় ভক্তিরসে ডুবাইয়া, জীব-জগৎকে ধর্ম্মের দিক দিয়া সরস করিয়া তুলিতেছে। হিন্দী ভাষায় তুলসীদাসের, বাঙ্গালায় শ্রীরামপ্রসাদের, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তুকারামের 'অভঙ্গ' পদাবলী

---

* হালিসহর খাসবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি ৺রামধন গাঙ্গুলী প্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি সাধকের পদাবলী লিখিয়া রাখিতেন। 'দিব দিব' বলিয়া ইনি মূল খাতাটা দিয়া যাইতে পারেন নাই, পরে ইহার পৌত্র-দের নিকট বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঐ অমূল্য রত্ন পাওয়া যায় নাই। এইভাবে যত্নাভাবে বিশেষত ঔদাসীন্যে কত রত্ন বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডার হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

ভাবের গভীরতায় ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে আজ লক্ষ লক্ষ নরনারীর কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে। হিন্দুস্থানে তুলসীদাসের দোঁহা এবং বাঙ্গালায় প্রসাদের পদাবলী না শুনিয়াছেন, বা না জানেন, এমন ব্যক্তি বোধ হয় অল্পই আছেন। বাঙ্গালার রাজপথে, নদীবক্ষে, নগরে, পল্লীতে, মাঠে ঘাটে এমন স্থান নাই, যেখানে সাধক প্রসাদের পদাবলী শ্রুত না হয়। ইহা বাঙ্গালীর খাঁটি নিজস্ব সম্পত্তি। ভিখারী হইতে মহারাজাধিরাজ পর্য্যন্ত ইহা সাদরে গান ও শ্রবণ করেন। এই সাধকশ্রেষ্ঠ প্রসাদের মাতৃভাবের প্রতি ভক্তি ও নির্ভরশীলতা আমরা নিজ নিজ জীবনে যে পরিমাণে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিব, ততই আমাদের মঙ্গল। তাঁহার ভক্তিপ্রবণ হৃদয় হইতে সমুত্থিত পদাবলী ভাগীরথীর সলিলের ন্যায় স্নিগ্ধ, পবিত্র ও তৃপ্তিকর। বাঙ্গালার কত তাপ-ক্লান্ত পাঠক, কত শুষ্ককণ্ঠ নরনারী আজও তাঁহার সেই ভক্তিরসপূর্ণ অমৃতনিস্যন্দিনী পদাবলীতে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। সাধক প্রসাদ কেবল বাঙ্গালীর নয়, সমগ্র হিন্দু জাতির গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব পরিস্ফুট। সাধক প্রসাদের চরিত্র অতীব বিস্ময়কর ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ ও ভক্তির গভীরতা ভাবিতে গেলে মোহিত হইতে হয়। সেই পুণ্য-শ্লোক সাধকের কথাই আজ আমি তাঁহারই কৃপায় লিখিতে বসিয়াছি। বহুদিন হইতে প্রসাদী-কথা লিখিবার বাসনা হৃদয়ে ছিল, কিন্তু কি ভাবে যে উহা আরম্ভ করিব এবং কোথায়ই বা উপাদান পাইব, এই ভাবনায় অনেক কাল কাটিয়া গেল। একদিন বিজয়ার ভাসান দেখিয়া নৌকাযোগে গৃহে ফিরিবার সময় আমার পূজ্যপাদ খুল্লতাত শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধুর কণ্ঠে

> 'মা আমায় ঘুরাবি কত ?
> কলুর চোকঢাকা বলদের মত।
> ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
> পাক দিতেছ অবিরত ॥'

এই পদাবলীটি শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। সেই দিন হইতে এই ভক্তশ্রেষ্ঠের পুণ্য কথা ও তাঁহার গালভরা মাতৃনামের তত্ত্ব জানিবার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। যদিও সাধক কবির প্রাণে প্রাণে অনুভূত দুই একটি ভাব সঙ্গীত-ধারার ভিতর দিয়া আমার কৈশোর জীবনে কখনও কখনও ক্রিয়া করিতেছিল, কিন্তু তখনও আমি নানা কারণে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। শিলং প্রবাসকালে 'সর্ব্বানন্দ' লিখিবার সময় 'রামপ্রসাদ' লিখিবার সংকল্প করি। আমি তখন প্রসাদ-জীবনের মূল ঘটনাগুলির একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম। প্রসাদ-সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধান এই পর্য্যন্তই শেষ হইয়াছিল। তারপর রাঁচি আসিয়া হঠাৎ একদিন আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট জানিতে পারিলাম 'প্রসাদের একজন বংশধর রাজসাহী কমিশনারের পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট ছিলেন, সম্প্রতি তিনি এই নূতন প্রদেশের কোথাও আছেন। তাঁহার নাম মানসরঞ্জন বলিয়া মনে হয়।' এই সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি পুনরায় প্রসাদী কথার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। মনে হইল যখন প্রসাদের বংশধর এখনও জীবিত, তখন নিশ্চয়ই আমি প্রসাদ-জীবনীর উপাদান-সংগ্রহে সফলকাম হইব। এইভাবে আমি প্রসাদী-কথার অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলাম। প্রথমে খসড়াটা সম্পূর্ণ করিয়া মনে হইল সাধকের বাস্তুভিটা ও পঞ্চমুণ্ডী আসন নিজ চক্ষে দেখিতে হইবে। তখন আমি আমার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের উপদেশমত বিগত ১৩২০ সালের ১০ই পৌষ বৃহস্পতিবার রাঁচি হইতে হালিসহর রওনা হই। কুমারহট্ট বাঙ্গালীর পুণ্যতীর্থ। এই পুণ্যতীর্থের শেষ চিহ্নের ফটো তুলিবার জন্য

হালিসহরে।

স্থানীয় পূর্ত্তবিভাগের ড্রাফটস্‌ম্যান বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ কাননগুইকে সঙ্গে লইয়াছিলাম। ইঁহার সাহায্য ভিন্ন আমি সেই পুণ্যভূমির ছায়াচিত্র তুলিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ, এজন্য আমি ত্রৈলোক্য বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ।

পরদিন (শুক্রবার, ১১ই পৌষ) শিয়ালদহে ১০-৪৫ মিঃ গাড়ীতে চড়িয়া ১২-১৫ মিঃ হালিসহর ষ্টেশনে অবতরণ করি। হালিসহর যাব একথা শুনিয়া অনেকেই আমাকে নানারূপ বিভীষিকা দেখাইয়াছিলেন। কেহ কেহ যাত্রার পূর্ব্বে কুইনিন

সেবন করিতেও উপদেশ দিয়াছিলেন। হালিসহর শ্মশান—মহাশ্মশান—বাংলার এই শ্মশানে সাধক শ্রীরামপ্রসাদ তান্ত্রিক সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ সেই শ্মশানের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া আমাকে প্রথমে কতই না বিভীষিকা দেখিতে হইয়াছিল। গাড়ীতে হালিসহরের একটি লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। ইনি কাঁচরাপাড়া 'লোকো' আফিসে কাজ করেন। ইনিই আমার পথপ্রদর্শক। গাড়ী হইতে নামিয়া ক্যামেরাটী হাতে করিয়া আমরা হালিসহরের দিকে অগ্রসর হই। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাটী গ্রামের ভিতর দিয়া গঙ্গার দিকে চলিয়াছে, চতুর্দ্দিকে কেমন একটা নীরবতা, এই নীরবতার ভিতর খেজুর গাছের ঝোপে বসিয়া দুই একটি পাখী গান গাহিতেছিল। প্রায় কুড়ি মিনিট পথ হাঁটিয়া আসিয়া রাস্তার ডান দিকে শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গোলাবাড়ী দেখিতে পাইলাম। সম্মুখে বড় একটি পাকা ধানের গোলা, বাড়ীর সর্ব্বত্রই বঙ্গলক্ষ্মীর সুষমামণ্ডিত অপূর্ব্বশ্রী উথলিয়া পড়িতেছে। একটি গেরুয়া বসনধারী খোট্টাকে আহারে ব্যস্ত দেখিলাম। বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বাবুজী বাড়ী হ্যায় ?' ভোজনে ব্যস্ত সন্ন্যাসী (?) ঠাকুর একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিলেন,—'হ্যাম্ নেই জান্তা হ্যায়, ভিতরমে পুছিয়ে।' আমি গোলাঘরের বারান্দায় প্রবেশ করিয়া দেখি—কে জানি একজন একখানি কাঠের মাচার উপর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। একটি ভৃত্যকে ভূষণবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেই জানিতে পারিলাম বাবু বাড়ী আছেন এবং ঐ মাচার উপর শুইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পর গাঙ্গুলী মহাশয়কে ঘুম হইতে তুলিলাম। তাঁহার ঋষিতুল্য সৌম্য মূর্ত্তিখানি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। তাঁহার মূর্ত্তিতে আমি প্রাচীনযুগের মুনিঋষিদের চিত্র অঙ্কিত দেখিলাম। তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'অতুলবাবু, এসেছেন,—আমি আপনার জন্যই এখানে অপেক্ষা করিতেছি। আপনি আসিবেন বলিয়াই আমি তীর্থভ্রমণে বাহির হই নাই।' বৃদ্ধের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপাদি করিয়া আমরা প্রসাদ-গৃহ দর্শনে চলিলাম। গোলাবাড়ী হইতে বাহির হইয়া সম্মুখেই চাঁদনিঘাটযুক্ত একটি পুষ্করিণী, ডানদিকে দেখিতে পাইলাম। বিখ্যাত সিভিল সার্জ্জন কর্ণেল ৺কালীপদ গুপ্ত তাঁহার মায়ের অনুমতিক্রমে ইহা খনন করাইয়াছিলেন। সোজা রাস্তায় অনেক বাগান ও পরিত্যক্ত ভিটার উপর দিয়া আমরা ১-৭ মিঃ সময় প্রসাদ-গৃহে আসিয়া পৌঁছাই। পুণ্যভূমির চতুর্দ্দিকে কেবল জঙ্গল, আশে পাশে দুই একখানা বাড়ী। রাস্তার উপর দিয়া দুই একটি 'প্লীহা পেটে কঙ্কাল' মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। অদূরে বন হইতে শিবাদলের ডাক শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, 'এ কিছু আশ্চর্য্য নয়, এখানে এই জঙ্গলের ভিতর নিয়তই শৃগালের ডাক শুনিতে পাওয়া যায়।' আমরা তিনজন প্রসাদ-গৃহের চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। এক বিঘা জমির উপর প্রসাদ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে হালিসহরে সাবর্ণ চৌধুরীরা প্রসাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এই জমি দান করিয়াছিলেন। বাস্তুভিটার দক্ষিণদিকস্থিত প্রাঙ্গনের পূর্ব্বদিকে পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডী আসন * দেখিলাম। এই আসনের উপর বসিয়া সাধক সাধনা করিতেন। এখন এই আসনখানি ইট দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চবটীর অশ্বত্থ ও বট এই দুইটি মাত্র গাছ এখনও বিদ্যমান আছে। বটটির মূল-কাণ্ড খুঁজিয়া পাইলাম না। অশ্বত্থটি বহুপ্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। ইহার উপর একটি গাবগাছ অর্দ্ধগ্রস্ত অবস্থায় আছে। জনশ্রুতি এই যে, এই গাব গাছেই সাধকের যোগবলে পদ্মফুল ফুটিয়াছিল। উপরে প্রসাদ-গৃহের ভগ্নাবশেষ। গৃহের সম্মুখেই চণ্ডীমণ্ডপের জমি দেখিতে পাইলাম। এই জমির উপর একটি খেজুর ও কদবেল বৃক্ষ আছে। ভদ্রাসনের চারিদিকটা এখন বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভূষণবাবু প্রভৃতির উদ্যোগে প্রসাদের শয়নগৃহ ও রান্নাগৃহের উপর দুইখানি ক্ষুদ্র পাকা কোঠা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। শয়নগৃহে (পূর্ব্বদিকের কোঠায়) বাৎসরিক শ্যামাপূজা হয়। রান্নাঘরের (পশ্চিমদিকের কুঠরীতে) লোকজন বসিয়া পূজা দর্শন করেন। গৃহপ্রাঙ্গনের একটি নক্সা

* ৺দয়ালবাবু লিখিয়াছেন 'শ্রীরামপ্রসাদের আসনতলে সিন্দুর-মণ্ডিত পাঁচটী নরমুণ্ড প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।'

আঁকিয়া লইলাম। এদিকে বন্ধুবর ক্যামেরাটি ঠিক করিয়া লইলেন। প্রথমে তিনি দক্ষিণদিক হইতে প্রসাদ-গৃহের ফটো তুলিলেন। তারপর তিনি পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডী আসনের ফটো তুলিতে অগ্রসর হইলেন। তখন আমার হৃদয়মধ্যে কেমন একটা শঙ্কার ভাব জাগিয়া উঠিল। পদাবলীর ভিতর সাধকের যে চিত্র দেখিয়াছি, সেই পুণ্য চিত্র প্রাণের ভিতর জপ করিতে লাগিলাম। সাধকের বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া ভিন্ন এ সব কাজে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। প্রসাদকে ভাবিতে ভাবিতে ক্যামেরার মুখটি খোলা হইল। দুইবার দুইখানি প্লেট 'একস্‌পোজ' দিয়া আমরা ছায়াচিত্রের কাজটা সারিয়া লইলাম। বেলা ৩টার সময় গাঙ্গুলী মহাশয় আমাদিগকে শিবের গলির ঘাটের দিকে লইয়া চলিলেন। এই রাস্তা দিয়া শ্রীরামপ্রসাদ গঙ্গাস্নানে যাইতেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখি কত অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, একটি বাড়ীতে দেখি লোকজন নাই, বাহিরে একটি তালা দিয়া বন্ধ। শুনিলাম বাড়ীর গৃহস্থ পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী করেন। অনেক গলি ও রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা দুইটি মঠের নিকট আসিলাম। এখানে শিব প্রতিষ্ঠিত। চারিদিকে কোথায়ও লোকজনের বড় সাড়া পাইলাম না। সম্মুখে সদর রাস্তা অতিক্রম করিতেই ডানদিকে গঙ্গাতীরে মুমূর্ষু নিকেতনের ভগ্নাবশেষ। এখানে গঙ্গার তীর অত্যন্ত খাড়া ও উচ্চ। আমরা ঘাট দিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম। এখান হইতে গঙ্গাদৃশ্য বড়ই মনোরম দেখায়। অপর পারে হুগলী জেলার বাঁশবাড়ী। এই ঘাটে প্রসাদের বিসর্জ্জন হইয়াছিল। তখন সাধকের কত স্মৃতি আসিয়া প্রাণের ভিতর সাড়া দিল। আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া মনে মনে সাধককে ডাকিলাম। আমার বন্ধুবর এই সময়ে ঘাটের একখানি ফটো লইলেন। নিকটে একটি চিতা জ্বলিতেছিল। আজ প্রসাদের পুণ্যতীর্থে শিবার ডাক শুনিয়া এবং চিতা ও নরকঙ্কাল দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন একটা উদাস ভাব আসিল। গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট প্রসাদ-স্মৃতি সংরক্ষণের ইতিহাস শুনিলাম। তিনি আমাকে প্রসাদের কাশীগমন সম্বন্ধে বলিলেন,—'প্রসাদ কাশী যান নাই, তিনি ত্রিবেণী হইতেই দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।' এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তিনি যে কাশী গিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ তাঁহার পদাবলীর ভিতরই পাওয়া যায়। তবে ইহা ঠিক যে তিনি প্রথম যাত্রায় ত্রিবেণী হইতে স্বপ্নাদেশে গৃহে ফিরিয়া আসেন।

ঘাট হইতে আমরা পুনরায় প্রসাদ-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি এবং তথা হইতে সোজা রাস্তা ধরিয়া ষ্টেসনে চলিয়া আসি।

ভূষণ বাবুর নিকট স্মৃতি-সংরক্ষণের ইতিহাস শুনি। সেই ইতিহাস এই। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে

প্রসাদ-স্মৃতি।

খাসবাটীর ৺দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় হালিসহরের উচ্চ বিদ্যালয়গৃহে শ্রীরামপ্রসাদ ও ঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। হালিসহরের উত্তরে 'মুখুয্যে' পাড়ায় আজিও মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর ভদ্রাসনের শেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দীননাথ বাবু সোদপুরে নথ-বেঙ্গল-রেলওয়ের চিফ্‌ক্লার্ক ছিলেন। ইনি, প্রফেসর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম, এ, কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত, হাইকোর্টের উকিল শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি হালিসহরের মনীষিগণের উদ্যোগে ও যত্নে 'Goodwill Fraternity society'র প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সমিতির সেক্রেটারী। 'রামপ্রসাদ স্মৃতিভাণ্ডার' এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত। হুগলী নিবাসী ৺শিবচন্দ্র দে এম, এ, বি, এল (যখন তিনি হালিসহর বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন) প্রসাদ-স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রসাদের ভদ্রাসন ও পঞ্চমুণ্ডী আসন-সংলগ্ন সমগ্র ভূভাগ জঙ্গলাকীর্ণ এবং শৃগাল ও সর্পের আবাসভূমি ছিল। একদল উদ্যোগী

বার্ষিক পূজা।

যুবক এই পুণ্যভূমিকে জঙ্গলমুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই সৎকার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। জঙ্গল কাটিবার জন্য মুটেমজুর সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব হইয়াছিল। সাধকের বিরাগভাজন হইতে হইবে মনে করিয়া মজুরেরা জঙ্গল কাটিতে অস্বীকার করে। তখন ভূষণ বাবু, হরিদাস বাবু, জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি

উদ্যোগী যুবকগণকে সঙ্গে করিয়া নিজেরাই জঙ্গল পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এই যুবকদল কার্ত্তিক মাসে শ্যামাপূজা ও প্রসাদী-মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। পূজার প্রথম বৎসরে ইঁহারা একখানি নারিকেলপাতার ঘরে শ্যামাপূজা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ইচ্ছা ছিল, রাত্রির প্রথমভাগে এই পরিত্যক্ত ভদ্রাসনে শ্যামা-পূজা শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যান। কিন্তু দৈব-ক্রমে ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছিল, সেই কথাই এখানে বলিতেছি। সন্ধ্যার সময় যুবকেরা প্রতিমা লইয়া আসিতেই ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। অমা-বস্যার রাত্রি, চারিদিকে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টিপাত, প্রবল ঝড়, এই সব কারণে নারিকেলপাতার ঘরে প্রতিমা স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তাই ইহাঁরা পূর্ব্বদিকে বাগ্দী-দের বহির্ব্বাটীতে প্রতিমাখানি কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া দেন। রাত্রি ১১টার সময় বৃষ্টি থামিল, আকাশের মেঘ কোথায় চলিয়া গেল। নিশাতে শ্রীযুক্ত হরি ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথম কালীপূজা করেন। হালিসহরের অনেক পুরোহিতই ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া পূজা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে হরি ভট্টাচার্য্য মহাশয় নির্ভীক পুরোহিতের উপযুক্ত মনের বল দেখাইয়া-ছিলেন। পরদিন গ্রামের বৃদ্ধেরা আকস্মিক ঝড় বৃষ্টির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'তোমরাত মান্‌বে না, প্রসাদ বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি রাত দুপুরে মায়ের পূজা কর্‌তেন। তোমরা সাঁঝের বেলা তাঁর ভদ্রাসনে শ্যামা মায়ের পূজা করলে চল্‌বে কেন? তাই মা তোমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়ে দিলেন।' সেই অবধি আজিও শেষ রাত্রে বৎসরে একবার কালীপূজা হইয়া থাকে। এ পূজায় ছাগবলি নাই, কেবল ইক্ষু ও কুমড়া বলি দেওয়া হয়। এই পূজা উপলক্ষ্য করিয়া প্রতি বৎসর 'প্রসাদ মেলা' জমিয়া থাকে। তবে সাধা-রণত কার্ত্তিক মাসে হালিসহরে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রকোপ হয় বলিয়া মেলাটি ভাল করিয়া জমিতে পারে না।

ডেকে লও।

(শ্রীহিরণ্ময়ী চৌধুরাণী)

মোহের স্বপন, কাটিল যখন
নয়ন মেলিয়া চাই,
মাধুরী তোমার পুন দেখিবার
পুলক আবেগে ধাই ;
কোথা কোন্ দেশে আছ কোন্ বেশে,
কোথায় খুঁজিব তোমা ?
তুমি বলে দাও যাতনা ঘুচাও
বারেক ডাকিয়ে আমা'।
লহ তব পাশে হের অই আসে
গগনে নীরদমালা,—
আজিকে একাকী লহ মোরে ডাকি
ঘুচাও হৃদয় জ্বালা।
পাঠায়েছ মোরে, সহিবার তরে,
কেবলি যাতনা দুখ ;
কিছু না কহিতে পারি প্রকাশিয়া,
হায়রে হয়েছি মূক ;
হে দয়াল! মোরে লহ ত্বরা করে,
তোমার চরণ তলে,
চরণে তোমার, ঢালি দুঃখভার,
সকল যাইব ভুলে ॥

বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি।

ওঁ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তুমি যে সুখকর, কল্যাণকর, সুখকল্যাণের আকর কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

আমরা গত পৌষ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কৃষিশিক্ষার সমর্থন উপলক্ষে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—"বর্ত্তমান মহাসমর যদি আরও কিছু-কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্টকে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক অধিক পরি-মাণে ভারতবাসীদিগের দ্বারা সেনাদল সংগঠনে মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। এই সেনাদল সংগঠনে বঙ্গবাসীদিগকে কিছুতেই একেবারে বাদ দিতে পারা যাইবে না।" আমাদের এই ভবিষ্য-দ্বাণী যে এত শীঘ্র সফল হইতে চলিবে, এত শীঘ্র

গভর্ণমেণ্ট যে বাঙ্গালীকে সৈন্যদলে গ্রহণ করিবেন, ইহা সম্ভবপর ভাবিলেও আমরা ঠিক যে ইহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম সে কথা বলিতে পারি না। যাই হৌক, ভগবান যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে সৈন্যদলে বাঙ্গালীকে লইবার শুভবুদ্ধি দিয়াছেন, ইহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতাভরে অবনতমস্তকে ভগবানকে প্রণাম করিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কৃষি-কার্য্যের ফলে দেশের যেমন একদিক দিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির বিশেষ সম্ভবপরতা আছে, সেইরূপ দেশ-বাসীর সৈন্যভুক্ত হইবার ফলেও আর একদিক দিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথ উন্মুক্ত হওয়া বিশেষ সম্ভবপর। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অর্থে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ উন্নতিই যে বুঝিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

সৈন্যভুক্ত হইতে গেলেই যে সর্ব্বপ্রথম শারীরিক উন্নতিসাধন, শারীরিক বলের সঞ্চয় করিতেই হইবে তাহা বোধ করি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। প্রথমেই তো যিনিই সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে যাইবেন, তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে যে সেগুলি ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতের বেগসহনে সক্ষম কিনা, অন্ততঃ অভ্যাসের দ্বারা সেগুলিকে সক্ষম করিয়া লওয়া যাইতে পারে কিনা। সেই ঘাত-প্রতিঘাতের বেগই বা কি? আদেশ পাইলেই হয়তো এক নিশ্বাসে অবিশ্রামে দশবিশ মাইল সমান পদক্ষেপে সকলের সহিত মিলিতভাবে চলিতে হইবে। আবার শুধু-হাতে চলা নহে—তোমাকে অন্ততপক্ষে তোমার নিজের অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্যজল ও শয্যা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল বহন করিয়া সেই দীর্ঘপথ চলিতে হইবে—সময়ে সময়ে দৌড়াইয়াও চলিতে হইতে পারে। ইহা নিতান্ত সহজ কথা নহে—সখের চলা নহে, আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চলা; পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে অথবা আদেশের একটী অক্ষরেরও বিপরীতে চলিলে তোমার নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে শতসহস্র মানবের জীবননাশের সম্ভাবনা আছে, এই একটী ভীষণ মানসিক আতঙ্কের ভার লইয়া চলা। শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল রক্ষা করা প্রত্যেক সৈন্যের একটী অপরিহার্য্য কার্য্য। বঙ্গবাহিনীর প্রত্যেকে যখন সেই অপরিহার্য্যতার কারণে শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল সঞ্চয় করিয়া শারীরিক সুখ ও আরাম অনুভব করিতে থাকিবেন, তখন তাঁহারা নিজেদের দৃষ্টান্ত ও অনুশাসনের দ্বারা স্বাস্থ্য ও বলের উপকারিতা ও সুখদায়কতা প্রচার করিতে কিছুতেই বিরত হইতে পারিবেন না। তখন দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার একটা সুবাতাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে, এবং ক্রমশ তাহার উপায় সকলও অবলম্বিত হইতে থাকিবে। আর, গভর্ণমেণ্টও যখন বঙ্গসেনা হইতে বিশেষ সাহায্য পাইতে থাকিবেন, তখন, অন্তত স্বীয় স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেও, বঙ্গবাসীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি গভর্ণমেণ্টের স্বভাবতই মনোযোগ পড়িবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই প্রকারে গভর্ণমেণ্ট ও স্বদেশবাসীগণ যখন মিলিতভাবে দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যত্নবান হইবেন, তখন ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি দুর্জ্জয় রোগশত্রুসকল কোথায় যে পলায়ন করিবে তাহার ঠিকানাই থাকিবে না। কথিত আছে যে একটা ভীষণ সমরে যত না লোকক্ষয় হয়, একমাত্র ম্যালেরিয়া তদপেক্ষা অনেক বেশী লোককে প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে প্রেরণ করে।

বাঙ্গালী জাতি সৈন্যদলভুক্ত হইলে আর একটী বিষয়ে বড়ই উপকার হয়। বর্ত্তমানে নানা কারণে, বিশেষত অশ্লীল উপন্যাস ও প্রেমের কবিতা প্রভৃতির অতিমাত্র বিস্তৃতির কারণে দেশের মধ্যে অস্বাভাবিক কামুকতা এবং সেই সঙ্গে নানাবিধ ভয়াবহ কুৎসিত রোগসমূহের ভীষণ প্রকোপ কিরূপ খরতর বেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সে বিষয়ে কি কেহ সন্ধান রাখেন? এই অস্বাভাবিক কামুকতার ভীষণ ফল হইতে সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অধিকাংশ দেশের শাসনকর্ত্তাগণ কামুকতার প্রশ্রয়দানের নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়া দেন। অন্যান্য দেশের সাধারণ অধিবাসীগণ ধর্ম্মভাবে অত্যন্ত হীন বলিয়াই তাহাদের শাসনকর্ত্তাগণ ঐপ্রকার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বাধ্য হন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী; আমরা বাঙ্গালীকে যতদূর জানি তাহাতে খুবই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে বাঙ্গালীর অন্তরতম প্রদেশে, ভিতরে ভিতরে একটী সুদৃঢ় ধর্ম্মভাব সর্ব্বদাই জাগ্রত হইয়া আছে। সেই ধর্ম্মভাবের সুদৃঢ় ভিত্তি থাকিবার ফলে বাঙ্গালী সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলে, প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়া-

ইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তে ভগবানের বিচারাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আহ্বান শুনিতে পাইয়া, আশা করি, অশ্লীল আমোদ প্রমোদে আত্মবিসর্জ্জন দিতে বিরত থাকিবেন এবং কাজেই নানাবিধ ভীষণ ও কুৎসিত রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন। তাঁহারা দেশের অন্যান্য লোককেও সে বিষয়ে যে নিবৃত্ত করিবেন তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই প্রকারে বঙ্গসেনা সংগঠনের ফলে যদি দেশে কামুকতা এবং তাহার ফল কুৎসিত রোগসমূহের প্রকোপ কিয়ৎপরিমাণেও প্রতিরুদ্ধ হয়, তবে জানিব যে দেশের একটী মহাকল্যাণ সাধিত হইল। আজ অল্প কয়েক দিন হইল লণ্ডনের বিশপ এই কামুকতার প্রশ্রয়দানের বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—"যে সকল পাষণ্ড আমাদের সৈনিক বালকদিগের পৌরুষ কলঙ্কিত করে এবং তাহাদের অন্তঃকরণ কলুষিত করে, জর্ম্মনির গুপ্তচরদিগের ন্যায় তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করা উচিত। * * * পূতিগন্ধময় যে সকল গ্রন্থ লোককে ভুলাইয়া বিপথে লইয়া যায়, সেই সকল গ্রন্থের লেখকগণকেও ঐ সকল পাষণ্ডের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করা উচিত। * * * যে সকল মধ্যবয়স্ক পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি পান নাই তাঁহাদের এবং লণ্ডনের স্ত্রীলোকদের কর্ত্তব্য, সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই সাম্রাজ্যের অন্তর হইতে এই সকল পাপ ধৌত করিয়া ফেলা। তখন পর্য্যন্ত যদি লণ্ডন পুরাতন লণ্ডনই থাকে, তবে যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা বৃথাই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" এই উক্তির অক্ষরে অক্ষরে আমরা প্রাণের সহিত সায় দিই এবং প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা অশ্লীল আমোদ প্রমোদ অশ্লীল উপন্যাসাদি পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক বলবিধানে যত্নবান হউন এবং সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া দেশের মঙ্গলসাধনে সাম্রাজ্যের মঙ্গলসাধনে অগ্রসর হউন।

বঙ্গসেনার সংগঠনের ফলে যেমন দেশবাসীর শারীরিক উন্নতি খুবই সম্ভবপর, সেইরূপ মানসিক উন্নতিও বড় অল্প সম্ভবপর নহে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা এবং আমরা বহুকাল যাবৎ মার্ষম্যান মেকলে প্রভৃতির রচিত ইতিহাস নামের অযোগ্য ও মিথ্যা জঞ্জালপূর্ণ গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া, মানুষ হইয়াছি বলিতে পারি না, মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হইতে শিখিয়াছি বলিতে পারি। তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বঙ্গবাসীদিগকে ভীরু, বাকপটু, পলায়নতৎপর প্রভৃতি অযথারূপে চিত্রিত করিয়া নিজেদের লেখনীকণ্ডুয়ন নিবারিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা শতবার বলিব যে তাঁহারা ইহা দ্বারা গুরুতর অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। এই অবিবেচনার ফলে তাঁহারা যেমন বঙ্গবাসীর প্রতি ঘোর অবিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ ইহার ফলে গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। শোনা যায় যে চীনবাসী ও জাপানীগণ জন্মাবধি কেবল যথাযুক্ত চাপা দিবার বন্দোবস্তের ফলে গৃহসজ্জার্থ বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষসমূহকে নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি করিয়া প্রস্তুত করে। সেইরূপ ইংরাজরাজত্বের প্রথমে যখন বাঙ্গালীদের নবজীবন প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই অবধি ঐ সকল ঐতিহাসিকদিগের ভ্রমপূর্ণ উক্তিসকল তাঁহারা গলাধঃকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি বাঙ্গালীর সাহস ও তেজকে একটা ঊর্ণাজালের মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া, প্রস্ফুটিত হইবার অবসর দেওয়া দূরে থাক, চাপিয়া মারিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহার ফলে, এখন, যখন দলে দলে বঙ্গসন্তান অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান মহাসমরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিলে এদেশের এবং সমগ্র সাম্রাজ্যের বিশেষ উপকার হইতে পারে, তখন গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীর নিকটে সে অকাতর সাহায্য পাইতেছেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ দেবঋষিগণের মন্ত্রসঞ্জীবিত ভগবদাশ্রিত অতি পুরাতন দেশ। এ দেশের কোন অংশ আপনাকে একটা অসত্যের আচ্ছাদনে চিরকাল আচ্ছাদিত রাখিতে পারে না, চিরকাল নিজের নিশ্বাসপ্রশ্বাসরোধের ব্যবস্থা করিয়া মৃত্যুর চরণে আত্মবলি দিতে পারে না। বঙ্গবাসীগণ যখন অবধি ঐ সকল লেখকগণের ভ্রমাত্মক উক্তিসকল বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন অবধিই তাঁহারা যেন সেগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়—কে

যেন তাঁহাদের মনে উহাদের সত্যতা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল। তাঁহারা এবিষয়ে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে বঙ্গবাসীর নামে আরোপিত কলঙ্কের মিথ্যাত্ব অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশবাসীগণ যে একটা মহাজাগরণে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহারা মিথ্যা কলঙ্কের বৃথা ভারবহনে আর কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না। তাঁহারা নিজেদের ভিতর হইতে সেই ভার ঝাড়িয়া ফেলিয়া ঘোর মানসিক পরাধীনতা হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে চাহিতেছেন। প্রবন্ধে ও বক্তৃতাতে অনেক পরিমাণে এই মুক্তিলাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু যথাযুক্ত কার্য্যে সেই মুক্তিলাভের পরিচয় প্রদান না করিলে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। আমাদের এই একটা পরম লাভ হইয়াছে যে আমরা এখন জানিয়াছি যে অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতি ভীরু ছিল না সাহসী বীর ছিল, বাকপটুমাত্র ছিল না কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রণী হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থলযুদ্ধে ও জলযুদ্ধে উভয় যুদ্ধেই শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়াছিল; বাঙ্গালী জাতি কথায় কথায় পলায়নতৎপর ছিল না, কিন্তু প্রাণের বিনিময়েও নিজের অধিকার রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ তৎপর ছিল। বঙ্গসেনার পথপ্রদর্শকগণ এখন পুনরায় তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা বাঙ্গালীর সাহসের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়া বাঙ্গালীজাতির মানসিক মুক্তিলাভকে সম্পূর্ণতা দিবার পক্ষে যে সহায়তা করিয়াছেন তাহা আশাতীত। এই মহাকার্য্য সাধনের জন্য এই সকল পথপ্রদর্শকগণের নাম দেশের ইতিহাসে নিশ্চয়ই অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

এই একটা ব্যতীত আরও নানা উপায়ে বঙ্গসেনা দেশের মানসিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রথমেই তো দেখি যে যাঁহারা সৈন্যদলে যাইবেন, তাঁহাদের বিশেষভাবে সংযমশিক্ষা হইবে। তোমার ইচ্ছা থাক বা নাই থাক, তোমাকে তোমার উচ্চতন কর্ম্মচারীর আদেশ অনুসারে নিক্তির ওজনে চলিতে হইবে—আদেশের একটী কেশাগ্রও ব্যতিক্রম করিবার অধিকার তোমার নাই। এই সংযমশিক্ষার যে কত দূরব্যাপী ফল তাহা যিনি এবিষয়ে স্থিরচিত্তে আলোচনা না করিয়াছেন তাঁহাকে তাহা বোঝানো দুরূহ। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, যখন গুরুগৃহে যাইয়া সংযমমূলক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের প্রথা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে এবং বঙ্গসন্তানেরা অপাঠ্য উপন্যাসাদি পাঠ ও অন্যান্য নানা কারণে অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত বা nervous হইয়া উঠিয়াছেন, সংযমের অভাবে স্থিরভাবে কোন বিষয়ে বিচার করিতে পারেন না, এই অবস্থায় আমাদের বিশ্বাস যে এই সৈনিকের কঠোর সংযমশিক্ষা আশ্চর্য্য ফলপ্রসূ হইবে। বঙ্গসেনা যখন সংযমের সুফল প্রত্যক্ষ করিয়া স্বীয় পরিপার্শ্বেও সেই সংযমের ভাব বিস্তার করিতে থাকিবেন, তখন আর বিপ্লবের কথা দেশে স্থান পাইবে বলিয়া মনে হয় না; অন্তত বিপ্লবের ভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

বঙ্গসেনা সংগঠনের ফলে আর একটী বিশেষ লাভের আশা আমরা করি। পুরাতন ভগ্ন মন্দিরের উপর অশ্বত্থ বট প্রভৃতির বীজ পড়িয়া সেই সকল বীজ হইতে বৃক্ষসকল বহির্গত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে হইতে ক্রমশ যেমন স্বীয় শিকড়জালের দ্বারা সেই ভগ্ন মন্দিরকে ঘিরিয়া ফেলিয়া জীর্ণ হইতে জীর্ণতর করিতে থাকে, সেইরূপ সুদীর্ঘকালের পরাধীনতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টার কারণে দেশে নানাবিধ সামাজিক সঙ্কীর্ণতার বীজ রোপিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে হইতে ক্রমশ প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া বর্ত্তমানে স্বীয় শিকড়জালে আমাদের সমাজকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহার শ্বাসরোধের ব্যবস্থার উপক্রম করিতেছে। বঙ্গসেনা সংগঠনের ফলে আমরা খুবই আশা করি যে দেশ হইতে সেই সকল সঙ্কীর্ণতা একে একে খসিয়া যাইবে। যে বিষয়ের সঙ্কীর্ণতার বিষয় সহজেই আমাদের মনে উদিত হয় তাহাই দৃষ্টান্ত স্বরূপে এখানে উল্লেখ করিতেছি। এই যে আমাদের দেশে একটা ছুঁই-ছুঁইভাব দিবানিশি জাগিয়া থাকিয়া আমাদের হৃদয়কে কিরূপ সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিতেছে, আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতিরূপ মহান্ ভাবকে প্রতিমুহূর্ত্তে কিরূপ নিঃশেষে বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহা আমরা কয়-

জন স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিতেছি? আর যাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জনই বা এই সঙ্কীর্ণতা, স্বদেশের প্রতি এই অবিচার দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন?. সৈন্যদলে বঙ্গসেনা প্রবেশ করিবার ফলে এই মহাসর্বনাশকর ছোঁয়া-ছুঁয়িভাব দাঁড়াইতে পারিবে না বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তুমি কায়স্থ, অতএব তুমি ব্রাহ্মণের ভাত স্পর্শ করিতে পারিবে না, কিন্তু লুচি-রুটি প্রভৃতি অনায়াসে স্পর্শ করিতে পারিবে; তুমি চাষী কৈবর্ত্ত, তোমার হাতে ব্রাহ্মণেরা পানীয় জল গ্রহণ করিতে পারিবে. কিন্তু তুমি জেলে কৈবর্ত্ত, তোমার স্পৃষ্ট জল নিতান্ত অস্পৃশ্য। মানবের প্রতি এই প্রকার ঘৃণিত অবজ্ঞার ভাব মানুষ কি কখনও চিরকাল সহ্য করিতে পারে? একটা ছাগল বা বিড়াল তোমার আহারস্থানে উপস্থিত হইলে কোন কিছুই অপবিত্র হইল না, কিন্তু এক-জন মানুষ—যাহাকে তুমি অস্পৃশ্য অনাচরণীয় বলিয়া মনে কর—একজন মানুষ তোমার ভোজন-গৃহের সীমায় পদার্পণ করিবামাত্র তোমার সমস্ত আহার্য্য অপবিত্র হইয়া গেল! মানুষ কি পশু অপেক্ষাও অধম? যে মানুষ সেই স্বাধীন পুরুষ পরমাত্মার সন্তান, সেই মানুষ কি এত অবজ্ঞা নীরবে সহ্য করিতে পারে? এত অবজ্ঞা, এত ঘৃণা মানব-প্রকৃতি সহ্য করিতে পারে না বলিয়া শত-সহস্র বন্ধনে মানুষের হাত পা বাঁধিবার চেষ্টা করিলেও মানুষ তোমাদের সেই বাঁধন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া মুক্তি লাভ করিতে চাহে—চারিদিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে যে তোমাদের দেশের লোকেরা মুখে তোমাদের বাঁধন মানিতেছে স্বীকার করিলেও কার্য্যত বাঁধন ভাঙ্গিয়াই চলিয়াছে। এইরূপ অবিচার, এইরূপ সঙ্কীর্ণতা মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধ বলিয়াই সমাজের মধ্যে বিপ্লব আনয়নের মূল কারণ হইয়া পড়ে। আমরা কেবল এই একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। ইচ্ছা থাকিলে আমাদের সমাজের চারিদিকেই সঙ্কীর্ণতার সর্ব্বগ্রাসী শিকড় নামিয়াছে দেখিতে পাইব। আমাদের কোনই সন্দেহ নাই যে, বঙ্গসেনাসংগঠন আমাদের সমাজশরীর হইতে এই সকল নিষ্ঠুর সঙ্কীর্ণতা অপসারিত করিয়া অবশ্যম্ভাবী সামাজিক বিপ্লব সংঘটনের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিবে। যে সকল বঙ্গসন্তান সৈন্যদলে প্রবেশ করিবেন, আমরা তো স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না যে তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার ছুঁই-ছুঁই ভাব থাকিতে পারে। তুমি কি ভাব যে বঙ্গসেনার মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ আহত হইলে যদি একজন সুবর্ণবণিক তাঁহাকে পানার্থে জল প্রদান করেন, তবে সেই আহত ব্রাহ্মণ সেই জল পান করিবেন না? মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কি তোমাদের সুখের অবস্থার ঘরগড়া সঙ্কীর্ণতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়াইতে পারে? এই সকল ক্ষুদ্র মলিন সঙ্কীর্ণতা যদি বঙ্গসেনার মধ্যে বিদূরিত না হয়, তবে সমরাগ্নিতে তাঁহাদের জীবন বিসর্জ্জন বৃথা হইবে। আর, যদি এই সকল সঙ্কীর্ণতা দূরীকরণে তাঁহারা পথপ্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে সমগ্র ভারত-ভূমি হইতেও ঐ সকল সঙ্কীর্ণতা অপসারিত হইতে বিলম্ব হইবে না এবং ভারতবাসী একপ্রাণতার অভি-মুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইবে। এই প্রকারে সমগ্র দেশ যখন একপ্রাণতার দিকে অগ্রসর হইবে, তখ-নই জানিব যে বঙ্গসেনার পথপ্রদর্শকগণ সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া সার্থকজীবন হইয়াছেন।

বঙ্গসেনা দ্বারা আরও কত দিক দিয়া যে দেশের উন্নতিসাধনের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে তাহা বলা যায় না। বঙ্গসেনার প্রত্যেককেই যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক উন্নত হইতে হইবে। যতই তাঁহারা বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার ফলে নিজেদের জ্ঞান বর্দ্ধিত করিবেন, ততই তাঁহারা আত্মরক্ষা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য লাভ করিবেন। তার পর, যখন দেশের বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ সন্তানগণ জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইবেন, তখন দৃষ্টান্তের গুণে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণও আপনাদের জীবনকে জ্ঞানগরিষ্ঠ করিয়া তুলিবে এবং স্বদেশপ্রেমে আত্মহারা হইয়া যাইবে ও রাজ-ভক্তিতে অবনতমস্তক হইবে। তখনই বঙ্গসেনার পথপ্রদর্শকগণের জীবন ধন্য হইবে।

সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইবার ফলে যেমন শারীরিক ও মানসিক উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়া আসি-লাম, সেইরূপ উহার ফলে দেশের আধ্যাত্মিক ও ও নৈতিক উন্নতিরও খুবই সম্ভাবনা আছে। মহা-ভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে

ভারতবাসীমাত্রেরই, কেবল ভারতবাসী কেন, জগতবাসীমাত্রেরই হৃদয়ে এই একটী নীতি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, সংগ্রামে যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই ভগবান, সেই পক্ষেই ঐশ্বর্য্য এবং সেই পক্ষেই নিশ্চিত জয়। অর্থের লোভে, ভূমিলাভের লোভে কিছুকালের জন্য অধর্ম্মের পক্ষে যথেষ্ট লোকসংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু মহাভারত এই একটী সত্য জ্বলন্তভাবে জীবন্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছে যে ভগবানের কলকাঠি এরূপভাবে কার্য্য করে যে পরিণামে অধর্ম্ম নিজের বিষের জ্বালায় নিজেই প্রাণত্যাগ করে এবং ধর্ম্ম নিজের অক্ষয় স্বর্ণসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আজ ইউরোপ যে মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই মহাসমরেও যে সেই প্রাচীন কুরুক্ষেত্রসমরের পুনরভিনয় হইতেছে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বলপরীক্ষা হইতেছে এবং পরিণামে যে ধর্ম্মেরই জয় হইবে, অধর্ম্মের সমূলে বিনাশসাধন হইবে, সত্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহমাত্র নাই। এই ধর্ম্মাধর্ম্মের মহাসমরে যখন বঙ্গসেনা ধর্ম্মের জয়প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমত সাহায্য করিবেন, যখন বঙ্গসেনা দেখিবেন যে সেই প্রাচীন যুগের ন্যায় বর্ত্তমান যুগেও ধর্ম্মেরই জয় হইল, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে নৈতিক বল যে কিরূপ দৃঢ়তা লাভ করিবে তাহা একমুখে বলা অসম্ভব। তাঁহাদের সুনীতির নির্ম্মল বাতাসে বর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র দেশবাসীও যে অচিরে নৈতিক বলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে তাহা নিঃসন্দেহ।

সুনীতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, অধ্যাত্মযোগ, এই উভয়ের পরস্পরের মধ্যে একটী নিকটতম সম্বন্ধ আছে, ঘনিষ্ঠতম সংযোগ আছে—এত নিকট যোগ যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতিকেই এক আধ্যাত্মিক উন্নতি নামেই অভিহিত করা হয়। আমাদের তো খুবই বিশ্বাস যে মানুষ সাধারণত সুনীতির পথে অগ্রসর হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতিরও পথে, অধ্যাত্মযোগেরও পথে অগ্রসর হইবেই। তাহার উপর, সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইলে অধ্যাত্মযোগের পথে অগ্রসর না হওয়াই আশ্চর্য্য। অবশ্য, সৈন্যগণ সাধকগণের ন্যায় দুদণ্ড বসিয়া ভগবানের নাম করিবার অবসর না-ও পাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অধ্যাত্মযোগের অভাব হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। আমাদের মনে হয় যে সৈন্যগণের অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে অধ্যাত্মযোগ সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতে থাকে। প্রবাদ আছে যে মৃত্যু যেন চুলের মুঠি ধরিয়া আছে এইভাবে ধর্ম্মাচরণ করিবে—"গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"। সৈন্যভুক্ত হইলে আর "যেন"র কথা আসিতে পারে না। তখন তো প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতই মৃত্যু কর্ত্তৃক ধৃতকেশ হইয়া থাকিতে হইবে। কখন্ কাহার প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার আদেশ হয় তাহার স্থিরতা নাই এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কখন্ যে কাহার মৃত্যু আসে তাহাও কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। এ অবস্থায় নিতান্ত নাস্তিকেরও চক্ষু সেই সর্ব্বদর্শী পরমপুরুষের প্রতি উত্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তখন বলা বাহুল্য যে যাহাদের অন্তরে কিছুমাত্র ধর্ম্মভাব আছে তাহাদের সেই ধর্ম্মভাব আরও বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিবে,—তুচ্ছ আমোদ প্রমোদের প্রতি তাহাদের মতিগতি থাকিতে পারে না; যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তাহাদের ঈশ্বরের উপর নির্ভর শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়া যাইবে। যে সকল বঙ্গসন্তান সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে তাঁহাদের মধ্যে এমন একজনও নাই যিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে স্মরণ করিতে এতটুকুও দ্বিধা করিবেন। বঙ্গসেনা যখন এই প্রকারে ধর্ম্মভাবে, অধ্যাত্মযোগে দৃঢ় হইয়া সমাজের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন তাঁহাদের সেই দৃঢ় ধর্ম্মভাবের সম্মুখে কি অন্যায় অধর্ম্ম ক্ষণকালের জন্যও দাঁড়াইতে পারিবে? কেবল তাহাই নহে,—কে বলিতে পারে যে তাঁহাদের সেই জ্বলন্ত ধর্ম্মভাবের দৃষ্টান্তে দেশে জীবন্ত সত্যধর্ম্মের একটা প্রবল তরঙ্গ আন্দোলিত হইবে না?

এই প্রকারে যখন বঙ্গসেনার আবির্ভাবের ফলে বঙ্গবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধিত হইবে; কি শরীরে, কি মনে, কি আত্মাতে, সর্ব্বতোভাবে যখন বঙ্গবাসী দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, তখন বাঙ্গালী

স্বাধীন জগতের অধিবাসীর পার্শ্বে নিজের যথাযথ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। তখন আর বাঙ্গালী ভীরু কাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না, তখন আর বাঙ্গালীকে কোন জাতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবার গর্ব্বিত অধিকার পাইবে না। আমরা খুবই আশা করি যে সৈন্যদলে প্রবেশের ফলে কোন না কোন সময়ে সমগ্র ভারতের অধিবাসী এক মহামিলনে আবদ্ধ হইবে, পরস্পর পরস্পরকে সত্যসত্যই এক মাতার সন্তান সহোদর ভাই বলিয়া চিনিতে পারিবে। তখন আর সুশিক্ষিত (?) আমেরিকা অশিক্ষিত (?) ভারতবাসীর বিরুদ্ধে রুদ্ধ দ্বারের আদেশ দিতে সাহস করিবে না। আর, আজ যদি এই পঁচিশ ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর অর্দ্ধেকও সৈনাদলভুক্ত হইয়া সম্রাটের পক্ষে সাম্রাজ্যের হিতকল্পে জীবনোৎসর্গে উদ্যত হয় তবে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের লোকের অভাব কোথায়? যে অল্প সংখ্যক ভারতবাসী ইতিমধ্যেই সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদেরই বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া—বোধ হয় বলিতে পারি যে অন্তরে ভীত হইয়া—জর্ম্মনি শ্বেতসমরে কৃষ্ণসৈন্য প্রয়োগের বিরুদ্ধে কত না নালিশ করিয়াছে। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট যে দুইটী দল অনুমোদন করিয়াছিলেন, সেই দুইটী দল সম্পূর্ণ সংগৃহীত হইয়াছে। উপযুক্ত দৈহিক গঠন প্রভৃতির অভাবে আজ যদি সাতকোটী বঙ্গবাসীর মধ্য হইতে দুইশত আটাশ জনে নির্ম্মিত দুইটী দলও সংগ্রহ করিবার সুবিধা না হইত, গবর্ণমেণ্ট যদি বঙ্গসেনার দুইটী দলও যথাসময়ে সংগ্রহ করিতে না পারিতেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই বলিতাম যে পিতৃপিতামহাদির রক্তে আগত ম্যালেরিয়া বিষই তাহার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী, সাহসের ও বীরত্বের অভাব নহে। আর বোধ হয় ইহা বলিলেও দোষের হইত না যে গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে এতদিন যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদান না করাতে আজ অভাবের সময় উপযুক্তরূপ সাহায্য লাভে অসমর্থ হইলেন।

সকল দিক আলোচনা করিয়া উপসংহারে আমরা সমগ্র বঙ্গবাসীকে অনুরোধ করি যে বাঙ্গালী সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার এমন শুভ অবসর যেন অবহেলায় না হারাইয়া বসেন। প্রাচীন ভারতের নির্ভীকহৃদয় ঋষিরা আমাদিগকে অভয় দিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—"যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্ম্মযুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হয়"—

ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥

হে বঙ্গসন্তান, ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমরের ধর্ম্মযুদ্ধে তোমাদের আহ্বান আসিয়াছে। তোমরা আর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না, সংগ্রামে অগ্রসর হও। রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিও না। যে জাতি এক সময়ে স্বয়ং রঘুরাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বিশেষ বেগ প্রদান করিয়াছিল, সেই জাতির জাতীয় বীরত্ব প্রদর্শন কর। এই মহাসমরকে কেবলমাত্র ইউরোপের মহাসমর বলিয়া উপেক্ষাদৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। ইহার উপর ভারতেরও মঙ্গলামঙ্গল যথেষ্ট নির্ভর করিতেছে। স্বদেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া তোমরা সৈন্যদলে প্রবেশ কর। জন্মিলেই তো মৃত্যু অদৃষ্টে লিখিত আছেই, এবং মৃত্যু তো একবারের অধিক দুইবার হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ দেশের জন্য সাম্রাজ্যের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে যদি তোমাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে তোমাদের কীর্ত্তি জগতে চিরকাল বিঘোষিত হইবে।

বঙ্গসেনা সংগঠনে যাঁহারা পথপ্রদর্শক হইয়া স্বীয় জীবনদানে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে আমাদের এই বেদনাকম্পিত বাণী উপস্থিত হউক—"তোমরা এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক, একথা ভুলিও না। তোমাদের সাহসের প্রতি, তোমাদের বীরত্বের প্রতি শত শত শতাব্দী অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে জানিবে। তোমাদের কার্য্যের প্রতি কেবল এদেশ নহে, কেবল তোমাদের স্বজাতি নহে, কিন্তু সমগ্র সুসভ্য জগত, পূর্ব্বদিকের জাপান হইতে পশ্চিমের আমেরিকা পর্য্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে যে তোমরা প্রাচীন ভারতের আর্য্যজাতির উপযুক্ত বীরত্ব প্রদর্শনে অগ্রসর হও অথবা চিরপরাধীন ক্রীতদাসের উপযুক্ত কাপুরুষত্ব অবলম্বন করি-

তেই কৃতসঙ্কল্প হও।" সাম্রাজ্যের চারিদিক হইতেই আজ সকলে সম্রাটের সহায়তা করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে; কেবল বাঙ্গালী আমরা যেন ভয়প্রপীড়িত হইয়া আমাদের নিকট প্রত্যাশিত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ না হই। বঙ্গসেনা সম্রাটের বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদিগের সহিত একপ্রাণে কার্য্য করিয়া একপ্রাণতার মহাবল জীবনে প্রত্যক্ষ করুন। সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং, এই বৈদিক মহামন্ত্র বঙ্গবাসীর জীবনে সার্থকতা লাভ করুক।

রাণাডের স্মৃতি কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার বিবাহ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে, গোধূলি মুহূর্ত্তে আমার বিবাহ হয়। বিবাহ সম্বন্ধীয় বেদোক্ত অনুষ্ঠান-বিধি শেষ হইলে পর, প্রায় ১০॥ টার সময়, আমাদের বরযাত্রীরা গৃহে আসিলেন এরূপ বলা অপেক্ষা, আমরা দুজনেই আমাদের গৃহে বরাবর পদব্রজে চলিয়া আসিলাম—এই টুকুই সত্য। বিবাহ হইয়া গেলে বাড়ী আসিবার সময় আমার মাতৃগৃহে আমার স্বামী আহারাদি করেন নাই এবং তাঁহার নিজ গৃহে আসিয়া কাহারো সহিত কোন কথা না কহিয়া, কিছু না খাইয়া, একেবারে আপনার ঘরে গিয়া ভিতর হইতে দ্বারে কড়া লাগাইয়া দিলেন। সেই দিন তাঁহার অসহ্য মনস্তাপ হইয়াছিল। একে-ত বরাবর-কার প্রিয় পত্নীর বিয়োগ হইয়াছে সবে এক মাস মাত্র। সেই শোকটা একেবারেই তাজা ও টাট্‌কা ছিল, এই অবস্থায়, পুনর্ব্বার বিবাহ করা তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কেবল আমার শ্বশুর মহাশয়ের দুরাগ্রহ ও জেদের দরুণ তাঁহাকে আবার বিবাহ করিতে হইল; আর তাহাও দুইটি ব্রত পালনের নিমিত্ত। এক ব্রত,— "গুরুজনের কথার অবাধ্য হইবে না; দ্বিতীয় ব্রত পরিবারের সুখে প্রতিবন্ধক হইবে না।" তাই তিনি, বহু দিবস হইতে স্বীকৃত ও ভাল বলিয়া বিবেচিত নিজ মতটিকে, পুরাতন প্রিয়তম বন্ধুদিগকে, নিজ আত্মাভিমানকে, এবং সেই সঙ্গে মিলনের সুখকে ও ধন্যবাদকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া, উক্ত দুই ব্রত পালন করিলেন। তাহার দরুণ জগতের নিকট উপহাস ও দোষারোপ সহ্য করিতেও স্বীকৃত হইলেন। এই কারণে, এই বিবাহরাত্রিকে যে তিনি অসহ্য সংকট কাল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। তাঁর পক্ষে ঐরূপ মনে করাই ঠিক। কারণ কেহ কেহ এখনো এইরূপ মনে করেন, আমার স্বামীর সমস্ত জীবনের মধ্যে যদি কোন দুর্ব্বলতা ও হীনতা প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে সেই বিষয় সম্বন্ধে। কিন্তু এই সম্বন্ধে উল্টা আমার মত এই, তাঁহার সমস্ত চরিত্রের মধ্যে স্বার্থত্যাগ ও উদারচিত্তের যদি কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়া থাকে, তবে এইটিই সব-চেয়ে উচ্চ ও মহৎ নিদর্শন। এই সম্বন্ধে নিজ নিজ দৃষ্টি অনুসারে যেই যত দোষ দিক্ না কেন, কিন্তু আমার নিকট তাঁহার এই আচরণটি অত্যন্ত আদরণীয় বলিয়া মনে হয়; এবং যথার্থ ভক্তির সহিত যে কেহ তাঁহার চরিত্র সমগ্রভাবে অবলোকন করিবে, তাহারই নিকট ইহা আদরণীয় হইবে।

বিবাহের পূর্ব্বে প্রায় পনেরো দিন ধরিয়া মিত্রমণ্ডলীর নিকট হইতে ক্রমাগত পত্র আসিত,—"এই সময় আসিয়াছে। এবার আমি ছোট মেয়ে বিবাহ করিব না, পুনর্বিবাহ করিব,—এইরূপ গুরুজনদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিবে" ইত্যাদি কথা ঐ সব পত্রে থাকিত। প্রথম প্রথম পত্র গুলি ডাকঘর হইতে আমার স্বামীর হাতে আসিত। কিন্তু এইরূপ পত্রাদি বোম্বাই হইতে আসিতেছে, আমার শ্বশুর মহাশয়ের কাণে আসায়, তিনি ডাকের চিঠি সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। ডাক-হরকরা ডাক আনিলে পর, তিনি প্রথমেই তাহা আপনার নিকট আনাইয়া লইয়া তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের পত্র ও টেলিগ্রামগুলি রাখিয়া বাকী পত্রাদি উপরে পাঠাইয়া দিতেন। শ্বশুর মহাশয়কে বাড়ীর সবাই ভয় করিত বলিয়া এই কথা কেহই প্রকাশ করে নাই। প্রথম পত্নী মারা গেলে পর, শ্বশুর মহাশয় কোল্হাপুর হইতে পুনায় আসিলেন; তখন হইতেই কনের সন্ধান চলিতে লাগিল। বিধবাবিবাহের অনুকূলে আমার স্বামীর মত থাকায়, এখন আমার স্বামী বালিকা-বিবাহ করিবেন না, বিধবাবিবাহ করিয়া বসিবেন, এইরূপ শ্বশুর মহাশয়ের আশঙ্কা হইল এবং বোম্বায়ের মিত্রমণ্ডলীর সহিত আমার স্বামীর সাক্ষাৎকার ঘটিয়া তাহাদের অনুরোধ উপরোধ শুনিবার পূর্ব্বেই, বিবাহ ঘোষণা করিয়া দিবেন এইরূপ শ্বশুর মহাশয় স্থির করিলেন, এবং তদনুসারে প্রতিদিন কনের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

সেই সময় শ্বশুর মহাশয় আমার পিতার জায়গাতেও কনে দেখিবার জন্য পুনায় আসিয়াছিলেন। আমার পিতা শ্বশুর মহাশয়ের নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। দুজনের

মধ্যে পূর্ব্বকার পরিচয় ছিল। তিনি শ্বশুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন :—"আমাদের মেয়েদের বিবাহ একেবারে স্থির করা ব্যতীত কেবলমাত্র দেখবার জন্য পাঠানো আমাদের রীতি নয়; অতএব আপনার নিকট আমার এই মিনতি, আপনার কোন লোককে আমাদের গ্রামে মেয়ে দেখবার জন্য পাঠিয়ে দিন। মেয়েকে যদি তাঁর পছন্দ হয় তাহলে তাকে সেখান থেকে আনান যাবে। বিবাহের জন্য কোন মেয়েকে বাহিরে নিয়ে এলে, যদি তার পর বিবাহ না হয়, ফিরে আসে, তাহলে আমাদের বংশে মর্য্যাদার হানি হয়। তাই প্রথমেই মেয়েকে পছন্দ না হলে, তাকে আমি আনাতে পারি না।" তখন শ্বশুর মহাশয়, আমাদের আশ্রিত বেদমূর্ত্তি রাঃ বালভট্‌জী ওয়াট্‌ওয়েকে আমার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বালভট্‌জী ১০৷১২ বৎসর বয়স হইতে, অর্থাৎ বাল্যকাল হইতেই, আমাদের গৃহে ছিলেন। ইনি খুব বিদ্বান ও কর্ম্মিষ্ঠ। ইঁহার আচরণ পরিশুদ্ধ হওয়ায় বাড়ীর লোকেরা সবাই ইঁহাকে আত্মীয়ের মত মনে করিতেন। আর, শ্বশুর মহাশয়েরও তাঁহার উপর খুব বিশ্বাস ছিল। বালভট্‌জী ও আমার পিতা আমার মাতৃগৃহে আসিলে পর, বালভট্‌জী আমার মুখ দেখিলেন। যাহা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল যথারীতি জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, এবং সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ঘর সংসারের সমস্ত অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্যই হউক, কিংবা কি-জানি কেন অপেক্ষা করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার সময় আমার পিতাকে তিনি বলিলেন,—"মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। কাল সকালেই আপনি মেয়েকে নিয়ে চলে যান। তার পর একটু অপেক্ষা করিয়া, তার-যোগে আপনার মণ্ডলীকে বিবাহের জন্য ডাকিয়া পাঠান।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর, আমি, আমার পিতা, ও বালভট্‌জী, ডাকের টাঙ্গা গাড়ীতে চড়িয়া পুনায় আসিলাম। ইত্যবসরে, আমার স্বামী বিবাহ করিবেন না বলিয়া নানা কথা শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। "আমি এখন ছোট নই, আমার বয়স ৩২ বৎসর। অতএব এখন আমি নিজেই ভাল মন্দ বিচার করিতে পারি। দুর্গা আমা আপক্ষা বয়সে ছোট হওয়ায়, একুশ বৎসর থেকে বিধবা হয়েছে। আপনার স্নেহ আমা অপেক্ষা তাহার উপরে কোন অংশেই কম নয়; এইরূপ অবস্থায়, তার সম্বন্ধে, আপনার ত কোন ভাবনা চিন্তা হচ্চে না; তবে আমার বিবাহ সম্বন্ধেই এত আগ্রহ কেন? যদি আপনি মনে করেন, দুর্গার পক্ষে ব্রতস্থ হইয়া থাকাই শ্রেয়, তাহলে আমার বেলাই তাহা না হইবে কেন? আমাদের দুজনের অবস্থাই ত সমান। পাছে আমি বিধবা বিবাহ করি, তাই যদি আপনার ভয় হয়, তাহলে আমি বিধবা বিবাহ করব না, আপনার নিকট এই অঙ্গীকার করচি। সে সম্বন্ধে আপনার কোন চিন্তা নাই।" এইরূপ নানাপ্রকারে কাকুতি মিনতি করিলেও শ্বশুরমহাশয় নিজের কথা ছাড়িলেন না। আরও বেশী ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন আমার স্বামী বলিলেন, "আমার কথা আপনি না শুনিলেও, অবশ্য আপনার কথা আমার শুনতেই হবে। আরো ছয় মাস আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দিন—অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমি বিলাতে গিয়ে আবার ফিরে না আসি সেই পর্য্যন্ত"। এ কথাতেও শ্বশুর মহাশয় রাজি হইলেন না। তখন আমার স্বামী লোকের দ্বারা এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেনঃ— "আমার কথা ত কিছুই রাখ্‌লেন না। আপনি আমার বিবাহ না দিয়ে আর ছাড়বেন না। তবে আমার একটা কথা রাখুন—যার সঙ্গে বিবাহ হবে সে মেয়ে যেন স্বগ্রামের না হয়, পরগ্রামের মেয়ে হওয়া চাই; কুলীন বংশের ও নামজাদা ঘরের মেয়ে হওয়া চাই; ভাল ভাল লোকের সঙ্গে তাহার কুটুম্বিতা আছে কিনা ;ভাল করে জেনে নিয়ে তবে এই বিষয় স্থির করা চাই। স্বগ্রামের মেয়ে আমি একেবারে চাই না। রূপসী ও বয়স্ক হইলেও সাধারণ বংশের মেয়ে আমি চাই না। রূপ অপেক্ষা কুলীনত্বের উপর বেশী লক্ষ্য রাখিলে তবেই সেই সম্বন্ধ সুখের হবে।" এইরূপ নানাকথা বলা হইলে পর, আমরা দুই তিন দিনের মধ্যে পুনায় আসিয়া পৌছিলাম। আমি যে বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, শ্বশুর মহাশয় সেখানে গিয়া আমার মুখ দেখিলেন, এবং পছন্দ করিয়া একাদশীর মুহূর্ত্তই বিবাহলগ্ন স্থির করিলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় আমার পিতাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে "আজ সন্ধ্যাকালে তুমি আমার বাড়ীতে নিশ্চয় আসবে এবং আমার পুত্রের কি বলবার আছে শুনে নেবে। অনুকূল মত হয় ত কথাই নেই, কিন্তু যদি প্রতিকূল মত হয় তবে, এই মেয়ের সঙ্গেই বিবাহ দেব স্থিরনিশ্চয় করেছি এই কথা তাকে স্পষ্ট শুনিয়ে দেবে।" আমার পিতা এই কথা শিরোধার্য্য করিলেন এবং সন্ধ্যাকালে আমাদের বাড়ী আসিয়া আমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপরে গেলেন। আমার পিতার চেহারায় কুলীন বংশ-সুলভ একটা গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়নিশ্চয়তার ভাব ছিল। তাঁকে দেখিবামাত্র আমার স্বামী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তারপর বসিলেন এবং দস্তুর মত ভদ্রতার প্রশ্নাদি করিলেন। তখন আমার পিতা, "আমি অমুক গাঁয়ের জায়গীরদার" ইত্যাদি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া শেষে বলিলেন "আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বার্ত্তা করতে এসেছি।" তখন আমার স্বামী বলিলেন—"আমার

কি দেখিয়া আপনি আমাকে মেয়ে দেওয়া স্থির করেছেন? প্রথমত, আপনি পুরাতন বংশের জায়গীরদার, আর আমি সমাজ-সংস্কারকদলভুক্ত হওয়ায় বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। আমার শরীর দেখ্‌তে বেশ মোটা সোটা কিন্তু আমার চোখের ও কানের হীনতা আছে। তাছাড়া আমার বিলেত যাবার কথা আছে। সেখান থেকে এসে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব না। অতএব, আপনি এই সব বিষয় বিচার করে যাহা কর্ত্তব্য স্থির করবেন।" আমার পিতা উত্তর করিলেন—"তোমার পিতা ভাউসাহেবের সহিত আমার পুরাতন পরিচয়। তিনি আমাকে সমস্তই বলেছেন, এবং আমার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেব বলে অঙ্গীকার করেছি।" এই কথা শুনিয়া, একটু থামিয়া, আমার স্বামী বলিলেন:—"আপনার মেয়ের বিবাহ যদি আমার সঙ্গে দেওয়াই স্থির করে থাকেন, তবে আমার একটা কথা বলবার আছে; আজ লগ্ন স্থির না করে কেবল বাঙ্‌নিশ্চয় করে এক বৎসর অপেক্ষা করা হোক। তারপর বিবাহের লগ্ন স্থির করা হোক।" কিন্তু আমার পিতা বলিলেন, "তা করা উচিত নয়, আমার বংশমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখবে।" এই প্রকার নানা কথা বলিয়া বিবাহ সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাইলেন। তখন, আমার স্বামী বলিলেন—"এখন এই কাজে আমার পিতা ভাউসাহেবের উপরেই বিচারের ভার দেওয়া হোক; এবং তিনি যা বলবেন আমরা উভয়েই তা শুনব।" এই কথা শুনিয়া আমার পিতা চলিয়া গেলেন। কেবল আমার স্বামী ভাবিলেন—"আমি যখন ভাউসাহেবের সমস্তই কথাই শুনিয়াছি, তখন কেবল বৎসর দেড়েক বিবাহ স্থগিদ করতে হবে, আমার এই অনুরোধটি তিনি রাখিবেন না, এমন হবে না। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমার স্বামী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট গিয়া, আমার পিতা অন্নাসাহেব কুলকর্ণী তাঁর নিকট গিয়া যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন সমস্তই বলিলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় বলিলেন,—"শেষ নিষ্পত্তিটা কি হল আমাকে জানাও।" তখন আমার স্বামী বলিলেন—"শেষ নিষ্পত্তির ভার আপনার উপরেই দেওয়া হয়েছে। আপনাকে কি তাঁর সমস্ত কথাই শুনতে হবে? আপনার কথা কি তিনি একটুও রাখবেন না? আমি তাঁকে বলেছি, আপনার সব কথাতেই আমি রাজি আছি। আমি বিবাহ করব কিন্তু এখনি না। বছর দেড়েকের মধ্যে করব।" এইরূপ অনেক কথা আস্তে আস্তে বলে আমার স্বামী শ্বশুর মহাশয়কে লওয়াবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্বশুর মহাশয় এই সমস্ত শুনিবার পর, ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কাল স্তব্ধ হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন; কোন উত্তর দিলেন না। আমার স্বামী আস্তে আস্তে কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু শ্বশুর মহাশয়ের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। প্রায় দুই ঘণ্টার পর শ্বশুর মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেখানে যে সব লোক দাঁড়াইয়াছিল তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা সবাই বাহিরে যাও, দুই এক ঘণ্টা এখানে এসো না।" তদনুসারে সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন; কেবল আমার ননদ কি-কথাবার্ত্তা হইতেছে আড়ি পাতিয়া শুনিতে লাগিল। শ্বশুর মহাশয় আমার স্বামীকে বলিলেন—"এতক্ষণ তুমি যা বল্লে তা শুনে আমি মনে মনে খুব বিচার করে দেখলেম; কিন্তু এবার তোমার কথাটা রাখ্‌তে পারব না, মনে হচ্চে। আমি তোমাকে কখন অবিশ্বাস করিনি, এখনো করিনে। কিন্তু যে রকম সময় উপস্থিত হয়েছে,—বিবেচক ব্যক্তি বিচার করে একটা কিছু স্থির করলেও, তার আশপাশের মোহ-প্রলোভন তার সঙ্কল্পকে টলিয়ে দিতে পারে,—এটা কি তুমি দেখছ না? একবার তোমার কথা অনুসারে এক বৎসর দেড় বৎসর তোমাকে স্বাধীনতা দিলে, আমার এই বৃদ্ধ বয়সের প্রকৃত সুখ ও শান্তি হারাতে হবে এই রকম আমার ভয় হয়। এর কারণটা এখন তোমাকে বল্‌চি—গত পনেরো দিনের মধ্যে, বোম্বায়ের মিত্রমণ্ডলী হতে যে সব পত্র ও তার এসেছে, সে সব পাঠ করে আমার কাছে রেখে দিয়েছি। সে সমস্ত বিচার করে, তোমার কথা শোনা উচিত নয়, এইরূপ আমার মনে হয়েছে। প্রথমত নব্য মতের দিকেই তোমার ঝোঁক, অথচ তোমাকে আটক করে রাখবার মত কোন জিনিসই নেই। এই রকম সব দিকেই তোমার স্বতন্ত্রতা থাকায়, সহজেই নব্যতন্ত্রের মতটাই উথলে উঠবে ও তোমাকে মোহিত করবে;—আমার এই ভয় আছে। কিন্তু আমার বয়স পূর্ণ হয়েছে। আমাদের পরিবারের স্ত্রীপুত্রাদির ভার ও কর্ত্তাগিরি তোমার উপরেই বর্ত্তেছে এবং তুমি এই ভার বহনের যোগ্যও বটে। সে যাক্। কিন্তু এ সব সত্য হলেও, তোমার কথা অনুসারে বছর দেড়েক বিবাহটা স্থগিদ রাখতে দিলে, আমার পারিবারিক সুখশান্তি অন্তর্হিত হবে। এই দুই দিকই তোমাকে দেখালেম। তুমি বিবেচক, যা ভাল বোধ হয় তাই করবে। কেবল আমি একটা এই স্থির করে রেখেছি, এখন যদি বিবাহ না কর তবে আমি মেয়েকে আর ফেরত পাঠাতে পারব না। কারণ, তাহলে আন্না-সাহেবের বংশমর্য্যাদার হানি হবে এবং আমারও অপমান হবে। কিন্তু এরূপ কাজ যদি করতেই হয় তাহলে তোমার আমার মধ্যে সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ায়, আমিও চিরকালের মত "করবীর" তীর্থস্থানে চলে যাব। পরে আমার অদৃষ্টে যা ঘট্‌বার তা ঘটবেই।" এই বলিয়া একটা

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শ্বশুর মহাশয় উঠিয়া হাত পা ধুইয়া সন্ধ্যা করিতে গেলেন এবং আমার স্বামী উপরে চলিয়া গেলেন। বিবাহের পূর্ব্বেকার এই বিবরণ আমি ননদের মুখে শুনিয়াছি।

ইহার পর,—পূর্ব্বে শ্বশুর মহাশয় যেরূপ স্থির করিছিলেন—১৮৭৩ অব্দে ডিসেম্বর মাসে গোধূলি মুহূর্ত্তে আমার বিবাহ হইল। বিবাহের পূর্ব্বে ও বিবাহের পরে, স্ত্রী আচার প্রভৃতি লৌকিক উপচার মোটেই করা হয় নাই। কেবল বেদোক্ত বিধি ও হোম-হবনাদি অনুষ্ঠান সমস্তই হইয়াছিল। বিবাহের দিনেও আমার স্বামী আদালতের ছুটি লন নাই। বিবাহের সময়ের পূর্ব্বে আদালত হইতে আসা পর্য্যন্ত, শ্বশুর মহাশয়ের ভয় ছিল, পাছে বোম্বায়ের কোন মিত্র আসিয়া এই সুযোগে বিবাহের মুহূর্ত্তটা কাটাইয়া দিবার জন্য আমার স্বামীকে বাহিরে কোথাও বেড়াইতে লইয়া যায় কিংবা কি করে কে জানে। কিন্তু আমার স্বামীর উপর এতটা বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও যাহা তিনি একবার যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহার কখনই অন্যথা করিবেন না। আমার স্বামী কোর্টের কাজ শেষ হইলে বেড়াইতে না গিয়া অথবা লাইব্রেরী প্রভৃতিতে না গিয়া একদম বাড়ী আসিলেন। এই প্রকারে বিবাহ হইয়া গেলে পর, আমার পিতা আমাকে একলা পুনায় শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া, স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। এই সময় বলা আবশ্যক, আমাকে দেখাবার জন্য যে সময় আমাকে পুনায় আনিলেন, সে সময় আমার পিতাই কেবল আমার সঙ্গে ছিলেন। তিথি স্থির হয়ে গেলে পর, আমার মা, ভাই, ভাজ, বোন, কাকা কাকী প্রভৃতি বাড়ীর লোকদিগকে তার-যোগে ডাকিয়া পাঠাইবার কথা ছিল। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় বিবাহের দিনটা খুব কাছাকাছি ধরায়, তাহার সময় পাওয়া গেল না। কেবল বেদোক্ত বিধি ছাড়া অন্য কোন ক্রিয়া কর্ম্ম করা হইবে না, এইরূপ আমার স্বামী স্পষ্টরূপে বলায়, স্ত্রী পরিবার ও ছেলে পিলেদের আনিয়া তাহাদিগের মনক্ষুণ্ণ করা আমার পিতা পছন্দ করিলেন না। (ক্রমশঃ)

বাল গঙ্গাধর টিলক-প্রণীত—

গীতা-রহস্য

(প্রস্তাবনার অনুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা হইতে গীতা-রহস্যের অন্তর্ভূত বিচার-আলোচনার সাধারণ উদ্দেশ্য কি, পাঠক বুঝিতে পারিবেন। গীতাসম্বন্ধীয় শঙ্কর ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে টীকাকারদিগের অভিপ্রায়ের যে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে উপলব্ধি হয়—গীতাসম্বন্ধীয় প্রথম টীকাটি কর্ম্ম যোগপর। এই টীকা এখন পাওয়া যায় না; তাই গীতাসম্বন্ধে কর্ম্মযোগপর ও তুলনাত্মক বিচার আলোচনা প্রথমেই করা হইয়াছে—এইরূপ বলায় বাধা নাই। ইহাতে কতকগুলি শ্লোকের অর্থ আধুনিক টীকায় দেওয়া অর্থ হইতে ভিন্ন হওয়ায়, মারাঠী ভাষায় পূর্ব্বে কোথাও বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয় নাই এরূপ অনেক বিষয় বলিতে হইয়াছে। এই সকল বিষয় ও এই সকল বিষয়ের উপপত্তি সংক্ষেপে অথচ যতটা-সম্ভব স্পষ্ট ও সুবোধ্যভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। এবং পুনরুক্তি হইলেও, তাহার মধ্যে যে-যে শব্দের অর্থ মারাঠীতে অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই তাহার পর্য্যায় শব্দ তাহাতে জুড়িয়া দিয়া অনেক স্থানে তাহার তাৎপর্য্যার্থ দেওয়া হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এই বিষয়ের প্রধান-প্রধান সিদ্ধান্ত, যুক্তি-বিন্যাস হইতে পৃথক বাহির করিয়া স্থানে স্থানে সংক্ষেপে দেখান হইয়াছে। তথাপি অল্প শব্দের সাহায্যে শাস্ত্রীয় ও গহন বিষয়সমূহের আলোচনা করা প্রায়ই কঠিন হওয়ায়, এই বিষয়ের মারাঠী পরিভাষাও অদ্যাপি স্থির নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এইজন্য, ভুলচুক, দৃষ্টিভ্রম কিংবা অন্যকারণে, আমাদের এই নূতন রকমের আলোচনার মধ্যে কাঠিন্য, দুর্ব্বোধতা, অপূর্ণতা বা অপর কোন দোষ থাকা যে সম্ভব ইহা আমি জানি। কিন্তু ভগবদ্গীতা পাঠকদিগের তো অপরিচিত নহে। গীতা অনেকেরই নিত্য পাঠ্য হওয়ায়, উহা শাস্ত্রদৃষ্টিতে অধ্যয়ন করিবারও অনেক লোক আছে। এইজন্য, এইরূপ অধিকারী পুরুষের প্রতি আমার এই মিনতি যে, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের হাতে আসিলে, তৎপাঠে যদি কোন দোষ ত্রুটি তাঁহাদের নজরে পড়ে,—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যেন জানান। তাহা হইলে, তাহার বিচার করিয়া এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের সময়, তাহাতে যথাযোগ্য সংশোধন করা যাইতে পারিবে। আমরা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক, সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা গীতায় একটা বিশিষ্ট অর্থ

করিতেছি,—কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতেও পারেন। এই নিমিত্ত, এইখানে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, এই "গীতারহস্য" কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে, কিংবা সম্প্রদায়বিশেষের উদ্দেশে লিখিত হয় নাই। আমার বুদ্ধি অনুসারে গীতার সংস্কৃত শ্লোকসমূহের যে সরল অর্থ বুঝিয়াছি তাহাই আমি দিয়াছি। এইরূপ সরল অর্থ করায়—এবং এক্ষণে সংস্কৃতের খুব প্রসার হওয়া প্রযুক্ত, সরল বা অসরল ইহা অনেকেই সহজে বুঝিতে পারিবেন—তাহাতে যদি কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে সাম্প্রদায়িকতা আমার নহে, তাহা গীতার। "নানা পন্থার কথা বলিয়া আমাকে গোলের মধ্যে ফেলিও না, তাহার মধ্যে যাহা নিশ্চিত শ্রেয় তাহাই আমাকে বল" (গী-২অ-৩ শ্লো) ভগবানের প্রতি অর্জ্জুনের এইরূপ প্রশ্ন হওয়ায়, গীতার প্রতিপাদ্য কোন-একটা বিশিষ্ট মত থাকা চাই—ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এবং সেই মতটি কি, তাহা গীতারই অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া নিরপেক্ষভাবে আমাদিগকে দেখাইতে হইবে। প্রথমে কোন একটা মত স্থির করিয়া, তাহার সহিত গীতা থাপ খায় না বলিয়া, গীতার্থকে টানিয়া বুনিয়া তাহার সহিত মিল করিতে যাওয়া ঠিক নহে। মোট কথা—গীতার মধ্যে সত্য সত্যই যে রহস্য আছে—সে যে-কোন সম্প্রদায়ের বা পন্থার হউক না কেন—গীতাভক্তদিগের মধ্যে তাহার প্রচার করিয়া, স্বয়ং ভগবানের কথা প্রমাণে এই জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠানে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। এবং আমি আশা করি, তাহার পূর্ণ সিদ্ধি সম্পাদনার্থ, উপরে যে জ্ঞানভিক্ষা চাওয়া হইয়াছে, আমাদের দেশবন্ধু ও ধর্ম্মবন্ধু আনন্দের সহিত আমাকে সেই ভিক্ষা দিবেন।

প্রাচীন টীকাকারগণ কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত গীতার তাৎপর্য্য এবং আমাদের মতানুসারে গীতার রহস্য এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কেন হইয়াছে তাহার কারণ গীতারহস্যে বিস্তারিতরূপে বলা হইয়াছে। কিন্তু গীতাতাৎপর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ হইলেও, গীতা সম্বন্ধে যে সকল বহুল ভাষ্য ও টীকা আছে, অথবা পূর্ব্বে ও অধুনা প্রচলিত লোক-ভাষায় যে ভাষান্তর হইয়াছে, এই গ্রন্থ লিখিবার সময়, তাহাদের হইতে প্রসঙ্গানুসারে নানা বিষয়ে অল্প বিস্তর সাহায্য লাভ করায় তাহাদের নিকট আমি অত্যন্ত ঋণী আছি, এ কথা এখানে বলা আবশ্যক। সেইরূপ স্থানে স্থানে যে সকল পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি হইতে সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছি, সে জন্যও তাহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আবশ্যক। কিংবহুনা, যে সকল গ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত এই গ্রন্থ লেখা হইত কি হইত না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায়, এই প্রস্তাবনার আরম্ভেই "সাধুদের উচ্ছিষ্ট যা' তাই আমি বলিতেছি শেষে" তুকারাম বাবার এই বাক্য আমি স্থাপন করিয়াছি। সর্ব্বকাল এক সমান হইয়া পড়ায়, গীতার ন্যায় যে গ্রন্থ ত্রিকালে অবাধিত জ্ঞানের উপদেশ করেন, তাহার মধ্যে কালভেদানুগত জ্ঞানের নূতন নূতন স্ফুরণ মনুষ্যগণ যে প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। কারণ এইরূপ ব্যাপক গ্রন্থের ধর্ম্মই এই। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থের আলোচনায় এতটা পরিশ্রম যে করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, ইংরেজি, জর্ম্মান ভাষায় গীতার ভাষান্তর যে করিয়াছেন তাহা ন্যায্যই হইয়াছে। এই সকল ভাষান্তর,প্রায়ই গীতার প্রাচীন টীকাকারদিগেরই অনুসরণ করিয়াছে। তথাপি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বাধীনভাবে গীতা-তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু যথার্থ (কর্ম্ম) যোগের তত্ত্ব অথবা বৈদিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়দিগের ইতিহাস ঠিক উপলব্ধি না হওয়া প্রযুক্ত, অথবা বহিরঙ্গ-পরীক্ষার দিকে তাঁহাদের বিশেষ ঝোঁক থাকায়, কিম্বা এইরূপ অন্য কোন কারণে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এই সকল আলোচনা বড়ই অপূর্ণ ও কোন কোন স্থলে নিশ্চিতরূপে ভ্রমপূর্ণ হইয়াছে। এই গ্রন্থে গীতাসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তের সবিস্তর বিচার কিংবা পরীক্ষা করিবার কোন হেতু নাই। তাঁহাদিগের উপস্থাপিত মুখ্য মুখ্য প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের কি বল্‌বার আছে, তাহা এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট প্রকরণে দেওয়া হইয়াছে। তথাপি অধুনা গীতা সম্বন্ধে যে সকল ইংরেজি লেখা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ এইখানে করা আবশ্যক। প্রথম লেখাটি মিঃ ব্রুক্সের। ব্রুক্স থিওসোফিষ্ট

পন্থী হওয়ায়, ভগবদ্‌গীতার তাৎপর্য্য কর্ম্মযোগপর এইরূপ তিনি তাঁহার গীতাসম্বন্ধীয় গ্রন্থে নিরূপণ করিয়াছেন এবং নিজের বক্তৃতাদিতেও এই মত প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় লেখা মাদ্রাজের মিঃ এস্ রাধাকৃষ্ণর। এই লেখা ক্ষুদ্র নিবন্ধরূপে আমেরিকায় "সার্ব্বরাষ্ট্রীয় নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ত্রৈমাসিকে" প্রকাশিত হইয়াছে (জুলাই ১৯১১)। ইহাতে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও নীতিধর্ম্ম এই দুই বিষয় সম্বন্ধে, গীতা ও কাণ্টের মধ্যে সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের মতে এই সাম্য ইহা অপেক্ষাও অধিক ব্যাপক হওয়ায়, কাণ্ট অপেক্ষাও গ্রীনের নৈতিক উপপত্তির সহিত গীতার অধিক মিল আছে। কিন্তু এই দুই প্রশ্নেরই মীমাংসা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে বলিয়া তাহার পুনরুক্তি এখানে আর করিলাম না। সেইরূপ পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের "কৃষ্ণ ও গীতা" নামক এক ইংরেজি গ্রন্থও সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ায়, তাহাতে উক্ত পণ্ডিতের প্রদত্ত বারোটি বক্তৃতা ছাপা হইয়াছে। কিন্তু ইহাঁর সহিত, অথবা মিঃ ব্রুক্সের সহিত আমাদের প্রতিপাদিত মতের বিস্তর প্রভেদ আছে তাহা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। তথাপি উপরি উক্ত লেখা প্রমাণে গীতাসম্বন্ধে আমাদের বিচার আলোচনা অ-পূর্ব্ব না হওয়ায়, গীতোক্ত কর্ম্মযোগের প্রতি লোকের অধিকাধিক দৃষ্টি পড়িতেছে ইহা একটা সুচিহ্ন বলিতে হইবে, এইজন্য আমরা আধুনিক লেখকদিগকে এইখানে অভিনন্দন করিতেছি।

এই গ্রন্থ মন্দলে লেখা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু উহা উড্‌পেন্সিলে লিখিত হওয়ায়, তাহাতে অনেক স্থানে কাটাকাটি ও সংশোধন করা হইয়াছিল। তাই, পরে উহা সরকার বাহাদুরের হাত হইতে ফেরত আসিলে পর, ছাপাইবার জন্য উহার সংশুদ্ধ পাঠ নকল করা আবশ্যক হয়; এবং এই কাজের ভার আমাদের উপর পড়িলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরো কত মাস লাগিত কে জানে! কিন্তু রাঃ রাঃ বামন-গোপাল-জোশী, নারায়ণ-কৃষ্ণ-গোগটে, রামকৃষ্ণ দত্তাত্রেয়-পরাড়কর, রামকৃষ্ণ-সদাশিব-পিম্প্‌টকর, অপ্পাজি-বিষ্ণুকুলকর্ণী প্রভৃতি সদাশয় ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই কার্য্যে সাহায্য করায় উহা শীঘ্রই শেষ হইয়াছিল, এইজন্য তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। সেইরূপ রাঃ রাঃ কৃষ্ণাজি প্রভাকর-কাশীনাথ.শাস্ত্রী খাড়িলকর এবং বিশেষরূপে বেদশাস্ত্রসম্পন্ন দীক্ষিত কাশীনাথ শাস্ত্রী লেলে ইহাঁরাও বোম্বাই হইতে এখানে আসিয়া গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠের কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন এবং বড়ই উপযুক্ত ও মর্ম্মার্থসূচক পরামর্শ দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের প্রতি ঋণী আছি। তথাপি গ্রন্থ-প্রতিপাদিত মত সম্বন্ধে সমস্ত জবাবদিহি আমাদেরই, একথা কেহ যেন বিস্মৃত না হন। এইরূপে গ্রন্থখানি ছাপাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যুরোপের মহাযুদ্ধের দরুণ, কাগজের অভাব পড়িয়াছিল। বোম্বায়ের স্বদেশী কাগজের কারখানার মালিক "মেঃ পদমজী অ্যাণ্ড সন্" সময়মত আমাদের অভিপ্রায় অনুসারে ভালো কাগজ সরবরাহ করায় কাগজের অভাব দূর হয়। এবং গীতার গ্রন্থ ভাল স্বদেশী কাগজে ছাপাইতে পারা গিয়াছিল। তথাপি গ্রন্থ ছাপিবার সময় উহা আন্দাজের অতিরিক্ত বাড়িয়া যাওয়ায় পুনর্ব্বার কাগজের অভাব পড়ে; এবং "পেপর-মিলের" মালিকেরা এই অভাব যদি পূর্ণ না করিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পাঠকদিগের আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করিতে হইত। এইজন্য, উপরি-উক্ত দুই কারখানার মালিকদের প্রতি শুধু আমাদিগের নহে, পাঠকদিগের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আবশ্যক। পরিশেষে রাঃ রাঃ রামকৃষ্ণ-সদাশিব-পিম্প্‌টকর ও রাঃ রাঃ হারে-রঘুনাথ-ভাগবত প্রুফ সংশোধনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতেও স্থানে স্থানে লিখিত অপর গ্রন্থাদির উল্লেখ ঠিক আছে কিনা এবং কোথাও অসম্পূর্ণ আছে কিনা তাহা নিরীক্ষণের ভার রাঃ রাঃ হরি-রঘুনাথ-ভাগবত একাকীই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইহাঁদের সাহায্য ব্যতীত এই গ্রন্থ এত শীঘ্র কেবল আমাদের দ্বারাই প্রকাশিত হইতে পারিত না। এইজন্য ইহাঁদের সকলের প্রতি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সর্ব্বশেষে "চিত্রশালা-ছাপাখানা"র মালিক এই কাজ অতীব যত্নের সহিত এবং যতটা সম্ভব শীঘ্র ছাপিয়া দিবার ভার গ্রহণ করায় তাঁহার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন হইলেও তাহা হইতে অন্ন প্রস্তুত হইয়া ভোজনার্থীর মুখে পড়া পর্য্যন্ত যেমন অনেক লোকের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে সেইরূপ কতকটা গ্রন্থকারদিগের—নিদেন পক্ষে আমাদের—অবস্থা, এইরূপ বলা যাইতে পারে। সেইজন্য, উক্ত প্রকারে যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহাদের সকলের নাম উপরে বলা হউক বা না হউক—আমরা পুনর্ব্বার তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া এই প্রস্তাবনা শেষ করিলাম।

প্রস্তাবনা সমাপ্ত হইল। এক্ষণে যে বিষয়ের আলোচনায় আজ অনেক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এবং যাহার সহিত নিত্য সহবাসে ও যাহার চিন্তায় মন সমাহিত হইয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছে, সেই বিষয় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়া আমার হাত ছাড়া হওয়ায় যদিও আমার খারাপ লাগিতেছে তথাপি এই বিচার আলোচনা—সম্ভব হইলে

টীকার সহিত, নচেৎ যেমনটি আছে তেমনি—উত্তর-বংশীয়দিগকে দিবার জন্য, আমাদের উপলব্ধ হওয়ায়, বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্গত রাজগুহ্যের এই পরশপাথর—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" "উঠ, জাগো ও এই বর বুঝিয়া লও"—এই কঠোপনিষদের মন্ত্রের দ্বারা প্রেমাদর পূর্ব্বক আমার আশাস্থল ভাবী পাঠকদিগের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইহাতে কর্ম্ম অকর্ম্মের সকল বীজই আছে ; এবং ইহা ধর্ম্মসংক্রান্ত স্বল্প আচরণকেও খুব সংকটের অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, ইহা স্বয়ং ভগবানের আশ্বাস-বাক্য। ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি চাই? "করা-ব্যতীত কিছুই হয় না" সৃষ্টির এই নিয়ম মনে রাখিয়া, তুমি কেবল নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ত্তা হইয়া কাজ করিলেই যথেষ্ট হইল। কেবল স্বার্থপর বুদ্ধিতে শ্রান্তক্লান্ত সাংসারিক লোকদিগের সময় কাটাইবার জন্য কিম্বা সংসার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইবার জন্যও গীতা কোন কথা বলেন নাই। সংসারে মোক্ষদৃষ্টিতে কিরূপ করা উচিত এবং মনুষ্যমাত্রের সংসারে প্রকৃত কর্ত্তব্য কি, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ইহার উপদেশ করিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তাই, পূর্ব্ব বয়সের গৃহস্থাশ্রমের কিংবা সংসারের প্রাচীন শাস্ত্র যত শীঘ্র বুঝিয়া লওয়া যায় তত শীঘ্রই প্রত্যেকে বুঝিয়া লইবেন, তাহাতে শৈথিল্য করিবেন না, এই আমার শেষ মিনতি। পুনা বৈশাখ ১৮৬৭ শক—বালগঙ্গাধর টিলক। ইতি প্রস্তাবনা সমাপ্ত।

ভুবন আনন্দময়।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এ)

ভুবন তোমার দুঃখময়
এই কি শেষে বল্‌বে জনে?
এই আকাশ পানে তাকিয়ে তারা
শপথ করে বল্‌বে মনে?
পারবে কি তা পার্‌বে কি গো—
থাক্‌না দুঃখ দহন শত?—
কমল হয়ে ফুটচে যে গো
যে ব্যথার কাঁটা করচে ক্ষত।
জ্বলছে আগুণ দারিদ্র্যেরি
তারও মাঝে দেখ্‌রে আলো;
অগ্নি-কণা ঢালছে সোনা
করছে নাশ আঁধার কালো।
তোমার ঝরছে যে গো সুধার ধারা
মানুষ তারে বলবে কি—না?
ভোরের আলোয় নিশার কালোয়
গলছে সুধা গলছে সোনা।
ফুলের বুকে কি গন্ধ ও—
বল্‌বো কি তা বিষেই ভরা?
বল্‌তে মোরা পার্‌ব না গো—
পিছনে তার আকাশ ধরা।
ঝরছে সুধা ফুলের বনে
ঝর্‌ছে সুধা চন্দ্রমাতে
ঝর্‌ছে সুধা হৃদয় মনে
ঝর্‌ছে প্রাণের আঙ্গিনাতে।
দুঃখ মোরা নিজেই গড়ি
অপরাধী নিজেই মোরা
সাক্ষী তাহার বন বিহগ
সাক্ষী আকাশ তপন তারা।
আয় রে তোরা বেরিয়ে আয়
ঝর্‌ছে সুধা প্রাণ ভরি নে;
দুঃখ ভরা শ্যামল ধরা,
মিছে অপবাদ রটাস্ নে॥

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

মূল। দ্বিতীয়াধ্যায়গত পাদার্থান্ বিভজতে—

দ্বিতীয়ে স্মৃতিতর্কাভ্যামবিরোধোঽন্যদুষ্টতা।
ভূতভোক্তৃশ্রুতের্লিঙ্গশ্রুতেরপ্যবিরুদ্ধতা॥ ৬॥

প্রথম পাদে—সাংখ্যযোগকাণাদাদিস্মৃতিভিঃ সাংখ্যাদিপ্রযুক্ততর্কৈশ্চ বিরোধো বেদান্তসমন্বয়স্য পরিহৃতঃ। দ্বিতীয়পাদে সাংখ্যাদিমতানাং দুষ্টত্বং দর্শিতং। তৃতীয়পাদে—পূর্ব্বভাগেণ পঞ্চমহাভূতশ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধঃ পরিহৃতঃ উত্তরভাগেণ জীবশ্রুতীনাং। চতুর্থপাদে লিঙ্গশরীরশ্রুতীনাং বিরোধপরিহারঃ॥

অনুবাদ। (ব্রহ্মসূত্রের) দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত পাদসমূহের বিষয়গুলিকে বিভক্ত করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্মৃতি ও তর্কের সহিত অবিরোধ, অন্যমতের দোষ, ভূত ও ভোক্তাবিষয়ক শ্রুতির অবিরোধ এবং লিঙ্গশরীরবিষয়ক শ্রুতির অবিরুদ্ধতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(এই অধ্যায়ের) প্রথম পাদে সাংখ্য, যোগ, ও কাণাদাদি স্মৃতিসমূহ এবং সাংখ্যাদি শাস্ত্রে প্রযুক্ত তর্কসমূহের সহিত বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধের পরিহার প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি মতবাদসমূহের দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়পাদের প্রথমাংশে পঞ্চমহাভূতবিষয়ক শ্রুতিসমূহের পরস্পরবিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। চতুর্থ

পাদে লিঙ্গশরীরবিষয়ক শ্রুতিসমূহের পরস্পর-বিরোধের পরিহার আলোচিত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রকে চারি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া আবার সেই চারি অধ্যায়ের এক একটীকে চারি চারিটী পাদে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের চারিটী পাদে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইবারে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত চারিটী পাদের বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। স্মৃতি অর্থে সাধারণতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝায়, কারণ সেগুলি শ্রুতি বা বেদোক্ত বিষয় সকল স্মরণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। এখানেও সেইরূপ বেদ বা শ্রুতির স্মৃতির উপরেই সাংখ্যযোগাদি দর্শনসমূহ দণ্ডায়মান বলিয়া সেগুলিও স্মৃতি নামে অভিহিত হয়। ভারতীয় আর্য্যগণের ধারণা এই যে সাংখ্যাদি দর্শনসমূহেরও মূল বেদশাস্ত্রের ভিতরেই প্রোথিত আছে এবং সেই মূলতত্ত্বগুলির স্মরণের উপরই নানাবিধ দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই সেগুলিকেও স্মৃতি বলা যায়। এখন, বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ে যে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্য, যোগ, কাণাদ (বৈশেষিক) প্রভৃতি দর্শন এবং সেই দর্শনোক্ত তর্কসমূহের সহিত উক্ত সমন্বয়ের অবিরোধ দেখানো হইয়াছে, অর্থাৎ সাংখ্য অবধি বেদান্ত পর্য্যন্ত সকল দর্শনেরই মূল লক্ষ্য এক, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি মতবাদের দুষ্টত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ সাংখ্যাদি দর্শনে যে প্রকারে উহাদের মতসমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই ব্যাখ্যাসমূহের অন্যায্যত্ব দেখানো হইয়াছে। তৃতীয় পাদের প্রথমাংশে পঞ্চমহাভূতবিষয়ক শ্রুতিসমূহের পরস্পর-বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। কোন শ্রুতিবাক্যে আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি দেখা যায়, কোন শ্রুতিতে বা আত্মা হইতে তেজের উৎপত্তি দেখা যায়। এইরূপ বিরোধাভাস বাক্যসমূহের প্রকৃতপক্ষে অবিরোধ দর্শিত হইয়াছে। সেইরূপ তৃতীয় পাদের শেষাংশে ভোক্তা বা জীববিষয়ক শ্রুতিসমূহের পরস্পর-অবিরোধ দেখানো হইয়াছে। "যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি বলা হইয়াছে—কাজেই উৎপন্ন জীবের নাশও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের একাত্মভাব সূচিত হইতেছে। এখন, উপরোক্ত দুইটী শ্রুতি দেখিলে সহসা উহারা পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আলোচ্য পাদে দেখানো হইয়াছে যে উহাদের পরস্পরের মধ্যে সত্যসত্য কোন বিরোধ নাই। চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীর বিষয়ক শ্রুতি সমূহের মধ্যে বিরোধের অভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন, এই সতেরোটীর সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর নাম দেওয়া হইয়াছে। কোন শ্রুতিতে সপ্তসংখ্যক ইন্দ্রিয়ের কথা দেখা যায়, আবার কোন শ্রুতিতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ দেখা যায়। এইরূপ বিভিন্ন শ্রুতির মধ্যেও যে প্রকৃত কোনই বিরোধ নাই, কেবল ব্যাখ্যাদির দোষেই যে বিরোধের আভাস দেখা যায়, তাহাই চতুর্থ পাদে বুঝানো হইয়াছে।

মূল। তৃতীয়াধ্যায়গত পাদার্থান্ বিভজতে—

তৃতীয়ে বিরক্তিস্তত্ত্বং পদার্থপরিশোধনং।
গুণোপসংহৃতিজ্ঞানবহিরঙ্গাদিসাধনং ॥

প্রথম পাদে জীবস্য পরলোকগমনাগমনে বিচার্য্য বৈরাগ্যং নিরূপিতং। দ্বিতীয় পাদে পূর্ব্বভাগেণ ত্বংপদার্থঃ শোধিতঃ, উত্তরভাগেণ তৎপদার্থঃ। তৃতীয় পাদে সগুণবিদ্যাসু গুণোপসংহারো নিরূপিতঃ। নির্গুণেব্রহ্মণ্যপুনরুক্তপদোপসংহারশ্চ। চতুর্থপাদে নির্গুণজ্ঞানস্য বহিরঙ্গসাধনভূতানি আশ্রমযজ্ঞাদীনি, অন্তরঙ্গ সাধনভূত শমদমনিদিধ্যাসনাদীনিচ নিরূপিতানি।

অনুবাদ। (ব্রহ্ম সূত্রের) তৃতীয় অধ্যায়ের পাদ সমূহের বিষয়গুলিকে বিভক্ত করা যাইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বৈরাগ্য, তত্ত্বংপদার্থের বিবৃতি, গুণের উপসংহার এবং জ্ঞানের বহিরঙ্গাদিসাধন (আলোচিত হইয়াছে।)

প্রথমপাদে জীবের পরলোকে গমনাগমন বিচার করিয়া বৈরাগ্য আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদের পূর্ব্বভাগে "ত্বং" পদের অর্থ এবং উত্তর ভাগে "তৎ" পদের অর্থ সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে সগুণ জ্ঞানসমূহে (উপনিষদুক্ত) সকল গুণের এবং নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে সকৃদুক্ত পদের উপসংহার করা হইয়াছে। চতুর্থপাদে নির্গুণ জ্ঞানের বহিরঙ্গসাধন আশ্রম যজ্ঞাদি এবং অন্তরঙ্গসাধন শমদমনিদিধ্যাসন প্রভৃতি বিষয় সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সর্ব্বপ্রথম জীবের পরলোকে গমনাগমন বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং তৎপরে বৈরাগ্যতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সংসারে অনিত্যবুদ্ধি না আসিলে বৈরাগ্য আসা দুরূহ বলিয়া সেই অনিত্যবুদ্ধি আনিবার সহায় স্বরূপে সর্ব্বপ্রথম পরলোকগমনের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগে ত্বং শব্দের প্রকৃত তত্ত্ব এবং শেষ ভাগে তৎ-শব্দের প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রকৃত পক্ষে নির্গুণ, অর্থাৎ আমরা যাহাকে গুণ বলি, সেই গুণের অতীত বা সেই গুণশূন্য। তথাপি

উপনিষদ সমূহের অনেক স্থলে ব্রহ্মকে সগুণভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন, উপনিষদের যেখানে যে গুণের উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত গুণ এই পাদে ব্রহ্মের সগুণত্ব বিচার উপলক্ষে সম্যক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক অনেকগুলি পদ আছে যেগুলি উপনিষদে পুনঃ পুনঃ উক্ত হয় নাই। একমেবাদ্বিতীয়ং প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও দুর্ব্বোধ্য অনেক পদ উপনিষদের নানাস্থানে বারম্বার উক্ত হইয়া জনসাধারণের সহজবোধ্য হইয়াছে, কিন্তু সেই সকল পদের অতিরিক্ত এমন অনেক পদ আছে যেগুলি উপনিষদে একটীবারমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক সকৃদুক্ত পদসমূহও তৃতীয়পাদে সংগৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধন দুই প্রকার—বাহিরের ও অন্তরের। নির্গুণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার সাধনেরও দুইটী অঙ্গ—বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ। যথাযুক্ত আশ্রম অবলম্বন, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান—এই সকল ক্রিয়াকলাপ হইল উক্ত সাধনের বহিরঙ্গ এবং শমদমাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধিই হইল উহার অন্তরঙ্গ। চতুর্থ পাদে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান-লাভের এই দুইটী অঙ্গই আলোচিত হইয়াছে।

মূল। চতুর্থাধ্যায়গতপাদার্থান্ বিভজতে—

চতুর্থে জীবতো মুক্তিরুৎক্রান্তের্গতিরুত্তরা।
ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্রহ্মলোকাবিতি পাদার্থসংগ্রহঃ॥ ৮॥

প্রথম পাদে—শ্রবণাদ্যাবৃত্ত্যা নির্গুণমুপাসনয়া সগুণং বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃত্য জীবতঃ পাপপুণ্যলেপ-বিনাশলক্ষণা মুক্তিরভিহিতা। দ্বিতীয়পাদে—ম্রিয়-মাণস্যোৎক্রান্তিপ্রকারো নিরূপিতঃ। তৃতীয়পাদে—সগুণবিদো মৃতস্যোত্তরমার্গোঽভিহিতঃ। চতুর্থ-পাদে—পূর্ব্বভাগেণ নির্গুণব্রহ্মবিদো বিদেহকৈবল্য প্রাপ্তিরভিহিতা। উত্তরভাগেণ সগুণব্রহ্মবিদো ব্রহ্মলোকে স্থিতির্নিরূপিতা। এবং পাদার্থাঃ সং-গৃহীতাঃ॥

অনুবাদ। চতুর্থ অধ্যায়ের পাদার্থসমূহকে বিভক্ত করা যাইতেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে জীবন্মুক্তি, উৎক্রান্তিপ্রকার, উত্তর গতি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং ব্রহ্মলোক, এই কয়টী বিষয় উক্ত হইয়াছে। পাদার্থ-সংগ্রহ সমাপ্ত হইল।

চতুর্থ-অধ্যায়ের প্রথম পাদে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মননাদি দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম অথবা উপাসনা দ্বারা সগুণ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করিলে জীবিত ব্যক্তির পাপপুণ্যের আবরণবিনাশস্বরূপ যে মুক্তি, তাহাই অভিহিত হইয়াছে। দ্বিতীয়পাদে মরণোন্মুখ ব্যক্তির উৎক্রান্তিপ্রকার নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে সগুণবেত্তা মৃত ব্যক্তির উত্তরমার্গ বিবৃত হইয়াছে। চতুর্থ পাদের প্রথম অংশে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীররহিত কৈবল্যপ্রাপ্তি এবং শেষাংশে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মলোকে স্থিতি নিরূপিত হইয়াছে। এই প্রকারে পাদার্থসমূহ সংগৃহীত হইল।

তাৎপর্য্য। বেদান্ত মতে দুই প্রকারে জীব-মুক্তিলাভ হয়—শ্রবণাদির আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ শ্রবণমননাদি অবলম্বনে নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-কারের দ্বারা এবং উপাসনা অবলম্বনে সগুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের দ্বারা। বেদান্ত মতে মুক্তির অর্থে পাপ ও পুণ্য উভয়েরই বিনাশ অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তি পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অতীত হইবেন। পাপ থাকিলেই পুণ্য সূচিত হয় এবং পুণ্যের দ্বারাও পাপ সূচিত হয়; সেই কারণে বেদান্ত মতে মুক্ত পুরুষ পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অতীত হইয়া নির্ম্মল থাকিবেন। প্রথম পাদে এই জীবন্মুক্তি আলো-চিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে মনুষ্যের মরণোন্মুখ অবস্থায় তাহার আত্মা কি ভাবে পরলোক গমন করিবে বা উৎক্রান্ত হইবে তাহারই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তৃতীয় পাদে—সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পর যে উপনিষদুক্ত উত্তরমার্গ বা দেবযানপন্থা অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-লোকের অভিমুখে অগ্রসর হয়েন, এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর মৃত্যুর পর যে পুন-রায় কোন প্রকার শরীর ধারণ করিতে হয় না এবং কৈবল্য বা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্তি হয়, এই বিষয় চতুর্থ পাদের প্রথমাংশে নিরূপিত হইয়াছে এবং এই পাদের শেষাংশে সগুণ ব্রহ্মোপাসকের মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে স্থিতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত বৈয়াসিক ন্যায়মালা গ্রন্থের উপোদ্-ঘাত প্রকরণে অথবা মুখবন্ধে ব্যাসদেবকৃত চতুরধ্যায়ী ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত চারিটী চারিটী পাদের আলোচ্য বিষয়সমূহ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

মহর্ষিদেবের দীক্ষার দিন স্মরণ করিয়া শান্তি-নিকেতনে উৎসবের প্রতিষ্ঠা, আগামী ৭ই পৌষ তদুপলক্ষে বোলপুরে প্রাতে ও সায়াহ্নে ব্রহ্মো-পাসনা হইবে। সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

একমেবাদ্বিতীয়ং

উনবিংশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৭।

৮৮২ সংখ্যা। ১৮৩৮ শক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

বেদাধ্যয়নার্থ কাশীধামে ছাত্র-প্রেরণ এবং ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতালাভ।

বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে যে কিরূপ সামান্য ঘটনা হইতে কিরূপ মহৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহা কে জানে? ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই-রূপ এক আশ্চর্য্য বিধানের কার্য্য দৃষ্ট হয়। কোথায় দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র কুড়াইয়া পাইলেন, তাহার ফলে তত্ত্ববোধিনী সভা হইল, সেই সভার আশ্রয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইল। সেই পত্রিকা হইতে বলিতে গেলে মাসিক পত্রসমূহের জন্ম সূচিত হইল এবং বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়সমূহের লিখনপ্রণালী দাঁড়াইয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ভগবদ্বিধানের আরও একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। সেই উপনিষদের ছিন্ন পত্র পাইবার ফলে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষৎসমূহ অধ্যয়ন করিয়া বেদবেদান্তের প্রতি তাঁহার হারাণো শ্রদ্ধা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তিনি অক্ষয়কুমারের বিরুদ্ধে বেদবেদান্তের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হইলেন। পরিণামে বেদবেদান্ত অধ্যয়ন পূর্ব্বক তাহাদের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণার্থ দেবেন্দ্রনাথ কয়েক জন ছাত্রকে কাশীধামে প্রেরণ করিলেন। ইহারই অবান্তর—অবান্তর বলি কেন, প্রত্যক্ষ ফল ভারতবর্ষে এবং ইউরোপে বেদবেদান্তের আলোচনা বিস্তার।

ডফ সাহেবপ্রমুখ মিশনরিগণ যখন হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তীব্র নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "বেদান্ত মতের সমর্থন" (Vedantic doctrines vindicated) নামক একটী ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হিসাবে অথবা ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বসম্মত মত-রূপে প্রকাশ করিতে অস্বীকার করায় ইহা ব্যক্তি-বিশেষের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথই এই প্রবন্ধ লিখাইয়াছিলেন। পত্রিকাতে ইহা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বাবধিই অক্ষয়কুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বেদবেদান্তের মতামত লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইত শ্রুত হওয়া যায়। এইরূপ বাদানু-বাদের ফলে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্ম্মের তথাকথিত মূল বেদচতুষ্টয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইলেন। ১৭৬৫ শকে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার নামে "এতদ্দেশে তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনের চালনার নিমিত্ত" একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া চারি জন ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। কিন্তু বেদবিষয়ক বাদানুবাদের কারণে তিনি কাশীধাম হইতে মূলবেদের তত্ত্ব সংগ্রহ কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বেদাধ্যয়নের জন্য কাশীধামে ছাত্র প্রেরণ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি-

লেন এবং তথায় পূর্ব্বোক্ত ছাত্রচতুষ্টয়ের অন্যতর আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে ১৭৬৬ শকে মূল চতুর্ব্বেদ ও বেদান্তদর্শন প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে প্রতিলিপি বা ক্রয় দ্বারা সংগ্রহ পূর্ব্বক শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কাশীধামে প্রেরণ করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্বন্ধে বলেন—"রামমোহন রায়ের যত্নে তখন কয়েকখানা উপনিষৎ ছাপা হইয়াছিল এবং যাহা ছাপা হয় নাই এমত কয়েক খানি উপনিষৎ আমিও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু বিস্তৃত বেদের বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না। বঙ্গদেশে বেদের লোপই হইয়া গিয়াছে। টোলে টোলে ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র পড়া হয়, অনেক ন্যায়বাগীশ স্মার্ত্তবাগীশ সেখান হইতে বাহির হন, কিন্তু সেখানে বেদের নামগন্ধ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম যে বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা, তাহা এদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; কেবল বেদবিরহিত নামমাত্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণ সকল রহিয়া গিয়াছেন। দুই একজন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভিন্ন কেহ তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা বন্দনার অর্থ পর্য্যন্ত জানেন না। আমার বিশেষরূপে বেদ জানিবার জন্য বড়ই আগ্রহ জন্মিল। বেদের চর্চ্চা কাশীতে, অতএব সেখানে বেদশিক্ষা করিবার জন্য ছাত্র পাঠাইতে আমি মানস করিলাম। একজন ছাত্রকে ১৭৬৬ শকে কাশীধামে প্রেরণ করিলাম। তিনি তথায় মূল বেদসমুদয় সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন।"

একজনের পক্ষে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন বহুকালসাধ্য এবং চারিজনের দ্বারা চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন অল্পকালে সম্পন্ন হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা হওয়াতে পর বৎসর গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের বিশেষ আনুকূল্যে আর তিনজন ছাত্র কাশীধামে প্রেরিত হইলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের ব্যয়ে চারিজন ছাত্র (আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বেদান্তবাগীশ, রমানাথ বিদ্যানিধি, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার এবং তারকনাথ তত্ত্বনিধি) চারি বেদ অর্থ সহিত শিক্ষা করিতে নিযুক্ত থাকিলেন। এই চারিজনের মধ্যে আনন্দ চন্দ্র এবং তারকনাথ ইতিপূর্ব্বেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেদ শিক্ষা পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের উপযুক্ত হইবার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে থাকিয়া শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ছাত্রবৃত্তি পাইতেছিলেন।

একদিকে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদেই উক্ত দেখিলেন যে বেদাদি সকল বিদ্যাই অপরা বিদ্যা এবং যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা; * অপরদিকে ১৭৬৭ শকে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বেদের অভ্রান্ততা ও নিত্যতাবিষয়ক বাদানুবাদ বড়ই তীব্রতা ধারণ করিল। ১৭৬৮ শকে এই বিষয়ে জগদ্বন্ধু পত্রিকার সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বাদানুবাদ প্রকাশ্যে চলিতে থাকে। অক্ষয়কুমার দত্ত জগদ্বন্ধু পত্রিকার সমর্থনে উদ্যত। তখন দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং কাশী যাইয়া বেদের তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রস্তুত হইলেন। ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসে লালা হাজারীলালকে সঙ্গে লইয়া তিনি পাল্কীর ডাকে কাশী যাত্রা করিলেন। গঙ্গাতীরে মানমন্দিরে তাঁহার বাসস্থান হইল।

পূর্ব্বোক্ত ছাত্রচতুষ্টয় তাঁহাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ পাঠের অবস্থা ও কাশীর অন্যান্য সংবাদ তাঁহাকে জানাইলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে বলিলেন—"কাশীর প্রধান প্রধান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমার এখানে একটা সভা করিতে হইবে। আমি সব বেদ শুনিতে চাই এবং বেদের অর্থ বুঝিতে চাই। রমানাথ! তুমি তোমার ঋগ্বেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। বাণেশ্বর! তুমি তোমার যজুর্ব্বেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। তারকনাথ! তুমি তোমার সামবেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর সামবেদী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। আনন্দচন্দ্র! তুমি তোমার অথর্ব্ববেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। এই প্রকারে কাশীর সকল ব্রাহ্মণদিগের নিমন্ত্রণ হইয়া গেল। কাশীতে একটা রব উঠিল যে, বাঙ্গালা হইতে কে একজন শ্রদ্ধাবান যজমান আসিয়াছেন, তিনি সমস্ত বেদ শুনিতে চান।"

দেবেন্দ্রনাথ সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার আত্ম-

চরিতে সুবর্ণিত দেখিতে পাই। তিনি বলেন—"আমার কাশী পঁহুছিবার তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকালে মান-মন্দিরের প্রশস্ত গৃহ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহাদের সকলকে চার পংক্তিতে বসাইলাম। ঋগ্বেদের এক পংক্তি, যজুর্ব্বেদের দুই পংক্তি এবং অথর্ব্ববেদের এক পংক্তি, সামবেদের দুইটী মাত্র বালক; তাহাদিগকে আমার পার্শ্বে বসাইলাম। তাহারা নূতন ব্রহ্মচারী, এখনো তাহাদের কর্ণে কুণ্ডল আছে। তাহাতে তাহাদের মুখে বড় শোভা হইয়াছে। বাণেশ্বর চন্দনের বাটী লইলেন, তারকনাথ ফুলের মালা লইলেন, রমানাথ কাপড়ের থালা লইলেন এবং আনন্দচন্দ্র ৫০০৲ পাঁচশত টাকা লইলেন। ব্রাহ্মণের ললাটে বাণেশ্বর যেমন চন্দনের ফোঁটা দিলেন, অমনি তারকনাথ তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিলেন; রমানাথ তৎপরে তাঁহাকে একখানা থান কাপড় দিলেন; অবশেষে আনন্দচন্দ্র তাঁহার হস্তে দুইটী টাকা দিলেন। এইরূপে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ফোঁটা, মালা, কাপড় ও মুদ্রা বিতরিত হইল। ব্রাহ্মণেরা এই পূজা গ্রহণে প্রহৃষ্ট হইয়া বলিলেন, 'যজমান বড় শ্রদ্ধাবান্, কাশীতে এরূপ কেহই করেন নাই।' আমি যোড়হস্তে বলিলাম, এখন আপনারা বেদপাঠ করিয়া আমাকে পবিত্র করুন।" সকলকে যথাযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে দেবেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্যরূপ সিদ্ধ ছিলেন।

প্রথমে ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা সকলে মিলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে উৎসাহ সহকারে "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং" পাঠ করিলেন। তাহার পরে যজুর্ব্বেদীরা যজুর্ব্বেদ আরম্ভ করিলেন। যজুর্ব্বেদের বিভাগ অনুসারে যজুর্ব্বেদীগণও দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদী এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদী; কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ প্রাচীনতর বলিয়া কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীগণ আপনাদিগকে অধিকতর সম্মানের যোগ্য বলিয়া মনে করেন। ঘটনাক্রমে সে দিন শুক্ল যজুর্ব্বেদী সম্প্রদায় প্রথমে পাঠ আরম্ভ করাতে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীগণ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের প্রাচীনতার উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিবার কথা জানাইলেন। দেবেন্দ্রনাথ উভয় সম্প্রদায়কে এবিষয় আপোষে মিটমাট করিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। তখন উভয় সম্প্রদায়ে বিবাদ বাধিয়া গেল—কে আগে পড়িবে। দেবেন্দ্রনাথ যখন দেখিলেন যে তাঁহাদের বিবাদ আর কোন মতে মিটে না, তখন তিনি তাঁহাদের দুই দলকেই একত্র পড়িতে বলিলেন। এই কথায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া দুইদলেই উচ্চৈঃস্বরে গোলমালে পড়িতে লাগিলেন—কিছুই বুঝা গেল না। তখন দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমাদের দুই দলেরইতো মান রক্ষা হইল, এখন একদল পাঠ কর।" ফলে, প্রথমে শুক্ল যজুর পাঠ হইয়া পরে কৃষ্ণ যজুর পাঠ হইল। যজুর্বেদ পাঠ করিতে অনেক সময় লাগিল। যজুর্বেদ পাঠ শেষ হইলেই সামবেদী বালকদ্বয় সুমধুর স্বরে "ইন্দ্র আয়াহি" সামগান ধরিল। দেবেন্দ্রনাথের নিকটে শুনিয়াছি যে এমন সুমিষ্ট গান তিনি আর কখনো শুনেন নাই। সর্ব্বশেষে অথর্ব্ববেদীরা পড়িলেন। সর্ব্বশেষে একজন ব্রাহ্মণ দেবেন্দ্রনাথকে এক যজ্ঞ দেখিতে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার সম্প্রদায়ে যজ্ঞে জীবিত পশুবধের পরিবর্ত্তে ময়দা প্রভৃতি দ্বারা গঠিত পশু বলি দিয়া যজ্ঞ করা হয়। তখন বিরোধী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ বলিয়া উঠিলেন যে, যে যজ্ঞে পশুবধ নাই, সে যজ্ঞ যজ্ঞই নহে, কারণ বেদে আছে—"শ্বেত মালভেত"—শ্বেত ছাগলকে বধ করিবে। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে যজ্ঞ বিষয়েও দলাদলি আছে। যাহা হউক সভা ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। আবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কাশীর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রালোচনার জন্য মানমন্দিরে আসিলেন। তাঁহাদের সভায় বেদের জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড এবং অন্যান্য শাস্ত্রের তর্কবিতর্ক হইল। কথাপ্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যজ্ঞে পশুবধ বেদবিহিত কি না? তাঁহারা বলিলেন "পশুবধ না করিলে কখন যজ্ঞ হয় না।" পরে সভাভঙ্গ হইল এবং শাস্ত্রীরা টাকা বিদায় লইয়া বাড়ী গেলেন। দেবেন্দ্রনাথও ১৭৬৯ শকেই কাশী হইতে আনন্দচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। অপর তিন জন ছাত্রও যথাক্রমে প্রত্যাগত হইলেন এবং চারি জনেই যথাসময়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। লালা হাজারীলাল কাশী হইতে রিক্ত হস্তে প্রচারের জন্য দূরদূরান্তে বহির্গত হইলেন।

একটী অঙ্গুরীমাত্র তাঁহার সম্বল ছিল, তাহাতে খোদিত ছিল "ইহ ভি নেহী রহেগা।" সেই যে তিনি গেলেন, আর ফিরিলেন না; তাহার পর তাঁহার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

দেবেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বেই উপনিষদের উপদেশে ব্রহ্মবিদ্যার তুলনায় বেদসমূহের অশ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া এখন তাহা সাধারণের নিকট ঘোষণা করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৬৯ শক হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোভাগ এই উপনিষৎবাক্যে শোভিত করিলেন—"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তচ্ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"* কাশীধামে স্বয়ং যাইয়া বেদবিশেষের প্রাচীনতা ও শ্রেষ্ঠতা এবং বেদবিশেষের অপ্রাচীনতা ও অশ্রেষ্ঠতা এবং যজ্ঞবিষয়ে বেদের মতামত সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মতভেদ ও বাদবিতণ্ডা দেখিবার ফলে ব্রহ্মবিদ্যার তুলনায় বেদবিদ্যার অশ্রেষ্ঠতা-জ্ঞান দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে চিরকালের জন্য দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া গেল। সেই অবধি বেদবেদান্তমাত্র যে ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র অবলম্বনীয় হইতে পারে না, প্রত্যুত আত্মপ্রত্যয়নিহিত সত্যই যে একমাত্র অবলম্বনীয়, এই মতের তিনি পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। ইহারই ফলে আমরা ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রভৃতি দেবেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব দান সকল লাভ করিয়াছি। ইহারই ফলে ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রারণ্যের অধীনতা হইতে নিজেও মুক্তিলাভ করিল এবং সমগ্র জগতের সমক্ষে মানবাত্মার স্বাধীনতার এক অপূর্ব্ব আদর্শ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কাশীধামে ছাত্র পাঠাইবার ফলে, আমরা দেখিতে পাই যে অবান্তর হিসাবেও দেশের প্রভূত মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে। ছাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে তারকনাথ তত্ত্বনিধি ব্রাহ্মসমাজে কিছুকাল কার্য্য করিয়া পরিণামে বর্দ্ধমানাধিপতির অধীনে কর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপচাঁদ বাহাদুর মহাভারতের এক সংস্করণ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশে যে কয়েকজন প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তারকনাথ তত্ত্বনিধি তাঁহাদিগের অন্যতর ছিলেন। বলা বাহুল্য এই সংস্করণ মহাভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ। বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের অধ্যক্ষগণ তাহারই সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীমাত্রকেই চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন—কত বঙ্গবাসী যে সেই মহাভারত পড়িয়া নিজেকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? এই সানুবাদ মহাভারতের স্বল্পমূল্যে পাইবার সম্ভাবনা হওয়াতেই বর্ত্তমানে শাস্ত্রচর্চ্চার এত বাহুল্য দৃষ্ট হইতেছে। ছাত্রগণের মধ্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশই শাস্ত্রবিষয়ে সর্ব্বতোমুখীন প্রতিভা প্রদর্শনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া, একদিকে বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে বেদের শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র সকল সম্পাদন করিয়া, অপরদিকে আদিব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে পঞ্চদশী, বেদান্তসার, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ সকল সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ করিয়া হিন্দুসমাজের যে কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন, তাহা একমুখে বলা যায় না। ইহার পূর্ব্বে এই সকল অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ সকল বঙ্গদেশে অপ্রকাশিত ছিল। ব্রাহ্মবিবাহবিষয়ক আন্দোলনেও তাহার শাস্ত্রীয়তা বিচারে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়া তিনি সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী উভয় সম্প্রদায়েরই হিন্দুদিগের যে উপকার করিয়াছেন, হিন্দুসমাজ তাহা বিস্মৃত হইলে কৃতঘ্নতাদোষে কলঙ্কিত হইবে নিঃসন্দেহ।

---

* ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সকলই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

সারারাত্রি ধরে ঝরায়েছে গান
তারার দল
সারারাত্রি ধরে ছড়ায়েছে ফুল
তরুর দল
সারারাত্রি ধরে ডেকেছে মোদের
আয় গো আয়

তোদেরও আছে যে অধিকার
মোদের এই সভায়
চিত্তপ্রদীপ জ্বালিয়ে তোরা
তুলিয়ে আয়
গীত-কুসুম সাজিয়ে তোরা
বাজিয়ে আয়—
তবু কি মোদের হয় না জাগরণ
জাগে না মোদের সুপ্ত জীর্ণ মন ?
ওগো বেদন দিয়ে আনো গো তুমি চেতন
মুক্ত কর বন্ধ বাতায়ন ॥

জাগরণ।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি এ)

আমাদের প্রত্যেক দিনের উপাসনায় এই কথা প্রাণ ভরিয়া বলিয়া যাইতেই হইবে যে অমৃত পুরুষ জাগিতেছেন—আমাদের জীবনের প্রত্যেক অণুপরমাণু জুড়িয়া তিনি জাগিতেছেন। প্রাণে প্রাণে সেই অমৃত পুরুষকে যদি অনুভব করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের ব্যর্থ উপাসনা, ব্যর্থ ক্রন্দন, ব্যর্থ সমস্ত আশা। যিনি হৃদয়ের দেবতা তাঁহাকেই যদি জাগাইতে না পারি, যদি প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে না পারি—আমি এ কথা বলিনা যে এক-দিনেই আমরা সক্ষম হইব—কিন্তু আমাদের এই সারাজীবনের ভিতর যদি এমন একটি দিনও না আসে যে দিন আমরা আমাদের প্রত্যেক শিরায় শিরায় শোণিতে শোণিতে তাঁর ওতপ্রোতত্ব অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলে বাস্তবিকই আমরা অতি দীন ও কৃপার পাত্র।

কিন্তু এমনি কি হয় যে আমাদের পিতা এই জীবনের মধ্যে একদিনের জন্যও আমাদের সুপ্ত হৃদয়কে জাগাইবেন না? তাহা অসম্ভব, কারণ তিনি করুণাময়। তিনি কতদিন হইতে আমাদের দ্বারে ভিখারীর ন্যায় অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন কবে আমরা আমাদের চিত্তদুয়ার খুলিব ও তাঁহার গলায় মালা দিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিব। আমা-দের জাগরণের জন্যই কি তিনি এত কোটী কোটী দূত পাঠান নি—এই যে নিশীথ আকাশে নক্ষত্র-মণ্ডলী সারা রাত্রি ধরিয়া অনাহত গান গাহিতেছে, এই যে চন্দ্রমা বিশ্বধরণীকে জ্যোস্নাধারায় প্লাবিত করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে, এই যে ঊষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শত শত বিহঙ্গকুল কলধ্বনিতে কাননভূমি মুখরিত করিতেছে, ফুল ফুটিতেছে, গন্ধ বহিতেছে, এ সমস্তই কি বৃথা, বাহুল্য, বৃথা আড়-ম্বর? এ গুলি কি প্রত্যেক নিমেষে নিমেষেই আমাদের অন্তরের নিভৃত প্রদেশে গভীরতম সুরে ডাক দিতেছে না—'আয় আয়' ব'লে আহ্বান করি-তেছে না? মানুষ হাজার কাজের মধ্যে থাকুক, ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকুক তবু সে ডাক একদিন না একদিন তাহার কর্ণগোচর হইবেই হইবে—এ সমস্ত বৃথা যাইবে না, বিফল হইবে না; জীবনের মধ্যে অন্তত একদিন মানুষকে বলিতেই হইবে 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্ব-স্মাৎ' এই তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল বস্তু হইতেই প্রিয়।

এই যে ভগবানের ডাক—ইহা বড় সহজ নহে—এ ডাক মানুষকে একেবারে পাগল করিয়া তুলে, মাতাল করিয়া তুলে। মানুষের যখন সেইরূপ জাগরণ হয়, মানুষ তখন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলে আমি ধন চাহি না, মান চাহি না এ বিশ্বের কিছুই চাই না—কেবল হে পরমেশ আমি তোমা-কেই চাই—আমি তোমারই প্রেমের ভিখারী—আমায় একটুখানি দয়া কর। এই যে মানুষের প্রাণের করুণ মিনতি—ইহা ভগবানের নিকট তাঁহার লক্ষ লক্ষ দূত অপেক্ষাও অধিকতর বলশালী—ইহা তাঁহাকে একেবারে অস্থির করিয়া দেয়—কাঁদাইয়া তুলে। তখন মানুষেরও আর সুখ দুঃখ জ্ঞান থাকে না—"কেবল তুমি কেবল তুমি।"

কিন্তু এই যে নিরন্তর বীণা বাজিতেছে, সঙ্গীত উঠিতেছে ইহা তো পশুরা শুনিতে পায় না—এখানে মানুষেরই একমাত্র অধিকার। কারণ মানুষ অমৃতের অধিকারী—অমৃত পান বিনা তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। অমৃতের তৃষ্ণা তাহার অন্তরে অন্তরে জ্বলিতেছে—একদিন না একদিন সে পিপাসার শান্তি হইবেই। সহস্র রোগ শোক মানুষের জীবনকে জর্জ্জরিত করুক, একদিন মানু-

ষকে বলিতেই হইবে—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।” কারণ পিতা—তিনি প্রতিদিনই জাগিতেছেন এবং অপেক্ষা করিতেছেন, কবে তাঁহার পুত্ত্রদের জাগরণ হইবে। তাহারা জাগুক আর নাই জাগুক পিতার জাগরণের বিরাম নাই। তাঁহার এই জাগরণে একদিন পুত্ত্রগণও জাগ্রহ হইয়া উঠিবেই। তখনই পিতার সঙ্গে পুত্ত্রদের এক অপূর্ব্ব মিলন ঘটিবে।

মেণ্ডেলমত ও পরিবর্ত্তবাদ।

(ডাক্তার শ্রীবনওয়ারি লাল চৌধুরী ডি, এস,সি, এডিন)

মেণ্ডেল ও তাঁহার পরবর্ত্তীগণ পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত দুইটি প্রকার-ভেদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে যৌন সম্বন্ধ ঘটাইয়া সঙ্কর উৎপাদন করিলে প্রথম বারের সবগুলি সঙ্কর-সন্ততিতে ঐ দুইটি ধর্ম্ম বা প্রকৃতির (character) মাত্র একটি প্রকাশ পায়, আর তাহার বিপরীত প্রকৃতিটি সেই পুরুষে (generation) একদা অপ্রকাশ থাকিতে দেখা যায়। যে প্রকৃতিটি (character) প্রথম বারের সবগুলি সঙ্কর-সন্ততিতে প্রকাশ পায় তাহার নাম দেওয়া হইয়া থাকে প্রবল প্রকৃতি বা অদমনীয় প্রকৃতি (dominant character), আর যে প্রকৃতিটি এই দ্বিতীয় পুরুষে (generation) লোপ পায় বা যাপ্য থাকে তাহার নাম দেওয়া হইয়া থাকে লুপ্ত বা যাপ্য বা দুর্ব্বল প্রকৃতি (recessive character)।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেণ্ডেল লম্বা কাণ্ড-বিশিষ্ট মটর আর খাট কাণ্ডবিশিষ্ট মটর এই দুই প্রকার-ভেদের মটরে কৃত্রিম উপায়ে সঙ্কর উৎপাদন করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে প্রথমবারের সব-গুলি বীচি হইতে যতগুলি মটর গাছ হইয়াছিল সে সবগুলিই লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট মটর গাছ। এই দ্বিতীয় পুরুষের (generation) সঙ্কর-সন্ততি গুলিতে এই লম্বা প্রকৃতির প্রভাব দেখিয়া মেণ্ডেল মটর কলাইয়ের গাছের এই দৈর্ঘ্যপ্রবণ প্রকৃতিটিকে (the character of tallness) “প্রবল” (dominant) এই সংজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং অন্য প্রকার-ভেদের যে ধর্ম্ম বা প্রকৃতিটি দ্বিতীয় পুরুষে একদা লোপ পাইল অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকারভেদের কাণ্ডের খর্ব্বতা (dwarfness) যাহা প্রথমবারের কোনও সন্তানে অর্শিল না, আদি জনয়িতার অর্থাৎ প্রথম পুরুষের সেই গুণ বা প্রকৃতিটিকে তিনি যাপ্য বা গোপনীয় (recessive) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই মটরসঙ্করের দ্বিতীয়-পুরুষের (generation) সবগুলি সন্ততিকে দ্বিপুঃ এই সংক্ষিপ্ত সাংকেতিক নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

এই সব লম্বা জাতীয় দ্বিতীয় পুরুষের সঙ্কর সন্ততিগুলির মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে যৌন সম্বন্ধ ঘটিয়া সন্তান সম্ভব হইয়া বিচি উৎপন্ন হইলে সেই বিচি হইতে যে সব মটরের চারা হইয়া থাকে তাহাদিগকে তৃতীয় পুরুষের (Third generation) চারা বলা হয়। ইহাদিগকে তৃপুঃ এই সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হইয়া থাকে। সবগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ঠিক প্রথম পুরুষের ন্যায় লম্বা কাণ্ড-বিশিষ্ট আর কতকগুলি খাট কাণ্ডবিশিষ্ট। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মাঝামাঝি রকমের কাণ্ডওয়ালা এক-টিও দেখা যায় না। যেগুলি লম্বা জাতীয় তাহাদের কাণ্ডের উচ্চতা আদি-জনয়িতা লম্বা প্রকারভেদের ন্যায় উচ্চ। অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকটিই ৫।৭ ফিট উচ্চ। আর যেগুলি খাট কাণ্ডবিশিষ্ট সেগুলির কাণ্ড মাত্র ৭।৮ ইঞ্চি মাত্র উচ্চ। পুনঃ পুনঃ গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে এই তৃতীয় পুরুষের সঙ্কর গুলির লম্বা ও খাট এই দুইপ্রকার সন্ততির মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাত বা হার রহিয়াছে। সব সময়েই দেখা গিয়াছে যে তৃতীয় পুরুষে প্রত্যেক তিনটি লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট চারাতে একটি করিয়া খাট কাণ্ডযুক্ত সন্তান রহিয়াছে। অর্থাৎ একশতটি চারাতে ৭৫টি লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট আর ২৫টি খাট কাণ্ডবিশিষ্ট।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদি জনয়িতাদের দুইটিতে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত গুণ থাকিলে দ্বিতীয় পুরুষের সবগুলি সন্ততিতে একটি জনয়িতার বিশেষ প্রকৃতিটি (character) প্রকাশিত হয় আর অন্য আদি জনয়িতার সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত প্রকৃতিটি দ্বিতীয় পুরুষের কোনও সন্তানে প্রকাশ পায় না।

মটরের লম্বা প্রকার-ভেদ ও খাট প্রকারভেদ লম্বা কাণ্ড ও খাট কাণ্ড এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত দুইটি বিভিন্ন গুণ বা এই দুইটি বিভিন্ন প্রকারভেদ প্রকৃতি (character)। ইহাদের মধ্যে স্বাভাবিক উপায়ে যৌন সম্বন্ধ কখনও হয় না। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে একটি লম্বা জাতীয় ও আর একটি খাট জাতীয় প্রকারভেদে যৌন সম্বন্ধ ঘটাইলে দ্বিতীয় পুরুষে যতগুলি সন্ততি হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে একটিতেও খাট কাণ্ড দেখা যায় না। অর্থাৎ একটি আদি জনয়িতার বিশেষ প্রকৃতিটি দ্বিতীয় পুরুষে একদা লোপ ঘটে। অন্য জনয়িতার যে প্রকৃতি বা গুণটি (character) প্রথমবারের সবগুলি সন্ততিতে দেখা যায় তাহাকে মেণ্ডেল "প্রবল" (dominant) নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দ্বিতীয় পুরুষের সবগুলি সন্ততিই এই প্রবল প্রকৃতিবিশিষ্ট। তৃতীয় পুরুষে সন্ততিদের মধ্যে শতকরা ৭৫টি প্রবল প্রকৃতিবিশিষ্ট আর শতকরা ২৫টি যাপ্য বা দুর্ব্বল প্রকৃতিবিশিষ্ট। অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষে যে প্রকৃতিটি একেবারে যাপ্য ছিল তৃতীয় পুরুষের শতকরা ২৫টি চারাতে সেই প্রকৃতিটিই ভাসিয়া উঠিয়াছে।

এই তৃতীয় পুরুষে (তৃ-পুঃ) নিজেদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ হইয়া বিচি উৎপন্ন হইতে দেওয়া হইলে এবং ইহাদের প্রতি গাছের উৎপন্ন বিচিগুলি আবার স্বতন্ত্র করিয়া পুতিয়া তাহাদের গাছগুলি বড় হইতে দিলে দেখা যায় যে এই চতুর্থ পুরুষের বংশধরগুলি নিম্নলিখিত ধারা পাইয়াছে।

(ক) প্রত্যেকটি যাপ্য-গুণ-বিশিষ্ট গাছের উৎপন্ন বিচি হইতে কেবল যাপ্যগুণসম্পন্ন গাছই হইয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান স্থলে তৃতীয় পুরুষের খাটকাণ্ড বিশিষ্ট সবগুলি গাছের সন্ততিই খাট কাণ্ডবিশিষ্ট হইয়াছে। তারপর এই তৃতীয় পুরুষের খাটকাণ্ড সন্ততি হইতে স্বাভাবিক নিয়মে যত পুরুষই (generation) পরে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের সব বংশধরেরাই খাটকাণ্ডবিশিষ্ট হইয়াছে। কাজেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে তৃতীয় পুরুষের যাপ্য প্রকৃতিবিশিষ্ট সন্ততিগুলির এই যাপ্য প্রকৃতিটি বংশানুক্রমে বিশুদ্ধ। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই তৃতীয় পুরুষের সন্ততিদের এই খাটকাণ্ড প্রকৃতিটি বংশপরম্পরায় বিশুদ্ধ। অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মে ইহাদের বংশপরম্পরায় ইহাদের এই খাট-কাণ্ড প্রকৃতিটির আর বিপর্য্যয় ঘটে না।

(খ) অন্য পক্ষে তৃতীয় পুরুষের (তৃ-পুঃ) লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট গাছগুলির স্বাভাবিক রকমে যে সব বিচি উৎপন্ন হয় তাহারদে প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র-ভাবে হিসাব রাখিয়া সেই সব বিচি হইতে চারা তুলিয়া গাছ বড় করিলে দেখা যায় তাহাদের লম্বা কাণ্ড-বিশিষ্ট সকল গাছের সন্ততিগুলি—(অর্থাৎ চতুর্থ পুরু-ষের সন্ততি (চ-পুঃ) সকলে লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট হয় নাই। তাহাদের কতকগুলি লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট আর কতক-গুলি সন্ততি মিশ্র অর্থাৎ কতকগুলি লম্বা কাণ্ড-বিশিষ্ট আর কতকগুলি খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট হইয়াছে। এইখানেই তৃতীয় পুরুষের যাপ্য প্রকৃতিবিশিষ্ট সন্ততি হইতে প্রবল প্রকৃতিবিশিষ্ট সন্ততির পার্থক্য। দ্বিপুঃয়ের লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট প্রত্যেক গাছের বিচি স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া গাছ তুলিলে দেখা যায় যে এই তৃতীয় পুরুষের লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট সন্ততির কতক-গুলির প্রকৃতি মিশ্র। ইহারা মূল জনয়িতাদের হইতে চতুর্থ পুরুষের সন্তান। প্রত্যেক গাছের বিচির স্বতন্ত্রতা রক্ষা করার দরুণ হিসাব করিয়া তাহাদের সংখ্যা ঠিক করা যায়। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে চতুর্থ পুরুষের মিশ্রপ্রকৃতির লম্বা কাণ্ড-বিশিষ্ট সন্ততির সংখ্যা বিশুদ্ধ লম্বাকাণ্ডবিশিষ্ট সন্ততির সংখ্যা হইতে দ্বিগুণ। কাজেই তৃতীয় পুরুষের যাপ্য প্রকৃতিবিশিষ্ট সন্তানগুলি যেরূপ বিশুদ্ধ প্রকৃতি-বিশিষ্ট, তৃতীয় পুরুষের প্রবল প্রকৃতি-বিশিষ্ট সন্ততিগুলির সকলে সেরূপ বিশুদ্ধ প্রকৃতি-বিশিষ্ট নহে। তাহাদের মধ্যে একতৃতীয়াংশ প্রবল প্রকৃতিটি সম্বন্ধে বিশুদ্ধ। অর্থাৎ উহাদের এক-তৃতীয়াংশের ধারাবাহিকরূপে বংশপরম্পরায় প্রবল প্রকৃতিটি (বর্ত্তমান স্থলে লম্বাকাণ্ডত্ব) বিশুদ্ধ। কিন্তু দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যার সন্ততির মধ্যে প্রত্যেক-টির পর পুরুষে শতকরা ৭৫টি প্রবল প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং ২৫টি যাপ্য প্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়।

উপরোক্তভাবে গণনার দ্বারা স্থির হইতেছে যে স্বাভাবিক নিয়মে আদিসঙ্করের তৃতীয় পুরুষে (generation) যে সব সন্ততি হয় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত হারে তিন প্রকৃতিবিশিষ্ট গাছ হইয়া থাকে যথা—(ক) বিশুদ্ধ প্রবল প্রকৃতিবিশিষ্ট

গাছ শতকরা ২৫টি, (খ) মিশ্র প্রবল প্রকৃতিবিশিষ্ট গাছ (অর্থাৎ যে সব গাছের সন্ততির শতকরা ৭৫টি লম্বাকাণ্ডযুক্ত ও ২৫টি খাটো কাণ্ডযুক্ত গাছ হইয়া থাকে) শতকরা ৫০টি এবং (গ) বিশুদ্ধ যাপ্য প্রকৃতি-বিশিষ্ট গাছ (অর্থাৎ বিশুদ্ধ খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট গাছ) শতকরা ২৫টি।

দাও ভক্তি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সত্যের আলোক তুমি ঋতের আকরভূমি!
তোমারি মহিমালোকে কেটে যায় মেঘ শত।
কি আশ্চর্য্য মহিমায় ঘিরিয়া আছে তোমায়
বুঝিতে পারিনা তাহা, ভাষায় বলিব কত॥

তুমি যে জগত পাতা তুমি যে আমার ধাতা
জ্যোতির্ম্ময় তব জ্যোতি ফেল গো প্রাণে আমার।
ভবের এ পারাবার কেবলি মিথ্যা অসার—
তোমারি ধরিয়া হাত অবহেলে হব পার॥

আমার প্রাণের কথা তুমি তো জান সে ব্যথা—
দূরিও, দেখায়ে তব মহিমার পূর্ণ আলো।
পৃথিবীর যাহা কিছু রেখে যেতে দাও পিছু—
সে সকল আবর্জ্জনা লাগে নাকো মোর ভালো॥

তব পুণ্য নাম যাতে গাহি দেবগণ সাথে
অনন্ত জীবন ভোর, সেই মত দাও শক্তি।
প্রতীক্ষা করিব কত আশায় হইয়া হত—
তোমারে যাহাতে পাই, সেই মত দাও ভক্তি॥

মধুর ভাব।

"প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্ত ভাব সর্ব্বসাধ্য সার॥

রায় রামানন্দ প্রভু চৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই চারি ভাবের কথা বলিয়া অবশেষে কান্তভাব যে সকল ভাবের উচ্চ ভাব তাহাই বলিলেন, কারণ কান্তভাবের মধ্যেই উপরোক্ত চারিভাব নিহিত রহিয়াছে; যেমন পঞ্চীকরণ নিয়মানুসারে স্থূল মহাভূত সকলের মধ্যে আকাশকে ধরিয়া ক্রমাগত এক দুই ও অবশেষে পাঁচটীই মিশ্রিত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মতে কান্ত বা মধুরভাব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাব। কান্ত বা মধুর ভাব কি? সাধারণতঃ লোকে বুঝে, ভগবানকে স্বামীবোধে নিজে তাঁহার স্ত্রীস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে ভজনা করার নামই কান্ত ভাব। কথাটা ঠিক হইলেও লোকে তাহা ঠিকভাবে বুঝিতে পারে না। স্বামীস্ত্রীসম্বন্ধ কথাটার বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন লোকে বুঝিয়া থাকেন। সকল প্রকার অর্থ সঙ্গত নহে। স্বামী-স্ত্রীসম্বন্ধ কথাটার অনেক প্রকার অর্থ লোকে বুঝিলেও প্রকৃত অর্থ অনেক নহে। প্রকৃত অর্থ একটীই। সেই প্রকৃত অর্থটী যত [illegible] না বুঝা ও ধারণা করা যাইবে ততক্ষণ কান্ত বা মধুরভাব বুঝা বা ধারণা করা যাইবে না, মধুর ভাব কলুষিত-ভাবাপন্ন হইয়া দূষিত হইবে, আসলের অপব্যবহার হইবে, ধর্ম্মের স্থলে অধর্ম্ম আসিয়া দেখা দিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে অনেক স্থলে তাহাই হইতেছে এবং ধর্ম্মেরও যথাসম্ভব অধোগতি হইয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীসম্বন্ধ বলিলে অন্য কোন দেশীয় বা জাতীয় স্বামী-স্ত্রীসম্বন্ধ বুঝিতে হইবে না। ভারতীয় এবং শাস্ত্রীয় যে স্বামী-স্ত্রীসম্বন্ধ তাহাই বুঝিতে হইবে। এই স্বামী-স্ত্রীসম্বন্ধ অন্যান্য স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ হইতে অনেকাংশে পৃথক্। হিন্দু স্ত্রীর নাম ধর্ম্মপত্নী, ইনি ধর্ম্মচর্য্যার সহকারিণী। ইহাঁর সাহায্য ব্যতীত ধর্ম্মচর্য্যা হয় না। তাই শাস্ত্রকারগণ বারবার দোহাই দিয়া বলিয়াছেন "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ"। পত্নীত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা আছে তাহারই প্রথমে ব্যাখ্যা করিব। মধুর ভাবে যাঁহারা ভগবানকে পাইতে চান তাঁহাদের শাস্ত্রের ঐ ব্যাখ্যা অবলম্বন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

মহাকবি কালিদাস "প্রেম্না শরীরার্দ্ধহরাং হরস্য" এই অতি সংক্ষেপ বাক্যটী দ্বারা পতি-পত্নীত্ব ভাব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। পার্ব্বতী শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী। কি প্রকারে অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়াছেন? প্রেমের দ্বারা শিবের অর্দ্ধাঙ্গ হরণ করিয়া। মহাদেব অনন্তপ্রেমের আকর বা অনন্ত প্রেমময়—সেই প্রেমের অর্দ্ধাংশ পার্ব্বতী। অর্থাৎ মহাদেব একা সম্পূর্ণ নহেন—অর্দ্ধপার্ব্বতীকে লইয়া তিনি

পূর্ণ। সমুদ্র অনন্ত জলরাশি ; অনন্ত নদীগণ এই সমুদ্রে পতিত হইতেছে—অনন্ত নদীগুলিকে লইয়াই সমুদ্র অনন্ত জলরাশি। সমুদ্রে পতিত নদীগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহারা সমুদ্রের অংশ বা অঙ্গ। পার্ব্বতীও তেমনি শিবের অর্দ্ধাঙ্গ, তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তিনি শিবরূপী মহা প্রেমসমুদ্রে পতিত হইয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। আমাদের পার্থিব পতি-পত্নীত্ব ভাবও এই প্রকারের। এক হৃদয়ের প্রেমরাশি অন্য হৃদয়ের প্রেমরাশির সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাওয়া। পত্নীর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না। তাঁহার শরীর, মন, ইচ্ছা, সঙ্কল্প সমস্তই সেই পতিরূপ অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে ; পতির ক্রিয়াই তাঁহার ক্রিয়া হইবে, পতির সুখেই তাঁহার সুখ, পতির ইচ্ছাতেই তাঁহার ইচ্ছা ; তিনি ছায়ার মত পতির অনুসরণ করিবেন। ব্যাপারটা সমস্তই প্রেমের। প্রেম ছাড়া এরূপ আত্মবিসর্জ্জন সম্ভব নহে। সমস্ত বিষয়ে স্বার্থপরতা আছে কিন্তু প্রেম সর্ব্বদাই নিঃস্বার্থ। প্রেম প্রেমের বস্তুকেই চায়, আর আপনাকে ভুলিয়া যায় ; প্রেমের বস্তুকে পাইলে তাহাতে মিলিয়া এক হইয়া যায়—দুটীতে মিলিয়া একটী হইয়া যায়। এইরূপ দুইটী প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের পরস্পর সম্মিলনের নামই পতিপত্নীত্বভাব। দুইটী হৃদয় পরস্পর সমান বিবেচিত হইলে পরস্পর সখ্যভাব হয়। পতি-পত্নীত্ব ভাবের সংস্থাপন দুইটী হৃদয়ের সমতা স্থলে সম্ভব নহে। উহাতে একটী হৃদয় সমুদ্রস্বরূপ অপরটী নদীস্বরূপ, একটী বৃক্ষের স্বরূপ অপরটী লতাস্বরূপ হওয়া আবশ্যক—অর্থাৎ প্রথমটী দ্বিতীয়টীকে স্থান দিতে পারে, আর দ্বিতীয় প্রথমটীকে আশ্রয় করিতে পারে—এরূপ হওয়া চাই। এইজন্যই জগতে অবলা ও সবলে এই ভাব হইয়া থাকে। জগতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সাংসারিক অন্যান্য বিষয়েরও সংস্রব আছে, কিন্তু সেগুলির সহিত মধুর ভাবের কোন সম্বন্ধ নাই। মধুর ভাব হৃদয়ের—প্রেমের—সুতরাং পতিপত্নীর মধ্যে যে প্রেমের অবস্থা তাহারই সহিত মধুর ভাবের সম্বন্ধ।

উপরোক্ত পতি-পত্নীভাব স্থলে পত্নীর হৃদয়টী যেরূপ পতিতে মিশিয়া যায়, পত্নীর নিজের কোন অস্তিত্ব, ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি কিছুই থাকে না, আমাদের নরনারী প্রত্যেকের হৃদয় যদি ভগবানে সেইরূপ মিশিয়া যাইতে পারে তবে তাহাকেই মধুর বা কান্তভাব বলে। তুমি সাগর আমি নদী। আমি তোমারই ; তোমাতেই আমি মিশিয়া যাইব, আমি আমার নদীত্বের অভিমান পরিত্যাগ করিব, তোমার অস্তিত্বেই আমার অস্তিত্ব, তোমার সৌন্দর্য্যেই আমার সৌন্দর্য্য, তোমার সুখেই আমার সুখ ; তুমি আনন্দে উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হইতেছ, সেই আনন্দে আমার আনন্দ; তুমি গম্ভীর নিনাদে গাহিতেছ সেই সঙ্গীতেই আমার প্রাণের সঙ্গীত। আমি লতা তুমি তরু ; আমি পত্র পুষ্পে তোমাকে সজ্জিত করি, তুমি সেই সজ্জায় সজ্জিত হও। আমার পত্রেই তোমার পত্র, আমার ফুলেই তোমার ফুল ; তোমাকে সাজাইতেই আমার আনন্দ ; তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়া, আমার নাম লোপ করিয়া দিয়া তোমারই নামে প্রকাশিত হওয়াই আমার পরম সুখ। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইলেই আমার সমস্ত পূর্ণ হইল। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমার একমাত্র কাজ। তোমার হৃদয়ে যে অনন্ত প্রেমসমুদ্র আছে আমি সেই সমুদ্রের একবিন্দু বারিস্বরূপ। সেই সমুদ্রে মিশিয়া যাইতে পারিলেই আমি আমাকে ধন্য মনে করিব। তুমি কোমলতা কঠিনতা প্রভৃতি সকলেরই আকর, আমি নিতান্ত কোমল, নিঃসহায় ও বলহীন,—তোমার আশ্রয় ব্যতীত আমি একদণ্ড থাকিতে পারি না ; তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। তুমি আধার আমি আধেয় ; আমি আধারশূন্য জল—তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকি, তুমিছাড়া হইলে ক্ষণকালও থাকিতে পারি না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মতে ব্রজগোপীগণের ও রাধার এই ভাব ছিল। গোপীগণ রাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ। রাধা কৃষ্ণে মধুরভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, আর গোপীগণ রাধাকে অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। গোপীগণের অবলম্বন রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে—রাধার অবলম্বন কেবলমাত্র কৃষ্ণ। ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনেক প্রকারের আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা লেখা অসম্ভব। ফলকথা, মধুরভাব যে সর্ব্বোচ্চ ভাব তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে মধুরভাব নাম দিয়া যদি ভাবান্তর অব-

লম্বন করা হয়, মধুরভাবের আধ্যাত্মিক বা আভ্যন্তরীণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া যদি দৈহিকতা অবলম্বিত হয় তাহা হইলে তাহা সর্ব্বোচ্চভাব হওয়া দূরে থাকুক, অধমেরও অধম ভাব হইয়া পড়ে। কালক্রমে মধুরভাব যে ঐরূপ একটা অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে না একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ভক্তিগ্রন্থগুলি ধারাবাহিকরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পূজনীয় ঋষিগণপ্রণীত গ্রন্থগুলি ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী জয়দেব প্রভৃতি ভক্তগণপ্রণীত গ্রন্থগুলি একভাবের নহে। ইঁহারাও পরমভক্ত ঋষিকল্প লোক, কিন্তু কালের গতিকে ও সমাজের অবস্থানুসারে ইঁহাদের প্রণীত গ্রন্থে ক্রমশঃ ঋষিদের কথিত আধ্যাত্মিক ভাবটা হ্রাস হইয়া দৈহিকতার প্রাবল্য দেখা দিয়াছে।* ঐ দৈহিকতাটুকু ত্যাগ না করিলে প্রকৃত মধুরভাব বুঝা যাইবে না। অনেকে ঋষিপ্রণীত গ্রন্থগুলিতেও তীব্রদৃষ্টি করেন এবং সেগুলিতেও দৈহিকতা দেখিতে পান। বাস্তবিক তাহা নহে। কতকগুলি ব্যবহার, কতকগুলি কথা, যাহা আর্য্য ঋষিগণের সময় পবিত্র ও আধ্যাত্মিক ভাবে চলিত ছিল, সমাজের অবস্থানুসারে সেগুলি দূষিত ভাবাপন্ন হইয়াছে তাহাতেই ঐরূপ বোধ হয়। কথা ও ব্যবহার যে সামাজিক অবস্থানুসারে অনেকটা দূষিত হয় তাহা সকলেই জানেন, সে বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা প্রেম প্রভৃতি কথার বিষয় উল্লেখ করিতে পারি।

বাল গঙ্গাধর তিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

প্রথম প্রকরণ।

বিষয় প্রবেশ।

আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদির মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একটি অতীব ভাস্বর ও নির্ম্মল হীরক খণ্ড। দেহব্রহ্মাণ্ডজ্ঞানমূলক আত্মবিদ্যার গূঢ় ও পবিত্র তত্ত্ব সঙ্ক্ষেপে অথচ অসংদিগ্ধরূপে বলিয়া তাহারই সিদ্ধান্ত অনুসারে, যে গ্রন্থ মনুষ্যমাত্রকেই নিজ আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থার সহিত অর্থাৎ পরম পুরুষার্থের সহিত পরিচিত করিয়া দেয়, এবং তাহারই সঙ্গে, জ্ঞানের সহিত ভক্তিকে, ও শেষে, শাস্ত্রসম্মত ব্যবহারের সহিত জ্ঞান ভক্তি উভয়কেই সুন্দররূপে যুক্ত করিয়া দিয়া সংসারাকুল বিভ্রান্ত মনকে শান্ত এবং বিশেষরূপে নিষ্কাম কর্ত্তব্যাচরণে প্রবৃত্ত করে—এরূপ দ্বিতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ, শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কেন, জগতের সাহিত্যের মধ্যেও দুর্লভ। শুধু কাব্যের হিসাবে দেখিতে গেলে, যে গ্রন্থ আত্মজ্ঞানের অনেক গহন সিদ্ধান্ত বিশদ সহজ ভাষায় আবালবৃদ্ধের নিকট সুগম করিয়া দেয় এবং যাহা জ্ঞানসমন্বিত ভক্তিরসে পূর্ণ, তাহাকে উত্তম কাব্যের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের বাণীর দ্বারা সকল বৈদিক ধর্ম্মের সার যাহাতে সঞ্চিত হইয়াছে তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে আর কি বর্ণনা করিব? ভারতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যখন প্রীতিভরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তখন ভগবানের মুখে গীতা পুনর্ব্বার শুনিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন এক দিন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ অনুরোধ করিলেন যে, "যুদ্ধারম্ভে তুমি যে উপদেশ দিয়াছিলে তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে আবার বল"। তখন ঐ প্রসঙ্গে "আমি অত্যন্ত যোগযুক্ত চিত্তে উচ্চাঙ্গের উপদেশ করিয়াছিলাম বলিয়া ঐ রকম পুনর্ব্বার বলা আমার পক্ষেও অসাধ্য" ভগবান অর্জ্জুনকে এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। তাহাই অনুগীতার আরম্ভে বলা হইয়াছে (মভা, অশ্বমেধ অ ১৩, শ্লো ৭০-৭৩)। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ভগবানের অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু তিনি কেবল "গীতা পুনর্ব্বার বলা আমার পক্ষেও অসাধ্য" এই কথা বলিয়াছিলেন; ইহা হইতে গীতার কতটা মাহাত্ম্য তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্ভূত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট বেদের ন্যায় এই গ্রন্থ আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর সকলের নিকটেই সমানরূপে মান্য ও প্রামাণ্য হইয়া আসিয়াছে। ইহার বীজও ইহাই; কারণ,

---

* শ্রীমদ্ভাগবতেও অনেক স্থানে যে দৈহিকতার বাহুল্য সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই বিষয়ে এবং ভাগবত গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত তৎসম্বন্ধে আমরা লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না।

তং পঃ সং।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

অর্থাৎ সর্ব্ব উপনিষদ গাভীস্বরূপ; গোপাল-নন্দন দোগ্ধাস্বরূপ, সুধী পার্থ অর্জ্জুন ভোক্তা বৎস স্বরূপ আর মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ। এইরূপ স্মৃতিকালীন গ্রন্থের গীতাধ্যান অলঙ্কারযুক্ত হইলেও ইহা যথার্থ বর্ণনা। হিন্দুস্থানের সমস্ত প্রাকৃত ভাষায় ইহার অনেক ভাষান্তর, টীকা অথবা ব্যাখ্যা হইয়াছে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃতের পরিচয় হইবার পর, গ্রীক, ল্যাটিন, জর্ম্মণ, ফ্রেঞ্চ ইংরেজি প্রভৃতি ভাষাতেও গীতার অনেক ভাষান্তর হওয়াতে আজ সমস্ত জগতময় এই অপ্রতিম গ্রন্থের প্রসিদ্ধি হইয়াছে।

কেবল সকল উপনিষদের সার এই গ্রন্থে আছে তাহা নহে, ইহার পুর্ণ নামই হইল "শ্রীমদভগবদগীতা উপনিষৎ।" গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়-সমাপ্তিজ্ঞাপক যে সঙ্কল্প আছে তাহাতে "ইতি শ্রীমৎভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে" ইত্যাদি শব্দ আছে। এই সংকল্প মূল-ভারতে দেওয়া না হইলেও গীতাগ্রন্থের সকল সংস্করণেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য সর্ব্বদা পাঠ করিবার জন্য যে সময় মহাভারত হইতে গীতা পৃথক করিয়া বাহির করা হইয়াছিল তখন অবধি, অর্থাৎ গীতার কোনপ্রকার টীকা হইবার পূর্ব্বে, উহা প্রচারিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান হয়; এবং এই হিসাবে গীতাতাৎপর্য্য নির্দ্ধারণে উহার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা পরে বলা যাইবে। আপাতত সংকল্পবাক্যের মধ্যে "ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু" এই দুই পদের বিচার করা কর্ত্তব্য। "উপনিষৎ" এই শব্দ মারাঠীতে ক্লীবলিঙ্গ হইলেও সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ; সুতরাং "শ্রীমদ্ভগবৎ কর্ত্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষৎ" এই অর্থে সংস্কৃতভাষায় "শ্রীমদ্ভগবৎগীতা উপনিষৎ" এই বিশেষণ ও বিশেষ্য, দুই-ই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং গ্রন্থ এক হইলেও সম্মানার্থে বহুবচনের দ্বারা নির্দ্দেশ করিবার পদ্ধতি থাকায় "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু" এই সপ্তমী-অন্ত বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। আচার্য্যদিগের ভাষ্যের মধ্যেও "ইতি গীতাসু" এইরূপ এই গ্রন্থের অনুলক্ষণ বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু সংক্ষেপ করিবার সময় সম্মানার্থক প্রত্যয় বা পদ এবং শেষের 'উপনিষৎ' এই জাতিবাচক সামান্য শব্দই ত্যাগ করিয়া 'কেন', 'কঠ', 'ছান্দোগ্য' এই সংক্ষিপ্ত নামানুসারে, "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষৎ" এই দুই প্রথমান্ত একবচনাত্মক শব্দের প্রথমে "ভগবদ্গীতা" ও পরে কেবল 'গীতা' এই স্ত্রীলিঙ্গী অতিসংক্ষেপ-রূপ প্রদত্ত হইয়াছে। 'উপনিষৎ' এই শব্দ যদি মূল-নামে না থাকিত তাহা হইলে 'ভাগবতম্', 'ভারতম', 'গোপীগীতম্' এই সকল শব্দের ন্যায় এই গ্রন্থের নাম 'ভগবদ্গীতম্' কিংবা কেবল 'গীতম' এই ক্লীবলিঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইত। তাহা না হইয়া 'ভগবদ্গীতা' কিংবা 'গীতা' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গী শব্দই যে অর্থে স্থায়ী রহিয়া গিয়াছে, সেই অর্থে তাহার পর 'উপনিষৎ' এই শব্দ প্রায়ই সংযোজিত হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। অনুগীতের উপর অর্জ্জুন মিশ্রের টীকাতে "অনুগীতা" এই শব্দের অর্থও এইরূপেই করা হইয়াছে।

কিন্তু 'গীতা' এই শব্দ কেবল সপ্তশতশ্লোকী ভগবদ্গীতাতেই প্রযুক্ত না হইয়া, প্রচলিত অর্থে উহা আরো অনেক গ্রন্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত, মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত মোক্ষপর্ব্বের কোন কোন বিচ্ছিন্ন প্রকরণে, 'পিঙ্গলগীতা' 'সম্পদগীতা', 'ভক্তিগীতা', 'বিষ্ণুগীতা', 'বৃত্রগীতা', 'পরাশর গীতা' ও 'হংসগীতা' এইরূপ পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। ইহা ব্যতীত 'অবধূত গীতা', 'পাণ্ডবগীতা', 'ব্রহ্মগীতা', 'ভিক্ষুগীতা', 'যমগীতা', 'রামগীতা' 'ব্যাসগীতা', 'শিবগীতা' 'সূর্য্যগীতা' প্রভৃতি আরো অন্য অনেক গীতা প্রসিদ্ধ আছে। * ইহার মধ্যে কতকগুলি স্বতন্ত্রভাবে নিরূপিত হইয়াছে, অবশিষ্টগুলি বিভিন্ন পুরাণ হইতে আসিয়াছে। উদাহরণার্থ,—গণেশগীতা গণেশপুরাণের শেষে ক্রীড়াখণ্ডে ১২৮ হইতে ১৪৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। এই গণেশগীতা অল্পশব্দভেদে ভগবদ্গীতারই অবিকল নকল এইরূপ বলায় বাধা নাই। 'ঈশ্বরগীতা' কূর্ম্ম-

* উপরি উক্ত অনেক গীতা ও আরও কতকগুলি গীতা (ভগবদ্গীতা সমেত) রাঃ রাঃ হরি রঘুনাথ ভাগবত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরাণের উত্তরবিভাগে প্রথম ৮ অধ্যায়ে আসিয়াছে ; পরবর্ত্তী অধ্যায়ে 'ব্যাসগীতার' আরম্ভ হইয়াছে। এবং স্কন্দপুরাণান্তর্গত সূত্রসংহিতার চতুর্থ অর্থাৎ যজ্ঞবৈভব খণ্ডের উপরিভাগে প্রারম্ভিক অধ্যায় ১ হইতে ১২ পর্য্যন্ত 'ব্রহ্মগীতা' ও ব্রহ্মগীতার অন্তর্গত ৮ অধ্যায়ে 'সূতগীতা' আছে। স্কন্দপুরাণের এই ব্রহ্মগীতা হইতে স্বতন্ত্র এইরূপ আর এক ব্রহ্মগীতা, যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণপ্রকরণের উত্তরার্দ্ধে ১৭৩ হইতে ১৮৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত আসিয়াছে। 'যমগীতা' তিন প্রকারের— প্রথম বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ৭ম অধ্যায়ে, দ্বিতীয় অগ্নিপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের ৩৮৭ অধ্যায়ে, এবং তৃতীয় নৃসিংহপুরাণের অষ্টম অধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। 'রামগীতার' বিষয়টাও এইরূপ। আমাদের এখানে যে রামগীতা প্রচারিত আছে তাহা অধ্যাত্ম রামায়ণের উত্তরখণ্ডের পঞ্চম সর্গে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অধ্যাত্মরামায়ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একভাগ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ব্যতীত আর এক রামগীতা মাদ্রাস অঞ্চলে প্রসিদ্ধ 'গুরুজ্ঞানবাসিষ্ট-তত্ত্বসারায়ণ' নামক গ্রন্থের মধ্যে আসিয়াছে। এই গ্রন্থ বেদান্তের গ্রন্থ হওয়ায়, জ্ঞান, উপাসনা ও কর্ম্ম এইরূপ তাহার তিন খণ্ড আছে। তৃতীয় অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের তৃতীয় পাদের প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে 'সূর্য্যগীতা' বিবৃত হইয়াছে। 'শিবগীতা' পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে আছে এইরূপ কথিত হয়। কিন্তু এই পুরাণের পুনাস্থিত আনন্দাশ্রমে যে সংস্করণ ছাপা হইয়াছে তাহার মধ্যে শিবগীতা পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় পদ্মোত্তর পুরাণে উহা পাওয়া যায় এই কথা পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ স্বকীয় "অষ্টাদশ পুরাণ দর্শন" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন। নারদপুরাণে, অন্য পুরাণের ন্যায় পদ্মপুরাণেরও যে বিষয়ানুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যেও শিবগীতার উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণে ১১ স্কন্ধ ১৩ অধ্যায়ে হংসগীতা ও ২৩ অধ্যায়ে ভিক্ষুগীতা বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় স্কন্ধের কাপিলেয়োপাখ্যানকেও (অ-২৩-৩৩)"কপিল গীতা" এই নামও কেহ কেহ দিয়া থাকেন। কিন্তু "কপিলগীতা" বলিয়া এক স্বতন্ত্র মুদ্রিত গ্রন্থও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই কপিলগীতা হঠযোগপ্রধান—উহা পদ্মপুরাণ হইতে গৃহীত এই উল্লেখ তাহাতে আছে। কিন্তু পদ্মপুরাণে ইহা পাওয়া যায় না শুধু নহে,—ইহার মধ্যে এক স্থলে (৪-৭) জৈন, জঙ্গম (লিঙ্গাইৎ) ও সোফী (মুসলমান সাধু) ইহাদের উল্লেখ থাকায় এই গীতা মুসলমানী আমলের হইবে, এইরূপ বলিতে হয়। ভাগবত পুরাণের ন্যায় দেবীভাগবতেও সপ্তম স্কন্ধের ৩১ হইতে ৪০ অধ্যায় পর্য্যন্ত এক গীতা থাকায় উহা দেবী কর্ত্তৃক কথিত বলিয়া উহার "দেবীগীতা" নাম হইয়াছে। ইহা ব্যতীত স্বয়ং ভগবদ্গীতার সার অগ্নিপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের ১৮০ অধ্যায়ে এবং গরুড় পুরাণের পূর্ব্বখণ্ডের ২৪২ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। সেইরূপ যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ যদিও রামাবতার প্রসঙ্গে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক রামের নিকট বিবৃত হইয়াছে এইরূপ বলা হইয়াছে, তথাপি তাহাতেই "অর্জ্জুনোপাখ্যান" এই নামে, কৃষ্ণাবতার ভগবান কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের নিকট ভগবদ্গীতার যে সার বলা হইয়াছে, তাহা ভগবদ্গীতার অনেক শ্লোক যেমনটি আছে তেমনিই রাখিয়া শেষের অর্থাৎ নির্ব্বাণ প্রকরণে গ্রথিত হইয়াছে। (যোগ ৬ পৃঃ-৫২-৫৮ দেখ)। পুণায় মুদ্রিত পদ্মপুরাণে "শিবগীতা" পাওয়া যায় না এইরূপ উপরে বলা হইয়াছে ; কিন্তু শিবগীতা না পাওয়া গেলেও এই সংস্করণের উত্তর খণ্ডের ১৭১ হইতে ১৮৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে,ভগবদ্গীতার প্রত্যেক অধ্যায় ধরিয়া এই মাহাত্ম্যের এক এক অধ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে ও তাহাতে এই সম্বন্ধীয় উপাখ্যানও আসিয়াছে। ইহা ব্যতীত, বরাহ পুরাণে এক গীতামাহাত্ম্য থাকায়, শৈব কিংবা বায়ুপুরাণেও তৃতীয় আর এক গীতামাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে এইরূপ কথিত হয়। কিন্তু কলিকাতায় মুদ্রিত বায়ুপুরাণে আমরা তাহা পাই নাই। "গীতাধ্যান" বলিয়া এক নূতন শ্লোকপ্রকরণ ভগবদ্গীতার মুদ্রিত সংস্করণের আরম্ভভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইহার মধ্যে, "ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা" এই শ্লোক অল্প শব্দভেদে সম্প্রতি প্রকাশিত ভাস কবির "উরুভঙ্গ" নামক নাটকের আরম্ভেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাই, এই ধ্যান, ভাস কবির কালানন্তর প্রচারিত হইয়া থাকিবে এইরূপ অনুমান হয়। কারণ, ভাসের ন্যায় প্রসিদ্ধ কবি এই শ্লোক গীতাধ্যান হইতে উদ্ধৃত

করিয়াছেন এইরূপ স্বীকার করা অপেক্ষা, গীতা-ধ্যানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানের শ্লোক গ্রহণ করা হইয়াছে ও কতকগুলি নূতন রচিত হইয়াছে, ইহা বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। ভাস কবি কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায় তাঁহার কাল নিদানপক্ষে তিনশত শক হইতে অধিক অর্ব্বাচীন হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

নিতি নূতন শোভা তোমারি
অম্বরে, সাগরে, ধরাতলে
অতি মনোহারী।
নব-ভানু-ছটা মাঝে
তোমারি জ্যোতি রাজে
সৌম্য-সুন্দর সাঁঝে
তোমারি মাধুরী॥

কথা—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

র্সর্সা II { ণধা পর্সা -ণধা -পগা। মা -া পা -া I র্সাঃ নঃ নর্সা -র্রর্সা।
নিতি নূ॰ ত॰ ॰॰ ॰ন শো ॰ ভা ॰ তো মা রি॰ ॰॰

। -র্সণা -ধপা -ধা (র্সর্সা) } ণধা। -া ণা ণা র্রা। র্সা র্সর্সা ণা পধা I
॰॰ ॰॰ ॰ "নিতি" অ॰ ॰ ম্ব রে, সা গ রে, ধ রা

I না র্সা নর্রা র্সর্সা। ধর্সা ণধা -পধা র্সর্সা II
ত লে, অতি মনো হা॰ রী॰ ॰॰। "নিতি"

II -া মমা ধণর্সাঃ নঃ। র্সা না র্সা র্সা I পনা র্সা র্সর্রা র্সা। -া ণর্সা ণা ধা।
॰ নব ভা॰॰ নু ছ টা মা ঝে তো॰ মা রি॰ জ্যো ॰ তি॰ রা জে

। গা -মা গা মা। পা ধা না র্সা I -া নর্সা নর্সর্রা র্সর্সা। -নর্সা ণধা পধা র্সর্সা II II
সৌ ॰ ম্য, সু ন্দ র, সাঁ ঝে ॰ তোমা রি॰॰ মা ॰॰ ধু॰ রী॰ "নিতি"

ভারতীয় কবি ও কাব্যের ধারা।

(শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী)

কবি কে এবং প্রকৃত কাব্য কি, ইহা লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তথাপি এ কথার সম্পূর্ণ মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুগভেদে "কবি" শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রচলিত, কাব্য কিন্তু সকল সময়েই "কবেরিদং কবি রসাত্মক বাক্য সমূহং" বলিয়া পরিচিত। অতি প্রাচীন যুগে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলা হইত যথা—শ্রীমদ্ভগবৎগীতায়—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ"—এস্থানে কবি অর্থে বিবেকবুদ্ধিশালী জ্ঞানীগণের কথা বলা হইতেছে। আবার গীতার অপর এক অধ্যায়ে "কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্......" ইত্যাদি শ্লোকে সর্ব্বজ্ঞ নিত্য, সত্য, পরম পুরুষকে "কবি" এই আখ্যা দেওয়া হইতেছে। উপনিষদেও সর্ব্বদর্শী পরম পুরুষ অর্থে "কবি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—"কবির্মনীষী।" কবি এত উচ্চস্তরে অবস্থিত ছিলেন। সেই দূর অতীতযুগে কবি ও ঋষি একশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ঋষিমাত্রই ধ্যান-পরায়ণ পরম ভাবুক ও আত্মতত্ত্ব অন্বেষণে নিযুক্ত থাকিতেন। সেই জ্ঞানী পুরুষগণ তাঁহাদের শিষ্যবর্গকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থনিবদ্ধ হইয়া শাস্ত্রাদির আকার ধারণ করিয়াছে। সৃষ্টির আদি দিবসে যখন ধরণী দেবী প্রলয়পয়োধিজলে স্নান করিয়া নবফলফুলভারে সুসজ্জিত, রূপ-রস-সৌরভময়, এবং অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্ভার লইয়া নবসৃষ্ট নরনয়নের গোচরীভূত হইলেন, তখন বিমুগ্ধ নর সামগানে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন—হৃদয়ের প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি লাবণ্যময়ী তরুণী ধরণীর চরণতলে বর্ষিত হইল—বিস্ময়ের সীমা রহিল না—আদি মানব যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই *বিস্ময়! কি অপূর্ব্ব—কি সুন্দর!* বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইল,—তিনি ধরণীর বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া ভক্তি-প্রণতান্তঃকরণে গান গাহিতে লাগিলেন—গাহিতে গাহিতে অন্তর খুলিয়া গেল, বহিঃপ্রকৃতির সহিত মানবাত্মার সংযোগ হইল। প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে ভারতের সেই নিবিড় অরণ্যে সঙ্গীতের সুরতানলয়ে জগতের আদি কাব্যের জন্ম। কবি এই দৃশ্যমান বাহ্য জগত দেখিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভাবে অপূর্ব্ব রসে আপ্লুত হইতেছে—তাঁহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে—যাহা দেখিয়া আনন্দ, সেই বহিঃপ্রকৃতির সহিত মিশিতে হইবে! কি করিয়া মিশিবেন—কি করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন—তাঁহার প্রাণের মধ্যে যাহা হইতেছে, বহুমূর্ত্তিময়ী ধরণীকে তাহা কেমন করিয়া তিনি জানাইবেন! উপায় কি?—সহসা হৃদয়ের সেই অপূর্ব্ব রস বাক্যরূপে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইল—জগত তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। কবির আত্মপ্রকাশই কাব্য এবং রসাত্মক বাক্যের দ্বারাই সেই আত্মপ্রকাশ সম্ভব তাই আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে রসাত্মক বাক্য বলিয়াছেন। প্রকৃতির নিকটেই মানব সর্ব্বাগ্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতির নিকট এই আত্মনিবেদন বৈদিক যুগের কাব্য। ইহাই ভারতের প্রথম প্রভাতনিনাদিত সামগান। আর কোনও দেশে এ সামগান নাই—ইহা ভারতের নিজস্ব। পাশ্চাত্য Lyric এর সহিত ইহার তুলনা হয় না। Lyric (lyre 'শব্দ হইতে উৎপন্ন) সঙ্গীত হইতেই উৎপন্ন, কিন্তু তাহা প্রকৃতির স্তুতি নহে, মানবাত্মার বহির্জ্জগতের সহিত মিলনেচ্ছায় তাহার উৎপত্তি নহে, তাহা 'human emotions in such a from as admits of being set to music' মানবের সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদে তাহার জন্ম।

বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগের প্রতি যখন আমাদের দৃষ্টি পড়ে তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মানবের সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদে অন্য প্রকার অভিনব কাব্য কি প্রকারে জন্মলাভ করিল। মহর্ষি বাল্মীকি তমসাতীরে বসিয়া ধ্যানস্তিমিতনেত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন; পূতসলিলা তমসা মৃদুমন্দ গতিতে চলিয়াছে, বৃক্ষশাখায় পাখীর কলগান সেই পুণ্যভূমিকে আনন্দের স্রোতে ভাসাইয়াছে, চারিদিকে আনন্দ—চারিদিকে উচ্ছ্বাস—সহসা কোথা হইতে এক করাল নিষাদ সেইখানে উপস্থিত হইয়া সুখে বিভোর ক্রৌঞ্চদম্পতীর একটাকে শরাহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিল। মহর্ষির

ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল—সে শর যেন তাঁহার বুকে বিদ্ধ হইল—হৃদয় শোকে অভিভূত হইল—তখন তাঁহার হৃদগত সেই মহাশোক বাক্যরূপে শ্লোকের আকার ধারণ করিয়া বহির্গত হইল—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

মহর্ষি নিজের বাক্যে নিজে চমকিত হইলেন—একি, এ অপূর্ব্বপদ কেমন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল। অন্তরের করুণার ধারা রসাত্মক হইয়া বাহিরে আসিয়াছে। সেই দিন মানবকাব্যের জন্ম (poetry of human emotions)। তখন মানবের সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, প্রেম, স্নেহ, কর্ত্তব্য ইত্যাদি মানবধর্ম্ম লইয়া মানবোচিত উপাদেয় কাব্য রচিত হইল। রামায়ণ ও মহাভারত মাত্র পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ব, কাব্য বা epic নয়—এই সকল গুলিরই সমষ্টি। ইহাতে প্রাচীন ইতিবৃত্ত আছে, ধর্ম্মতত্ব আছে, রসাত্মক পদ আছে, epic এর গুরু-গম্ভীর সমরনিনাদ ও অস্ত্রঝনৎকার আছে, অপূর্ব্ব আদর্শ চরিত্রাবলী, উৎকৃষ্ট নাটকীয় ভাবদ্বন্দ্ব এবং নাটকের ন্যায় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের উচ্ছ্বসিত লহরলীলা ও তাহার অপূর্ব্ব ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আছে। এই দুই মহাকাব্যের তুলনা জগতে নাই। আদর্শ স্ত্রী সীতাচরিত্রের পরেও মহাভারতকার দ্রৌপদী ও সাবিত্রীচরিত্র দেখাইয়াছেন। ইচ্ছামৃত্যু গাঙ্গেয় ভীষ্মের তুলনা আর কোন্ কাব্যে থাকিতে পারে? গ্রীক epic এর সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের তুলনা হইতে পারে না। যুদ্ধোদ্যম ও বীরত্বকাহিনী বর্ণনা epic এর প্রাণ, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের প্রাণ যুদ্ধ নয়—যুদ্ধ তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। সমস্ত যুদ্ধকোলাহলের মধ্য হইতে মহাভারতের অন্তর্গত গীতার অভয়বাণী কাহার কর্ণে না প্রতিধ্বনিত হয়।

বৈদিক যুগের কাব্য প্রকৃতির প্রতিধ্বনি; পৌরাণিক যুগের কাব্য সমাজের প্রতিবিম্ব—ঠিক পৌরাণিক সমাজ যেমন যেমন ছিল তাহারই অসংখ্য ছবি রামায়ণ মহাভারতে উঠিয়াছে। বৈদিক ও পৌরাণিক উভয় যুগের কবিই ঋষি। তারপর বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে কলানৈপুণ্য প্রথম প্রকাশিত। রামায়ণ ও মহাভারত প্রকৃতি ও সমাজের স্বচ্ছ দর্পণস্বরূপ—উহাতে সবই যেন আপনাআপনি স্বভাব হইতে আসিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের কাব্য-সমূহে কলানৈপুণ্যের সাহায্যে চিত্রের বর্ণবৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে। এই যুগের রাজা মহাকবি কালিদাস। তিনি আর ঋষি নহেন, সাধারণ জ্ঞানী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কবির আসন পাইয়াছেন। এই যুগেই ভারতে নাট্যশাস্ত্রের পূর্ণতা সাধিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে কাব্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; দৃশ্য-কাব্য, শ্রাব্যকাব্য ও গীতিকাব্য। ঐতিহাসিক যুগে দৃশ্যকাব্য ও শ্রাব্যকাব্য চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। দৃশ্যকাব্য সুদূর অতীতে সুর, তান, লয়, নৃত্য ও সঙ্গীত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আনন্দই ইহার উৎপত্তির কারণ—দুঃখ নহে। তাই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক নাই এবং সুখের সময়েই নাটকের অভিনয় হইত। অভিনয় শেষ হইয়া গেলে রসিক সুজন আনন্দে ঘরে ফিরিয়া যাইতেন। বোধ হয় মহাকাব্য ও নাটক সমসাময়িক, শ্রাব্যকাব্য তাহার পর। আমরা দেখিয়াছি বালিকাগণ খেলা ঘরে খেলা করে। একজন বালিকা তাহার পুতুল লইয়া অপর বালিকার পুতুলের সহিত বিবাহ দেয় এই প্রকারে তাহারা নিজেদের সংসারধর্ম্মের একটা অভিনয় করিতে থাকে। মানব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিয়াই বোধ হয় বালিকার পুতুল খেলার ন্যায় আপনাদের কার্য্যাবলীর অভিনয় করিয়া আসিতেছে। জন এস কেল্‌টী (John S. Keltie) তাঁহার সম্পাদিত "The British Dramatists" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"Indeed, the love of dramatic representation is as prevalent and as natural to man as religion itself."

মহর্ষি ভরত ভারতীয় নাট্যকাব্যের জনক। পাঠক লক্ষ্য করিবেন আদি কবির ন্যায় আদি নাট্য-কবিও মহর্ষি। কাব্য হইতে নাটক আরও মানবোচিত। যতপ্রকার ভাবের শক্তি মানব অনুভব করিয়াছে প্রেমই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সেই নিমিত্ত অধিকাংশ শ্রাব্য ও দৃশ্যকাব্য প্রেমমূলক। মহা-কাব্যেও মানবের চরিত্র বর্ণিত আছে, তাহারও আখ্যানবস্তু মানবপ্রেম; কিন্তু মহাকাব্যের প্রেম ফল্গুধারার ন্যায় ঘটনাপ্রসঙ্গের অন্তরে অন্তরে প্রবা-

হিত—বাহিরে তাহাদের ক্বচিৎ প্রকাশ। নাটক ও শ্রাব্য কাব্যে কিন্তু তাহা নয় (আমি ভারতীয় নাটকের কথা বলিতেছি)—প্রেম ভিন্ন অন্য কোন বিষয় লইয়া অতি অল্প নাটকই লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে ঘটনাপ্রসঙ্গ এত বেশী যে আমরা রাম ও সীতাকে এক স্থানে প্রায়ই দেখি না অথচ তাঁহাদের প্রেম রামায়ণের প্রতি ঘটনায়, প্রতি কার্য্যে, সাগর বন্ধনে, মহাযুদ্ধে প্রকটিত হইতেছে। রামায়ণের রামসীতা আদর্শ দেবপ্রতিম নরনারী, কিন্তু রঘুবংশের রাম-সীতার প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে আমরা আরও মানবোচিত ভাব তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাই। সীতাকে উদ্ধার করিয়া রাম বিমানযোগে আসিতেছেন; এখানে কাব্যে কি চমৎকার কলা-নৈপুণ্য। এ রামসীতাকে দেখিলে বাল্মীকির সৃষ্ট চরিত্র মনে পড়িবে না; ইহা কালিদাসের নিজস্ব। রাম যুবক, বীর, রাজপুত্র ও প্রেমিক—তিনি স্বীয় প্রাণতোষিণী প্রিয়তমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নৈসর্গিক দৃশ্য বর্ণনা শুনাইতে শুনাইতে চলিয়াছেন! আবার উত্তররামচরিতের প্রথম দৃশ্য মনোহারিত্বে ও অভিনবত্বে আরও চমৎকার! ঐতিহাসিক যুগের কাব্য ও নাটকে পৌরাণিক যুগের চরিত্র সম্পূর্ণ নূতনভাবে চিত্রিত হইয়াছে। প্রকৃতিতে চরিত্রগুলি অবশ্য একই, তবে ভঙ্গিমা অন্য প্রকার। পুরাণেও শকুন্তলা আছে কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা—

> চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
> রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতানু।
> স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
> ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

ইংরাজীতে যাহাকে sentiment বা emotion বলে তদ্দারাই পৌরাণিক যুগের কাব্য হইতে ঐতিহাসিক যুগের কাব্যের প্রভেদ বুঝা যায়। নাট্য-কলা বা কাব্যকলা এই sentimentকে সৃষ্টি করিয়াছে।—sentiment কি তবে সত্য নয়? না তাহা নহে—sentiment সত্য—তবে উহা সত্যের স্থির মূর্ত্তি নয়—লীলাতরঙ্গ। রামায়ণ মহাভারতে সত্যের স্থির মূর্ত্তি আছে, লীলাতরঙ্গ নাই। রামায়ণ মহাভারত প্রশান্ত মহাসাগর, ঐতিহাসিক যুগের কাব্য কল-কল্লোলিনী তটিনী। রামায়ণ মহাভারতকার ঋষি; ঐতিহাসিক যুগের কাব্যপ্রণেতাগণ সুশিক্ষিত কবি, কিন্তু ঋষি নহেন। বৌদ্ধযুগ ভারতীয় কাব্য ও নাট্যকলার চরমোৎকর্ষের যুগ। কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, ভাস, মাঘ, নৈষধচরিত-প্রণেতা ইত্যাদি মহাকবিগণ এই যুগকেই অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

ইহার পর ভারতীয় কাব্যাকাশ বহুদিনের নিমিত্ত মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সে মেঘ অপসারিত করিয়া যে নবতর জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব কাব্য। ইহা প্রেম মূলক—প্রেমের নানা মূর্ত্তি ইহাতে প্রকটিত। তমসাতীরে যেমন মহাকাব্যের জন্ম, তেমনই বঙ্গদেশে অজয়নদের তীরে কেন্দুবিল্বগ্রামে এই গীতিকাব্যের উদ্ভব। বৈদিক কাব্যের ন্যায় বৈষ্ণব কাব্যও আত্মনিবেদন, কিন্তু উভয়ের ধারা স্বতন্ত্র। বৈদিক কবি প্রকৃতির নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছেন—বৈদিক কাব্য উদার, শান্ত, গভীর—উন্মুক্ত বিরাট আকাশের ন্যায় তাহার গাম্ভীর্য্য—ওঙ্কারে বৈদিকগীতির মূর্চ্ছনা। কিন্তু বৈষ্ণব কাব্য মানবোচিত—মানব তাঁহার পরমারাধ্য উপাস্য দেবতাকে আত্মনিবেদন করিতেছেন। যিনি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিবেন—কখনও তাঁহাকে পতিভাবে দেখিয়াছেন, কখনও পুত্র, কখনও সখা—পরিতৃপ্তি নাই—অবিরাম রসের তরঙ্গলীলা। তাহা যথার্থই কবিহৃদয়ের অনুভূতি এবং সে অনুভূতি এত সত্য যে তাহা সমগ্র জাতিকে এক অভিনবভাবে উদ্বোধিত করিল।* যে প্রেমে মানব আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার প্রিয়কেই দেখিতে থাকে,—কখন কখন প্রিয়ের সঙ্গে এক হইয়া যায়, বৈষ্ণব কাব্য সেই মহাপ্রেমের কাব্য। বৈদিকযুগের কাব্যে দেখিতে পাই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাব কিন্তু বৈষ্ণবকাব্যে পরমপুরুষের প্রতি গভীর প্রেম। আবার এই কাব্য বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব। প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যের যদি গর্ব্ব করিবার কিছু থাকে তো সে তাহার বৈষ্ণব সাহিত্য। ইংরাজী কোন Lyric এর সহিত এ গীতিকবিতার তুলনা হয় না। Shelley, Byron

* কবি রাসলীলা, দোললীলা বর্ণনা করিয়াছেন, সমগ্র জাতি সেগুলিকে জাতীয় অনুষ্ঠান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

প্রভৃতি প্রেমের কবি বটে কিন্তু তাঁহাদের কাব্যে বৈষ্ণব কবিতার সে হৃদয়োন্মাদকারী ভাব কোথায়? সে রূপ কোথায়, যাহা জন্মাবধি দেখিয়াও নয়নের সাধ মেটে না—যাহা নিত্য সুন্দর, যাহাতে মলিনতা নাই যাহা "নব নব নিতুই নবরে"। বৈষ্ণব কবি রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া অরূপের সন্ধান পাইয়াছেন!

তাহার পর ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের যুগে আমরা উপস্থিত হই। এ যুগের কাব্য আবার বৈষ্ণব কবিতা হইতে স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব কবিতা সার্ব্বভৌম। ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের কবিতা তাহা নহে—উহা এক বিশিষ্ট সমাজের। বঙ্গদেশের তদানীন্তন সমাজের সজীব ছবি উহাতে প্রতিফলিত; কবির মানসী সৃষ্টি কিছুই নাই। দৈনন্দিন সুখ,দুঃখ, অভাব, অভিযোগ, সারল্য উহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। জাতির তদানীন্তন সমস্ত ভাবই তাহাতে আছে, জাতি ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া কোন সনাতন বস্তু কবি আমাদিগকে প্রদান করেন নাই। অন্নপূর্ণা পাটনীকে বর দিতে চাহিলেন সরল গ্রাম্য পাটনী বর চাহিল—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" কি সুন্দর গ্রাম্য ছবি। তারপর বাঙ্গালাদেশে এক সময় আসিয়াছিল যখন বাঁধনদার মাত্রকেই কবি বলা হইত। গ্রামে গ্রামে কবির দল ছিল, কবির লড়াই হইত। জাতির ভাব কিরূপ নিম্নতম সোপানে পতিত হইয়াছিল এই কবির লড়াইয়ে তাহা বুঝা যায়। জাতি ইহাতেই আনন্দ উপভোগ করিত, জাতির চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাব্যের প্রয়োজন ছিল না। ইংরাজ রাজত্বে আধুনিককালে আবার কাব্যের আদর্শ উচ্চতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সকল সময় ও সকল দেশের কাব্য আলোচনা করিলে আমরা তাহার দুইটী ধারা দেখিতে পাই। একটী সনাতন আর একটী সাময়িক। জাতির জীবনের পক্ষে সাময়িক কাব্যের বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে কিন্তু প্রকৃত কাব্য শুধু সাময়িক নয়, সর্ব্বসাময়িক বা সনাতন। সত্যের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা। "সত্যং, শিবং সুন্দরং" ইহাই প্রকৃত কাব্যের মূলমন্ত্র। যে কাব্যে এই মন্ত্র উচ্চারিত, তাহাই ধরণীতে চিরদিন জীবিত থাকিবে। মানব সেই সত্য, শিব এবং সুন্দরকে অনুসন্ধান করিতেছে। যেথানে একটীকে পাইয়াছে, দেখিয়াছে সেইখানে তিনটীরই মিলন। যাহা সাধারণ মানব অন্বেষণ করিয়া পায় নাই, কবি তাহা দেখিয়াছেন—সেই সৌন্দর্য্য সাগরে নিমগ্ন হইয়া, সেই সত্য, শিব ও সুন্দরের সঙ্গমতীর্থে স্নান করিয়া—কবি বিশ্ববাসীকে ডাক দিয়া বলিতেছেন—"এই দেখ আমি প্রকৃত সৌন্দর্য্যরসানুভব করিয়াছি—ইহা সত্য এবং মঙ্গলময়।" কবি সমাজের শিক্ষক, জাতির শিক্ষক, সমগ্র মানবের শিক্ষক, গুরু। তিনি অরূপকে রূপ দেন, ছায়াকে কায়া দেন, অন্তর্জগতে যে রহস্য চলিতেছে বাহিরে তাহারই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। প্রকৃত মহাকবির নিকট অরূপ রূপবান হন, ধ্যানের বস্তু চক্ষের সম্মুখে আগমন করেন, বাক্যের অতীতকে তিনি স্তবের দ্বারা তুষ্ট করেন, আবার তাঁহার মহিমা লাঘব হইল বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সমগ্র পুরাণ-কাব্য রচনা করিয়া ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

কবিহৃদয়ের এ রহস্য কে বুঝিবে?

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ।*

(মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী)

"সাজাইতে মাতৃভাষা, সদা যা'র মনে আশা,
নাশিতে স্বদেশবাসি-অজ্ঞান-তিমির।
জন্মভূমি-জননীর, মুছাতে নয়ননীর,
দিবসযামিনী যার পরাণ অধীর॥
রত্নপ্রসূ বসুধার সে রত্ন-সন্তান।
এ মর-ধরণী 'পরে অমর-সমান॥"

সমবেত সভ্যমণ্ডলী, দেখিতে দেখিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন দশম বর্ষে উপনীত হইল। বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ প্রতিবর্ষে, কোন স্থানে সম্মিলিত হইয়া, মাতৃভাষার চরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ

* বাঁকীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

করেন, নানা রোগ-জর্জ্জর বঙ্গভূমির প্রিয় সন্তানবৃন্দ, এই সম্মিলনের তিন দিন, আপন-আপন সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ,—সমস্ত একপদে বিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে, সাধকের ন্যায় উপবিষ্ট, ইহা বাঙ্গালীর পরম মঙ্গলের কথা, শ্লাঘার কথা।

মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন,—যাহার যেটুকু আছে, সে যদি সেইটুকুতেই সুস্থ থাকে, অভ্যুদয়ের দিকে আর না তাকায়, তবে, মনে হয়, বিধাতা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই, তাহার আর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করেন না। সংসারী জীবের পক্ষে এ উক্তি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমের ফলে, বঙ্গভাষা বর্ত্তমানকালে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে, অদূর-ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কেননা, যে সকল গ্রন্থকে স্তম্ভস্বরূপ আশ্রয় করিয়া, বঙ্গভাষা এই প্রতিযোগিতাসঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে অক্ষয়ত্ব লাভ করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষায় তাদৃশ গ্রন্থাদি তত অধিক পরিমাণে উপনিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং আমাদের নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বঙ্গবাসি-জনগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাঙ্গালাভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একটা তরঙ্গ উত্থিত থাকে, বাঙ্গালী-হৃদয় কোন সময়ের জন্য নিস্তরঙ্গ, স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নপর থাকিতে হইবে। বঙ্গভাষা-বিষয়িণী আলোচনা দেশের সর্ব্বত্র আরও অধিকতররূপে আবদ্ধ করিতে হইবে। আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকে বলেন, "এই সাহিত্য-সম্মিলনের কোন উপযোগিতা নাই। বর্ষে-বর্ষে এতগুলি টাকা ব্যয় করায় ভাষার তেমন কি অভ্যুদয় হইয়াছে? এই দীর্ঘ দশ বৎসরে বাঙ্গালাভাষার কোনই ত উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাই না। তবে এ আন্দোলনের আবশ্যকতা কি?"—ইত্যাদি। যাঁহারা এই কথা বলেন, দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অনন্তকালের সমক্ষে যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে দশ বৎসর বা দশশত বৎসর নিমেষ-তুল্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। যদি আমরা আমাদের জাতীয়তা সঞ্জীবিত রাখিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন আবশ্যক। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, বাঁচিবার উপায়, উপকরণগুলির প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঔদাসীন্যে চলিবে না। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, এক হিসাবে তাহার কিছুই নাই; সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালীজাতির যদি জগতে কাল-জয়ী হইবার বাসনা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য, বৎসরে একবার কেন, যদি প্রয়োজন বুঝা যায়, একাধিকবারও এতাদৃশ সম্মিলনের অধিবেশন অনভিপ্রেত নহে। চাই উৎসাহ, চাই উদ্যম। আমার মাতৃভাষাকে জগতের বরণীয় করিয়া তুলিব, একা আমি নহি, আর দশজনেও যাহাতে আমার মাকে মা' বলিতে পারিলে, নিজেকে ধন্য, কৃতার্থম্মন্য মনে করিবে, এমনভাবে আমার মাকে গড়িয়া তুলিব,—প্রাচ্য-প্রতীচ্য-নির্ব্বিশেষে আমার মার অধিকার প্রসৃত হইবে,—এইরূপ ধারণা লইয়া যদি আমরা কাজ করিতে পারি, তবে, আজ যাহা স্বপ্ন বা একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা করস্থ আমলকবৎ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং যাহাতে বঙ্গবাসীর মনে বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার স্পৃহা সতত জাগরূক থাকে, তজ্জন্য, এবং মধ্যে মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণের প্রীতিপ্রণয়ের আদান-প্রদানের জন্য, এইরূপ সম্মিলন যে একান্ত আবশ্যক, ইহা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে।

বাঁকিপুর দশম সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ সেই মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে স্থানে একদিন ভারতের তদানীন্তন একচ্ছত্র সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক বৌদ্ধ-সঙ্গীতির আহ্বানপূর্ব্বক মগধের স্মরণীয় মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন,—যে পাটলীপুত্রের পুরাচিহ্নসমূহের সামান্য একটু অংশ-প্রাপ্তির জন্য ঐতিহাসিকগণ সতত উদ্গ্রীব, ভারতের নবীন ইতিহাসের প্রতি পত্রে যে প্রাচীন নগরের স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে,—সেই পাটলীপুত্রে আজ বঙ্গের সারস্বত-সেবকগণ সম্মিলিত হইয়াছেন,—ইহা বাঙ্গালীর বিশেষ শ্লাঘার কথা, এবং অদ্যকার এই দিন,—

বঙ্গবাসীর তথা বঙ্গের ভবিষ্য জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় বস্তু। পার্থিব ব্যাপারে আজ বঙ্গ এবং বিহারের মানচিত্র পৃথগ্‌ভূত হইলেও, অপার্থিব সারস্বত ব্যাপারে এই উভয় প্রদেশেই যে একসূত্রে গ্রথিত, অদ্যকার এই সম্মিলন তাহার অন্যতম নিদর্শন।

এই জাতীয় সাহিত্য সম্মিলনে পূর্ব্বে-পূর্ব্বে যে সকল মনস্বী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির পরিচয় নূতন করিয়া আমি আর কি দিব? সেই সকল সুযোগ্য সাহিত্যরথিগণের স্পৃহনীয় আসনে আপনারা আমাকে বসাইয়া সেই মহার্হ আসনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এইরূপ কার্য্যে, বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের মহাসম্মিলনে, আমি সভাপতির কার্য্য করিব। আমি সাহিত্যিক নহি, বঙ্গবাণীর সেবকগণের যে গৌরব, আমি তাহার ভাজন হইবার যোগ্য নহি, ইহা আমি যতটা জানি, এবং বুঝি, বোধ হয় অন্যে ততটা জানেন না, বা বুঝেন না। বঙ্গের যে সকল কৃতী সন্তান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণপণে এবং নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গভারতীর অর্চ্চনা করেন, সেই সকল মহাত্মার কোন কাজে, কোন উপকারে আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে চরিতার্থ হই। সভ্যগণ আপনারা আমাকে সে সুযোগে বঞ্চিত করিয়াছেন। সাহিত্য সাধকগণের সেবা করিতে যাহার অভিলাষ তাহাকে সাহিত্য-সাধন-যজ্ঞের ঋত্বিকরূপে মনোনীত করায়, উক্ত যজ্ঞের অগৌরব হইয়াছে, এবং তাহার সে সাধেও বাদ সাধিয়াছেন।

প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোনমতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু অপলাপে লাভ কি? যে সম্পদ্ থাকিলে, যে শক্তি থাকিলে মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করা যায়, দুর্ভাগ্য আমি, আমার সে সম্পদ্ বা শক্তি নাই। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম, কবে এমন দিন আসিবে, যখন আমার শিক্ষিত দেশবাসিগণ আচারে-ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায়, চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন হইবে। কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্রস্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা। কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্বসমক্ষে কথা বলিতে, বা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী বঙ্গভাষার সেবকরূপে নিজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভূত হয় যে, সে সুদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্যধ্যেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্ত্তমান। একদিকে, দেশের যাঁহারা ভবিষ্যৎ আশার স্থল, যাঁহাদের বিবেচনার উপর বঙ্গদেশের অদৃষ্ট নিহিত, সেই শিক্ষার্থী যুবকগণ আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজভাষার সহিত বঙ্গভাষার আলোচনা করিতেছেন। আর দু'দিন পরে যাঁহারা ইচ্ছা করিলে তর্জ্জনীহেলনে দেশের লোকমত পরিচালন করিতে পারিবেন, সেই যুবকবৃন্দ বঙ্গভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে; শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদলবাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। আর ঐ দেখ, অন্যদিকে যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সৌভাগ্যদেবতার আদরের সন্তান, তাঁহারাও বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ।

কয়েক মাস পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণে আমি জাতীয় সাহিত্যগঠন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, "দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎপথে লইয়া যাইতে হয়, মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহা জাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের

ইতর-সাধারণ পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ-সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ, আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ, আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্ব-সাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, বিদেশীয় আয়ুধেও সন্নদ্ধ হইতে হইবে।” সুতরাং জাতীয় সাহিত্য-গঠন সম্বন্ধে অদ্য আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অদ্য আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যগঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বদ্বৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে; এবং সেই চিন্তা-প্রসূত উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। তবেই ত বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ করিবে। যদি এমনভাবে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গসাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের ঔৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়,—আজ যেমন আমরা অনেক মহার্ঘ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট বিষয় আবিষ্কৃত এবং উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্যমাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্য শিক্ষণীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ-ঐ বিষয়-সমূহ এতাবৎকাল লিখিত হয় নাই,—তাহা হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন। সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলেই, যাহাতে বঙ্গভাষাও অপরাপর ভাষার ন্যায় শিখিতে হয়, না শিখিলে অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়া যায়, সুতরাং অন্য শত ভাষার শিক্ষাতেও পূরা মানুষ হওয়া যায় না, যদি এমনই ভাবে বঙ্গভাষার সম্পদ্-বৃদ্ধি করা যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চিরস্থায়িনী হইবে, বাঙ্গালার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে সমুন্নীত হইবে। অন্যথা বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার গৌরব বাড়িল কৈ? বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমনভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা যায়। কাল অনন্ত এবং পৃথিবী বিশাল, সুতরাং ব্যস্ততার কারণ নাই; ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপপূর্ব্বক, আমার জননী বঙ্গভাষাকে, অনন্তকালরূপা অক্ষয়বটের ছায়াশীতল তলদেশে লইয়া যাইয়া, বঙ্গের পূজনীয় ভাষাকে জগতের পূজনীয় করিতে হইবে। বিষয়টা আরও একটু বিশদ করিতে চেষ্টা করা যাক্। একদেশের ভাষা অন্য দেশের লোকের নিকট আদৃত হইবার কারণ প্রধানতঃ দুইটি, একটি রাজনৈতিক কারণ, অপরটি ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্য।

রাজার জাতির ভাষা না শিখিলে, রাজার জাতির ভাষায় বিজ্ঞতালাভ না করিলে, নানারূপ অসুবিধা, সুতরাং বিজিত জাতির বিজেতার ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ধরিয়া লউন, আমাদের ইংরাজ যদি আজ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইতেন, তাহা হইলে এই বিশাল পৃথিবীতে ইংরাজীভাষাই প্রধানতঃ প্রচলিত হইত। সেরূপ কোনও সম্ভাবনা আমাদের বঙ্গভাষার নাই, সুতরাং প্রথমোক্ত কারণে বঙ্গভাষা জগতের ভাষা হইতে পারে না। কিন্তু রাজভাষা না হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক ভাষা দেখিতে পাই, যাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর নিকট অনাদৃত নহে, প্রত্যুত যথেষ্ট আদৃতই হইয়া থাকে। যেমন ইংরাজিভাষা। সমগ্র পৃথিবী ইংরাজের রাজত্ব না হইলেও, অনেক স্বাধীন দেশেও এই ভাষার আদর দেখিতে পাই। এইরূপ রুষদেশীয় ভাষাও এখন অনেক দেশে যথেষ্ট সমাদৃত, যেখানে হয় ত এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একজনও রাষিয়ান দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের গর্ব্বের কারণ, ভারতবর্ষের স্পর্দ্ধার

বিজয় বৈজয়ন্তী, সংস্কৃতভাষা, অথবা ইউরোপের লাটিন এবং গ্রীকভাষা কোন্ দেশে অনাদৃত? কোন্ মেধাবী ব্যক্তি এই সকল ভাষা শিখিয়া কৃতার্থ হইতে না চান? ফরাসী ভাষায় যে সকল বিশিষ্ট-বিশিষ্ট জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি আছে, তাহার অনুবাদমাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া কোন্ আজীবনছাত্র মনস্বী উক্ত ভাষা অভ্যাস না করেন? এই সকলের কারণ কি? ঐ-ঐ ভাষায় এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা না শিখিলে সেই সেই বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ হইয়াছেন, এ কথা অবিসংবাদে স্বীকার করা যায় না। মনে করুন, গণিত এবং রসায়ন শাস্ত্র; রাষিয়ান ভাষায় গণিত এবং রসায়নশাস্ত্রের এত অধিক পর্য্যালোচনা ও গবেষণা আছে যে, সেই-সেই শাস্ত্রব্যবসায়ীদের পক্ষে সেগুলি অবশ্য-দ্রষ্টব্য। যদি কেহ অঙ্ক বা রসায়নশাস্ত্রে প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে চান, ঐ-ঐ বিষয়ে নিজের যে জ্ঞান-পিপাসা, তাহা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে চান,—তবে তাঁহাকে রুষীয় ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে; অন্যথা সে সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের, অথবা কেবল ইংলণ্ড কেন, জগতের গৌরবভাজন মহাকবি সেক্ষপীয়রের অমৃতময়ী লেখনীর রসাস্বাদ করিবার জন্য কোন্ সুরসিক ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে না চান? রাজনৈতিক কারণ ব্যতিরেকেও রাষিয়ান্ এবং ইংরাজী ভাষার প্রতি এত যে আদর, জ্ঞানার্থীদের এত যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রকৃত কারণ হইল, তত্তৎ ভাষায় ঐ সমুদায় মহার্ঘ বিষয়ের সন্নিবেশ। যদি অঙ্ক এবং রসায়ন বিষয়ে রাষিয়ান্ ভাষা অতটা সম্পন্ন না হইত, বা সেক্ষপীয়ার, মিলটন, বাইরণ প্রভৃতির অপূর্ব্ব কল্পনালোকে, বা নিউটনের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারে ইংরাজি ভাষা সমলঙ্কৃত না হইত, তবে রুষিয়া এবং ইংরাজের অনধিকৃত দেশসমূহেও এই-এই ভাষার কি এত গৌরব কদাচ বৃদ্ধি পাইত? ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানময় সংস্কৃতভাষার ইউরোপেও যে এত আদর, তাহার কারণ কি? পরাধীন ভারতের প্রাচীনতম ভাষার প্রভাব স্বাধীন পাশ্চাত্য জগতে যে ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কালে এমন এক দিন আসিবে, যখন পশ্চিমের প্রত্যেক বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কোন-না-কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য সংস্কৃতভাষার অনুশীলন করিবেন। কবে, কোন্ দিন, কত শত-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে বসিয়া, ক্রৌঞ্চমিথুনের কবি, তাঁহার তপঃসিদ্ধ বীণায় ঝঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, আর আজও ঐ দেখ, সকল দেশের সুপণ্ডিত ব্যক্তিই সেই ঝঙ্কার শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া আছেন। বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসের মহাভারত, ভারতের অপৌরুষেয় বেদসংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃতভাষায় উপনিবদ্ধ বলিয়া, সকল দেশের জ্ঞানপিপাসুই এই ভাষায় আস্থাসম্পন্ন। মহাকবি কালিদাস শিপ্রাতটে বসিয়া যে মোহন বংশীধ্বনিতে ভারতবর্ষকে উদ্‌ভ্রান্ত, একেবারে তন্ময় করিয়া গিয়াছেন, আজও সে বাঁশরী-ঝঙ্কারের যেন বিরাম হয় নাই। ঐ দেখুন, ইউরোপের মেধাবী সন্তানগণ, ঐ মনোজ্ঞ সঙ্গীতের রসাস্বাদের আশায়, সংস্কৃতভাষার অনুশীলন করিতেছেন। এ দেশীয় শকুন্তলা নাটকের বিদেশীয়-কৃত অনুবাদের অনুবাদ পড়িয়াও সুকবি গেটে আত্মহারা হইয়াছিলেন। জগতের অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল প্লেটো, ইউক্লিড, পিথাগোরাস, এরিষ্টটল প্রভৃতির মনীষা-সাগরোত্থিত রত্নমালা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক গ্রীক্ ভাষা এই মরধামে অমরতা লাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক আধিপত্যে উল্লিখিত ভাষাসমূহ অকিঞ্চিৎকর হইলেও জ্ঞানের আধিপত্যে, সম্পদের আধিপত্যে ঐ-ঐ ভাষা জগতের শিক্ষিত সমাজের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক গগনের চন্দ্র-সূর্য্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণবের বেলাভূমিতে ঐ যে সমুদয় প্রাচীন মনীষিগণের সুচিন্তা-রত্নমণ্ডিত সৌধাবলী শির উত্তোলনপূর্ব্বক স্মরণাতীত কাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে, জগতের ঐহিকবাদিগণের পরস্পর বাদ-বিসংবাদ দর্শনে যেন নীরবে হাসিতেছে,—ঐ সকল মনীষামন্দিরের কোন দিন বিলোপ ঘটিবে না। নানাবিধ বিপ্লবে ভারতবর্ষ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইলেও সেই প্রাচীন কাল হইতে বেদাদি-রত্নহারে সুশোভিত হইয়া সংস্কৃত-ভারতী একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি সংস্কৃতভাষায় বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা প্রভৃতি উপনিবদ্ধ না হইত, যদি কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতি অমর কবিকুলের

সম্বন্ধগ্রথিত মণিময় হারে সংস্কৃত ভাষা অলঙ্কৃত না হইত, তবে কি আজ এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনেও সংস্কৃতভাষা এমনই অক্ষতদেহে ভারতীয় সভ্যতার কিরীটরূপে শোভা পাইত? ভাষার অমরত্বের এবং সর্ব্বত্র প্রসারের কারণ হইল, সম্পদ। যে ভাষায় যত সম্পদ্, যে ভাষা যত অধিক সুচিন্তা-প্রসূত-বিষয়ে বিমণ্ডিত, সেই ভাষার প্রসার জগতে তত অধিক। সে ভাষা যে দেশেরই হউক না কেন, সকল বিদেশীয়েরাই আন্তরিক যত্নসহকারে সেই ভাষার সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য করিবেন। এইরূপ সংস্কারে হৃদয় দৃঢ় করিয়া, বঙ্গভূমির প্রকৃত সুসন্তানের ন্যায়, আমরা যদি বঙ্গভাষার আলোচনা করিতে পারি, কালে বঙ্গভাষা জগতের শিক্ষণীয় ভাষা হইবে। বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ন্যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্ত্তমান মনস্বিগণও যদি তাঁহাদের জ্ঞানগরিমার সম্পদ্ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ করেন, এবং উত্তরকালেও যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত-রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্ব-স্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যান,—এবং এই প্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন এক দিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়-গণের অনেক কৃতবিদ্যকেই আগ্রহ-পূর্ব্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রাবীণ্য লাভ করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হ'ন, তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্ব-স্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশ-পূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরববৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন। অবশ্য তাহাতে বঙ্গভাষা জগতের সর্ব্বত্র একাধিপত্য করিবে না, সত্য, কিন্তু রাষিয়ান্, গ্রীক্, লাটিন্, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষাও পৃথিবীর তাবৎ শিক্ষা-কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম আলোচনীয়রূপে গৃহীত হইবে। (ক্রমশঃ)

শিলক প্রবাহণ সংবাদ।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য বেদান্ততীর্থ)

বহুদিন পূর্ব্বে উপনিষদুক্ত গল্প বা ইতিহাস ভাগের অনুবাদ করিবার ইচ্ছা আমার হইয়াছিল। অনেকেই বর্ত্তমান সময়ে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া অনাবশ্যক বোধে এতদিন আমি এই কার্য্য হইতে বিরত ছিলাম, কিন্তু কতিপয় বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে পুনরায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বেদ ভারতবর্ষের প্রাণ। বেদ ছাড়িয়া দিলে ভারতবর্ষ প্রাণহীন হয় ইহা কেবল মুখের কথা নহে। বাস্তবিক প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির বিকাশস্থল একমাত্র বেদ। ইহা লইয়াই আজও ভারতবাসী বিদেশীয়দের নিকট প্রাচীন সভ্যতার গৌরব করিতেছে। বেদ কোন্ সময় কি ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল আর্য্য ঋষিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা জানিতে না পারিয়া বেদকে অনাদি নিত্য অপৌরুষেয় বলিয়া গিয়াছেন। আজ কাল কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেদের কাল নির্ণয় করিয়াছেন বটে কিন্তু বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে তাহাও ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া মনে হয় না। মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদের পূর্ব্বভাগে কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য ক্রিয়া-সকল উক্ত হইয়াছে, পরভাগে জ্ঞানকাণ্ড তত্ত্ব-জ্ঞানের বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ঐ জ্ঞানকাণ্ডই এক একটী শাখা প্রশাখাভেদে এক একখানা উপনিষদ্। সেই উপনিষদের সুকঠিন তত্ত্বসমূহ ধারাবাহিকরূপে বলিয়া গেলে লোকের দুর্ব্বোধ্য হইবে বলিয়া শ্রুতিতে এক একটী গল্প দ্বারা এক একখানা চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি চিত্রপট পাঠকদিগের নিকট উপহার দিতেছি।

সামবেদোক্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথমেই উদ্গীথ উপাসনার কথা আছে। 'উদ্গীথ' অর্থে প্রণব। প্রণবের উপাসনা প্রসঙ্গে সংশয়াদির নিবৃত্তিরজন্য একটী গল্প উক্ত হইয়াছে। তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। উদ্গীথ বিদ্যার পারদর্শী তিনজন একত্রিত হইয়া উদ্গীথ বিদ্যার বিচার করিয়াছিলেন—শিলক চৈকিতায়ন এবং

প্রবাহণ। তাঁহারা পরস্পরকে বলিয়াছিলেন "উদগীথ বিদ্যায় আমরা নিপুণ হইয়াছি অতএব আসুন আমরা পরস্পর পক্ষপ্রতিপক্ষ অবলম্বন করিয়া উদগীথতত্ত্বের বিচার করি। কোন বিষয় ভালরূপ জানিলেও যে পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত তদ্বিষয়ে আলাপ না হয় ততক্ষণ তাহার প্রামাণ্য স্থির হয় না। অতএব আমরা পরস্পর আলোচনা করিলে যদি এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহার নিবৃত্তি হইবে।" মহাকবি কালিদাস এই বৈদিক গল্পের অনুসরণ করিয়াই বোধ হয় বলিয়া গিয়াছেন—"আপরিতোষাদ্‌বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং" যে পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ পরিতোষ লাভ না করেন সে পর্য্যন্ত কোন বাক্যই সাধু বলা যায় না। যোগশাস্ত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি পরস্পরসংলাপ সাধনের একটী প্রধানঅঙ্গ বলিয়াছেন। শিলক চৈকিতায়ন এবং প্রবাহণ, ইহাঁরা সকলে একস্থানে উপবেশন করিলে পর প্রবাহণ বলিলেন "আপনারা দুইজনে প্রথমত বলুন, আপনাদের কথা আমি শুনিব।" তাহার পর শিলক চৈকিতায়নকে বলিলেন "আমি তোমাকে প্রশ্ন করি।" চৈকিতায়ন বলিলেন "আচ্ছা করিতে পার।"

এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া শিলক চৈকিতায়নকে জিজ্ঞাসা করিল "কা সাম্নোগতিরিতি" সামের আশ্রয় কি? চৈকিতায়ন বলিলেন "স্বরইতি" স্বরই সামগানের আশ্রয়। তখন ক্রমশ এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল—"স্বরের আশ্রয় কি?" "প্রাণ ইতি" প্রাণই স্বরের আশ্রয়। "প্রাণের আশ্রয় কি?" "অন্ন ইতি" আমরা প্রত্যহ যাহা খাই তাহাই প্রাণের আশ্রয়। "অন্নের আশ্রয় কি?" "জলই অন্নের আশ্রয়।" "জলের আশ্রয় কি?" "ভূলোক জলের আশ্রয়।" "ভূলোকের আশ্রয় কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে চৈকিতায়ন বলিলেন "স্বর্গলোক, সামান্তর্গত প্রণবের শেষ আশ্রয় স্বর্গলোক, অতএব আমরাও এই প্রণব উপাসনা দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইব।"

প্রণবউপাসনা সম্বন্ধে চৈকিতায়নের যেরূপ জ্ঞান ছিল, আশ্রয়-আশ্রয়ীরূপে তাহা বলিবার পর শিলক বলিলেন "দেখ চৈকিতায়ন, তুমি সামের প্রতিষ্ঠা (শেষ আশ্রয়) জানলা, অতএব তুমি তাহা না জানিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত অনুচিত কার্য্য করিয়াছ; যে বিদ্যা যে ব্যক্তি জানে না সে যদি শ্রোতৃবর্গকে প্রতারিত করিবার জন্য তাহা বলে, তাহা হইলে সেই বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিত সেই স্থলে উপস্থিত থাকিলে সেই অসম্পূর্ণ বক্তার মস্তক পড়িয়া যায় অতএব তোমারও মস্তক পড়িয়া যাইত, তবে তুমি প্রতারণার উদ্দেশ্যে বল নাই তাই এখনও তোমার মস্তক পড়ে নাই।" এই কথা শুনিয়া চৈকিতায়ন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন "আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রণবউপাসনার প্রতিষ্ঠা কোথায় তাহা আমাকে বলুন।" তখন শিলক বলিলেন "আচ্ছা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর।" চৈকিতায়ন জিজ্ঞাসা করিল "অমুষ্য লোকস্য কাগতিরিতি" স্বর্গলোকের আশ্রয় কি? শিলক বলিলেন "এই লোক (ভূলোক) স্বর্গলোকের আশ্রয়, কারণ এই লোক হইতেই যজ্ঞ দানাদি দ্বারা স্বর্গ লোকের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে অতএব ভূলোকই স্বর্গলোকের আশ্রয় এবং এই পৃথিবী সামেরও আশ্রয়; এই লোক ভিন্ন এই উদগীথ বিদ্যারও অপর আশ্রয় নাই, অতএব উদগীথ উপাসনা দ্বারাই ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

উভয়ের এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়া প্রবাহণ বলিলেন "অহে শিলক এই তোমার 'সাম' জ্ঞান; যে এই রূপেই 'সাম'কে জানে, ইহা ভিন্ন আর কিছু জানে না, সে যদি অহঙ্কারপূর্ব্বক অন্যকে সামের বিষয় উপদেশ করে তাহা হইলে তাহারও মস্তক পড়িয়া যায়, অতএব তোমার ও-মস্তক পড়িয়া যাইবে।" এই কথা শুনিয়া শিলক বিনীত ভাবে বলিলেন "আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সামান্তর্গত উদগীথবিদ্যার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বলুন (আমি আপনার মত জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট এই বিষয়ে বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত বালকোচিত কার্য্য করিয়াছি।") ইহা শুনিয়া প্রবাহণ বলিলেন "আচ্ছা বলিতেছি শ্রবণ কর।" ইহার পর চৈকিতায়ন এবং শিলক যে পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন তাহার পর হইতে প্রবাহণ বলিতে লাগিলেন। শিলক ভূলোককেই স্বর্গলোকের আশ্রয় এবং সামের শেষ আশ্রয় বলিয়াছিলেন, এখন ভূলোকের আশ্রয় কি তাহা জিজ্ঞাসা করায় প্রবাহণ বলিলেন "আকাশ ইতি"

আকাশই এই লোকের গতি বা আশ্রয়, কারণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল ভূতই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার প্রলয় কালে আকাশেই লয় হইবে; অতএব আকাশই সকল হইতে শ্রেষ্ঠ. আকাশই সকলের প্রতিষ্ঠা।” এই আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মা, শ্রুতি আত্মা হইতে সকল জগতের উৎপত্তি এবং তাহাতেই লয় ইহা বলিয়াছেন; সেই সকল বাক্যের সহিত এই বাক্যের ঐক্য করিলে এই আকাশ শব্দের অর্থে পরমাত্মা বলিতে হয়। অন্যথা শ্রুতি একবার বলিলেন, পরমাত্মা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আবার বলিলেন আকাশ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ইহাতে কোন বাক্যের উপরেই আস্থাস্থাপন করা যায় না। তাই “আকাশ স্তল্লিঙ্গাৎ” এই সূত্র দ্বারা ব্যাসদেব এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য আকাশের অর্থে ব্রহ্মত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে সামান্তর্গত উদগীথ বিদ্যা (প্রণবোপাসনা) দ্বারা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ভৌতিক আকাশ বা স্বর্গলোকাদি নহে। এই উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় বলিয়াই ইহা সকল উপসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ব্যাপক। যিনি এই উপাসনা জানেন তিনি মনুষ্যের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন এবং লোকলোকান্তর জয় করিয়া থাকেন।

অতিধন্বা শৌনক ঋষি উদরশাণ্ডিল্য নামক শিষ্যকে এই প্রণবোপাসনা শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে পর্য্যন্ত তোমার বংশধরগণ এই বিদ্যা জানিবে সে পর্য্যন্ত মনুষ্যলোকে তাহারা প্রাধান্য লাভ করিবে, এবং মৃত্যুর পর পরলোকেও প্রাধান্য লাভ করিবে। যোগী (বিদ্বান্) ব্যক্তি এই উপাসনা করিলে তাহারও এইরূপ ফল হইবে।

এই আখ্যায়িকা দ্বারা এক সময় প্রণবোপাসনায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়গণ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এইরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, কারণ প্রবাহণ ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা শ্রুতি দ্বারাই প্রমাণিত হয়। প্রবাহণ বলিয়াছেন ভগবন্তাবগ্রেবদতাং ব্রাহ্মণয়োর্বদতোর্বাচংশ্রোষ্যামি” আপনারা দুইজন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে বল তোমাদের বাক্য আমি শুনিব। এই শ্রুতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া চৈকিতায়ন এবং শিলককে উল্লিখিত করা হইয়াছে, এইজন্যই ভাষ্যকার প্রবাহণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা কেহ যেন এইরূপ মনে না করেন যে ওঙ্কার উপাসনা ক্ষত্রিয়গণই জানিতেন ব্রাহ্মণগণ জানিতেন না। শ্রুতিই বলিয়াছেন “তংহৈতমতিধন্বাশৌনকউদরশাণ্ডিল্যায়োক্ত্বা উবাচ”। (ব্রাহ্মণ) শৌনক ঋষি উদরশাণ্ডিল্য নামক শিষ্যকে প্রথম এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সংবাদ।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় ১লা জানুয়ারি “রায় সাহেব” উপাধিলাভ করিয়াছেন।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। উপাসকবর্গ তাঁহাদের উপাসনায় প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন ইহাতে আমরা আনন্দিত।

শোকসংবাদ।

বিগত ১১ই পৌষ বর্ষীয়ান শ্রদ্ধেয় গুরুচরণ মহলানবিশের দেহান্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার যোগ বহুকাল স্থায়ী। অশীতি বৎসর অতীত হইয়াছিল, তথাপি একদিনের জন্যও তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতচিন্তা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহা অপেক্ষা সুপ্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। পরমেশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিসুখ বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য শ্রদ্ধেয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ৭ই পৌষ ট্রামে কাটা পড়িয়া ভবানীপুরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনের পর হইতে যাঁহারা অদম্য উৎসাহে কার্য্য করিয়াছিলেন, চণ্ডী বাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুদীর্ঘ জীবনী লিখিয়া তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত স্পষ্টবক্তা বড় দেখিতে পাওয়া যাইত না। সেদিন তাঁহার

জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দুকে লুসিটানিয়া জাহাজে হারাইয়া তিনি শান্তিহারা হইয়াছিলেন। পরম পিতার ক্রোড়ে যাইয়া তাঁহার আত্মা অক্ষয়শান্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা।

শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, গুরুচরণ মহলানবিশ প্রমুখ ব্রাহ্মগণ ক্রমে ক্রমে অল্পদিনের মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন। জানিনা কে তাঁহাদের স্থান কবে পূর্ণ করিবে।

আদিব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে দান প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সভা আদিব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদান করিয়াছেন।

১। জ্যোতিষ দর্পণ। ২। ধর্ম্মপূজা বিধান। ৩। গঙ্গা মঙ্গল। ৪। চণ্ডীদাসের পদাবলী। ৫। মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা। ৬। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু। ৭। বৌদ্ধ গান ও দোহা। ৮। দুর্গা মঙ্গল। ৯। তীর্থ ভ্রমণ। ১০। তীর্থ মঙ্গল। ১১। মৃগলুব্ধ। ১২। সত্যনারায়ণের পুঁথি। ১৩। মৃগলুব্ধ সংবাদ। ১৪। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু। ১৫। মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৬। রাধিকা মঙ্গল। ১৭। মুখবন্ধ। ১৮। মহাভারত। ১৯। রামায়ণ। ২০। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী। ২১। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা। ২২। ঐ। ২৩। ঐ। ২৪। ঐ। ২৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ২৬। বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়। ২৭। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর। ২৮। রাসায়নিক পরিভাষা। ২৯। শ্রীকল্কিপুরাণ। ৩০। প্রাচীন পুথির বিবরণ। ৩১। বাঙ্গালা ভাষা। ৩২। ঐ। ৩৩। ঐ। ৩৪। ঐ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

১৮৩৮ শকের বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত।

ডাক্তার এস, এন, মল্লিক ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
শ্রীবিপিনবিহারী দে ১৮৩৬ শকের মূল্য	১৲
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
ডাঃ বি, এল, চৌধুরী ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
শ্রীনীলকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৮৩১ শকের	৸০
১৮৩২ শকের	৩৲
১৮৩৩ শকের	৩৲
১৮৩৪ শকের	২৸৵০
শ্রীসতীনাথ রায় ১৮৩৭ শকের মূল্য	২৲
মাননীয় মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আর, সি, এস, আই, ১৮৩৬ ও ১৮৩৭ শকের মূল্য	৬৲
রায় সাহেব রসিকলাল রায় ১৮৩৭ শকের মূল্য	।০
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী ১৮৩৭ শকে মূল্য	৩৲
শ্রীশ্রীশচন্দ্র মল্লিক ১৮৩২ শকের	১।০
১৮৩৩ শকের মধ্যে	৸০
শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
শ্রীশ্যামলাল সরকার ১৮৩৭ শকের	৩৲
শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
শ্রীচারুচন্দ্র বসু ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
শ্রীহৃদয়নাথ আচার্য্য ১৮৩৬ শকের মূল্য	৩৲
১৮৩৭ শকের মূল্য মধ্যে	১৸৵০
অনারেবল মিঃ বি, চৌধুরী ১৮৩৬ ও ১৮৩৭ শকের মূল্য	৬৲
পি, কে, দাসগুপ্ত স্কোয়ার ১৮৩৪ শকের মূল্য	৲
১৮৩৫ শকে মধ্যে	১৸৵০
শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
শ্রীরণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
মিসেস্ জি, এল, গুপ্ত ১৮৩৭ শকের মূল্য	২৲
পি, এন, চ্যাটার্জ্জি স্কোয়ার ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
মহেন্দ্রনাথ সেন ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
শ্রীশ্রীশচন্দ্র মল্লিক ১৮৩৩ শকের বাকী	৸৵০
১৮৩৪ শকের মূল্য	১।৵
১৮৩৫ শকের মধ্যে	৩৲
শ্রীশশীমোহন পাল চৌধুরী ১৮৩৭ শকের মূল্য	১।০
বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুর ১৮৩৩ শক হইতে ১৮৩৭ শক পর্য্যন্ত	১৫৲
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ নন্দী ১৮৩৭ শকের মূল্য	২৲
শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত ১৮৩৭ শকের মূল্য	২৲
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসাক ১৮৩৭	১।০
শ্রীমতী লাবণ্যময়ী দেবী ১৮৩৭ শকের মূল্য	২৲
নোয়াখালি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক	
১৮৩১ শকের	।৵
১৮৩২ শকের	১।৵
১৮৩৩ শকের	১।৵
১৮৩৪ শকের	১৵
এন, গুহ স্কোয়ার ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
শ্রীশিশিরকুমার সেন ১৮৩৭ শকের মূল্য	২৲
শ্রীনলিনীনাথ বিসি ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত ১৮৩৫ শকের বাকী	১৵
১৮৩৬ শকের	৩৲
১৮৩৭ শকের মূল্য মধ্যে	।৵

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৩৪ শকের বাকী	১৲
১৮৩৫ শকের মূল্য	১।০
১৮৩৬ শক মধ্যে	।০
শ্রীরমণীরঞ্জন রায় ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
শ্রীশরৎবালা রক্ষিত ১৮৩৭ শকের মূল্য	২৲
শ্রীসরলাসুন্দরী দাস ১৮৩৭ শকের মূল্য	৩৲
শ্রীশ্রীশচন্দ্র মল্লিক ১৮৩৫ শকের বাকী	১।/
১৮৩৬ শকের মূল্য মধ্যে	৸৶
শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর ১৮২৪ শক হইতে	
১৮২৯ পর্য্যন্ত মূল্য	১৮৲
১৮৩০ শক হইতে ১৮৩৫ শক পর্য্যন্ত মূল্য	১৮৲
১৮৩৬ শকের মূল্য	।৶
শ্রীকল্যাণচন্দ্র বড়াল ১৮৩৮ শকের মূল্য	২৲
শ্রীকাশীনাথরুদ্র সরকার	২৲
শ্রীসুকুমার হালদার	২৲
শ্রীআশুতোষ দাস	৩৲
শ্রীতুলসি দাস দত্ত	৩৲
শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী	২৲
শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস	৩৲
শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ	৩৲
এস সি, চক্রবর্ত্তী স্কোয়ার	৩৲
শ্রীশিশিরকুমার দত্ত	১।০
শ্রীকনকচন্দ্র বড়াল	২৲
রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়	৫৲
শ্রীঅসিপদ মল্লিক	৩৲
শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ	৩৲
শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৲
ডাঃ পি দেব	৩৲
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কবিকণ্ঠভূষণ	৩৲
শ্রীবেহারিলাল মল্লিক	৩৲
অনারেবল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দি বাহাদুর	৩৲
শ্রীপ্রসাদদাস মল্লিক	৩৲
শ্রীআনন্দপ্রকাশ ঠাকুর	৩৲
শ্রীসুকুমার রায় চৌধুরী	৩৲
শ্রীতেজেসচন্দ্র বসু	৩৲
রায়বাহাদুর নৃত্যগোপাল বসু	৩৲
শ্রীচন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	৩৲
অনারেবল মহারাজা হৃষিকেশ লাহা বাহাদুর	৩৲
S. K. Lahiry Esqr	৩৲
C. S. Ghosal Esqr.	৩৲
Honble Mr B. Chakraberty	৩৲
মাননীয় শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	৩৲
শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী	৩৲
শ্রীরণেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৩৲
শ্রীপান্নালাল মিত্র	৩৲
শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মিত্র	১।০
P. N. Chattarjee Esqr	৩৲
শ্রীমতী সুনীতিবালা সেন	
১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শকের মূল্য	৬৲
শ্রীমহেন্দ্রনাথ সেন	৩৲
শ্রীলালবেহারি বসাক	৩৲
শ্রীশশীমোহন পালচৌধুরী	১।০
বৰ্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুর	৩৲
শ্রীমতী লাবণ্যময়ী দেবী	২৲
শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩৲
শ্রীবনমালী চন্দ্র	৩৲
N. Gohain Esqr	৩৲
শ্রীমতী সরোজিনী গুপ্তা	২৲
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	২৲
শ্রীশিশির কুমার সেন	২৲
শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য	২৲
শ্রীরমণিরঞ্জন রায়	৩৲
শ্রীমন্মথনাথ দাস বরিশাল	২৲
রায় সাহেব রসিকলাল রায়	১।০
শ্রীসতিশচন্দ্র মল্লিক ১৮৩৮ শকের সাহায্য	৬৲
শ্রীগোবিন্দলাল দাস	৩৲
শ্রীগগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৲
শ্রীশরৎচন্দ্র রক্ষিত	২৲
শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দাস	৩৲
N. N. Bose Esqr.	৩৲
শ্রীমুকুন্দলাল সেন	৩৲
শ্রীরাজচন্দ্র বসু	৩৲
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী	৩৲
N K Banerjee Esqr	৩৲
শ্রীঅনাদিধন বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৮৩৮ শকের ৬ মাসের মূল্য	১৲
মিসেস হেমাঙ্গ চৌধুরী	৩৲

সপ্তাশীতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ বুধবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

তোমার গান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আকাশ ভরিয়া তব উঠিয়াছে গান
স্তব্ধ হয়ে শুনি তাহা কম্পিত হৃদয়ে।
থরে থরে থরে উঠে কত তার তান
রবি হতে গ্রহে, গ্রহ হতে শত গ্রহে॥

সারা বিশ্বচরাচরে ভরে নিজ তানে
ঝঙ্কার সে অনাহত ফিরে ধরণীতে।
কত-না জাগায়ে তুলে জগতের প্রাণে
আনন্দ বসন্ত হাসি নব নব গীতে॥

আতুর শয়ান যেথা জীর্ণ কুড়ে ঘরে
তোমার সে গান যায় লয়ে সেথা শান্তি।
তোমার নামে যে দেব! শান্তিসুধা ঝরে
রোগ শোক দূরে যায়, ফুটে কত কান্তি॥

দেবতামন্দির হতে আরতির গান
ভকতের কণ্ঠে যবে উঠে উচ্ছ্বসিয়া,
শুনি' তাহে তোমারি যে সঙ্গীতের প্রাণ,
ভক্তসনে তব সাথে যাই যে মিলিয়া॥

মধ্যাহ্নে প্রকৃতি স্তব্ধ—বালু কাঁপে দূরে
তারি মাঝে জাগে দেখি তব রুদ্রভাব।
জীবনের ধারা নামে দীপকের সুরে—
আঁধার পলায়ে যায় মলিন প্রভাব॥

সন্ধ্যা যবে নামে তব নিশ্বসিয়া গান
তারকাখচিত নব ধূপছায়া পরি'—
অতি ধীরে তারি-সাথে ভেসে যায় প্রাণ
নিস্তব্ধ স্রোতের পরে যথা মুক্ত তরী॥

জোছনা শিশির আর যত কিছু আছে
সকলে ধ্বনিত শুনি' তব পুণ্য নাম।
তোমারে পেয়েছি হৃদয়ের বড় কাছে—
ধরেনা আনন্দ—হ'ল পূর্ণ মনস্কাম॥

জীবন ভরিয়া দাও গাহিবারে শক্তি
তোমার পবিত্র নাম মধু হতে মধু।
হৃদয় ভরিয়া দাও তোমা পরে ভক্তি
চরমে চরণ পাই যেন প্রাণ বঁধু॥

সপ্তাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

প্রাতঃকাল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে মধুময় মাঘোৎসবের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১১ই মাঘের পবিত্র নির্ম্মল প্রাতঃকালে ভক্তমণ্ডলী সভাস্থ হইলে কি শোভাই না হইয়াছিল। সকলেরই মুখে ধর্ম্মানুরাগ পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছিল। যথাসময়ে বোলপুর শান্তিনিকেতনস্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায় এবং আদিব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মধ্যে লইয়া বেদীগ্রহণ করিলেন। নেপাল বাবু সর্ব্বপ্রথম একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ভক্তমণ্ডলীকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিলেন। ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্বাধ্যায় পাঠ ও উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন হইবার পর চিন্তামণি বাবু নিম্ন-লিখিত বক্তৃতা করিলেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

আদিব্রাহ্মসমাজের গৃহপ্রতিষ্ঠার মধুময় স্মৃতি বহন করিয়া, আজ ১১ই মাঘের পবিত্র প্রাতঃকাল আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত। ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে, ঠিক এই দিনের প্রাভাতিক গগনে, বিমল সূর্য্যের যে অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই দিনের গুরুত্ব একবার আলোচনা কর। বৈদিক যাগ যজ্ঞের ক্রিয়াবাহুল্যের ভিতরে আমরা একেশ্বরবাদ হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম; বেদান্তের শুষ্ক অদ্বৈতবাদের ভিতরে আমরা উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়াছিলাম; বৌদ্ধ যুগে বাসনা নিবৃত্তির সাধনে ঈশ্বর হইতে দূরে পড়িয়াছিলাম; পুরাণ তন্ত্রের জটিলতা ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আমরা বহুদেবতার কল্পনা করিয়াছিলাম। অদ্যকার প্রাতঃসূর্য্য অন্ধকারের সেই ঘোর যবনিকা ভেদ করিয়া ঠিক এই দিনের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক প্রভাতে জ্ঞানের রশ্মিজাল বিস্তার করিয়াছিল। এই দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার প্রবেশ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। একেশ্বরবাদের বাণী, যাহা বহুযুগ পূর্ব্বে ব্রহ্মাবর্ত্তের বিজন প্রান্তর কাঁপাইয়া আরণ্যক ঋষিগণ প্রতিধ্বনিত করিতেন, তাহা এই মহানগরীতে বিঘোষিত হইতে আরম্ভ হইল। তাই এই পুণ্য দিনে আমাদের এই আনন্দকোলাহল।

অশীতি বৎসরের পূর্ব্ব সময়ের একটি জীবন্ত চিত্র কল্পনার মধ্যে আনয়ন কর। দেখিবে, পাশ্চাত্য শিক্ষার খরতর কিরণ এদেশে পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিবার সমস্ত আয়োজন বিস্তার করিয়াছে, আমরা জাতীয়ত্ব হারাইতে বসিয়াছি, প্রচলিত ধর্ম্মে অবিশ্বাস জাগিয়া উঠিতেছে; অন্যদিকে কালব্যাপী প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীন চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়াছি, দেবার্চ্চনার গুরুভার গুরুপুরোহিতের উপর ন্যস্ত করিয়া বসিয়া রহিয়াছি, কতকগুলি আচার ও অন্ধ ধারণা লইয়া আলস্যে জীবন ক্ষেপণ করিতেছি। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে রামমোহন রায় দুন্দুভি নিনাদে আমাদের লুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন। তিনি নেতা হইয়া গন্তব্য পথ আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। প্রকৃত সত্যধর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া তিনি আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিলেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া বিনাশের হস্ত হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে রক্ষা করিলেন।

তিনি যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা প্রাচীন হইলেও চিরনবীন, হিন্দুধর্ম্মের সারভূত হইলেও উহা অসাম্প্রদায়িক। তিনি ধর্ম্মজগতে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া গেলেন, তাহা প্রসারিত হইয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আকুল করিয়া তুলিতেছে। আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ পরিসর আজ ব্রাহ্মসাধারণকে স্থান দিতে পারিতেছে না। এই রাজধানীর বিভিন্ন কেন্দ্রে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে, অদ্যকার পুণ্য তিথিতে, শতসহস্র কণ্ঠে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আনন্দে উৎসাহে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছে।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী সময়ে যে বিরাট হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান আপনার মূল প্রথম প্রসারিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যে পরিবারের ভিতরে আপনার শাখা প্রশাখা প্রথম বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে গৃহে ব্রহ্মের সিংহাসন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবাস নিকেতন, এই তাঁহার সন্তান সন্ততি, যাঁহারা শিক্ষায়, সঙ্গীতে, ত্যাগে, আদর্শে ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাধারণের উপভোগ্য করিয়াছেন। আজ এই উন্মুক্ত গগনের নিম্নে, মহর্ষির পবিত্র স্মৃতিমণ্ডিত এই পবিত্র তীর্থে আমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া সেই দেবাধিদেবের আরাধনা করিতেছি।

রাজা রামমোহন রায় যে কি এক অজের ব্যাকুলতার তাড়নে উৎপীড়িত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় যদি পাইতে চাও, তবে নিকটে আইস। দেখিবে, সেই তরুণ বয়সে তিনি প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়াছেন, স্বজনের তাড়

নায় তিনি পিতামাতার স্নেহরজ্জু ছিঁড়িতেছেন। লৌহবর্ত্ম প্রভৃতি যাতায়াতের কোন সুবিধা ছিল না, তিনি গৃহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সত্যের সন্ধানে হিমালয়লঙ্ঘনে কৃতসংকল্প। সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি শাস্ত্ররাজি পাঠ করিতেছেন, পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া উপনিষদ অভ্যাস করিতেছেন, মুসলমান ধর্ম্মসাহিত্যের মর্ম্মভেদ করিবার জন্য পাটনায় গিয়া আরব্যভাষার অনুশীলন করিতেছেন, বাইবেলের ইংরাজি অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া হিব্রুভাষার পরিচয় গ্রহণ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য উদ্যম! যাঁহারা সত্যের ভিখারী, তাঁহারা এই ভাবেই সত্যসঞ্চয় করেন। যখন তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি তাহা অকাতরে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তর্কে বিচারে গ্রন্থ প্রকাশে তিনি তুমুল আন্দোলনের ব্যবস্থা করিলেন। তাহারই ফলে আমরা এই পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভিতরে সেই ব্যাকুলতা। কত ছিন্নপত্র প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে উড়িয়া যায়। "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই মন্ত্রে মুদ্রিত পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। "ভগবানের দ্বারা এই সমস্তই পরিব্যাপ্ত" এই মন্ত্রার্থ যখন তাঁহার হৃদ্গত হইল, কি অসাধারণ ব্যাকুলতা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। সমস্ত উপনিষদ, সমগ্র হাফেজ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। প্রকৃতিপাঠে ভগবানের বিমল সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য পরিশেষে হিমালয়শিখরে ব্যাকুলভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহারই রচিত সঙ্গীতে আমরা তাঁহার ব্যাকুলতার আভাস পাই। প্রভূত ধনৈশ্বর্য্যের স্বামী দেবেন্দ্রনাথ ব্যাকুলভাবে গাহিয়া উঠিলেন, "বিষয়ের সুখ যাহা, জানি তা, কাজ নাই, সে সুখে, সে ধনে। আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে"।

সত্য অন্বেষণের চেষ্টায়, তর্কসংগ্রামে রামমোহনের জীবন কাটিয়া গিয়াছিল; দেবেন্দ্রনাথ নিজে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে আকার প্রদান করিলেন। নিজে জাগ্রত থাকিয়া প্রহরীরূপে ইহাকে আজীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। "ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মামৃত রস পানে" তাঁহার জাগরণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার জাগরণ, সত্যে তাঁহার জাগরণ, সাধনে তাঁহার জাগরণ, শাস্ত্রপাঠে তাঁহার জাগরণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শরক্ষায় তাঁহার জাগরণ। এমন আর একটি অনিদ্র পুরুষ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে জাগিবে কি না, জানি না।

আজ সকলের মধ্যে সেই জাগরণ আনিয়া দিবার জন্য আমাদের এই উৎসব আয়োজন। সেই ব্যাকুলতায় প্রমত্ত করিবার জন্য এই সঙ্গীত ও উপদেশ। রামমোহন রায়ের পথপ্রদর্শক কেহই ছিল না, ছিল তাঁর সত্যলাভের ব্যাকুলতা; সহায় সম্বল কিছুই ছিল না, ছিল তাঁহার মস্তকের উপরে ভগবানের শুভ আশীর্ব্বাদ। দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও তাহাই দেখিতে পাই। উপনিষদের ছিন্ন পত্র আকাশবাণীর ন্যায় তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়িল, উহার মর্ম্ম তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। ভগবানের নিকটে যাঁহারা দীক্ষালাভ করেন, তাঁহাদের জীবনই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা অবতারের স্থান চাহেন নাই। তাঁহারা আমাদের সহকর্ম্মী, সহধর্ম্মী, ধর্ম্মপথের প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁহারা যে নির্ম্মাল্য পুষ্প লইয়া আসিয়াছিলেন, মস্তক পাতিয়া তাহা গ্রহণ কর। তাঁহারা যে বিমল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তী হও, ব্যাকুলতাকে প্রবর্দ্ধিত করিয়া আকুলভাবে আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধান কর। ধর্ম্মকে নীতিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁহারা পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনুষ্যত্বের রাজ্যে অগ্রসর হও। যখন নিরাশা আসিবে, ঊর্দ্ধনয়নে ভগবানের দিকে তাকাইয়া থেকো; হৃদয় যখন কঠিন ও মরুময় হইয়া আসিবে, প্রতীক্ষা করিও, "সরস প্রেমের বরষা" অন্তরে অবতীর্ণ হইবে।

ভগবন্! নব প্রেরণা, নব জীবন, নব দীক্ষা লাভ করিবার জন্য আজ এই উৎসবপ্রাঙ্গনে মিলিত হইয়াছি, অন্তরের ভিতরে আজ বিচিত্র সুর বাজিয়া উঠিতেছে। প্রীতি কৃতজ্ঞতা আজ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। মনুষ্যজীবনের দায়িত্ব আজ ভালরূপে উপলব্ধি করিতেছি। "আধা জীবে বিসয়ে মর যাও" তোমাতেই জীবন এবং তোমাকে বিস্মৃত হওয়াই মৃত্যু, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া লজ্জায় ক্ষোভে আজ মস্তক অবনত হইয়া পড়ি-

তেছে। বলদাতা বিধাতা! "বল দাও মোরে বল দাও", প্রাণে দাও মোর শকতি, সকল হৃদয় লুটায় তোমারে করিতে মিনতি"। করুণা বিতরণ কর, শতসহস্র অপরাধ মার্জ্জনা কর। অদ্যকার এই উৎসবের রাগিণী যাহাতে সমস্ত জীবন ধরিয়া হৃদয়-কুঞ্জে প্রতিধ্বনিত করিতে পারি, আমাদিগকে সেই সৌভাগ্য বিধান কর। অদ্যকার উৎসবক্ষেত্রে ইহাই আমাদের মিনতি।

সায়ংকাল।

সূর্য্যদেব পশ্চিমপ্রান্তে ডুবিয়া যাইতে না যাইতে সন্ধ্যা যখন নীরব পদক্ষেপে ধরাপৃষ্ঠে নামিয়া আসিল, তাহার বহুপূর্ব্বেই উৎসবপ্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যথাসময়ে মঙ্গল্য শঙ্খধ্বনি সভাস্থ ভক্তমণ্ডলীকে ঈশ্বরে আত্মসমাধান করিবার সময় জ্ঞাপন করিয়া দিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে মধ্যে লইয়া বেদীগ্রহণ করিলে পর চিন্তামণি বাবু নিম্নলিখিত মর্ম্মস্পর্শী বাক্যে ভক্তমণ্ডলীকে ব্রহ্মোপাসনায় সমুদয় হৃদয় নিয়োগ করিয়া ব্রহ্মোৎসবকে সার্থক করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

উদ্বোধন।

কোন্ অনাদি কাল হইতে সেই একই বাণী সমগ্র জগতের নরনারীর কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়া গগনাভোগ প্রতিধ্বনিত করিতেছে "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"—কোন দেবতাকে হবি দ্বারা অর্চ্চনা করিব, কাহাকেই বা পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিব। তাহাদের উদাস প্রাণ এক অনির্দ্দেশ্য দেবতার সন্ধানে ধাবিত। চক্ষে যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, হৃদয় তাঁহাকে ধরিতে চায়। বাক্য মন যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, অন্তর্দ্দেশ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চায়। হৃদয়ের এই যে গভীর ব্যাকুলতা, অন্তরাত্মার এই যে স্পন্দন ইহারই ফলে বৈদিক ঋষিদিগের জ্ঞানচক্ষু ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা পরমাত্মাকে আপনার বোধের মধ্যে যখনই আনিতে পারিলেন, বলিয়া উঠিলেন, যদি পূজার নৈবেদ্য দিতে হয় তবে তাঁহাকে, যিনি আত্মদা, বলদা, অমৃত যাঁর ছায়া, নদী সমুদ্র যাঁর মহিমা, এই দিক সকল যাঁহার বাহু, যাঁর আলোকে দ্যুলোক প্রদীপ্ত, যাঁর শক্তিতে পৃথিবী সুদৃঢ়, সূর্য্য যাঁহাতে সমুদিত, যিনি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, সমগ্র জগতের যিনি অধিপতি—তাঁহাকে আমরা বরণ করিব। তাঁহাদের বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্র যখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইল, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া হৃদয়ের বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া তাঁহার চরণের দিকে আকুলভাবে ধাবিত হইল। জ্ঞান ও ভাবের এই যে যুগপৎ মিলন, ইহাতেই তাঁহারা আপ্তকাম হইলেন।

কতকাল হইতে চলিল প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন; সাধনালব্ধ জীবিত সত্য সকল তাঁহারা উপনিষদের পাত্রে নিহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" এই যে অন্তরাত্মার ক্রন্দন, এক দিনের জন্যও তাহা বিরামলাভ করে নাই। প্রতি যুগে প্রতি মনুষ্যের হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া এই একই বাণী চারিদিক হইতে সমুত্থিত হইতেছে। ইহারই ফলে যুগে যুগে দেশ দেশান্তরে কত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। কত শত মতামত, কত শত সম্প্রদায়, কত কত বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল।

আজ আমরা এই যে উৎসবক্ষেত্রে সকলে সমাগত হইয়াছি, কোথা হইতে আমরা সেই অরূপী অশরীরী ঈশ্বরের পূজার সন্ধান লাভ করিলাম। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, ৮৭ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" এই দারুণ পিপাসা লইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, তাহারই ফলে তাঁহার সহিত আমরা এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাতরতা এই মন্ত্রেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই ফলে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম, ইহারই ত্রিবেণী সঙ্গমে আমরা আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আমরাও যদি প্রাণের ব্যাকুলতা তুল্যভাবে তাঁহাদের মত জাগাইয়া তুলিতে পারি, তবেই এই উৎসবের প্রকৃত মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব, জীবন ধন্য হইবে।

বিমূঢ় হতচেতন হইয়া থাকিলে আর চলিবে না। সকলে জাগ্রত হও, অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, সত্যের প্রকাশ পরিস্ফুট হইয়া আসিতেছে, আপনার অধিকারকে প্রশস্ত কর, মুক্তিপ্রবাহে

অগ্রসর হও। সুধাসিন্ধুর এত নিকটে আসিয়াছ, স্পর্শ করিয়া অমরত্ব লাভ কর। স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রেমমন্দিরের দিকে ধাবিত হও। আমরা সকলে তাঁহার উদার বাহুবেষ্টনের মধ্যে অবস্থিত, ইহা জানিয়া তাঁহার চরণে প্রেমভক্তির পূর্ণাহুতি অর্পণ কর। স্তবে গানে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। এই সমবেত ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ের বিমল উচ্ছ্বাস আজ তাঁহার সিংহাসন স্পর্শ করুক, জীবন মধুময় হউক।

তদনন্তর সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্বাধ্যায় পাঠ ও উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন হইবার পর ক্ষিতীন্দ্রবাবু নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিলেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা।

শ্রেয় ও প্রেয়।

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যৎশ্রবণং যদর্হণং।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

যাঁহার কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার দর্শন, যাঁহার বন্দনা, যাঁহার বিষয় শ্রবণ এবং যাঁহার পূজা লোকসমূহের পাপ সদ্য বিনষ্ট করে, সেই মঙ্গলশ্রবা পরমেশ্বরকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার।

মধুবসন্তের সমাগমের ন্যায় যে মাঘোৎসবের জন্য আমরা সম্বৎসর ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, যে মাঘোৎসবে দেশ বিদেশ হইতে কত সাধুসজ্জনের সমাগম হইয়া থাকে, আজ আমাদের সেই প্রিয় মাঘোৎসব সমুপস্থিত। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত ছিয়াশিটী মাঘোৎসব আসিয়াছে, আর চলিয়া গিয়াছে। এই ছিয়াশিটী মাঘোৎসব উপলক্ষে কত মনস্বী ব্যক্তি এই উৎসবপ্রাঙ্গনে কত যে নব নব ভাবের উপদেশ দিয়াছেন, কে তাহা গণনা করিয়া রাখিয়াছে? তাঁহাদের সেই সকল মর্ম্মস্পর্শী উপদেশের পর আজ এই উৎসবের দিনে সমাগত ভক্তজনগণের সম্মুখে আমি কি যে নূতন বার্ত্তা উপস্থিত করিব তাহা ভাবিয়া আকুল হইতেছি। যে উৎসব-প্রাঙ্গনে পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়নিঃসৃত ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিয়া কতশত সংশয়াত্মার হৃদয়গ্রন্থিসকল ছিন্ন ও বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল, যে উৎসবপ্রাঙ্গনের প্রত্যেক স্তম্ভ ভক্তিভাজন আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথের গম্ভীর সিংহনাদে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত, এবং যে উৎসবক্ষেত্রে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠনিঃসৃত উপদেশ বৎসরের পর বৎসর শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত, সেই উৎসব-প্রাঙ্গনে আমার ন্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তি নূতন কথা কি আর বলিতে পারে?

আমি কোন নূতন কথা বলিবার আশা করিয়া আজ এখানে আসি নাই। আমার যিনি পিতা, ভারতবাসীর যিনি পিতা, কিন্তু যিনি বহুকাল যাবৎ এই ভারতভূমিতে উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিলেন, আজ আমার স্বদেশবাসীগণ, আমার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে পিতা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, এবং চিনিতে পারিয়া এই ভগবৎ-নিকেতনে তাঁহার চরণপূজা করিবার জন্য মিলিত হইয়াছেন, সেই অনুপম আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি। সৃষ্টির আদি অবধি অনন্ত আকাশে কোটী কোটী সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র যে দেবতার অন্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ পর্য্যন্ত যাঁহাকে লাভ করিতে পারে নাই; যে দেবতাকে লাভ করিবার জন্য যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া আকুল আকাঙ্ক্ষার একটা গভীর মহানাদ দিবানিশি সমুত্থিত হইতেছে, আজ সেই বিশ্বপতি কিন্তু অকিঞ্চন-গুরুর প্রেরণাতেই আগত ও অনাগত সকল বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হৃদয়ে তাঁহারই চরণবন্দনায় যোগদান করিয়া, তাঁহারই পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়া আমি নিজেকেই কৃতার্থ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।

দিনের পর দিন চলিয়া গিয়াছে, মাসের পর মাস চলিয়া গিয়াছে। প্রতিদিনের ন্যায় আজও প্রভাতে সূর্য্য পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিয়া সেই বিশ্বেশ্বরের আরতি করিতে করিতে সায়াহ্নে পশ্চিমসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে বটে; প্রতিদিনের ন্যায় আজও অগণিত নদনদী ভগবানের চরণ ধৌত করিয়া মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে বটে; প্রতিদিনের ন্যায় আজও বায়ু তাঁহারই সুগন্ধ বহন করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতের জীবজন্তুগণকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে বটে। কিন্তু ছিয়াশি বৎসর পূর্ব্বে এই মাঘোৎসবের দিনে আজিকার মত পবিত্র ১১ই মাঘে এই দীন-দরিদ্র বঙ্গদেশের এক কোণে বঙ্গের সুসন্তান পুণ্যশ্লোক রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিয়া নব্যযুগে এই ধরণীতলে ব্রহ্মনামের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ এই উৎসব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি, তাঁহার বিজয়বৈজয়ন্তীর নিম্নে ভারতবাসী সর্ব্বপ্রথম পৌঁছিতে পারিয়াছিল, তাহারই স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য আমাদের এই উৎসবে এত লোকসমাগম, এত আনন্দ, এত সমারোহ।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবার সমসময়ে জগত জুড়িয়া মহাপ্রলয়ের হুহুঙ্কার গর্জ্জন শোনা গিয়াছিল। একদিকে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইউরোপ সবেমাত্র রুদ্রমূর্ত্তি ফরাসিবিপ্ল-

বের করালগ্রাস হইতে আবাতক্লিষ্ট তনু লইয়া বহির্নিক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে, এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য পালিত পুত্রগণের রক্তবিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন পূর্ব্বক সবেমাত্র বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতেছে; অপরদিকে আমাদের এই প্রিয় ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষণে ভাবের এক মহাপ্রলয় জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই জগতজোড়া মহাপ্রলয়ের ভিতর হইতে ভগবানেরও মহাজাগরণের জগতজোড়া একটা আহ্বান জাগিয়া উঠিল। ভগবান সেই প্রলয় অবস্থার ভিতরেই জাগরণের মহাভেরী বাজাইয়া সমগ্র জগৎকে জাগাইয়া তুলিলেন, এবং নিজ নিজ ইচ্ছামত গ্রহণ করিবার জন্য জগতের সম্মুখে শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ই উপস্থিত করিলেন। চিরন্তন অভ্যাসজনিত প্রাণের আকর্ষণে পাশ্চাত্যগণ প্রেয়কে বরণ করিল এবং ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী শ্রেয়কে সাদরে আলিঙ্গন করিল।

প্রেয়কে বরণ করিবার ফলে পাশ্চাত্যগণ ধন প্রভুত্ব ক্ষমতা প্রভৃতি পার্থিব শ্রীসম্পদ সকলই লাভ করিল বটে, সমগ্র ভূমণ্ডল তাহাদের করায়ত্ত হইল বটে, কিন্তু তাহারা সেই সঙ্গে সকল সম্পদের মূল, সকল শান্তির আলয় ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া গেল, পার্থিব উন্নতির মধ্যে ধর্ম্মকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের বহিরাবরণকেই গ্রহণ করিয়া তাহারা পরিতৃপ্ত রহিল; রাজনৈতিক সভাসমূহকে ধর্ম্মসংস্থাপনের কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইল। কাজেই তাহাদের সকল কার্য্য ধর্ম্মের অনুগত হইবার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মই সকল কার্য্যের অধীন হইয়া পড়িল। তাই তাহারা শত উন্নতির মধ্যে, শতপ্রকারে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা লাভের মধ্যে শান্তিলাভ করিতে পারিল না। ধর্ম্মের অভাব ও তাহার নিত্যসহচর অশান্তি তাহাদের হৃদয় উৎকীর্ণ করিতে লাগিল। পাশ্চাত্য জাতিগণের প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি প্রয়োগের জন্য উত্তরোত্তর বলশালী মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিতে নিরত থাকিল। যে জাতি যত অধিক ও যত বলশালী মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিতে পারিল, সেই জাতি ধনের মত্ততায়, ক্ষমতার গর্ব্বে ততই আত্মহারা হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে এ সকলের একটা সীমা আছে। যখন তাহারা সেই সীমা অতিক্রম করিল, তখনই আবার সমগ্র ইউরোপে মহাসমরের রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ নরহত্যার রক্তরঞ্জিত ফরাসি বিপ্লবের কঠোর আঘাত পাইয়াও যখন পাশ্চাত্য ভূখণ্ড শিক্ষালাভ করিল না, শ্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়কে বরণ করিল, তখন প্রলয়কর্ত্তা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর পাশ্চাত্যজগৎকে স্বীয় ক্রোড়ে টানিয়া লইবার জন্যই কঠোরতর বজ্রের আঘাত প্রদান করিলেন এবং প্রলয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিধান করিলেন। আজ সেই প্রলয়যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে লক্ষ লক্ষ নহে, কিন্তু কোটী কোটী মানব আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। ফরাসি বিপ্লব হইতে শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই তাহা হইতে শতগুণ বৃহত্তর মহাসমর মহাপ্রলয়ের রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় করাল বদনে সমুদয় পৃথিবীকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে।

আজ যদি ধর্ম্মের আবরণের পরিবর্ত্তে যথার্থত ধর্ম্ম পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ব্যবহারের নিয়ামক হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই লোকক্ষয়কর মহাসমরের সম্ভাবনাই আসিত না। পাশ্চাত্য মনস্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অনেকেই এতদিন বাদে বুঝিয়াছেন যে পাশ্চাত্য জাতিগণের অন্তরে এখনও প্রকৃত ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহাদের মুখে আজকাল ধ্যানধারণা, নীরব সাধনা প্রভৃতি উপায়ে প্রকৃত ধর্ম্ম অবলম্বনের উপদেশ বারম্বার শোনা যাইতেছে; "যে ধর্ম্মের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলিবে না, এবং যে ধর্ম্ম মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশে সহায় হয়," সেই সরল ও সবল ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। মানবের অন্তরে ভগবৎনিহিত ব্রহ্মজ্ঞান এখন তাঁহাদের অন্তরে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতই, যতদিন পাশ্চাত্য জাতিসমূহ যথার্থত সরল ও সবল সত্যধর্ম্মকে অবলম্বন না করিবে, আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে পিতা বলিয়া জানিয়া অন্তরে তাঁহার নীরব অনুশাসন শুনিতে অভ্যাস না করিবে, ততদিন শত চেষ্টাতেও এই প্রলয়াগ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবে না। যদি বা ইহা কিছুকালের জন্য নির্ব্বাণোন্মুখ হয়, তথাপি ইহা প্রধূমিত হইতে বিরত হইবে না।

অপরদিকে যমনাচিকেত সম্বাদের পুণ্যস্মৃতিতে বিজড়িত এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ শ্রেয়কে অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারিল না। ভারতবাসী বলিলেন—"আমি ধনজনমান কিছুই চাহি না, সমগ্র ভূমণ্ডল করায়ত্ত করিয়া অসীম ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অন্ধকার শিখরে উঠিয়া মৃত্যুলাভ করিতে চাহি না, কেবল যদি সেই জ্যোতির জ্যোতি একটীবার আসিয়া আমার এই দরিদ্র কুটীর আলোকিত করেন, কেবল যদি সেই প্রাণের প্রাণ আসিয়া আমার অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে একটীবারও অধিষ্ঠিত হয়েন এবং আমার সমুদয় হৃদয়ের ভক্তি ও পূজা গ্রহণ করেন।" ব্যাসবশিষ্টের ন্যায় শত শত ঋষি যে ভারতভূমিকে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন, প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিকল্প মহাপুরুষগণের কৃপায় বেদবেদান্তের অমূল্য তত্ত্বসকল যে ভারতের শিরায় শিরায় অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, সেই ভারতের অধিবাসী যে প্রেয়কে হেয় জ্ঞান করিয়া শ্রেয়কেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রকৃষ্টতম পথ বলিয়া গ্রহণ করিবেন,

তাহা কি কিছু আশ্চর্য্য ? নচিকেতা যমদেবতার নিকট আত্মজ্ঞান প্রার্থনা করাতে যম তাঁহাকে শতায়ু, পুত্র পৌত্র বিস্তৃত রাজ্য, এমন কি ইচ্ছামৃত্যু পর্য্যন্ত বর প্রদানে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নচিকেতা যখন সেই সকল অশেষ-বিধ প্রলোভনেও মুগ্ধ হইলেন না, তখনই তিনি যমের নিকট আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেইরূপ ভারতবাসী রাজা রামমোহন রায় যখন একনিষ্ঠার সহিত পার্থিব শ্রীবৃদ্ধির সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের অপরাজিত পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান হইলেন, তখনই তিনি ভারতের এক কোণে শতসূর্য্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতর ব্রহ্মজ্ঞানের এক আশ্চর্য্য প্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে সক্ষম হইলেন। তখনই তিনি ব্রহ্মকেন্দ্রক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ভেরীনিনাদে স্বদেশবাসীকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেন।

সেই যে ব্রাহ্মসমাজ শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়া এদেশে জাগরণের ভেরী ধ্বনিত করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আজ শতাব্দী অতীত হইবার বহু পূর্ব্বেই, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখি যে স্বদেশবাসীগণ কি শারীরিক, কি, মানসিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েরই উন্নতিসাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। দেশের মধ্যে জাগরণের একটা মহাকোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। পড়িবারই কথা। পরমেশ্বর যে অনন্তস্বরূপ ভূমা পুরুষ। তাঁহাকে যিনি সকল কর্ম্মের কেন্দ্র করিবেন, তিনি যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। ব্রহ্মের সহিত প্রত্যেক মানবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগের উপদেশ দিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ বেদ-বেদান্তনিহিত অমূল্য সত্য সকল প্রচারে হস্তক্ষেপ করিলেন, আর আজ সেই বেদবেদান্ত গৃহে গৃহে আলোচিত হইতেছে। যে জাতীয়তা, যে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ সমাজের জীবনকেন্দ্র, ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ সেই জাতীয় ভাবের বীজ প্রোথিত করিলেন, আর আজ তাহার মূল ভারত-সমাজের কত গভীর স্তরে নামিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের সৃষ্টিমহিমা আলোচনা এবং এদেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে সেই আলোচনা বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্বদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করিলেন ; আর, আজ কি আনন্দের কথা, কি আশার কথা যে স্বদেশবাসীগণ বিজ্ঞানের নব নব তত্ত্বসমূহের আবিষ্কারে সিদ্ধকাম হইতেছেন এবং স্বদেশীয় ভাষায় সেই সকল আবিষ্কার প্রকাশ করিবার কথা নব শক্তিতে উত্থাপিত হইতেছে। ব্রহ্মনাম প্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ সবল সাহিত্যের জন্মদান করিলেন, আজ সেই সাহিত্য কত প্রকারে না শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া একবার যখন আমরা উন্নতির পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তখন সে পথে আমাদিগকে ক্রমাগতই চলিতে হইবে। এখন আর বিশ্রামের কথা বলিলে চলিবে না। শত শত জাতি উন্নতির অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ সময়ে একটী মুহূর্ত্তও বিশ্রামের অবসর অন্বেষণে নষ্ট করিলে আমাদিগকে সেই শত শত জাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। আর পথেও যে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? আমাদের যেমন বিশ্রামেরও সময় আসে নাই, সেইরূপ এই শতাব্দীমাত্রের উন্নতির আভাস পাইয়া আনন্দ-বিহ্বলচিত্তে অতিমাত্র ত্বরা করিলেও চলিবে না। আমাদিগকে ধীর গতিতে অথচ সুনিশ্চিত পদক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে আমাদের সম্মুখে অনন্তকাল এবং অনন্ত উন্নতির ক্ষেত্র পড়িয়া আছে।

আমাদের প্রাণে নূতন জাগরণ নামিয়া আসিয়াছে বটে, উন্নতির পথে আমরা ছুটিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আশঙ্কা হয় যে পাছে সেই জাগরণের কোলাহলে আমরা ঈশ্বরকে হারাইয়া ফেলি, পাছে সেই উন্নতির পশ্চাতে ছুটিবার মত্ততায় আমরা ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া চলি। ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া উন্নতির পথে চলিবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মকে আমাদের আচারগত করিয়া লইতে হইবে, আমাদের ছোট বড় সকল কর্ম্মের কেন্দ্রে ধর্ম্মকে বসাইতে হইবে, তবেই আমাদের উন্নতি সহজে ধ্বংসমুখে পতিত হইবার অবকাশ পাইবে না। সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মকেন্দ্রক করিবার প্রাচ্যভাব ইতিপূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকটে উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু বিলাতের শিক্ষাসম্বন্ধীয় বর্ত্তমান আন্দোলনে সেই প্রাচ্যভাব সর্ব্বতোভাবে সমর্থিত হইতেছে দেখিতে পাই। আমাদের দেশেও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধরহিত হওয়াতে কি যে কুফল হইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শত পরিদর্শক, শিক্ষাবিভাগের শত কর্ম্মচারী ও শত দুর্ব্বোধ্য নিয়মাবলীর বন্ধন সত্বেও যে ছাত্রগণ অবিনয় ঔদ্ধত্য কদাচার দুরাচার প্রভৃতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছেন না একথা কে না জানে? অথচ, ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীতে রাশি রাশি পরিদর্শকের ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রাচীন শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে সদাচার বিনয় প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত হইতেন, ইহাই বা কে অস্বীকার করিবে?

ধনমদের মত্ততায়, ক্ষমতালাভের দর্পে, ধর্ম্মের মর্য্যাদা

ক্ষুণ্ণ করিবার ফলে, ন্যায় সত্য প্রভৃতি ভগবানের অনুশাসন পদদলিত করিবার কারণে কেবলই যে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে দগ্ধ হইতে হইয়াছে তাহা নহে। এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিও প্রলয়দহন হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বাঁচাইতে পারে নাই। ঐতিহাসিক যুগের বহুপূর্ব্বে এই ভারতভূমিতেই ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের মধ্যে মহাসমরের মহাপ্রলয় জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু দেবঋষিগণের মন্ত্রসঞ্জীবিত ভগবদাশ্রিত এদেশে সেই দাবানলের চিতাগ্নি হইতে একটী আধ্যাত্মিক মহাসত্য সমুদ্ভূত হইল—ধিক বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং। অনুমান হয় যে এই মহাসমরেরই ফলে আমরা গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের একটী মহাবীজ প্রাপ্ত হইয়াছি।

সেই যুগের পর, আজ বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, বলিতে গেলে ঐতিহাসিক যুগের ভিতরেই, আর একবার অধর্ম্মের অতিমাত্র বৃদ্ধির কারণে মহাপ্রলয়ের বাড়বানল প্রজ্জলিত হইয়া সমুদয় প্রাচ্য জগতকে স্বীয় করাল বদনে গ্রাস করিয়াছিল। ভগবানের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সর্ব্বস্থানে ও সকল কালে অপ্রতিহত শক্তিতে কার্য্য করিয়া থাকে। সেই সুদূর অতীতকালেও যখন ভারতকেন্দ্রক প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের বহিরাবরণকেই জীবনের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, পাপের মলিনতায় ডুবিয়া গিয়া স্বার্থেরই চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তখনই প্রলয়কর্ত্তা ভগবান প্রলয়যজ্ঞের দ্বারা ধরণীকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইলেন। কিন্তু সেই কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের প্রলয়যজ্ঞের মধ্য হইতে মহামতি ব্যাসদেব মহাভারতরূপ যে শান্তিচরু সংগ্রহ করিয়া ভারতের চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিলেন, তাহার ফলে আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসীমাত্রেরই অন্তরে ধর্ম্মবীজ গ্রথিত হইয়া গেল এবং সেই বীজ কালক্রমে মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া আজও ভারতের অসংখ্য নরনারীকে শান্তিচ্ছায়া বিতরণ করিতেছে।

এই সকল মহাপ্রলয় বৃথা আসে না। যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা ও করুণাময় পিতা, তিনি আমাদের বিনাশ সাধনের জন্য, কেবল প্রলয়েরই জন্য প্রলয় প্রেরণ করেন না। তিনি স্বীয় মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনেরই অভিপ্রায়ে এই সকল মহাপ্রলয় প্রেরণ করেন। এই যে বর্ত্তমান মহাসমরের বিভীষিকায় আমরা পদে পদে ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িতেছি; তাহারও মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য কত না সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। ভগবানের এই এক আশ্চর্য্য বিধান যে মৃত্যুরই মধ্যে অমৃতধারা প্রবাহিত হয়, প্রলয়েরই মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতির বীজ নিহিত থাকে। এই মহাসমরেরই ফলে পাশ্চাত্য জগতে সত্যধর্ম্মের প্রতি একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। যে সুরা রাক্ষসী পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে অন্তঃসারশূন্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, এই মহাসমরই পাশ্চাত্য জগত হইতে সেই সুরা রাক্ষসীকে চিরনির্ব্বাসিত করিবার উপক্রম করিতেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতিসমূহের মধ্যে যে অবজ্ঞা-প্রাচীর বিশাল হইতে বিশালতর আকার ধারণ করিতেছিল এবং মনুষ্যত্বের নিশ্বাসরোধের উপক্রম করিতেছিল, একমাত্র এই মহাসমরই সেই প্রাচীর ভূমিসাৎ করিবার উপক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভীরু, কাপুরুষ প্রভৃতি অপবাদের যে বিষম পাষাণভার আজ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গবাসীর মনুষ্যত্বকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিতেছিল, একমাত্র এই মহাসমরেরই ফলে বঙ্গবাসীর স্কন্ধ হইতে সেই অতি বৃহৎ পাষাণেরও ভার নামিয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মকে অবহেলা করিবার ফল, শ্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়কে বরণ করিবার ফল, ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিবার ফল ইতিহাসে এবং নয়নের সম্মুখে দেখিলেও কি আর আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য? ইউরোপীয় মহাপ্রলয়ের অগ্নিশিখা হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যে আমাদের দেশেও আসিয়া পৌঁছায় নাই তাহা নহে। এ সময়ে যদি আমরা মহাবিনাশ হইতে রক্ষা পাইতে চাই, তবে প্রাচীন ঋষিদিগের অনুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিতে হইবে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বরকে আমাদের সকল কর্ম্মের কেন্দ্রে রাখিতে হইবে। যাঁহা হইতে এই প্রলয় আসিয়াছে এবং মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই যাঁহার ছায়া, আমাদিগকে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; তাঁহারই মঙ্গল চক্ষুর উপর আমাদিগের চক্ষু দৃঢ়নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। তবেই শত মৃত্যুও আমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই অমোঘ আশ্বাস দিতেছেন যে, যাঁহার এক ইঙ্গিতে এই ব্রহ্মচক্র নিয়মিত হইতেছে, যাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের একটী নিমেষও পড়িতে পারে না এবং যে দেবতা আজিকার এই উৎসবে সাধুগণের মুখশ্রীতে জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশমান আছেন, তিনিই আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে মঙ্গলময় বিধাতা ও ধর্ম্মাবহ পিতারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন—স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা। তাঁহাকে পিতা বলিয়া উপলব্ধি করিয়া, তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া উন্নতির পথে চলিলে শত মহাপ্রলয়ও সে পথে বাধা দিতে পারিবে না। তিনিই আমাদের সকল ভয় দূর করিবেন এবং আমাদিগকে মৃত্যু হইতে স্বীয় আনন্দধামে লইয়া গিয়া অমৃতত্ব প্রদান করিবেন।

হে দেবাধিদেব পরমদেব! এই অনন্ত আকাশে সহস্রকোটী জ্বলন্ত সূর্য্য তোমারই চক্ষুস্বরূপে বর্ত্তমান

পাকিয়া এই জগতসংসারকে নিরন্ত রক্ষা করিতেছে। হে অকিঞ্চনগুরু! তোমারই প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা তোমাকে আমাদের অন্তরেরও চক্ষুস্বরূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি; তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়া, তুমিই প্রলয়ের মধ্যে মৃত্যুর মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান আছ জানিয়া নির্ভয় হইয়াছি। তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, আমরা শত যন্ত্রনায় নিষ্পেষিত হইলেও যেন তোমাকে লাভ করিবার পথ শ্রেয়কে পরিত্যাগ না করি; তোমাকে সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই যেন ধরিয়া থাকি। আমাদের শুষ্কজীবনে তুমি করুণাধারায় নিত্য অবতীর্ণ হও। আমাদের ভয় শোক দুঃখ দৈন্য সকলই তোমার তেজে দগ্ধ হইয়া যাউক। হে ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর! হে দয়াল পিতা! তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।

প্রাতঃকালে শ্রীমান্ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে বোলপুর শান্তিনিকেতনস্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকবৃন্দ এবং উক্ত আশ্রমের সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমরাজ শাস্ত্রী সঙ্গীত করিয়া এবং সায়ংকালে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর নেতৃত্বে সঙ্গীত সংঘের ছাত্র ও ছাত্রীগণ এবং শ্রীমান্ দীনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে উক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রগণ সঙ্গীত করিয়া সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ এবারে সুদূর প্রবাসে থাকিলেও তাঁহারই রচিত সঙ্গীতে উৎসবে তাঁহার আবির্ভাব অনুভূত হইয়াছিল।

তবে কেন?

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এ)

সারা দিনটা ধরে ফির্‌বো ধনের পাছে
এই কি তোমার রুদ্র নিঠুর মনে আছে?
তবে কিসের তরে দিলে মোরে মুক্ত কবির প্রাণ—
কে চেয়েছিল এমনতর অযাচিত দান?

তবে কিসের তরে সকাতরে চায় গো তোমার আকাশ?
কিসের তরে এমন ফুলগন্ধবহ বাতাস?
কিসের তরে রবি শশী তারারা সব মিলে
গান গেয়ে যায়, ডাকে আমায় আয় গো আয় বলে'?

আমি যখন যাইগো তোমার কাননপথটী দিয়ে
কেন তোমার পুষ্পপাতা ডাকে দুহাত তুলে?
কেন তোমার পাখীরা সব কলকোলাহলে
মর্ত্ত্যতলে স্বর্গ আনে—প্রাণে আমার দোলে?
কেন তোমার উষাকাশের রক্ত-রাঙা ভাস?
কেন তোমার নৈশাকাশের জ্যোৎস্নামৃদু হাস,
সোনার রোদে ঝলসিত নিবিড় নীলাকাশ
সান্ধ্য-গগনকোলে এমন দীপ্ত জলদ-রাশ?

তবে কিসের তরে বুকের তলে সুধার তৃষা জ্বলে?
কিসের তরে জুড়ায় না প্রাণ পাপের হলাহলে?
কিসের তরে ছুটে গো প্রাণ উদার আকাশ পানে,
ঝঙ্কারিত জীবনবীণা তারার গভীর গানে?

তবে কিসের তরে শান্তি না পাই ধনে জনে মানে?
কিসের তরে জীবন আমার মাতে তোমার গানে?
তোমার নামে এতই উচ্ছাস কেন আমার প্রাণে—
কাঁটার বুকে দাঁড়িয়ে হৃদয় তোমায় প্রিয় মানে?

ওগো এমনিতরই ফাঁদ পেতেছ ভুবনখানি ভরে'
অনেক পথে ফিরাও তুমি সারাজীবন ধরে;
সবার শেষে ফিরিয়ে আন আপনারই ঘরে—
কমল সম ফুটে থাকে, জীবন, চরণ পরে।

জান্‌বো আমি মান্‌বো সদা তুমিই রাজার রাজা;
তোমারি দান মঙ্গল দান—দুঃখ নয়তো সাজা
মঙ্গলময় তুমি পিতা বারেবারেই জেনেছি
শেষে নয়নজলে চরণতলে আপনিই হার মেনেছি।

মঙ্গল মোর কিসে হবে তুমিই তা জান প্রভু
তোমার চরণ শরণ করে মান্‌বো না ভয় কভু
সকল জীবন রাখিব আমার কল্যাণ তব কাজে
তোমারি ইচ্ছা সাধিয়া চলিব দীন জীবনমাঝে।

তোমারি দ্বারে রহিব গো সদা তব ভৃত্যেরি সাজে
সারা জীবনে যেন না নামাই মাথা দৈন্য হীনতা লাজে
মোর সকল কর্ম্ম সকল বাসনা অসীমেই যেন বাজে
এই কৃপা কর তাহলেই হব ধন্য জগত মাঝে।

অর্থের দাস নাহি যেন হই এই কর বরদান
বাসনার টানে নাহি যেন ফিরি খুলে দাও দুনয়ান;
তুমি যাহা দিবে বহিয়া নীরবে আনন্দে গাহি গান—
জীবনের মাঝে অনাহত বাজে যেন গো তোমার নাম।

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ।

(মাননীয় বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অবশ্য এইরূপ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা দু'এক দিনে বা দু'দশবৎসরে সম্ভব নহে, বা আরম্ভ-

মাত্রেই ফললাভের আশা নাই। কিন্তু যদি যথার্থ দেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্গভাষাকে অক্ষয় করিবার বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, মানুষের অনন্য-সাধারণ-কমনীয়,—নিজের জাতীয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ অথবা বর্দ্ধিত করিবার জন্য,—বাঙ্গালী নিজের নিজের জ্ঞানধামতার পরিচয়, স্ব-স্ব উপার্জ্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্যসম্ভার, নিজ-নিজ মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাতযশের সম্মোহনী তৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতীর কল্যাণ-কামনায় একমাত্র বঙ্গভাষাকেই সেব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই দুরূহ বলিয়া প্রতিভাত কার্য্য ক্রমেই সুকর হইয়া আসিবে। আজ যাহা অসম্ভব মনে হইতেছে, কাল তাহা একান্ত সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইবে। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার গৌরব-কেতন কালের অক্ষয় গগনে বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর বিজয়প্রশস্তি ঘোষণা করিবে। এই সকল ব্যাপার করিতে হইলে, এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তীর্থজলে অভিষেকের এবং সংযমের প্রয়োজন। বিনা অভিষেকে বা বিনা সংযমে যজ্ঞ-বেদিতে উপবিষ্ট হইতে নাই। দেশ-মাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব, আমার জননী বঙ্গ-ভাষাকে জগতের বরণীয় করিব,—আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশজন অন্য মায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে,—এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে অভিষেকপূর্ব্বক,—কোন-একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জ্জিত হইবে,—এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা উত্তম, যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতেই লিপি-বদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া ধনের উপচয় করিব, বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারের সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও, কদাচ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইবে না। উষার অরুণচ্ছটায় যেমন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়, তেমনই আমার মাতৃভাষার আলোক-চ্ছটায় পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত হইবে, ভাস্বর হইবে। এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ সংস্কারে চিত্ত বলীয়ান করিয়া তপস্বীর ন্যায় একাগ্র-হৃদয়ে বঙ্গবাণীর সেবা করিতে হইবে। নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই, বাঙ্গালার মাটী বড়ই উর্ব্বর। বঙ্গদেশ বড়ই সুজন্মা। অধিকাংশ স্থলই দেবমাতৃক, ক্বচিত নদীমাতৃক; আপনা হই-তেই বিধাতার কৃপায় বঙ্গে মেধাবীর আবির্ভাব হয়। চিরকাল হইয়া আসিতেছেও। কোথাও বা সামান্য সেচনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সুফল লাভ সর্ব্বত্রেই নিশ্চিত। ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস, কুমারহট্টের রামপ্রসাদ, কৃষ্ণনগরের ভারতচন্দ্র, খানকুলের রাম-মোহন, পিলের দাশরথি প্রভৃতি এই বঙ্গেরই ছায়া-শ্যামল পল্লীবাটের সুস্বাদু ফল। প্রভাকরের ঈশ্বর, আলালের টেকচাঁদ, নীলদর্পণের দীনবন্ধু, কপোতা-ক্ষীর মধুসূদন এই বঙ্গেরই অলঙ্কার। বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, কালী-প্রসন্ন যে বঙ্গভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন সে ভাষা বা সেই দেশ কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। এখনও, এই ঘোর বিপর্য্যাসের মধ্যেও যে দেশে এবং যে ভাষায় পৃথ্বিরাজের ন্যায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের এবং সেই ভাষার শক্তি যে কত বিপুল, তাহা মনস্বিমাত্রেরই সহজে বোধগম্য হইবে। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই একটা সঞ্জীবনী-শক্তি আছে, যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না। বাঙ্গালী অদৃষ্টবাদী। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা পৌরুষহীন নহে। মেকলের উক্তির প্রতিবাদ যখন বিধাতাই বাঙ্গালীর দ্বারা করাইতেছেন, তখন অপরের সে সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক হইলেও, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, চণ্ডীদাস গোবিন্দদাসের বঙ্গে, রামবসু নিধুবাবুর বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমের প্রবাহ শ্রীচৈতন্যের বঙ্গে কখনও ভাবের বা রসের অভাব হইবে না। প্রাণের অভাব হইবে না। উপাদানের অভাব নাই, কেবল উদ্যোগের অভাব, অনুষ্ঠানের অভাব। এই জ্ঞ,

সামান্য উদ্যোগেই ভীরু-বাঙ্গালী বীর-বাঙ্গালীতে উন্নীত হইতে চলিয়াছে। যাহাদের ঢক্কায় বাঙ্গালীর ভীরুত্ব নিনাদিত হইত, এখন তাহাদেরই কলমধুর বীণায় বাঙ্গালীর বীরত্ব অনুরণিত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, আছে সব, মালমসলা কিছুরই অভাব নাই, এখন কেবল জনকয়েক সুশিক্ষিত, কল্পনা-কুশল স্থপতি বদ্ধপরিকর হইলেই সঙ্কল্পিত বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে। আজ আমার যে কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। জগতের ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ বঙ্গভাষা অধিকার করিয়া বসিবে। অনতি-বিস্তৃত বঙ্গসাহিত্য ক্রমে বিশাল বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইবে।

এই অসাধ্য সাধন করিতে হইলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষ সংযমের প্রয়োজন, কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। সভ্যগণ, আপনারা আমাকে এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমার প্রতি যেমন আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও যদি আমার ধারণায় অনুরূপ, আমার বিবেকের অনুকূল সত্য, কঠোর বলিয়া, সম্প্রদায়বিশেষের স্তুতিনিন্দার দিকে লক্ষ্য করিয়া, প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের অপব্যবহার করা হইবে। তাই, আপাততঃ ঈষদ্ অপ্রিয় হইলেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, আমি বলিতে বাধ্য যে, পূর্ব্বোক্ত অসাধ্যসাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে, যদি কোন দলাদলি, কোনরূপ বিরোধী ভাব থাকে, তবে তাহা পরিহার করিতে হইবে। মতভেদ নিন্দার কথা নহে, কিন্তু মতভেদ হইলেই যে প্রণয়ভেদ হইবে, আত্মীয়তাভেদ হইবে, ইহা ত আমি বুঝি না। বঙ্গভাষা এখনও বঙ্গের বাহিরে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে নাই। এখনও ভারতের বহির্দ্দেশে বঙ্গভাষার বংশীধ্বনি সন্তুতভাবে পৌঁছায় নাই। যে ভাবে, যেরূপে আমি বঙ্গভাষাকে গঠিত করিবার কথা বলিলাম, সেই হিসাবে বঙ্গভাষার এই সবে কৈশোর; এরূপ অপরিপক্ব বয়সে, তাহাতে অন্তঃকলহের কীট প্রবেশ করিতে দিলে, অচিরাৎ সমস্ত উদ্যম, উদ্‌যোগ পণ্ড ভস্মসাৎ হইবে। হিমাদ্রির চিরতুষারস্নিগ্ধ অভ্রভেদী কাঞ্চনজঙ্ঘায় যাহারা পৌঁছিতে চাহে, উপত্যকার কঙ্করময় কণ্টকক্ষেত্রেই তাহাদের ক্লান্তি জন্মিলে চলিবে কেন? মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে, একটা মহাত্যাগ চাই। বিনা ত্যাগে লাভ হইতে পারে না। আমার ভাবিতেও দুঃখ হয়, যে, এই সবে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সানুরাগ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র, আর ইহারই মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি। আমি সানুনয়ে বলি, সনির্ব্বন্ধে বলি, আমরা সকলেই এক মার সন্তান; বঙ্গভূমি এবং বঙ্গভাষা আমাদের সকলেরই জননী; মাতৃপূজায় দীক্ষিত হইয়া, মায়ের মন্দিরে তুচ্ছ অলীক এবং ক্ষণিক যশের প্রলোভনে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ করিতে নাই। বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বহু কোটী বঙ্গবাসী বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে, তবে ঐ সঙ্কল্পিত সৌধের মাত্র ভিত্তিপ্রোথন হইবে। এইরূপ দুষ্কর কার্য্যে, কঠোর কার্য্যে, বঙ্গে যিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য করুন। মায়ের মন্দির-গঠনে সকল সন্তানেরই তুল্য অধিকার। তুল্য অধিকার বলিয়া, প্রত্যেককেই যে তুল্য পরিমাণে দ্রব্যসম্ভার যোগাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যিনি যাহা পারেন, লইয়া আসুন। মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন। আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিব। কে কি পরিমাণে মাতৃমন্দিরের দ্রব্যসংগ্রহ করিলেন, ইহার হিসাব-নিকাশ করিব না, এখন হিসাব-নিকাসের সময়ও নহে; করিতে হয়, আমাদের অধস্তন বংশধরেরা তাহা করিবে। আমরা কেবল গড়িয়াই যাইব, কাজ করিয়া যাইব। এই সময়ে, কাহাকেও মনঃপীড়া দেওয়া বা সাময়িক মোহের কুহকে অন্ধ হইয়া আত্মাভিমানের চরিতার্থতা বিধান করিতে যাওয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। কোন-প্রকার অসংযমের আধিক্য হইলেই, এই সঙ্কল্পিত স্বর্ণসৌধের আশা সমূলে ধ্বংস হইবে, বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করিবার আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইবে। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, হে বঙ্গ-সাহিত্যের হিতৈষীবৃন্দ, হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ জাতীয় সৌধের স্থপতিবৃন্দ,—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বিরোধ বিস্মৃত হইয়া, একই লক্ষ্যে চিত্তস্থির করিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন, সমস্ত ভুলিয়া, আপন ভুলিয়া,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মলিন স্বার্থের

পুঁটুলিগুলি দূরে এককোণে সরাইয়া রাখিয়া, একমনে, একপ্রাণে কার্য্য করুন,—তবেই ত আপনাদের স্পৃহনীয় মৎস্যচক্র ভেদ করিতে পারিবেন। একই তীর্থের যাত্রী আপনারা, একযোগে অগ্রসর হউন,—ভিন্নপথে বা অপথে যাইয়া সংহতি ক্ষয়পূর্ব্বক অবসন্ন হইবেন না।

বাঙ্গালার আজ বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সকলেরই মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে যে, কি প্রকারে বঙ্গভাষাকে সজ্জিত করিবেন। ধনী-নির্ধননির্বিশেষে সকলের মধ্যেই একটা প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে। ইহা পরম মঙ্গলের কথা। যখন "বান" আসে, তখন অনেক আবর্জ্জনাও তাহাতে ভাসাইয়া আনে সত্য, কিন্তু সেই আবর্জ্জনারাশি তটিনীর উভয় তটেই জমিয়া ক্রমে মাটীতে পরিণত হয়। তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য বঙ্গভাষার এই নবীন বন্যায় অনেক আবর্জ্জনাও আসিতেছে, অনেক অপাঠ্য কুপাঠ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি বিরচিত হইতেছে সত্য, কিন্তু সেগুলি কদাচ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। যাহা উত্তম, সৎ, যাহা নির্ম্মল, নিষ্পাপ, তাহাই থাকিয়া যায়, তদিতর কালের অতলগর্ভে অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ সকল অপাঠ্য কুপাঠ্য বিষয়ের জন্য বঙ্গভাষার হিতৈষীবৃন্দের তত চিন্তার কারণ নাই। দেশের সর্ব্বত্র, বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বত্র, যথার্থই যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বাল্যে যে সকল উপকথা, রূপকথা শুনিতে শুনিতে মাতা বা মাতৃস্বসার কোলে ঘুমাইয়া পড়িতাম, আজ নগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে যখন সেই সকল গল্প, সেই "সাতভাই-চম্পা",—সেই "পক্ষিরাজ ঘোটক", সেই 'শিব-ঠাকুরের বিয়ে' প্রভৃতি শিশুরঞ্জন কথাসমূহ যথার্থই নয়নরঞ্জন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে দেখি, তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি। বটতলায় যে কৃত্তিবাস-কাশীদাসের কঙ্কাল রক্ষিত হইত, আজ তাহাতে নবজীবন সংযোগ দেখিয়া প্রীতিবিহ্বল হইয়া পড়ি। মানুষ যতদিন নিজের সত্তার উপলব্ধি না করে, ততদিন প্রকৃত মানুষই হইতে পারে না। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার কি ছিল, কি নাই, কি অর্জ্জন এবং কতটুকুই বা বর্জ্জন করিতে হইবে, এ চিন্তা যে করে না, সে নরাকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নর বলিতে পারি না। বাঙ্গালী এতদিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে; মা-নাম যে কি মধুর, মা-নামে যে কত তৃপ্তি, তাহা এতদিনে বঙ্গসন্তান বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর প্রাণে একটা নবীন বলের সঞ্চার দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি এই যে একটা দেশব্যাপিনী অনুরক্তির লক্ষণ, ইহাকে রক্ষিত এবং ক্রমে বিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। জাতীয় জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হইল, জাতীয় সাহিত্য-নির্ম্মাণে স্পৃহা। সেই স্পৃহা যখন হৃদয়ে একবার জাগিয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ জাতির হৃদয়ে দেখা গিয়াছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই। পালে যখন বাতাস বাধিয়াছে, তরণী এইবার পক্ষিণীর মত চলিবে, আমাদিগকে শুধু সাবধান হইয়া, হাল ধরিয়া বসিতে হইবে। যাহাতে গন্তব্যের বিপরীত দিকে না যাইয়া পড়ি, সে পক্ষে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে। আর যখন যতটুকু আবশ্যক, ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, আমার তরণীকে অনুকূল বায়ুর বশীভূত করিয়া পরিচালিত করিতে হইবে। যে সময়ে এইরূপ গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত, তখন কি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মতামত লইয়া আত্মবিচ্ছেদ শোভা পায়? যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহাকে সেচনাদির দ্বারা বিবর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত করিতে হইবে। অঙ্কুরটির মস্তক ভগ্ন করিয়া লাভ কি? আপামর-সাধারণের মধ্যে যাহাতে বঙ্গভাষার প্রতি অনুরক্তি জন্মে,—আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার সেবক হওয়া চাই,—এই ধারণা যত অধিক বদ্ধমূল হইয়া যাহাতে দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের মত থাকিয়া যায়, তৎপক্ষে চেষ্টাপর হইতে হইবে। এই সময়ে ভুলিলে চলিবে না, যে যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'ন বা হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বঙ্গভাষার আলোচনা করেন, মাত্র তাঁহাদিগকে লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। কোন আলেখ্যের পশ্চাদ্ভাগ বিশেষ দক্ষতার সহিত কল্পিত না হইলে, যেমন মূল চিত্র যতই সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হউক না কেন, কিছুতেই তেমন মনোরম হয় না, তদ্রূপ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, মুষ্টি-

মেয় বঙ্গসন্তান, স্ব-স্ব জ্ঞানগরিমায় যতই বিমণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশে, অথবা চতুর্দ্দিকে ঐ যে কোটী-কোটী বাঙ্গালী পড়িয়া আছে, শিক্ষিতগণ যতদিন না উহাদিগকে নিজের সান্নিধ্যে টানিয়া আনিতে পারিবেন, ততদিন, বঙ্গের প্রকৃত অভ্যুদয় হইল, এ কথা স্বীকার করিতে পারিব না। শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প পল্লব প্রভৃতি লইয়াই ত বৃক্ষ। এই সব ত্যাগ করিয়া, মাত্র মূল স্থাণুটিকে কেহ বৃক্ষ বলে না, বা বৃক্ষের আশা ঐ স্থাণুতে চরিতার্থ হয় না। সুতরাং যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালীজাতি একান্ত মুষ্টিমেয় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বঙ্গের সেই অশিক্ষিত জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে, অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যতদিন না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগত শিক্ষাই শিক্ষা নহে; একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইতে হইলে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অগ্নিতে অনেক পরীক্ষার প্রয়োজন। কেবল অর্থার্জ্জনের জন্যও শিক্ষা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য—আত্মবিকাশ লাভ করা। হৃদয়ের মার্জ্জনা করা। দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থ করা এই ভাবে যদি একবার তৈরি হইয়া উঠে, ক্রমে একটা জাতি তৈরি হইয়া উঠে, তবে সেই জাতিকে আর পয়সার জন্য লালায়িত বা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। ঐ প্রকারে গঠিত জাতির কোন স্পৃহাই অপরিপূর্ণ থাকে না, অর্থ ত কোন ছার। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে চাই, সমাজের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা। যা কিছু কষ্ট বা পরিশ্রম, ঐ প্রথমাবস্থাতেই; পরে একবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে,—ঐ জাতি আপনিই আপনার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। তখন আর তাহাকে প্ররোচিত করিবার প্রয়োজন হয় না। কষ্ট ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি ঠিক বুঝিতে বা ধরিতে না পারি যে, আমি কি চাই, কোন্ বস্তুটি পাইলে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইবে। যদি একবার আমার সেই অভিপ্রেত বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেইদিকে আমার হৃদয়ের যে গতি হইবে, এমন কেহ নাই, যে, সে গতি রোধ করিতে পারে। বাঙ্গালী-জাতীর ইতর-ভদ্র সকলের মনে একবার কোনক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের তথা মদীয় জাতীয় অভ্যুদয় গ্রথিত; বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট, বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতরভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের বিশ্ব-সাহিত্যে অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন ঋতুরাজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে, এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে, একমনে সকলে মধুর বাসন্তী মূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে একভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননী বঙ্গ-ভাষার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির বিমলপ্রভায় বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভূজা বঙ্গভারতী দশভূজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণা। দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। "বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলে" পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

একবার ভাবিয়া দেখ, জন্ম জন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছিলে, কত তপস্যা করিয়াছিলে, তাই এমন মধুর বাঙ্গালায় আসিতে পারিয়াছ। স্নিগ্ধশ্যামল কাননকুন্তলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় যাহাদের দেহ পরিপুষ্ট, বঙ্গের নিত্যনীলনবীন নভশ্চন্দ্রাতপ-তলে শিশিরস্নাত দূর্ব্বাসনে যাহাদের উপবেশন, আর কলকণ্ঠ শুক-কোকিলের মধুর কাকলীতে যাহাদের কর্ণবিবর পরিপূর্ণ, তাহাদের হৃদয়ে কল্পনার অভাব হইবে কেন? সম্মুখে যাহার পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী, তাহার কণ্ঠ পিপাসায় শুকাইবে কেন? বঙ্গ-বাসী, তোমাদের কিসের অভাব? তোমরা কাহার চেয়ে কম? কিসে দুর্ব্বল? বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যাহাদের আদর্শ গ্রন্থ—সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা যাহাদের আদর্শ সতী—রাম, যুধিষ্ঠির, শিবি, দধিচি, ভীষ্ম, অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ নায়ক—ভরত, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন

যাহাদের আদর্শ ভ্রাতা, তাহাদের আবার অভাব কিসের? অতীতের বিস্ময়পূর্ণ চিত্রশালা হইতে একবার এইদিকে তাকাও; ঐ দেখ,—তোমাদের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া অক্লান্তশ্রমে, তোমাদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ কত মনোহর পত্রপুষ্প-পল্লবে, বঙ্গসাহিত্যের মণ্ডপ সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণপাতী যত্নে রত্নমণ্ডপের রত্নবেদিতে আমার রত্নহারবিভূষিতা বঙ্গবাণীর উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। মায়ের মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তোমাদের এখন পূজায় বসিতে হইবে। বঙ্গসাহিত্যসেবীগণ, সদ্ভাবচন্দনে মনঃপ্রাণ চর্চ্চিত করিয়া, তোমাদের সাহিত্য-মণ্ডপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও। একবার সাতকোটী বাঙ্গালী সমস্বরে বঙ্গভারতীকে "মা" বলিয়া ডাক,—দেখিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে ডাকে চমকিয়া উঠিবে। আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে, পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে সে ডাকের সাড়া পৌঁছিবে। বঙ্গভারতী বিশ্বভারতীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন। সাময়িক স্তুতিনিন্দা, বাদ-বিসংবাদ, স্বার্থচিন্তা প্রভৃতি একপদে বিস্মৃত হইয়া একবার সাধকের মত, যোগীর মত, ব্রতদীক্ষিতের মত, সংযতভাবে জননী বঙ্গভাষার পাদ-পূজায় প্রবৃত্ত হও, একবার মাতৃ-প্রেমে, জাতীয় প্রেমে, জাতীয় সাহিত্যের প্রেমে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া, সাতকোটি কণ্ঠে, উদাত্ত স্বরে মাতৃভাষাকে "মা" বলিয়া ডাক দাও, বিশ্ব কাঁপাইয়া একবার বল—

"তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ,
তোমারি তরে মা, সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাইবে গান॥"

দেখিবে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিতে মুখর করিয়া, তোমাদের এই আবেগস্খলিত গীতি দিব্যধামে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিবে, স্থলে জলে, পর্ব্বতে কন্দরে, প্রান্তরে-কান্তারে বঙ্গভারতীর বীণার অনুরণন হইতেছে, বঙ্গভাষার মধুর বাঁশী সুমধুর লয়ে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে, চিরনবীনা ধরণী রোমাঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালীর দেবতাকে বক্ষে আসন পাতিয়া বসাইতেছেন।

মনে রাখিও, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। কল্পনার অগম্য স্থান নাই। মানুষের যে কত অসীম শক্তি, তাহা মানুষ নিজে অনেক সময়ে বুঝিতেই পারে না। তাহা যদি পারিত, তবে এই পৃথিবীর দশা এতদিনে অন্যপ্রকার হইত। আমার বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিব, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; এই প্রতিজ্ঞার পরিপূরণের জন্য, যাহা সঙ্গত মনে হইবে, তাহাই অসঙ্কোচে করিব। এই মন্ত্রে পরিপূত হইয়া ব্রত আরম্ভ কর। সিদ্ধি হইবে। কালে অমর হইতে পারিবে। বাঙ্গালী জাতি ও তাহার বঙ্গভাষা জগতে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যদি কখনও নৈরাশ্যের ভীষণ মূর্ত্তিতে চমকিয়া উঠ, কালের করাল কশা দর্শনে ভীত হও, তখন তোমারই বরণ্যে কবি হেমচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া জলদ-প্রতিম-স্বনে তোমার দেশবাসীকে শুনাইও—

"হোথা আমেরিকা নব-অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

আর সেই সঙ্গে বলিও—হে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য-মন্দিরের ভবিষ্য-স্থপতিবৃন্দ,—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে',
বায়ু উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধরে',
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

সমাপ্ত।

বাল গঙ্গাধর তিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(বিষয় প্রবেশ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

ভগবদ্‌গীতার কোন্ কোন্ অনুবাদ ও কতগুলি অনুবাদ, অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ নকল, তাৎপর্য্য কিংবা মাহাত্ম্য পুরাণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে। অবধূত অষ্টাবক্র প্রভৃতি গীতা কোন্ কোন্ পুরাণে আছে, অথবা পুরাণাদিতে না থাকিলে, উহা স্বতন্ত্র-

ভাবে কখন রচিত হয় ও কাহা কর্ত্তৃক রচিত হয় তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তথাপি এই সমস্ত গীতার কিংবা তদন্তর্গত বিষয়ের সংগ্রহ দেখিলে, এই সমস্ত গ্রন্থ, ভগবদ্‌গীতা প্রকাশিত হইয়া লোকমান্য হইবার পর রচিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ অনুমান হয়। কিংবহুনা, ভগবদ্‌গীতার ন্যায় কোন এক গীতা স্বকীয় বিশিষ্ট গ্রন্থে বা পুরাণে থাকা ব্যতীত তাহার পূর্ণতা হয় না এই ধারণাতেই এই পৃথক্ পৃথক্ গীতাগুলি রচিত হইয়াছে, এইরূপ বলিলেও চলে। ভগবদ্‌গীতায় যেরূপ ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, ঐরূপ বর্ণনা শিব-গীতা, দেবী গীতা, গণেশ-গীতাতেও আছে; এবং শিব-গীতা, ঈশ্বর-গীতা প্রভৃতির মধ্যে অনেক শ্লোকই অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে, এই সকল গীতার মধ্যে ভগবদ্‌গীতা হইতে কিছু বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকায় অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে মিল স্থাপনে ভগবদ্‌গীতার যে-একটা অপূর্ব্ব নৈপুণ্য আছে, সেরূপ নৈপুণ্য আর কোন গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ভগবদ্‌গীতায়, পাতঞ্জল-যোগ কিংবা হঠযোগ এবং কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস, এই সকলের যথোচিত বর্ণনা নাই, এইরূপ মনে করিয়া কেহ কেহ ভগবদ্‌গীতার পূর্ণতা সাধনের হিসাবে, কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপাকথন চ্ছলে, উত্তর-গীতা পরে রচনা করিয়াছেন; এবং "অবধূত", "অষ্টাবক্র" প্রভৃতি কোন কোন গীতা নিছক একদেশীয় বলিয়া, অর্থাৎ তাহাতে কেবল সন্ন্যাসমার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া, "যম-গীতা", "পাণ্ডব-গীতা" প্রভৃতি অন্যান্য গীতা, স্তোত্রের ন্যায় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও ভক্তিপর এইরূপ দেখা যায়। "শিব-গীতা", "গণেশ-গীতা", ও "সূর্য্য-গীতা" ইহারা উক্ত প্রকারের নহে এবং উহার মধ্যে, জ্ঞান কর্ম্মের সম্মিলন সম্বন্ধে সযৌক্তিক সমর্থন আছে সত্য, তথাপি উহাতে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার অনেকাংশ ভগবদ্‌গীতা হইতে গৃহীত, সুতরাং উহাতে কোন নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই, অবশেষে ভগবদ্‌গীতার পরিপূর্ণ ও ব্যাপক তেজের সম্মুখে, পরবর্ত্তী কালে রচিত এই সকল নকল-গীতার দ্বারা ভগবদ্‌গীতার মাহাত্ম্য আরও বেশী ব্যক্ত ও স্থাপিত হইয়াছে। এবং "গীতা" শব্দের অর্থ "ভগবদ্‌গীতাই" মুখ্যরূপে প্রচলিত হইয়াছে। "অধ্যাত্ম রামায়ণ" ও "যোগ-বাশিষ্ঠ" এই দুই গ্রন্থ বিস্তৃত হইলেও উহা যে ভগবদ্‌গীতার পরবর্ত্তী গ্রন্থ তাহা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনা হইতেই প্রকাশ পায়। মাদ্রাজ অঞ্চলের "গুরুজ্ঞান-বাসিষ্ঠ-তত্ত্বসারায়ণ" কাহারও কাহারও মতে অতীব প্রাচীন; কিন্তু আমাদের তাহা মনে হয় না। তাহাতে যে ১০৮ উপনিষদের উল্লেখ আছে তাহা প্রাচীন বলিয়া মানিতে পারা যায় না; এবং সূর্য্য-গীতায় বিশিষ্টাদ্বৈত মতের উল্লেখ পাওয়া যায়, ও কোন কোন স্থানের যুক্তি-ক্রমও যেন ভগবদ্‌গীতা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই গ্রন্থও বহু পরবর্ত্তী কালে—কিংবহুনা শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী কালে, রচিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ অনুমান হয়।

অনেকগুলি গীতা থাকিলেও ভগবদ্‌গীতার শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপে নির্ব্বিবাদ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে; তাই, অন্যান্য গীতার প্রতি বেশী মনোযোগ না দিয়া কেবল ভগবদ্‌গীতার পর্য্যালোচনা করিয়াই তদন্তর্গত তাৎপর্য্য আমাদের ধর্ম্ম-ভ্রাতাদিগকে বলায় উত্তরকালীন বৈদিক পণ্ডিত ইহার কৃতকৃত্যতা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। গ্রন্থের পর্য্যালোচনা দুই প্রকারে হইতে পারে; এক অন্তরঙ্গ পর্য্যালোচনা, আর এক বহিরঙ্গ-পর্য্যালোচনা। সমগ্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া তাহার মর্ম্ম, রহস্য, মথিতার্থ কিংবা প্রমেয় প্রভৃতি বাহির করার নাম অন্তরঙ্গ পর্য্যালোচনা। গ্রন্থ কোথায় রচিত হইয়াছে, কে রচনা করিয়াছে, তাহার ভাষা কিরূপ, কাব্যদৃষ্টিতে তাহাতে মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণ কতটা উপলব্ধি হয়, গ্রন্থের শব্দরচনা, ব্যাকরণ শুদ্ধ কি না কিংবা তাহাতে কোন আর্ষ প্রয়োগ আছে কি না, অথবা তাহাতে কোন্ কোন্ মতের, স্থলের, কিংবা ব্যক্তির উল্লেখ আছে, ও তাহা ধরিয়া গ্রন্থের কাল-নির্ণয় করা যাইতে পারে কি না, অথবা তৎকালীন সামাজিক অবস্থার কোন সাধন পাওয়া যায় কি না, গ্রন্থান্তর্গত বিচার-আলোচনা স্বতন্ত্র কি অন্যের নিকট হইতে গৃহীত, যদি গৃহীত হয় তবে কোথা হইতে কোন্‌টা গৃহীত এইরূপ কেবল বাহ্যাঙ্গের

বিচার-আলোচনাকেই বহিরঙ্গ-পর্য্যালোচনা বলে। গীতা সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের যে ভাষ্য ও টীকা আছে, সে সমস্ত বাহ্যবিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই। কারণ, ভগবদ্‌গীতার ন্যায় অলৌকিক গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিবার সময় তদন্তর্গত বিষয়-সকলের প্রতি মনোযোগ দেওয়ামাত্র যে সকল উত্তম পুষ্প তাঁহাদের নজরে পড়িয়াছিল, তাহাদের সুগন্ধ, সুন্দর বর্ণ ও সৌন্দর্য্যে কৌতূহলাক্রান্ত না হইয়া কেবল তাহাদের পাপ্‌ড়ীর গণনা, কিংবা মধুভরা মৌচাক হস্তগত হইলে তাহার কতকগুলি মধুর আধার আছে অনুসন্ধান করা—এ কেবল বৃথা সময় ক্ষেপণ! পরন্তু, পাশ্চাত্যের অনুকরণে এক্ষণে আধুনিক বিদ্বানেরা গীতার বাহ্যাঙ্গেরই বিশেষ অনুশীলন করিতেছেন। গীতার মধ্যে কত আর্ষ-প্রয়োগ আছে তাহা দেখিয়া একজন এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ যিশুখৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে কোন-এক শতকে রচিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং গীতার অন্তর্ভূত ভক্তিমার্গ, তদুত্তর কালে প্রবর্ত্তিত খৃষ্টধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছিল কি না এই সংশয়ও নির্ম্মূল হয়। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে যে নাস্তিক মতের উল্লেখ আছে, তাহা বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্মের হইবে এইরূপ কল্পনা করিয়া, বুদ্ধানন্তর গীতা রচিত হইয়া থাকিবে, আর একজন এইরূপ বলিয়াছেন। আর এক জন এইরূপ বলেন যে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, 'ব্রহ্মসূত্র পাদৈশ্চৈব' এই শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ থাকায় গীতা ব্রহ্মসূত্রের পরে হইয়া থাকিবে। উল্টাপক্ষে, ব্রহ্ম-সূত্রের কোন কোন স্থানেও গীতার প্রমাণ মীমাংসারূপে গৃহীত হওয়ায় গীতা তদুত্তরকালীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না, একথাও কেহ কেহ বলেন। আরও কতকগুলি লোক এই-রূপ বলেন যে, ভারতীয় যুদ্ধে, রণভূমির উপর, সাত শত-শ্লোকী গীতা অর্জ্জুনকে বলার অবকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল না। যখন তুমুল যুদ্ধ চলিতে-ছিল সেই সময়ে ৫৫ সংখ্যক শ্লোক কিংবা তাহার অর্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে বলা হইয়া থাকিবে ও তাহারই বিস্তার,—সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে, ব্যাস কর্ত্তৃক শুককে, বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক জনমে-জয়কে, ও পরে সূত কর্ত্তৃক শৌনককে বলিবার সময় করা হইয়া থাকিবে, অথবা সর্ব্বশেষে যাঁহা কর্ত্তৃক মূল ভারতের 'মহাভারত' রচিত হয় তাঁহা কর্ত্তৃক করা হইয়া থাকিবে। গীতাগ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে মনের এইরূপ ধারণা হইবার পর, বুদ্ধিচালনা পূর্ব্বক কেহ সাত, কেহ আটাশ, কেহ ছত্রিশ, কেহ এক শো এইরূপ গীতার মূল শ্লোক খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন! পরিশেষে, এতদূর পর্য্যন্ত ভাবিয়া-ছেন, যে, গীতান্তর্ভূত ব্রহ্মজ্ঞান রণভূমির উপর অর্জ্জুনকে বলিবারও কোন প্রয়োজন না থাকায়, বেদান্তসম্বন্ধীয় এই উত্তম গ্রন্থ পরে কেহ মহাভার-তের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে। বহিরঙ্গ পর্য্যা-লচনায় এই প্রশ্ন সর্ব্বথা নিরর্থক হইয়া থাকে এরূপ নহে। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ, উপরে কথিত ফুলের পাপ্‌ড়ীর কথা কিংবা মৌচাকের ছিদ্রের কথা ধরা যাক্‌। বৃক্ষগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময়, অবশ্য তাহাদের ফুলের পাপ্‌ড়ীরও বিচার করিতে হয়। এবং মধুর পরিমাণ (ঘন ফল) কম হইবে না অথচ পরিবেষ্টনের পরিমাণ (পৃষ্ঠফল) যাহাতে খুব কম হইয়া মোমের খরচ কম হয় এইরূপ আকারের মধু ধারণ করিবার ছিদ্র মৌচাকে থাকে ও তাহার দরুণ মৌমাছিদিগের দৈহিক চাতুর্য্য পরি-ব্যক্ত হয়—ইহা গণিতের দ্বারা এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে। তাই, এই প্রকারের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে আমরাও বহিরঙ্গ পরীক্ষালব্ধ মাহাত্ম্যের কিছু কিছু বিচার করিয়াছি। কিন্তু গ্রন্থের রহস্য যাহাকে বুঝিতে হইবে বহিরঙ্গের প্রতি তাহার আসক্তিতে কোন লাভ নাই। বাগ্‌দেবীর রহস্যজ্ঞ ও তাহার বহিরঙ্গ সেবক—এই দুয়ের ভেদ প্রদর্শন করিবার জন্য মুরারি কবি এক সরস দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলেন—

অব্ধির্লঙ্ঘিত এব বানরভটৈঃ কিং তস্য গম্ভীরতাম্।
আপাতাল নিমগ্ন পীবর তনুর্জানাতি মন্দরাচল॥

সমুদ্রের অগাধ তলের বিচার করিতে হইলে কে তাহা বিচার করিবে? রামরাবণের যুদ্ধপ্রসঙ্গে সাহসী ও চপল বড় বড় বানরবীর সত্বর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপনীত হইল সত্য, কিন্তু সমু-দ্রের গভীর তল তাহারা বিচারের দ্বারা কেমন করিয়া অবগত হইবে?

সমুদ্রমন্থনের সময় মন্থন হইবার পর, রবি প্রভৃতি দেবতারা যে পর্ব্বতকে সমুদ্রতল পর্য্যন্ত গিয়া তবে পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত পাতালে মিলিত যে বড় মন্দরাচল সেই মন্দরাচলকে ইহারই দরুণ জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুরারি কবির এই যুক্তি অনুসারে গীতার রহস্য জানিতে হইলে, অনেক পণ্ডিত ও আচার্য্য যাঁহারা গীতাসাগরের মন্থন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থাদির অভিমুখেই অগ্রসর হওয়া উচিত। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মহাভারতকারই অগ্রগণ্য। কিংবহুনা তিনি আধুনিক গীতার একপ্রকার রচয়িতা বলিলেও হয়। তাই, স্বয়ং মহাভারতকারের মতে গীতার তাৎপর্য্য কি, প্রথমে তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

'ভগবদগীতা' কিংবা 'ভগবান কর্ত্তৃক গীত উপনিষৎ' এই নাম হইতেই, গীতাতে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ ভাগবৎ ধর্ম্মের উপদেশ, অর্থাৎ ভগবান কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উপদেশ, এইরূপ অনুমান হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের 'শ্রীভগবান্' এই নাম ভাগবৎ ধর্ম্মেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই উপদেশ নূতন নহে; পূর্ব্বে এই উপদেশই ভগবান কর্ত্তৃক বিবস্বানকে, বিবস্বান্ কর্ত্তৃক মনুকে এবং মনু কর্ত্তৃক ইক্ষাকুকে দেওয়া হয়, এইরূপ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভেই (গী, ৪অঃ, ১-৩) বলা হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের শেষে নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত-ধর্ম্মের যে সবিস্তর বিবৃতি আছে তাহাতে ব্রহ্মদেবের পৃথক জন্মকালে, অর্থাৎ কল্পান্তরে, ভাগবত-ধর্ম্মের পারম্পর্য্য কি তাহার বর্ণনা করিবার পর, পরিশেষে ব্রহ্মদেবের আধুনিক কালের জন্মের অন্তর্ভূত ত্রেতাযুগে—

ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ।
মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষাকবে দদৌ।
ইক্ষাকুনা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ॥

"এই ভাগবত ধর্ম্ম বিবস্বান্-মনু-ইক্ষাকু পরম্পরায় প্রসৃত হইয়াছে" এইরূপ বলা হইয়াছে। (সভা, শা, ৩৪৮, ৫১০ ৫২০) এই দুই পরম্পরারই পরস্পর মিল আছে (গীতা ৪, ১ উপরে আমার টীকা দেখ); এবং দুই ভিন্ন ধর্ম্মের পরম্পরা যে অর্থে একই হইতে পারে না, সেই অর্থে গীতাধর্ম্ম ও ভাগবত-ধর্ম্ম যে একই তাহা পরম্পরা ও ঐক্য হইতে সহজেই অনুমান হয়। কিন্তু এই বিষয়টা কেবল অনুমান অবলম্বন করিয়াই আছে এরূপ নহে। কারণ নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত-ধর্ম্মের যে বর্ণনা মহাভারতে আছে তাহাতেই—

এবমেষ মহান্ ধর্ম্মঃ স তে পূর্ব্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধি কল্পিতঃ॥

"হে নৃপশ্রেষ্ঠ জন্মেজয়! এই ভাগবত-ধর্ম্ম তাহার বিধি সমেত সংক্ষেপে হরিগীতাতে অর্থাৎ ভগবদগীতাতে পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি" (সভা, শা, ৩৪৬, ১০) বৈশম্পায়ন জন্মেজয়ের নিকট গীতার তাৎপর্য্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং এক অধ্যায় ছাড়িয়া পর অধ্যায়ে নারায়ণীয় ধর্ম্মের এই বর্ণনা—

সমুপোঢ়েষ্বণীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্ম্মৃধে।
অর্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ং॥

"কৌরব পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে দুই সৈন্যই সজ্জিত থাকায় অর্জ্জুন বিমনস্ক অর্থাৎ উদ্বিগ্ন হইলে, তাঁহাকে ভগবান বলিয়াছিলেন" (সভা, সা, ৩৪৮, ৮),—এইরূপ স্পষ্ট বলা হইয়াছে। ইহা হইতে, 'হরিগীতা' শব্দে 'ভগবদ্ গীতা'ই এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। গুরুপরম্পরা একই হওয়ায়, তা-ছাড়া গীতাতে প্রতিপাদ্য বলিয়া স্পষ্টরূপে দুইবার বর্ণিত এই যে ভাগবত কিংবা নারায়ণী ধর্ম্ম তাহারই 'সাত্বত' কিংবা 'ঐকান্তিক' ধর্ম্ম বলিয়া অন্য নাম আছে; এবং তাহার প্রচলিত বর্ণনা—

নারায়ণপরো ধর্ম্মঃ পুনরাবৃত্তি দুর্লভঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্ম্মো নারায়ণাত্মকঃ॥

"এই নারায়ণীয় ধর্ম্ম পুনর্জন্ম-নিবারক অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষপ্রদ এবং উহা প্রবৃত্তিপরও বটে"—এইরূপ উহার দ্বিতীয় লক্ষণ দিয়া (সাং ৩৪৭, ৮০, ৮১,) তাহার পর এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তিপর কিরূপ, মহাভারত তাহার পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছে। প্রবৃত্তি অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া আমরণ চাতুর্বর্ণ্যবিহিত নিষ্কাম কর্ম্মেই রত থাকা—এই অর্থে প্রসিদ্ধ আছে। তাই, গীতাতে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভাবগত ধর্ম্মের উপদেশ। উক্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তিপর হওয়া প্রযুক্ত ঐ উপদেশ মহাভারতকার প্রবৃত্তিপরই বুঝিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তথাপি

কেবল প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধর্ম্মই গীতাতে আছে এরূপ নহে ; এই ভাগবত ধর্ম্ম এবং—

যতীনাং চাপি যো ধর্ম্ম স তে পূর্ব্বম্ নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাস বিধিকল্পিতঃ॥

"এইরূপই, যতীর অর্থাৎ সন্ন্যাসীর নিবৃত্তিপর ধর্ম্মও, হে রাজন! তোমাকে পূর্ব্বে ভগবদ্ গীতাতে বিধি-সমেত সংক্ষেপে বলিয়াছি,"—এইরূপ বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে পুনর্ব্বার বলিয়াছেন (অ, ভা, সাং, ৩৪৮, ৫৩,)। কিন্তু প্রবৃত্তিপর ধর্ম্মানুসারেই, যতীর নিবৃত্তিপর ধর্ম্মও গীতাতে এইরূপ যদিও বলা হইয়া থাকে, তথাপি মনু-ইক্ষাকু ইত্যাদি গীতাধর্ম্মের যে পারম্পর্য্য গীতাতে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যতী ধর্ম্মের সহিত একেবারেই মিল হয় না ; কেবল ভাগবত ধর্ম্মের পারম্পর্য্যের সহিত মিল হয়। এইজন্য গীতাতে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা মুখ্যরূপে মনু ইক্ষাকু ইত্যাদি পরম্পরায় প্রচলিত প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ ; তাহাতে আনুষঙ্গিকক্রমে নিবৃত্তিপর যতিধর্ম্মের বর্ণনা আসিয়াছে, এইরূপ মহাভারত কাব্যের অভিপ্রায়,—উপরি-উক্ত বচন হইতে নিষ্পন্ন হয়। মহাভারতের এই প্রবৃত্তিপর নারায়ণীয় ধর্ম্ম এবং ভাগবত পুরাণের ভাগবত ধর্ম্ম মূলে একই, এইরূপ পৃথু, প্রিয়ব্রত, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভগবদ্‌ভক্তদিগের কথা হইতে কিংবা অন্যত্র ভাগবতে নিষ্কাম কর্ম্মের যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় (ভাগবত ৪,২১, ৫১,৫২ ; ৭,১০,১৩ ও ১১,৪৬ দেখ), কিন্তু ভাগবত ধর্ম্মের কর্ম্মপর প্রবৃত্তিতত্ত্বের সমর্থন ভাগবত-পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। এই সমর্থন মহাভারতে কিংবা বিশেষত গীতাতেও করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমর্থন অনুসারে ভাগবত ধর্ম্মের ভক্তির রহস্য যেরূপ দেখান আবশ্যক, সেরূপ দেখাইতে ব্যাস তখন ভুলিয়া গিয়াছিলেন; ভক্তি ব্যতীত কেবল নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যর্থ (ভাগবত ১,৫,১২) এইরূপ মনে করিয়া ভারতের এই অভাব পূরণ করিবার জন্য ভাগবত পুরাণ তাহার পরে স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন,—এইরূপ ভাগবতের প্রথম অধ্যায়গুলিতে বর্ণনা আছে। ভাগবত পুরাণের মুখ্য হেতু কি, তা ইহা হইতে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয় ; ও ইহার দরুণ অনেক প্রকারের হরিকথা বলিয়া ভাগবত ধর্ম্মের ভগবদ্‌ভক্তির মাহাত্ম্য ভাগবতে যেরূপ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে সেরূপ ভাগবত ধর্ম্মের কর্ম্মপর অঙ্গের আলোচনা তাহাতে করা হয় নাই। কিংবহুনা, সমস্ত কর্ম্মযোগ ভক্তি ব্যতীত ব্যর্থ হইয়া থাকে, এইরূপ ভাগবতকারের উক্তি (ভাগ ১,৫,৩৪) তাই, গীতার তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণে গীতা ভারতে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে নারায়ণীয় উপাখ্যান যেরূপ উপযোগী ভাগবত-পুরাণ ভাগবত ধর্ম্মীয় হইলেও কেবল ভক্তি প্রধান হওয়ায় সেরূপ উপযোগী হইতে পারে না, এবং এইরূপ আলোচনা করিলেও ভারত ও ভাগবত এই দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও কালও বিভিন্ন ইহা মনে রাখিয়া আলোচনা করা চাই, ইহা এখানে বলা আবশ্যক। নিবৃত্তিপর যতিধর্ম্ম ও প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধর্ম্ম ইহাদের মূলস্বরূপ কি, ইহাদের ভেদ ঘটিবার কারণ কি, মূল ভাগবত ধর্ম্মের সম্প্রতি কোন্ অংশ রূপান্তর হইয়াছে ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার পরে স্পষ্ট করিয়া করা যাইবে।

আমাতে আমি।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

আমারে পেয়েছি আমি, অন্তরেতে মোর—
জীবন বন্ধন কোথা—ছিন্ন মায়া ডোর!
কোথায় ত্রিতাপ জ্বালা, কোথা মোহবন্ধ—
অখণ্ড বিশ্বের মাঝে কি নব আনন্দ!
এ কোন্ অরুণোদয় পুলকের ধারা
জীবনে মরণে সন্ধি—চিত্ত আত্মহারা ;
জীবনে যা পাইয়াছি কিছু নাই তার,
অথবা সকলি আছে—সব একাকার।
চন্দ্র নাই সূর্য্য নাই—অপূর্ব্ব আলোক ;
সুখ দুঃখ কিছু নাই—দ্যুলোক ভূলোক
রাগ দ্বেষ ; কোথা গেল জন্মমৃত্যুভেদ!
হৃদয়বেদনা নাই হাহাকার খেদ ;
হারায়েছি যাহা ছিল, পাইয়াছি সব—
গগনে গহনে আজ কি নব উৎসব!
ধাও ধাও আরো ধাও জাগরিতপ্রাণ,
মিশাও হৃদয় মাঝে এ বিশ্ব মহান।

ক্ষুদ্রত্ব গিয়াছে চলি, হেরেছি আমায়—
মৃত্যু ভয়ে কম্পমান নহে ক্ষীণকায়
এক আমি, বহু আমি, নানা রূপে আমি—
আমিই আমার পুত্র পিতা জায়া স্বামী।
আমাকেই চিরদিন বাসিয়াছি ভাল ;
সকলই আমার রূপ—আঁধার ও আলো—
নাম নাই গোত্র নাই নাহি পরিচয়—
নিত্য, সত্য, চিরন্তন, অক্ষর অব্যয় !

উপাসনায় ব্রহ্মচর্য্য।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্ততীর্থ)

যাঁহার মহিমায় প্রতিনিয়ত ব্রহ্মচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, জন্মের পূর্ব্বেই জীবমাত্রের আহার্য্য সংগৃহীত হইতেছে, বিহগকুল প্রভাতে মনের সুখে গান করিতেছে, নদী সকল কুলু কুলু ধ্বনিতে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে, সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা যে নিত্য কর্ত্তব্য তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এই পরব্রহ্মের উপাসনায় ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় দ্বিতীয় সহায় আর কিছুই নাই। এক কথায় বলিতে গেলে ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন ভগবানকে কোন মতেই পাওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা সে মূলমন্ত্র ভ্রমেও কখন স্মরণ করি না। প্রাচীন সময়ে আর্য্যগণ যখন শিক্ষার্থী হইয়া গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতেন তখন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হইত। নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভের সহিত কষ্টসহিষ্ণুতা বিলাসবিদ্বেষ ও চিত্ত সংযমে অভ্যস্ত হওয়া এই ব্রতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন ভারতে সভ্যতার প্রবর্ত্তক ঋষিকুলে আমরা যে বিষয়বিরাগের সহিত অন্যান্য প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাই, ব্রহ্মচর্য্যই তাহার একমাত্র কারণ। হিন্দুর এই প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি না থাকিলে ভারতবর্ষ বোধ হয় প্রকৃত মহত্বের আশ্রয়স্থল হইত না।

বিদ্যায় মানুষের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইতে পারে, বহুদর্শনে চিত্তের প্রসারণ ঘটিতে পারে, মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি উন্নত হইতে পারে, কিন্তু চিত্তসংযমের অভাবে মানুষ কখনও প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল মানুষ আবর্ত্তঘূর্ণিত তৃণখণ্ডের ন্যায় কেবল এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার অপূর্ব্ব জ্ঞানগরিমা, অসামান্য প্রতিভা, অপরিসীম মানসী শক্তি কিছুই তাহাকে শান্তির অমৃতরস প্রদান করিতে পারে না। প্রতিভায় তাহার হৃদয় প্রদীপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু শান্তির অভাবে তাহার চঞ্চলতা ঘুচিতে পারে না। তাহার মনোমন্দিরের একদিকে যেমন উজ্জ্বল আলোক, অপরদিকে সেইরূপ ঘোর অন্ধকার। সে আলোকের সাহায্যে অতীত ও বর্ত্তমান কালের মনীষীদিগের মানসপট সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দেখিতে পারে, কিন্তু তাহা তাহার অভীষ্টরত্বের অন্বেষণে সহায় হইতে পারে না। বিশুদ্ধ সুখ ও শান্তির পথ তাহার সমক্ষে ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে, তাহার মনোমন্দিরের আলোক ঐ অন্ধকারভেদে সমর্থ হয় না। লোকসমাজে তাহার প্রশংসালাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু লোকের হৃদয়গত শ্রদ্ধা লাভ তাহার পক্ষে ঘটিয়া উঠা সম্ভব হয় না। লোকে তাহার মানসক্ষেত্রের আলোকে বিমোহিত হইয়া যেমন পুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয়, তাহার হৃদয়ের ধর্ম্মভাবের অভাব জনিত গভীর অন্ধকারে সেইরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে।

এই অন্ধকার দূরীভূত করিতে হইলে চিত্তকে সংযত করিতে হইবে, একনিষ্ঠ হইতে হইবে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি হইতে সংযমন রজ্জুর আকর্ষণে চিত্তকে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে। যেরূপ অতি প্রবল বেগে ধাবিত অশ্বকেও সুশিক্ষিত সারথি আত্মবশে রাখিয়া নিজের অভীষ্ট প্রদেশে লইয়া যায় সেইরূপ সংযম পুরুষচিত্তের চপলতা দূর করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্মুখীন করিয়া দেয়।

কঠোপনিষদ বলিয়াছেন "সৃষ্টিকর্ত্তা ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাই অতি সন্নিহিত অন্তরতম পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়গণ দেখিতে পায় না কিন্তু বাহিরের বস্তু সকল অনায়াসে দেখিতে পায়"। ইহা দ্বারা মনে হয়, ভগবান যেন বলিয়া দিতেছেন যে সাধনা ভিন্ন কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয় না। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ অন্তর্মুখীন হইলে সকলেরই আত্মদর্শন লাভ হইত, সকলেই আত্মজ্ঞানী ঋষিপদবাচ্য হইতেন। সাধনা কর,

সংযত হও. ইন্দ্রিয় সকলকে স্ববশে আনয়ন কর, সেই পরমাত্মার নির্ম্মল জ্যোতি দেখিতে পাইবে, শান্তির ক্রোড়ে স্থান পাইবে।

বর্ত্তমান সভ্য জগতের মুখপাত্র পাশ্চাত্য সভ্যগণও এখন সংযমের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছেন। এই যে মহালোকক্ষয়কর সমর সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহার কারণ সংযমের অভাব নহে কি? যদি পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলী সংযমের মূলমন্ত্রকে ভিত্তি করিয়া দেশ শাসন করিতেন, সংযমের উপকারিতা দেশকে বুঝাইতে পারিতেন, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আমাদের প্রাচীন শিক্ষানুযায়ী গুরুর সহিত ছাত্রগণের একত্র বাসের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ছাত্রগণের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হইত; ছাত্রগণ কামক্রোধাদি রিপুদিগকে স্ববশে আনিয়া পূর্ব্বতন মনীষীদিগের স্থান অধিকার করিতে পারিত, এবং সমগ্র জগৎ একটী সুখের ভাণ্ডার হইত। আমাদের বিশ্বাস যে তাহা হইলে ইউরোপকে এই ভীষণ সমরের করাল গ্রাসে পতিত হইতে হইত না। যে স্থলে আমরা সংযমের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই, সেই স্থলেই চিরশান্তি বিরাজিত দেখি। তাই যে কার্য্যের মূলে সংযম নাই সেইরূপ কার্য্যকে ভারতের আর্য্য ঋষিগণ উন্নতির সোপান বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

আমরা জনক যাজ্ঞবল্ক্য শুকদেব প্রভৃতি যে সকল মুক্ত পুরুষের কথা শ্রুতি পুরাণাদিতে শুনিতে পাই, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী মূর্ত্তিমান সংযমস্বরূপ ছিলেন। সংযম রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে মহর্ষি পতঞ্জলিও ব্রহ্মচর্য্যকে সাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ বলিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্য যে কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তিরই সহায় তাহা নহে, উহা আমাদের নৈতিক এবং সামাজিক উন্নতিরও প্রধান সহায়। সংযম না থাকিলে মানুষ কখনও উন্নত হইতে পারে না, দীর্ঘকাল আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হইলে বিষাদের কালিমা মনুষ্যকে আবৃত করিবে ইহা ধ্রুবসত্য।

ঐ যে গলিতনখদন্ত স্মৃতিশক্তিবিহীন অস্থিচর্ম্মসার নরদেহ কাতর কণ্ঠে রোদন করিতেছে দেখিতেছ, একদিন ইনিও তোমার মত সুস্থশরীর বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। আজ দেখ ইহাঁর কি ঘৃণিত অবস্থা! আজ ইহাঁর কত অনুতাপ! যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইনি ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেন না আজ তাঁহারাই ঘৃণায় ইহাঁর সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করিতে চাহেন না। অসংযতের ভীষণ মর্ম্মান্তিক পরিণাম ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়! সংযমের অভাবে আমরা দিন দিন যেমন হীন দুর্ব্বল এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার উপযুক্ত প্রতীকারের পন্থা কেহই পাইতেছেন না বা পাইয়াও অবলম্বন করিতেছেন না। তাহার ফলে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যেরূপ সুস্থকায় ও সবল ছিলেন তাহা আমরা বর্ত্তমান সময় বিশ্বাস করিতেও চাহি না। আর আমাদের পুত্র পৌত্রগণ আমাদিগের অপেক্ষাও যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে এখনও যদি আমরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করি তবে ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্ব থাকিবে কিনা সন্দেহ। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যে সকল দুর্দ্দমনীয় রোগ ভারতবর্ষকে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করিতেছে, আমাদের বিশ্বাস যে ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত ঐ সকল দুর্দ্দমনীয় রোগের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

এসো ভ্রাতৃবৃন্দ, ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া যাহাতে ভারতবর্ষে পুনরায় ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হই তাহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

ভগবান তোমাকে হস্তপদাদি দিয়াছেন তুমি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া স্বর্গের দেবতা হইতে পার, আবার অপব্যবহার করিয়া নরকের কীট সাজিতে পার। স্বর্গ ও নরক, উভয়ই মানুষের ইচ্ছাধীন; মানুষ ইচ্ছা করিলে দেবতা হইতে পারে, পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারে, অন্য প্রাণী তাহা পারে না। ইহাই ইতর প্রাণী হইতে মনুষ্যের বিশেষত্ব। এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদি ইতর প্রাণী যেরূপ অসংযতভাবে থাকে আমরাও সেইরূপ থাকি তাহা হইলে সে পরিতাপ রাখিবার স্থান কোথায়?

যে বিলাসিতা রাক্ষসী সমগ্র দেশকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে তাহার কবল হইতে আত্মরক্ষা

করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সংযমী হওয়া আবশ্যক। সংযত পুরুষের আধ্যাত্মিক দৈহিক আর্থিক সকল প্রকার উন্নতি হইয়া থাকে।

সংযমের উপকারিতা দেশের লোক উপলব্ধি করিতে পারিলে দেশে আবার প্রাচীন স্বাস্থ্য সুখ সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে, অকালমৃত্যু হ্রাস হইবে, নানাপ্রকার রোগ দূরীভূত হইবে, দেশে পূর্ণ সুখ সমৃদ্ধি জাগ্রত হইবে এবং শান্তির অমৃতধারা বহিবে। আবার আমরা জনক যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস বাল্মীকির মত মহাত্মাদিগের দ্বারা ভারতবর্ষকে অলঙ্কৃত দেখিতে পাইব। ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়দিগকে শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে পরোপকারে পরাজিত করিয়া ভূস্বর্গ বলিয়া পরিচিত হইবে।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

গত ১লা সেপ্টেম্বর (১৯১৬), ১৬ই ভাদ্র (১৩২৩), শুক্রবার শুক্ল চতুর্থীতে রাত্রি ৮টা ২৪ মিনিটে বালিগঞ্জ নিবাসী ডাক্তার (Ph, D) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরীর একটী পুত্রলাভ হইয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।

গত ১৪ই মাঘ বাঁকিপুর নিবাসী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সহিত শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কর্ম্ম এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। বিবাহসভায় অনেক-গুলি গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং বিবাহপদ্ধতির গাম্ভীর্য্য তাঁহাদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিল।

আদিব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে দান প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করি-তেছি যে লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়বাহাদুর মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন।

(১) সত্যনারায়ণের পুঁথি, (২) মুগলুব্ধ, (৩) শূন্য-পুরাণ, (৪) কাশী পরিক্রমা, (৫) ব্রজপরিক্রমা, (৬) বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড। (৭) বাঙ্গলাভাষা—দ্বিতীয় ভাগ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	মুদিয়ালী	৶
„ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	২৴
„ অবিনাশচন্দ্র দাস	কলিকাতা	১৴
„ রসিকচন্দ্র দত্ত	ঐ	৩৴
„ চুনীলাল দত্ত	ঐ	১৴
„ কেশবচন্দ্র পাল	ঐ	১৴
„ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৴
„ সুরেন্দ্রবিজয় চৌধুরী	ঐ	১৲
„ মহেশচন্দ্র ধর	ঐ	॥০
„ অতুলকৃষ্ণ কুণ্ডু	ঐ	।০
„ শ্রীজগনাথ রায়	ঐ	।০
„ দক্ষিণারঞ্জন চন্দ্র	ঐ	।০
„ যুগলকুমার মল্লিক	ঐ	৶০
„ শরৎচন্দ্র বসাক	ঐ	৶০
„ বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তী	ঐ	২৲
„ মুকুন্দলাল নন্দী	ঐ	।০
„ চণ্ডীচরণ দাস	ঐ	৶০
„ ভবনাথ রায়	ঐ	।০
D. N. Ghatak Esqr	ঐ	১৲
শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস লস্কর	বেহালা	১৲
„ সতীশচন্দ্র দত্ত	আলিপুর	॥০
„ ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	কালীঘাট	১৲
„ সুশীলকুমার গুপ্ত	কলিকাতা	১৲
„ কালীকুমার পাইন	ঐ	৩৲
„ ভগবতীচরণ মিত্র	ঐ	১৲
„ অনাথনাথ বসু	ঐ	১৲
„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	২৲
„ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	২৲
„ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	২৲
„ ছুটবেহারী চট্টোপাধ্যায়	ঐ	॥০
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	॥০
„ পূর্ণচন্দ্র দত্ত	ঐ	৵০
„ হরিশ্চন্দ্র মিত্র	আন্দুল	॥০
„ তুলসীদাস দত্ত	কালীঘাট	২৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিণী বসু	কলিকাতা	২৲
শ্রীযুক্ত বিনোদ বেহারী দত্ত	ঐ	১৲
„ জিতেন্দ্রজিত সেনগুপ্ত	ঐ	১৲

আয় ব্যয়।

১৮৩৮ শকের বৈশাখ হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত।

আয় ...	৬৫৬২।৩
পূর্ব্বস্থিত ...	৪৬৪॥/০
সমষ্টি	৭০২৬৶/৩
ব্যয়	৭০১৫/৪
স্থিত	১১॥৶/১১

জায়।

সেভিংস ব্যাঙ্ক—	৪৯/০
কোম্পানির কাগজ ট্রষ্টী মহোদয়গণ	
০৭৭৮৫০ নম্বরের ১ কেতা	২০০৲
১০৮৪৮১ নম্বরের ১ কেতা	২০০৲
সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
২২৩১৭৯ নম্বরের ১ কেতা	১০০৲
২৮১৭৮০ নম্বরের ১ কেতা	১০০৲
	৬৪৯/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ—

Bonded ware house	১০০৲
মাসিক দান	১৮০০৲
সাংবৎসরিক	২৪৲
আনুষ্ঠানিক	২৩৲
এককালীন দান	৬৩॥০
দানধারে প্রাপ্ত	৮৸৬
মাঘোৎসবের দান	১০৲
বিশেষ কার্য্য জন্য দান	২১৲
গচ্ছিত আদায়	২৫৬৬/৬
হাওলাত আদায়	৭৫৶৬
গচ্ছিত	৪৲
হাওলাত জমা	১৮৪৶০
	৪৯২৯॥/৬

তত্ত্ববোধিনী—

বকেয়া	১৭৩॥৶
হাল	১৮৭।০
মাশুল	১৯৷৴০
নগদ	১।০
	৩৭৯৸০

পুস্তকালয়—

সমাজের পুস্তক	৩১৮৸৶
গচ্ছিত	৭০৸৶
কমিশন	১৮॥৶
মাশুল	৪৸৶
	২১৫৸৶

যন্ত্রালয়—

পত্রিকা মুদ্রণ	২৭৭॥০
অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৩৫৪৸০
কাগজ	৪৬৮৶৯
দপ্তরী	৬৩৸০
বিবিধ	৩৶০
	১১৩৭॥৶৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

কর্ম্মচারীর বেতন	৪৬৭॥/৪
Electric Light	৩২৬৶৬
ট্যাক্স	১৫৫৸৶৯
লাইসেন্স	১২৲
অন্যান্য	১৬০॥/০
খাজনা	২১৲
কাগজ	১৫৮৸৶৯
গচ্ছিত	২৫৬১।৬
হাওলাত বাবত	১৪৩/৬
হাওলাত শোধ	১৩৬৸০
গচ্ছিত	৪৪৯/০
	৪৪৭৮৶/১১

তত্ত্ববোধিনী—

কাগজ	২০৩।৶০
মুদ্রাঙ্কন	২৭৭॥০
বাঁধাই	২৬৲
প্রবন্ধ	১৬১৷৴০
মাশুল	৫১৸৯
কর্ম্মচারীর বেতন	৫৪।৶৪
অন্যান্য	৸৶
বিজ্ঞাপন	৬৲
	৭৯৭৷৴০১

পুস্তকালয়—

দপ্তরী	১০৶৯
পুস্তক ক্রয়	২৸০
গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	৭০৸/০
কমিশন	২৬৶৬
মাশুল	১৪ ৬
অন্যান্য	২॥৯
	১২৪॥৶০

যন্ত্রালয়—

কর্ম্মচারীর বেতন	৭৫৪৶৪
অপরের কাগজ	৪৬০৸৶৯
দপ্তরী	৯৭।৭
অক্ষর	২২৬৶০
সাজিমাটি ইত্যাদি সরঞ্জাম	১৩২॥৶৬
অতিরিক্ত	১৬/৭
	১৬২৪॥৪

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

আলোর শতদল।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

ভুবন ভরে দুল্‌চে ওরে
আলোর শতদল
ভাস্‌চে ভূলোক ভাস্‌চে দ্যুলোক
ভাস্‌চে নভস্তল।

ওরে ভাস্‌চে কানন-গিরি
ওরে সরিৎ সাগর ঘিরি
উঠ্‌ছে ভাসি আলোর হাসি
মধুর নিরমল।

ওরে পাতায় পাতায় ভাসে
ওরে স্বর্ণ-কমল হাসে
ওরে শিশির-ভেজা ঘাসে
ঐ আলো ঝলমল।

আলোর শতদল,
ওরে আলোর শতদল
স্বচ্ছ সুবিমল
ওরে স্বচ্ছ সুবিমল!

ওরে কালো মাটির গায়ে
ওরে তরুদলের ছায়ে
জাগছে কমল শুভ্র অমল
আলোর শতদল।

ওরে প্রাণের গোপন তলে
ওরে অতল গভীর জলে
দুলুক্ তাঁহার আলোরই গো
শুভ্র শতদল॥

অকারণ নিরাশা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ব্রাহ্মসমাজ আমাদের সম্মুখে একটী বিরাট আশা ধারণ করিয়াছেন। সেই আশার মূলমন্ত্র আমাদের প্রত্যেকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। আমরা ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া, ব্রাহ্ম-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এই অমোঘ আশামন্ত্র লাভ করিয়াছি, এই একটী মহান্ শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে মঙ্গলময়ের রাজ্যে আমাদিগকে ক্রমাগত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিরই পথে চলিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই অনাদ্যনন্ত পরব্রহ্মই যে সত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই সত্যধর্ম্মকেই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আলিঙ্গন করিয়াছি এবং এই সত্যধর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল। আমাদিগের একটী মুহূর্ত্তও নষ্ট করিবার অবকাশ নাই। যে উন্নতির অন্ত নাই, সীমা নাই, সেই বিশাল বিপুল উন্নতির পথে আমাদিগকে অবিশ্রাম অগ্রসর হইতেই হইবে।

এই যে প্রবল আশা ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন, ইহাকে সফল করিতে

গেলে আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের প্রদর্শিত সরল পথে ব্রহ্মধামের যাত্রী হইতে হইবে। যে দেবতা আকাশে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের সম্মুখে স্বীয় মঙ্গলমূর্ত্তি অহর্নিশি প্রকাশ করিতেছেন, এবং যিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে প্রতিমুহূর্ত্তে স্বীয় সত্য-সুন্দর-মঙ্গলরূপে স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন, সেই মহান্ দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে হইবে—কোন মনুষ্য বা দেবতাকে অপরিহার্য্য সহায় বা মধ্য-বর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোন মানবের হস্তগঠিত বা কল্পনাপ্রসূত প্রতিমূর্ত্তি অবলম্বন অনাবশ্যক, ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে ইহাই বিশেষভাবে শিক্ষা দিতেছেন। আমরা যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের এই শিক্ষা হৃদয়ে উপলব্ধি করি এবং যখন চারিদিকে প্রত্যক্ষ করি যে ব্রাহ্ম-সমাজের এই অসাম্প্রদায়িক মূল সত্যমন্ত্র জ্ঞানত বা অজ্ঞানত অনুসরণ করিয়া সমগ্র বিশ্বজগত ধীরে ধীরে কিন্তু স্থিরগতিতে ব্রহ্মধামের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, তখনই আশা ও আনন্দ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে। কিন্তু যখন আমরা আপনাদিগকে ব্রহ্ম হইতে দূরে রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা হারাইয়া ফেলি তখনই আমরা নিরাশা ও নিরানন্দের গভীর কূপে নিমগ্ন হইয়া রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠি, চিন্তাজ্বরে হৃদয় জর্জ্জরিত ও মৃতপ্রায় হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের সম্মুখে আশার প্রদীপ ধারণ করিলে হইবে কি? আমরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাংসারাসক্তির নিকটে বলিদান করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ ব্রতপ্রতিপালনে বিমুখ হইয়া সেই উজ্জ্বল আশার আলোক দেখিতেই চাহি না—চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখি। তাই বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে এত নিরাশার কথা শোনা যায়, এত নিরানন্দের মর্ম্মন্তুদ ভাব দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজ লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজহিতৈষীগণের মধ্যে যখনই আলোচনা হয়, তখনই তাঁহাদের অনেকেরই মুখে গভীর নিরাশার কথা শোনা যায়। কিন্তু এ প্রকার নিরাশার প্রকৃত পক্ষে কোনই কারণ নাই।

এ প্রকার নিরাশার কোন কারণ থাক বা নাই থাক, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে সময়ে সময়ে এরূপ নৈরাশ্য হৃদয়ে জাগিয়া উঠা নিতান্ত অশুভ লক্ষণ নহে। বরঞ্চ মনে হয় যে ইহা ব্রাহ্মসমাজ-হিতৈষীগণের জীবনীশক্তির পরিচায়ক। মৃত ব্যক্তির নিকটে কোনপ্রকার সাড়াশব্দ পাইবারই সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজেরও সত্য সত্যই মৃত্যু ঘটিলে তাহার সম্বন্ধে আশা বা নিরাশা কোন প্রকার কথাই শোনা যাইত না।

নৈরাশ্যবাদীদিগের কতকগুলি ব্যক্তি বলেন যে ব্রাহ্মসমাজে যখন আর পূর্ব্বের ন্যায় মানুষের মত মানুষের অর্থাৎ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইতেছে না, তখন ইহার অবনতি ও মৃত্যু অনিবার্য্য। তাঁহাদের মনে এই এক প্রশ্ন উঠিয়া নিরাশাদংশনে তাঁহাদি-গকে দগ্ধ করিতে থাকে যে, যদি ব্রাহ্মসমাজের জীবন থাকিত, তবে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় সেই নূতন উৎসাহের সময়ে যেরূপ পর্ব্বতের ন্যায় জ্ঞানোন্নত ধর্ম্মোন্নত রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, সাধু বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষ সকল ব্রাহ্মসমাজে আবি-র্ভূত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে উন্নতির পথে সবেগে লইয়া চলিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে আর সেপ্রকার মহাপুরুষের আবির্ভাব হইতেছে না কেন? প্রতিনিয়ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক একটী মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখিতে পাইলে যেন তাঁহারা ব্রাহ্মসমা-জের জীবনী-শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারেন; তদ্বিপরীতে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের উপ-কারিতা দূরে থাক, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে কেবলই হাহুতাশের দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকেন।

এই সকল লোকেরা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগকালে ভুলিয়া যান যে হা-হুতাশ করিবার অবসর তাঁহাদের নাই। ব্রাহ্মসমাজের যে অবস্থার জন্য তাঁহারা হা-হুতাশ করিতেছেন, সে অবস্থা যে তাঁহারাই আনিয়া-ছেন। যে ভূমা পুরুষের এক ইঙ্গিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিশ্বসিত হইয়াছে, তাঁহারা কেন ভুলিয়া যান যে তাঁহারা সেই মহান্ অগ্নির এক একটী স্ফুলিঙ্গ? তাঁহারা কেন ভুলিয়া যান যে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানপ্রেমরূপ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিলে সেই অগ্নি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এমন এক আগুন জ্বালাইয়া দিতে পারে যাহা নিরাশার শত লক্ষ নদীর জল নির্ব্বা-পিত করিতে পারে না। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেব এই

প্রকারে যে অগ্নি একবার প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন, আজ শত সহস্র বৎসরের শত বিপ্লব, শত নিরাশা সে অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেছে না। এখনও কত লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার চরণোপান্তে উপস্থিত হইয়া আশার অগ্নিতে স্বীয় হৃদয়কে উজ্জ্বল করিয়া নূতন আনন্দে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং আপনাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করেন। পুণ্যভূমি ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে কত শত পুণ্যাত্মা যে আশার প্রদীপ উচ্চে ধারণ করিয়া জনসাধারণের হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছেন, তাহার কি সংখ্যা আছে? তাই বলিতেছি যে আমাদের হাহুতাশ করিবার অবসর নাই—আমরা প্রত্যেকে আমাদের অন্তর্নিহিত মহাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গকে প্রজ্বলিত করিয়া আশার প্রদীপে কেন না পরিণত করিব? পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগের উপদেশ অনুসরণ করিয়া আমরা বলের সহিত বলিতেছি, "তোমাদের চিত্তপ্রদীপ হইতে নিরাশার সর্ব্বগ্রাসী জঞ্জাল ও নিরানন্দের রোগবাহী ধূলি ঝাড়িয়া ফেল, উত্থান কর, জাগ্রত হও, ব্রহ্মধামের পথে অতুল আশা ও আনন্দে অগ্রসর হইতে থাক; ব্রাহ্মসমাজকে আত্মীয় বলিয়া হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন কর, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রতপালনে যত্নশীল হও—ব্রাহ্মসমাজের এবং তৎসঙ্গে সমগ্র দেশের নূতন শ্রী দেখিতে পাইবে।"

আর যদি বা স্বীকার করা যায় যে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে না, তাহাতেই বা কি? তাহাতেও নিরাশার কোনই কারণ দেখা যায় না। মোটামুটি হিসাবে ধরিলে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তিবিশেষের জীবন যে সার্ব্বভৌমিক নিয়মে চলে, একটী সমাজেরও জীবন সেই সার্ব্বভৌমিক নিয়মে অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনের সহিত সমসূত্রে চলিয়া থাকে। সমাজ যে অনেকগুলি ব্যক্তির একটী সমষ্টি মাত্র। সমাজের মহাপুরুষ, আর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিভা, এই উভয়কেই আমরা সমসূত্রে ধরিতে পারি—উভয়ই আমাদের মতে একটী সার্ব্বভৌমিক নিয়মে চলিয়া থাকে। প্রতিভার যেমন পরিচয় পাইতে গেলে তাহার একটী বিষয় অবলম্বন চাই, মহাপুরুষেরও আবির্ভাব হইতে গেলে তাঁহার আবির্ভাবের একটী অবলম্বন চাই। বাধাবিঘ্ন প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন পাইলেই প্রতিভা ব্যক্ত হইতে পারে। যতই বৃহৎ বৃহৎ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবে ততই প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে। সেইরূপ মহাপুরুষের আকারে সমাজেরও প্রতিভা ব্যক্ত হইবার জন্য তাহার উপযুক্ত বিষয় অবলম্বন পাওয়া চাই। সমাজের ভিতরে উন্নতির এমন সমস্ত বাধাবিঘ্ন আসা চাই, যে গুলি মহাপুরুষই অতিক্রম করিতে পারিবেন। সমাজের ভিতরে এমন কতকগুলি অভাবের তীব্র বোধ হওয়া চাই, যেগুলি মহাপুরুষ কর্ত্তৃকই পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা, যেগুলি মহাপুরুষ ব্যতীত জনসাধারণের অপর কাহারও কর্ত্তৃক পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা আতস কাচের ন্যায়—তাঁহাদের ভিতর দিয়া জনসাধারণের অভাব সংহত আকারে প্রকাশ পায় এবং কাজেই তাঁহাদের অন্তরেই সেই অভাব দূর করিবার উপায়ও উদ্ভাবিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে এমন কোন গুরুতর বাধাবিঘ্নও সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছি না, যাহা কোন মহাপুরুষের অতিক্রম করিতে হইবে; অথবা এমন কোন তীব্র অভাববোধও দেখিতেছি না, যাহা মহাপুরুষকে পূর্ণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় ব্রাহ্মেরা যে সকল বাধাবিঘ্ন প্রাপ্ত হইতেন, এখন তো সে সমুদয় স্বপ্নের মত বোধ হয়; সে সকলের ইতিবৃত্তমাত্র এখন শোনা যায়; চক্ষে আমরা আর তাহা দেখিতে পাই না। সেই সকল বাধাবিঘ্নের কারণের মধ্যে জাতিভেদ অস্বীকার ও উপবীত ত্যাগ বড়ই বৃহৎরূপে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মেরা মনে করিতেন যে ব্রাহ্ম হইলেই জাতিভেদ অস্বীকার করিতে হইবে এবং উপবীত ত্যাগ করিতে হইবে—এই দুইটী কার্য্য ব্রাহ্ম হইবার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। (এস্থলে কোন্ মত ঠিক, কোন্ মত ঠিক নয়, সে বিষয় বিচার করিতেছি না।) এদিকে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজ এই দুইটী কার্য্যকে ঘোর বিদ্বেষের চক্ষে দৃষ্টি করিতেন। কাজেই তখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশকামী ব্যক্তিগণ ঐ দুইটী কার্য্য করিতে গিয়া মহান বাধা কঠোর বিঘ্ন প্রাপ্ত

হইতেন। যাঁহাদের অন্তরে মহাপুরুষের তেজ লুক্কায়িত ছিল, তাঁহারা সেই বাধা ভূমিসাৎ করিয়া, সেই বিঘ্ন অপসারিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। আমরাও তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বোধে তাঁহাদের চরণে অবনতমস্তক হইলাম। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা উপবীত ত্যাগ ও জাতিভেদ অস্বীকার করাকে ব্রাহ্ম হইবার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন না, এবং যাঁহারা মনে করেন যে পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই ব্রাহ্মের অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্ম,—উপবীত ত্যাগ ও জাতিভেদ অস্বীকার ব্রাহ্মের পক্ষে অবান্তর কর্ত্তব্য ও সুতরাং ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে প্রবর্ত্তিতব্য। কাজেই এখন যাঁহারা ব্রাহ্ম হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় বাধার কঠোর আঘাত প্রাপ্ত হন না। বরঞ্চ দেখা যায় যে প্রকাশ্যে না হইলেও, প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনে অনেকে আত্মীয় স্বজনের নিকটে উৎসাহ পাইয়া থাকেন। জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে, দ্রব্যসমূহের মহার্ঘ্যতার সঙ্গে নাস্তিকতা মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি একপ্রকার উঠিয়া যাইতেছে বলিলেও চলে। এ অবস্থায় মহাপুরুষ আবির্ভাবের উপযুক্ত অবলম্বন দেখিতে পাই না, সুতরাং মহাপুরুষের আবির্ভাবের অভাবে আমরা নিরাশারও কোনই কারণ দেখি না।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে কোন বিষয়ে এমন তীব্র অভাববোধও দেখিতে পাই না, যে অভাব দূরীকরণের জন্য মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে হয়। আমাদের যে অভাব নাই এমন কথা বলি না। আমরা এমন কোন অভাব অনুভব করিতেছি না, যাহা দূর করা জনসারণের শক্তিসামর্থ্যে কুলায় না, যাহা দূর করা একমাত্র মহাপুরুষেরই উপর নির্ভর করে। ব্রাহ্মসমাজের তীব্র অভাববোধের যে সকল কারণ বর্ত্তমান ছিল, এখন সেই সকল অভাবের অনেকগুলিই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই হইল ব্রাহ্মসমাজের জন্মের কারণ এবং উহাই হইল ব্রাহ্মসমাজের আজীবন লক্ষ্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় তাহার এই সুমহান লক্ষ্য সাধনের উপযোগী উপকরণ কিছুই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—তখন না ছিল সাহিত্য, না ছিল বিজ্ঞান, না ছিল জ্ঞানপ্রচারের অমোঘ সহায় মাসিক পত্র। ব্রাহ্মসমাজকে সেই সকল উপকরণ গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল। গঠনের সেই আদিকালে, ভারতের নবজীবনের সেই সৃষ্টিকালে যাঁহারা সহায়হস্ত বিস্তৃত করিয়া ভারতবাসীকে বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ বলিয়া আমাদের নমস্য হইয়াছেন। সেই সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবরাজির সংঘর্ষণের কারণে সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় সাহিত্য, স্বদেশীয় ভাষায় মাতৃস্তন্যপুষ্ট ভাষায় বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার অভাব অতি তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছিল। সেই অভাববোধ রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় মহাপুরুষদিগের ভিতর দিয়া সংহত আকারে প্রকাশ পাইল। তাঁহারা এই বিষয়ে সকল বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া সেই অভাব দূরীকরণের পথপ্রদর্শন করিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সমগ্র সমাজ সমগ্র দেশবাসী স্বীকার করিয়া লইয়াছে। জাতীয় অভাবসকল এখন সমগ্র জাতিই পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সাহিত্য সংগঠন বল, স্বদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা বল, উচ্চদরের মাসিকপত্র সম্পাদন বল, এ সকলই এখন আর কেবল ব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে ন্যস্ত নহে, সমগ্র ভারতবাসী সে ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে মহাপুরুষের আবির্ভাবের উপযোগী তীব্র অভাব অনুভূত হইতেছে না। ব্রাহ্মসমাজ চাহিয়াছিল যে তাহা দ্বারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের যে সকল পথ উন্মুক্ত হইল, সমগ্র দেশ সেই সকল পথ অবলম্বন করুক। ব্রাহ্মসমাজের সেই ইচ্ছা যখন অনেক পরিমাণে সংসিদ্ধ হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মসমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল না বলিয়া আমাদের ব্যাকুল হইবার কোনই কারণ দেখি না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে ব্রাহ্মসমাজ অবনত শ্রেণীর উন্নয়ন প্রভৃতি যে সকল অভাব বর্ত্তমানে অনুভব করিতেছে, সেই অভাববোধ যখন বড় তীব্রতা ধারণ করিবে, তখনই আবার ব্রাহ্মসমাজ মহাপুরুষের জন্মদান করিবে নিঃসন্দেহ।

তারপর একটা কথা এই যে ক্রমাগত মহাপুরু-

যের সৃষ্টি কোন সমাজেরই পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয় না। এই সত্য ভগবান প্রকৃতিতে লিখিয়া দিয়াছেন। শরীরের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, যদি কেহ ক্রমাগত অবিশ্রামে শারীরিক পরিশ্রম করে, তবে তাহার শরীর সুদৃঢ় বলিষ্ঠ হইবার পরিবর্তে শীঘ্রই ভগ্ন হইয়া যায়। পরিশ্রমের মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম আবশ্যক। সেইরূপ যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে বিশ্রাম না দিয়া নব নব সত্য আবিষ্কারের জন্য ক্রমাগত চিন্তা করিতে থাকেন, তবে শীঘ্রই তাঁহার সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা বৃথা হইয়া যায়, মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সমস্ত শরীর ভগ্ন হইয়া তাঁহাকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। সেইরূপ সমাজের মধ্যে মহাপুরুষের জন্মগ্রহণে প্রকৃতির যে কঠোর পরিশ্রম লাগে, তাহাতে তাঁহাদের জন্মগ্রহণের মাঝে সুদীর্ঘ ব্যবধান নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। মহাপুরুষের জন্মদানের জন্য সমাজের মধ্যে নূতন নূতন জ্ঞান ও নব নব শক্তির সঞ্চয় আবশ্যক। কাজেই কোন সমাজে বিশ্রাম না পাইয়া, জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চয়ের অবসর প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমাগত মহাপুরুষের জন্মদানের চেষ্টা হইলে, প্রকৃতির নিয়মেই সে সমাজ শীঘ্রই ধ্বংসমুখে নিপতিত হইবে বলা বাহুল্য। ব্রাহ্মসমাজের ইহা সৌভাগ্য ও অন্তর্নিহিত বিশেষ বলের পরিচয়, অথবা ইহা ব্রহ্মনামেরই মহিমা যে এক শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপচন্দ্র, সাধু বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় অনেকগুলি মহাপুরুষের জন্মদান করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমাদের নিরাশার অবকাশ কোথায়?

প্রকৃতি আলোচনা করিলে আরও দেখি যে জগতের শৃঙ্খলায় যেমন হিমালয়ের ন্যায় মহোচ্চ পর্ব্বতসমূহের উপযোগিতা আছে, সেইরূপ যে ধূলিরাশিকে আমরা প্রতিনিয়ত পদদলিত করিতেছি, সেই ধূলিরাশিরও খুবই উপযোগিতা আছে। মঙ্গলময় ভগবানের রাজ্যে একটী ধূলিকণাও অবহেলার সামগ্রী নহে। ইহা একটী অতীব আশ্চর্য্য সত্য যে ধূলিরাশির অভাবে আমাদের চক্ষুর দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ধূলিরাশির অস্তিত্বের ফলেই আমাদের চক্ষু বলিতে গেলে দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। প্রকৃতিতে প্রত্যেক বালুকণার প্রত্যেক নিশ্বাসের আপনাপন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মসমাজেও যেমন মহাপুরুষের উপযোগিতা আছে, সেইরূপ সেই মহাপুরুষদিগের পদাঙ্কের অনুসরণকারী আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তিগণেরও উপযোগিতা আছে। মহাপুরুষেরা যে সকল সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা সেই সকল সত্য আমাদের জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া আমাদের জীবনকে সার্থক করিয়া তুলি। কেবল যদি মহাপুরুষেরই আবির্ভাব হইতে থাকিবে, তবে তাঁহাদের প্রচারিত সত্য সকল অনুষ্ঠানে কার্য্যে পরিণত করিবে কে?

ব্রাহ্মসমাজে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করেন যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ফুরাইয়া গিয়াছে, কাজেই তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মসমাজ কোন একটি বা ততোধিক বিশেষ কার্য্যের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং যখন সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে তখন তাহার জীবনের সার্থকতা পাওয়া যায় না। প্রথমেই আমরা তাঁহাদিগকে বলিতে চাহি যে, যে মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের পরে ব্রাহ্মসমাজকে জীবন্মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হিমালয়ের ন্যায় মহান্ এবং সাগরের ন্যায় গভীর। ব্রাহ্মসমাজের দেবতা যদি সত্যই পরব্রহ্ম হন এবং ব্রাহ্মসমাজের যদি প্রকৃত লক্ষ্য হয় দেশের এবং সেই সঙ্গে জগতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, তবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের কি অন্ত আছে? এমন কাল কি কখনও আসা সম্ভব যে, বিশ্বজগতের সকল অধিবাসীই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির শেষ বিন্দুতে উপস্থিত হইয়াছে? যেদিন তাহা ঘটিবে সেদিন সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কারণ উন্নতির শেষ সীমা হইলেন একমাত্র ভগবান। সকলেই যদি ভগবানের সত্তায় বিলয় প্রাপ্ত হয়, তবে আর সৃষ্টি রহিল কোথায়? যতদিন তাহা না ঘটিবে ততদিন ব্রাহ্মসমাজে কার্য্যের অভাব বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিবার আমাদের কোনই অবকাশ নাই। যাঁহারা কার্য্যের

অভাবের কথা বলিবেন, আমরা তাঁহাদিগকে বলিব যে তাঁহাদের আলস্য নিশ্চেষ্টা হইতেই সে কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ভগবানের রাজ্যে কার্য্যের অভাব নাই। জাগ্রত হইয়া কাজ খুঁজিয়া লইলেই পাইবে—দীর্ঘকাল ঘুমাইয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে স্বপ্নাবেশে কাজ নাই কাজ নাই করিয়া চীৎকার করিলে নিজেদের আলস্যপ্রিয়তা প্রভৃতি প্রকাশ পায়, কার্য্যের অভাব ঘটে না। যাঁহারা কার্য্যের অভাবের কথা বলেন, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি এই যে, যে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে দেশে ভীষণ রোগসমূহের অবাধ গতি চলিয়াছে, সেই রোগ নিবারণের কল্পে এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাঁহাবা কি নিজেদের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন? এই যে দেশে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নানা প্রকারে নিপীড়িত হইতেছে, তাহাদিগকে উঠাইয়া লইবার জন্য জ্ঞানধর্ম্মের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের কয়জন প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন? এই যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেই বিলাসিতা প্রভৃতি দোষগুলি বিষকীটের ন্যায় প্রবেশ করিতেছে, ব্রাহ্মসমাজের ছেলেমেয়েরা অল্পে অল্পে ধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে, কয়জন ব্রাহ্ম তাহাই দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন? যাঁহারা বলেন যে ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে, তাঁহারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাজ প্রার্থনা করুন, তাঁহাদের কার্য্যের একমুহূর্ত্তেরও জন্য অভাব হইবে না। যখন কার্য্যের অভাব নাই সপ্রমাণ হইতেছে, তখন কার্য্যের অভাবের জন্য যাঁহারা আক্ষেপ করেন ও নিরাশার তপ্ত নিশ্বাস নিক্ষেপ করেন, তাঁহাদের আর নিরাশার কোনই কারণ রহিল না।

ব্রাহ্মসমাজের লোকবলের অর্থবলের অল্পতাও অনেকের মনে ব্রাহ্মসমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সম্বন্ধে নিরাশা আনয়ন করে। সাধারণত মানুষ দুর্ব্বলহৃদয় এবং পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে চায়। এই কারণে মানুষ স্বভাবত একটু হৈ চৈ দেখিতে শুনিতে ভালবাসে, একটু জনতাপ্রিয় হয়। এই কারণে, যে সমাজে অনেক লোকজন যাইতেছে আসিতেছে, যে সমাজে শত শত লোক অগণিত মুদ্রা উপহার দিতেছে, অধিকাংশ লোকেই মনে করে যে সেই সমাজই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতেছে এবং সেই সমাজেরই স্থায়িত্ব ও উন্নতির আশা অধিক। কয়জন লোক ধর্ম্মের উপর সত্যের উপর অটল বিশ্বাসে দণ্ডায়মান হইয়া আবশ্যক হইলে সকল সংসারকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়? যাঁহারা লোকবল প্রভৃতির অল্পতার কারণে নিরাশা পোষণ করেন, তাঁহাদের কথার কিরূপ মূল্য দিব জানি না। তাঁহারা আসলে ধর্ম্মের উপর সংসারকে না দাঁড় করাইয়া সংসারের উপর ধর্ম্মকে দাঁড় করাইতে চাহেন। তাঁহারা ধর্ম্মের একমুখী ভাব ও অবিচলিত মহাশক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা এমন ধর্ম্ম চাহেন, যাহা অবলম্বন করিলে সাংসারিক সুখ কিছুমাত্র ত্যাগ করিতে হয় না, প্রত্যুত সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি হয়। তাঁহাদের নিকট সাংসারিক সুখই হইল সর্ব্বস্ব, ধর্ম্ম হইল অবান্তর বিষয় এবং সাংসারিক সুখসাধনেরই একটী উপকরণ। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে যাহা সকল প্রাণীর জাগরণের কারণ হয় অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে সাধারণ মনুষ্য সুখ পাইবার প্রত্যাশা করে তাহাই ধর্ম্মসাধকের পক্ষে রাত্রি হয়, ধর্ম্মসাধক তাহার মধ্যে কোন সুখই দেখিতে পান না, এবং সাধারণ মনুষ্য যে সকল বিষয়ে অন্ধকার দেখেন, সুখের কোনই সন্ধান পান না, সেই সকল বিষয়েই সাধক জাগ্রত হইয়া উঠেন এবং আশা ও আনন্দ প্রাপ্ত হন। এটা অবশ্য ঠিক কথা যে এরূপ সাধকের সংখ্যা অল্প। কিন্তু আমাদের জানিয়া রাখা ভাল যে একটী সাধকের ইঙ্গিতে শতসহস্র সাধারণ মানব পরিচালিত হইতে পারে। তাই আমরা, যাঁহাদের প্রাণ ব্রাহ্মসমাজে লোকবল ও অর্থবলের অভাবের কারণে নিরাশায় ও নিরানন্দে ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তাঁহাদিগকে ভগবানের নামে খুবই সাহস দিতে পারি যে তাঁহাদের নিরাশার কোনই কারণ নাই।

ব্রহ্মের মঙ্গলস্বরূপে আমাদের বিশ্বাস যদি স্থির থাকে, তবে আমাদের অন্তরে নিরাশা কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না। যে পরব্রহ্মে জগতের সকল উন্নতির পরিসমাপ্তি, সেই সত্য পরব্রহ্মকে যদি আমরা অন্তরের সহিত ধরিয়া থাকি, তবে ব্রাহ্মসমা-

জের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেই তাঁহার উপাসনা, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই যে বীজমন্ত্র আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, ইহাই আমাদের অমৃতত্ব লাভের একমাত্র সেতু এবং সকল উন্নতির একমাত্র মূল। সেই বীজমন্ত্রকে কৌস্তুভমণির ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমাদিগকে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে। এইরূপ করিতে যত্নবান হইলে আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজে আসা সার্থক হইবে। কেবল নিশ্চেষ্ট হইয়া হা-হুতাশ করিলে কোনই ফল হইবে না। কেবল অর্থ, কেবল মানমর্য্যাদা প্রভৃতির পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, কেবল কোলাহল কলরবে মত্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের অভাব বলিয়া নিরাশার অগ্নিতে আপনাকে দগ্ধ করিলে কোনই ফল নাই। উত্থান কর, নিজেকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত কর, সন্তানগণকে বাল্যাবধি জ্ঞানধর্ম্মে চলিবার পথ প্রদর্শন কর। তবেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা তোমার নিকট স্বতপ্রকাশিত হইবে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর আমাদের সহায় আছেন। নির্ভয় হও। যিনি এই অগণিত জগত সংসারকে নিশ্বসিত করিয়াছেন, তিনি যখন আমাদের পিতা, বলদাতা গুরু, তখন আমাদের নিরাশা নিরানন্দ কোথায়, কোথায় বা আমাদের দুঃখ দৈন্য ?

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

বেঁচে থেকে মরার চেয়ে
মরণ সে তো ভালো ;
পরের মুখে চাওয়ার চেয়ে
আপনি জাগাই ভালো।

ওরে বুকে প্রদীপ আছে
জ্বালা রে তুই জ্বালা—
সূর্য্য তারাও মুরছিবে
হেরে সে অরূপ আলা।

ওরে তুই যে আছিস সবার উপর
এইটুকু জান্ মনের ভিতর
বিজলী মালা ঝলকিবে
নাম্‌বে নিখিল চরাচর।

ওরে রাখিস্‌নে তুই ভাবনা
অজানাকে পাবনা
সে যে আপনি এসে দেখা দিবে
মোরা অন্য কোথাও যাবনা॥

শান্ত ভাব।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন-শাস্ত্রী)

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের সহিত শান্তভাবের বিশেষ পার্থক্য আছে। উক্ত চারি ভাবের প্রকৃতি ও শান্তভাবের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। দাস্যাদি চারি ভাব যেন স্রোতস্বিনী নদী ; অনবরত চলিতেছে, সর্ব্বদাই চঞ্চল, সর্ব্বদাই প্রাণের বস্তু খুঁজিতেছে ও তাহার পানে ধাবমান হইতেছে ; প্রাণের বস্তুকে না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থির থাকিতে পারিতেছে না—পাইয়া যদি কোন কারণ বশত কিছুকালের জন্য হারাইয়া ফেলে তবে বিরহে অধীর হইয়া পড়ে। পাইয়াও স্থির থাকিতে পারে না,—হাস্য, নৃত্য, লীলা প্রভৃতি নানা প্রকারের ভাববিকাশ হইতে থাকে। শান্তভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা প্রশান্ত, তরঙ্গাদিশূন্য স্থির অচঞ্চল মহাসমুদ্র বা নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপ। ইহাতে বিকার নাই, চঞ্চলতা নাই, প্রাণের বস্তুকে পাইবার জন্য অস্থিরতা নাই, পাইয়াও হাস্য নৃত্যাদিভাবে বিকাশ নাই, এ অতি শান্ত গম্ভীর আনন্দ।

সকল ভাবের মূলেই আত্মবিসর্জ্জন আছে। আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন কোন ভাবেরই বিকাশ হয় না। আপনাকে প্রাণের বস্তুতে ডুবাইয়া না দিলে প্রকৃত আনন্দলাভ হয় না। যতক্ষণ 'আমি' থাকিবে ততক্ষণ স্বার্থ থাকিবে। যতক্ষণ স্বার্থ ততক্ষণ দুঃখ—আনন্দ নাই। আমিই দুঃখের কারণ; সুতরাং আনন্দ পাইতে হইলে আমি-কে বিসর্জ্জন করিতে হয়। আমি-কে অন্যভাবে বিসর্জ্জন করিবারও উপায় যোগাদি দর্শনশাস্ত্রে দেখান হইয়াছে, কিন্তু ভক্তিধর্ম্মে আমি-কে প্রাণের বস্তুতে ডুবাইয়া দিয়াই বিসর্জ্জন করা হয়। আবার এই ভক্তিধর্ম্মে দাস্যাদি

চারিভাবে আমি যেভাবে বিসর্জ্জিত হয় শান্তভাবে সেরূপে বিসর্জ্জিত হয় না। দাস্যাদি চারিভাবের আমি, পতঙ্গ যেমন অগ্নি দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া তদুপরি লাফাইয়া পড়ে, তেমনি আপন আপন প্রাণের বস্তুতে আনন্দে অধীর হইয়া ডুবিয়া যায়, কিন্তু শান্তভাবের আমি তাহা করে না। শান্তভাব প্রাণের বস্তু চায়, প্রাণের বস্তু পাইবার জন্য অন্য সব ভুলিয়া যায়। অন্য চিন্তা যখন হৃদয় হইতে অপসৃত হইল, যখন হৃদয় শূন্য হইল, স্বার্থপরতা চলিয়া গেল, তখন সেই প্রাণের বস্তু সেই আনন্দের সমুদ্র আসিয়া তাহার শূন্য হৃদয় পরিপূর্ণ করেন, তখন সে সেই আনন্দজলধিতে সন্তরণ করিতে থাকে। শান্তভাবের আমি এইরূপে প্রাণের বস্তুতে ডুবিয়া গিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে। ইহাতে হা-হুতাশ নাই, বিচ্ছেদ নাই, মান নাই, কলহ নাই, উন্মত্ততা নাই—ইহা অতি শান্তিপূর্ণ ভাব। এইভাবে বিবেক ও বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া একে একে সকল কামনা সকল ইচ্ছা সর্ব্ব প্রকারের মায়াকে বিসর্জ্জন দিলে হৃদয়টী আবর্জ্জনাশূন্য হয়; তখন যে আবর্জ্জনা দ্বারা সেই পরমানন্দ ঢাকা থাকে সেই আবরণ সরিয়া যায়, পরমানন্দ প্রকাশ হইয়া পড়ে। হৃদয় কামনাদিশূন্য হইলে রজ ও তমোগুণের কার্য্যও বন্ধ হয় সুতরাং দুঃখ অলসতা প্রভৃতি চলিয়া গিয়া কেবল সত্ত্বময় শান্তভাবের উদয় হয়।

অন্যান্য ভাবেরও কামনাদি লোপ হয়। কামনাদির লোপ না হইলে কোন ভাবেরই বিকাশ সম্ভব নহে। তবে শান্তভাবে ও অন্যান্যভাবে কামনার বিলোপ সাধনের প্রণালী স্বতন্ত্র। অন্যান্যভাবে বিবেক ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হয় না। প্রাণের বস্তুর প্রতি আকর্ষণের এতই বল যে সে আর সবকে ভুলাইয়া দেয়। যেমন মা পীড়িত সন্তানের পার্শ্বে বসিয়া নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা কষ্ট প্রভৃতি কিছুতেই লক্ষ্য না রাখিয়া সন্তানের শুশ্রূষা করিতে থাকেন, সেইরূপ একটা প্রবল ভালবাসা আসিলে অন্যান্য সামান্য সুখ দুঃখ, কামনা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি আপনা হইতেই সরিয়া যায়। ভগবানের প্রতি এরূপ একটা প্রবল ভালবাসা জন্মিলে আর বিবেক ও বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কামনাদিকে বিসর্জ্জন দিতে হয় না।

বিবেক ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কামনাটি বিসর্জ্জন করা সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষ শিক্ষার ও অভ্যাসের প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ভগবানের প্রতি উপরোক্ত দাস্যাদি চারি ভাবের কোন এক-ভাবের প্রবল ভালবাসা পাওয়াও সকলের ভাগ্যে কেন, অনেকের ভাগ্যে ঘটে না দেখা যায়। ঐরূপ একটা ভালবাসা পার্থিব কোন শিক্ষা দ্বারা হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। তাহা কতকটা প্রকৃতিগত সংস্কারের উপর নির্ভর করে; তবে পার্থিব শিক্ষা যে কিছু সাহায্য না করিবে তাহাও বোধ হয় না। বীজ থাকিলে পার্থিব শিক্ষাও কতকটা অগ্রসর করিয়া দিবে।

শান্তভাব লাভ করা যদিও কঠিন তথাপি উহা পাইবার জন্য প্রত্যেকে আশা করিতে পারে, কেননা উহা শিক্ষার উপর নির্ভর করে এবং ঐরূপ শিক্ষা ও শিক্ষকের তেমন অভাব হয় না। কিন্তু দাস্যাদি ভাব কতকটা সংস্কারের উপর নির্ভর করে, সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব কিনা বলিতে পারি না। যাহার পক্ষে তাহা সম্ভব তাহার পক্ষে সেই সকল ভাবের ভিতর দিয়া ভগবানকে পাওয়া অতি সুগম; বিবেক বৈরাগ্যাদি সাহায্যে কঠোর সাধন করিতে হইবে না। এ ভাবের পথিক প্রবল আকর্ষণে তীব্রবেগে চলিয়া যাইবে—পথিমধ্যে শত বাধা তাহাকে আটকাইতে পারিবে না। তাহার প্রাণের বাঁশী যখন বাজিয়া উঠিবে, তখন যমুনা উজান বহিতে থাকিবে,—মনের ভিতরে জোয়ার আসিবে—তখন পর্ব্বত প্রান্তর বন জঙ্গল ব্যাঘ্র ভল্লুক, কিছু মনে থাকিবে না; তখন লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, মান, অভিমান বাসনা, বিবেচনা কিছুই থাকিবে না; সেই প্রবল স্রোতে সব ভাসিয়া যাইবে, তখন—

"যাক মান যাক কুল, মনতরী পাবে কূল,
চল ভাসি প্রেমনীরে ভেবে ও চরণ"

বলিয়া সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া সেই প্রেমসমুদ্রে সাধক সন্তরণ করিতে থাকিবে।

দাস্যাদি চারিভাবের, বিশেষত মধুর ভাবের এইরূপ কার্য্য। মহাপ্রভু চৈতন্য প্রভৃতি মহা মহা ভক্তগণ এই সকল ভাবে পরিচালিত হইয়া ভগবৎ-প্রেমে গদ-গদ হইয়া আনন্দে কখনও হাসিতেন, কখনও নাচিতেন, কখনও কাঁদিতেন—বাহ্যজ্ঞান কিছু থাকিত না।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয় নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো
দ্রুতচিত্তবৃত্তিঃ।
হসত্যসৌ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি
লোকবাহ্যঃ॥"

শান্তভাব সে প্রকারের নহে। উহাতে উন্মাদ, হাসি, কান্না, নৃত্য ইত্যাদি কিছুই নাই। উহা অতি শান্তিময় ভাব। গভীর সমুদ্র, কিন্তু তরঙ্গ ও আবর্ত্তশূন্য। ঐ যে মহর্ষি গিরিশৃঙ্গে বসিয়া ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে শান্তিপূর্ণ আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হইতেছেন, দুনয়নে প্রেমধারা বহিয়া যাইতেছে, উনি শান্তভাবাপন্ন। ঐ যে ভিক্ষুক বিদুর রাজ্যসিংহাসনাদি কামনাশূন্য, সাংসারিক সুখে বীততৃষ্ণ হইয়া ভিক্ষা মাত্র অবলম্বন করিয়া পরম সন্তোষ সহকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, আপনার যাহা কিছু আছে তাহাই ভগবানকে নিবেদন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন, উনিও শান্তভাবাপন্ন। যিনি যে কোন ভাবই অবলম্বন করুন না কেন, ভগবানের কাছে উপনীত হইতে পারিলে যে পরম আনন্দ লাভ হয় তাহা সকল ভাবেই সমান। ভাবগুলি ভগবানের কাছে যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। যিনি যে পথে যান না কেন সকলেই সেই অনন্ত সমুদ্রে যাইয়া পড়িবেন, তখন সব সমান।

কাব্যে দুঃখের প্রতিধ্বনি।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি যাহাই হউক, সুখ ও দুঃখ লইয়া উহা গঠিত। জীবনে সুখ ও দুঃখ ছায়ার ন্যায় মানবের সঙ্গী—এই উভয়ের প্রভাব তাহার প্রতি কার্য্যে ও চিন্তায় প্রতিভাত। কখনও মানব আশার বিমানে আরোহণ করিয়া সুখপবনহিল্লোলে কল্পনার অমরাবতীতে পরিভ্রমণ করিতেছে, আবার কখনও বা ভীত, ত্রস্ত, সংসার-সমরাঙ্গনে পরাস্ত, জীবনে বিফলতার তীব্র কশাঘাতের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, সুধা গরল, রৌদ্র মেঘ, মানব জীবনে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এই সকল বিপরীত ভাবদ্বন্দ্ব ও তাহাদের মীমাংসা উৎকৃষ্ট কাব্যের বিষয়। জীবনের এই সকল জটিল সমস্যার মীমাংসা মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণ তাঁহাদের মনোবিজ্ঞানে সম্যক ভাবে বুঝাইতে পারেন না। এই সকল সমস্যার বাস্তবিকই কোনও নাম বা সংজ্ঞা নাই। একমাত্র কবি তাঁহার সহানুভূতির সুধাবর্ষণে সেই জটিল তত্ত্বগুলিকে সরল করেন।

অনেক উৎকৃষ্ট কাব্যের বিষয় মানবজীবনের দুঃখের কাহিনী। জীবনসমুদ্র মন্থনে যে দুঃখরূপ হলাহল উঠিয়াছে—নীলকণ্ঠের ন্যায় কবি তাহা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। এই বিষপানেই বা আবার কত বিলাস। সংসারজ্বালায় জর্জ্জরীভূত কবি শেলী হৃদয়বীণার করুণ তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া গাহিতেছেন—

"জীবনে মোদের সেইত সুখের গান
ঝঙ্কারে যার উঠে অনিবার
গভীর বেদনা-তান।"

তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য্যের মধ্যে ধ্যান মগ্ন "অরফিয়স" প্রাণ-প্রিয়া পত্নীর শোক হৃদয়ে চির জাগরূক রাখিয়া বাঁশরীতে করুণ রাগিণী আহ্বান করিতেছেন আর প্রাণময়ী প্রকৃতি সহানুভূতির পবিত্র পীযূষধারায় আর্দ্র হইতেছেন। "ইউরিডাইসে"র শোকই "অরফিয়সের" জীবন—জীবনে তাঁহার অন্য সত্ত্বা নাই। এই দুঃখকেই তিনি চিরদিনের জন্য জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছেন—শোকই তাঁহার চিত্তবিনোদন।

সাংখ্যের মতে জীবন দুঃখময়—আবার সেই দুঃখ ত্রিবিধ। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক। যে কোনও অবস্থায় মানব থাকুক না কেন, এই তিন প্রকার দুঃখের অন্তত একটী তাহার সঙ্গে থাকিবেই থাকিবে। এই মায়িক দুঃখ মানবকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না। সুখের সময়েও হৃদয়ে ভাবী দুঃখের ছায়াপাত হয়। বিধবা জননী পুত্রের শুভ পরিণয় দিনে অমঙ্গল অশ্রুজল বস্ত্রাঞ্চলে গোপন করেন। সুখের আলোকমালায় সুসজ্জিত হর্ম্ম্যে কেমন করিয়া এই অশ্রুজল—এই চিরসঙ্গী বিষাদ লুক্কায়িত থাকে তাহা অতীব রহস্যজনক। কবি কীট্‌স এই বিষাদকে চিনিতে পারিয়া বলিতেছেন—

"কি আশ্চর্য্য ! আনন্দের লীলা নিকেতনে
বিষাদ লুকায়ে রয় বক্ত্র-আবরণে।"

মানবচিন্তা ও অনুভূতির স্তরভেদে এই ত্রিবিধ দুঃখের একটী না একটী মানবসহচর হইয়া থাকে।

পৃথিবীর দুঃখ—যাহা নিজের কর্ম্মফলে সংঘটিত হইয়াছে, যাহা আমি চেষ্টা করিলে অন্যরূপ হইতে পারিত কিন্তু আমার দোষেই যাহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে—এই আধিভৌতিক দুঃখ সংসারী ব্যক্তিমাত্রকেই ভোগ করিতে হয়। আধিদৈবিক দুঃখ দৈবের আকার ধারণ করিয়া অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করে। প্রিয়জন বিয়োগে যে দুঃখ তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা যাইতে পারে। তৃতীয় প্রকার দুঃখের নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। ইহার কারণ বাস্তবিকই অজ্ঞেয়—মানবাত্মায় ইহার বাস। বাহিরে দুঃখের কোন কারণ নাই, সব সুন্দররূপে চলিতেছে কিন্তু তবু দুঃখে হৃদয় পরিপূর্ণ। মানবাত্মা অনন্তকাল ধরিয়া কি যেন চাহিতেছে তাহা পায় নাই, কি যেন অভাব তাহার চিত্তে চির জাগরূক রহিয়াছে। জীবনের সেই চরম সার্থকতার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই বলিয়া যত দুঃখ যত বেদনা। সে অভাব, সে বেদনা যাইবার নয়, সে অশ্রুজল শুকাইবার নয়, সে মেঘ কাটিবার নয়—অন্তরে অন্তরে চিরপ্রচ্ছন্ন ভাবে এই শোকধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই দুঃখই আধ্যাত্মিক দুঃখ। মানব যদি কোন দিন তাহার যথার্থ অনুসন্ধানের বস্তুকে প্রাপ্ত হয়—তবেই এ দুঃখ অপসারিত হইবে, নচেৎ নহে।

জগতে অনেক শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে উপরোক্ত দুঃখ ত্রয়ের কোনটী না কোনটীর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মহাকবি সেক্ষপীয়রের বিয়োগান্ত নাটকগুলি প্রথমোক্ত দুই প্রকারের দুঃখ হইতে সৃষ্ট। ভারতীয় নাটকগুলি বিয়োগান্ত নহে বটে, কিন্তু সংস্কৃত অনেক মহাকাব্যে বিষাদের একটী করুণ ঝঙ্কার হৃদয় আর্দ্র করিয়া দেয়।

ম্যাকবেথের দুঃখ স্বকীয় কর্ম্মফল হইতেই উৎপন্ন। উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া তিনি যে বিষ পান করিয়াছিলেন, জীবনে কখনও তাহা পরিপাক করিতে পারেন নাই—তাঁহার সমস্ত মনের মধ্যে সেই বিষক্রিয়া বিকার উপস্থিত করিয়াছে,—বিষাক্ত স্মৃতি তাঁহার মনের নিকট ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—তিনি ভুতোপসৃষ্টের ন্যায় বলিতেছেন—

"নিদারুণ মনোব্যথা পার কি হরিতে
স্মৃতি হ'তে উপাড়িতে বিষাদের মূল ?"

তাঁহার পত্নীও সেই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিতা। কোথায় গেল সে অদম্য উৎসাহ ? ভাদ্রের ভরা-নদীর স্রোতের ন্যায় প্রারম্ভের সে তেজ কোথায় ? সব গিয়াছে—কর্ম্ম কর্ম্মফল প্রসব করিয়াছে ! আজ সেই তেজস্বিনী যুবতী কর্ম্মক্লান্তা—নিশীথ রজনীতে স্বপ্নসঞ্চরণ করিতে করিতে আপন মনে স্বকীয় দুষ্কার্য্যকাহিনী বিবৃত করিতেছেন ! তাঁহার একটী দীর্ঘনিশ্বাসে মনে হইতেছে যেন অন্তরাত্মা ফাটিয়া বাহির হইবে।

আবার জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া ম্যাকবেথ যখন জীবনসঙ্গিনীর মৃত্যুসম্বাদ শ্রবণ করিলেন—সমস্ত ব্যর্থ জীবনের স্মৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইল। বিগত জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার মুখ হইতে এই কয়টী কথা বাহির করিয়া দিল—

"কল্য, কল্য, কল্য ! ! !
ধীরপদে চলে দিন হয় লয় প্রারব্ধলিপির শেষাক্ষরে
গতকল্য একত্র হইয়া চলে যায় পথ দেখাইয়া
মিশাইতে শ্মশানধূলায় !
নিভে যা নিভে যা ওরে ক্ষণস্থায়ী দীপ
চলচ্ছায়া মাত্র এ জীবন !
ক্ষুদ্র অভিনেতা স্বীয় অভিনয় সময়ে যেমন
মদগর্ব্বে চলে রঙ্গস্থলে সঞ্চালিয়া হস্তপদ
পরে তার তত্ত্ব কেহ নাহি জানে
বাতুলের গল্প এ জীবন—অর্থহীন, মাত্র বহু বাক্য
আড়ম্বর !"

ম্যাকবেথ ও তাঁহার পত্নীর দুঃখ আধিভৌতিক, কেননা উহা তাঁহাদের স্বকীয় কর্ম্মের বিষময় বিপাক ! কিন্তু উহার গভীরতা কি অতলস্পর্শী কি মর্ম্মান্তিক !

"দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা নতু ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃকায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্ ॥"

.... এই আধিভৌতিক দুঃখের কাহিনী কাব্যে বিরল নহে। বায়রন, শেলী প্রভৃতি কবিবর্ণিত দুঃখ এই শ্রেণীরই।

বঙ্গদেশের আধুনিক অনেক কবি দুঃখের কবি। হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দদাস প্রভৃতির কবিতার অন্তরে অন্তরে দুঃখের একটী করুণ-ধারা প্রবাহিত আছে। ইহাদের মধ্যে আবার হেমচন্দ্রের বীণার ঝঙ্কার মর্ম্মন্তুদ বিষাদে পূর্ণ। কি দেশ সম্বন্ধে, কি আত্ম সম্বন্ধে সকল কবিতাই তাঁহার হৃদয়ের করুণরাগরঞ্জিত!—তাঁহার "পদ্মের মৃণালে" ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জাতি সম্বন্ধে কি গভীর দুঃখের অনুভূতি! তাঁহার রোদন শুধু স্বজাতির নিমিত্ত নয় সমগ্র মানবজাতির পরাধীনতার জন্য!— "তোর তরে কাঁদি অয়ি ফরাসী জননি!" বায়রন, শেলী, কীট্‌স্ প্রভৃতি দুঃখবাদী কবির ন্যায় তিনিও সংসার এবং জীবনের দুঃখবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। জীবনের মধ্যাহ্নকালে তিনি করুণস্বরে গাহিয়াছেন—

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিতরে
হ'য়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিতরে!

আধিদৈবিক দুঃখের নিদর্শন সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের কাব্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। "হ্যামলেটের" দুঃখ আধিদৈবিক—দৈব দুর্ব্বিপাকমূলক। যদি ঐ নিদারুণ ঘটনা তাঁহার জীবনে না ঘটিত, তাহা হইলে তাঁহার জীবন অন্যরূপ হইতে পারিত। আধ-বিকশিত কুসুমলতার মূলে বজ্রাঘাত হইলে সে লতা যেমন ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়—হ্যামলেটের জীবনের রসও তেমনি শুকাইয়া গিয়াছে। অন্যের নিকট মানব যেমন, জীবন যেমন, জগৎ যেমন, হ্যামলেটের নিকট তাহা নহে। পৃথিবী তাঁহার নিকট 'রসশূন্য মরুভূমি।' চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রমালা-খচিত সুন্দর নভোমণ্ডল 'কুৎসিৎ ও দুর্গন্ধপূর্ণ বাষ্প-সমূহের সমবায় ব্যতীত আর কিছুই নহে।' বিধাতার সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ মানব—বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্যে যিনি দেবসদৃশ তাহাও তাঁহার নিকট মাত্র "মৃত্তিকাসার"। নরনারী তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করে না। পাঠক এমন আর কোথাও কি দেখিয়াছেন? হ্যামলেটের বিশেষত্ব 'হ্যামলেট' স্বয়ং। তিনি সমস্ত স্বীকার করিয়াও কিছুই স্বীকার করিতেছেন না। তাঁহার জীবনের সুধাপাত্র গরল-স্পৃষ্ট হইয়াছে। জীবনে সৌন্দর্য্য নাই, প্রলোভন নাই, মরণেও বিভীষিকা নাই—তাই জীবনসাগরের কূলে দাঁড়াইয়া তিনি কেবলই চিন্তা করিতেছেন—

"রাখিব জীবন কিম্বা দিব বিসর্জ্জন
এ প্রশ্ন হৃদয় মম করে আলোড়ন।"

কারণ জীবনে ও মরণে তাঁহার নিকট বিশেষ কোনও ভেদ নাই, কেবল একটী জ্ঞাত আর একটী—

"অজানা প্রদেশ, কালগর্ত্ত হ'তে যার
পান্থ আর না আসে ফিরিয়া।"

গ্রীক্ ট্রাজেডীর মূল সূত্র প্রতিকূল ভাগ্যের বিরুদ্ধে মানবের সংগ্রাম। গ্রীক পুরাণ অনুসারে দেব দেবীগণ মানবের সুখদুঃখবিধাতা। "সোফোক্লেস" প্রভৃতি গ্রীক নাট্যকারগণের নাটকেও আমরা এই প্রকার আধিদৈবিক দুঃখের কাহিনী বিবৃত দেখিতে পাই। ইহা উচ্চ শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হতাশাপূর্ণ হৃদয়ের তীব্র আর্ত্তনাদ।

কালিদাসের রঘুবংশে "অজবিলাপ" ও কুমার সম্ভবে "রতিবিলাপ" আধিদৈবিক দুঃখোৎপন্ন বিষাদঝঙ্কারের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যে মালা করাল কৃতান্তের দূতরূপে আকাশ হইতে পতিত হইয়া ইন্দুমতীর প্রাণ অপহরণ করিয়াছে, মহারাজ অজ পুনঃ পুনঃ সেই মালা নিজের হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন কিন্তু তাহাতেও দেখিলেন যখন তাঁহার জীবন গেল না, তখন তিনি বিধাতার কার্য্য ও ইচ্ছা যে তাঁহার প্রতিকূল তাহাই বুঝিলেন। তিনি বলিতেছেন—

"স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহা হৃদয়ে কিং নিহিতা
ন হন্তি মাম্।
বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া॥
অথবা মম ভাগ্যবিপ্লবাদশনিঃ কল্পিত এষ বেধসা।
যদনেন তরুর্ন পাতিতঃ ক্ষপিতা তদ্বিপটাশ্রিতালতা॥

"হায়, ওরে মানব হৃদয়!
বার বার কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়, নাই নাই!"

সংসারসমরে মানবের এই যে পদে পদে পরাজয়, যাহা চাই তাহা পাই না, যাহা পাই তাহাও দুদণ্ডের বেশী স্থির থাকে না, অনিত্য, চঞ্চল, অচিরস্থায়ী, পাইতে না পাইতেই ফুরাইয়া যায়, আঁখি পালটিতে আর থাকে না; এই ব্যর্থতা এই বেদনা এই ব্যথা ইহাই কারুণ্যের মধ্য দিয়া শত শত যুগ, শত

শত জন্ম ধরিয়া মানবের অনন্ত পথের সাথী হইয়া চলিয়াছে।

দুঃখের তৃতীয় স্তর আধ্যাত্মিক দুঃখ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না—শরতের শ্যামল ক্ষেত্রের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কবি টেনিসন্ অশ্রুজলে নয়ন সিক্ত করিয়া গাহিতেছেন—

"অলস নয়নাসার!
আমি জানি না'ক হায়, কেন গো ঝরিছে
আঁখিবারি অনিবার!
মরমের কোন্ গভীর ব্যথায়
হৃদয়ে উঠিয়া আঁখিকোণে ধায়
(যবে) শরতের মাঠে চোখ দুটী চায়
অমনি গো ঝরে ধার
সে দিনের কথা পড়ে যায় মনে
(যাহা) আসিবে না ফিরে আর !!"

আমার দিন ছিল—সে দিন গিয়াছে। আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি! কোন্ স্বর্গ হইতে মলিন মর্ত্ত্যের এ ধূলায় পতিত হইয়াছি, আবার কেমন করিয়া সেখানে ফিরিয়া যাইব। প্রকৃতির গভীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হয় ইহাই প্রকৃত সুখ, তবে সে গভীর আনন্দসঙ্গীতে যোগ দিতে পারি না কেন? মনে হয় আমি কি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি, আমি ত চিরদিন এমন ছিলাম না। বিশ্বে আনন্দের তরঙ্গোচ্ছ্বাস যে শত ধারায় প্রবাহিত হইতেছে, তাহার কণামাত্র আভাস প্রাপ্ত হইয়া আমি আমার দুঃখ কি বুঝিতে পারিতেছি। আমি বুঝিতেছি সংসার আমার মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমাকে এই মোহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ইহাই আধ্যাত্মিক দুঃখ—ইহারই নাম আত্মোদ্বোধন! এই আধ্যাত্মিক দুঃখ বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ—ভক্ত বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিতরমণীসমাজে
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।"

মানবের ক্ষুদ্রত্ব মানব যখন বুঝিতে পারেন—জগতের নশ্বরত্ব বুঝিয়া যখন তাঁহার প্রকৃত আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়—তখনই আধ্যাত্মিক দুঃখ আমাদের হৃদয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি কত ক্ষুদ্র—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কি বৃহৎ!

এই বৃহৎকে দেখিবার, বিপুলকে জানিবার যে ব্যাকুল বাসনা, "কোন্ পথে গেলে পরে আমি মিলে দেমা বলে"—এই আত্মজ্ঞানলালসা আধ্যাত্মিক দুঃখের প্রথম সোপান। আবার এই দুঃখের পরিণতিই বুঝিবা চরম আনন্দ! ভক্ত কবি চণ্ডীদাস সুখদুঃখ একত্র করিয়া ফেলিয়াছেন! কোন্‌টি সুখ কোন্‌টি দুঃখ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিকট—"সুখ দুঃখ দুটী ভাই"! সুখের, আনন্দের অনুসন্ধান করিতে হইলে আগে দুঃখ হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। দুঃখবাদী কবি কীটস দুঃখের মধ্য দিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রকৃত সুখস্থানে উপনীত হইয়াছেন—তিনি বলিতেছেন—

"কোথায় বিরাজে শান্তি?
সেথায়—যেথানে সেই আবাহন
যার লাগি সদা জাগি আছে মন
সে যে গো পরম কান্তি
আত্মার সনে মিশে যাবে কায়
পূর্ণ জ্যোতিতে শোভিব ধরায়
আর ত আমার রবেনা'ক হায়
স্থান কাল বোধ ভ্রান্তি!"

আচার্য্য শঙ্করের সেই বেদবিহিত বচন—সেই "সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং, শিবোঽহং" স্মরণ হইতেছে।

সুখ বা দুঃখ জীবনের পরিণতি নয়—কিন্তু এই দুটী ভাই সমগ্র জীবন ধরিয়া, আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া জীবনের পরিণতির দিকে অগ্রসর করে। মৃত্যু অমৃতের রূপান্তর—দুঃখ সুখের রূপান্তর মাত্র—স্থানভেদে রূপভেদ। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে ও কবিতায় আমরা এই ভাবের লীলা দেখিতে পাই। যখন আমরা আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকি তখনই দুঃখ, নতুবা দুঃখ দুঃখ নহে—"তাঁহার চরণচিহ্ন"। বৈষ্ণব কবিতায় বিরহ,মান প্রভৃতির অশ্রুজলে দুঃখের ছদ্মবেশে পরমানন্দ! রবীন্দ্রনাথ এ সত্য স্পষ্ট অনুভব করিয়া সত্যই গাহিয়াছেন—

"মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ
তোমা হ'তে যবে হইয়া বিরূপ আপনার পানে চাই।"

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

বিষয় প্রবেশ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বয়ং মহাভারতকারের মতে গীতার তাৎপর্য্য কি তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে, ভাষ্যকার ও টীকাকার গীতা সম্বন্ধে গীতার তাৎপর্য্য কি স্থির করিয়াছেন তাহা দেখা যাক্। এই ভাষ্য ও টীকার মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গীতা-ভাষ্য অতিপ্রাচীন বলিয়া সকলের ধারণা। ইহার পূর্ব্বে, গীতার অনেক ভাষ্য ও টীকা যে হইয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু এই সকল টীকা এক্ষণে পাওয়া যায় না বলিয়া, মহাভারতের পর ও শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে—এই কালের মধ্যে, গীতার অর্থ কি ভাবে করা হইত তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার উপায় নাই। তথাপি শঙ্করভাষ্যেতেই এই প্রাচীন টীকাকারদিগের মতের যে উল্লেখ আছে (গী, শাংভা, অ, ২ ও ৩ ইহার উপোদ্‌ঘাত দেখ) তাহা হইতে এইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—আচার্য্যের পূর্ব্বেকার টীকাকারেরা গীতার অর্থ মহাভারতকারের ন্যায় জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়াত্মক—অর্থাৎ জ্ঞান অনুসারেই জ্ঞানী মনুষ্যকে আমরণ স্বধর্ম্মোক্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু বৈদিক কর্ম্মযোগের এই সিদ্ধান্ত শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নিকট মান্য না হওয়ায় তাহা ছাঁটিয়া ফেলিয়া, তাঁহার মতে গীতার তাৎপর্য্য কি, ইহা বলিবার অভিপ্রায়েই গীতা সম্বন্ধে তিনি নিজের ভাষ্য লিখিয়াছেন—তাঁহার ভাষ্যের আরম্ভের উপোদ্‌ঘাতে এই কথা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন। কিংবহুনা, 'ভাষ্য' শব্দের অর্থ এইরূপ;—ভাষ্য ও টীকা, এই দুই শব্দ কখন কখন সমান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু সাধারণতঃ 'টীকা'তে মূল গ্রন্থের সরল অন্বয় করিয়া শব্দের অর্থ সুগম করা হইয়া থাকে; এবং ভাষ্যকার তাহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া, ন্যায্যভাবে সমস্ত গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহার মতে গ্রন্থের তাৎপর্য্য কি ও সেই অনুসারে গ্রন্থের কিরূপ অর্থ করা হইবে, তাহা বলা হইয়া থাকে। গীতা সম্বন্ধে শঙ্কর-ভাষ্যের স্বরূপ এই প্রকারের। কিন্তু গীতার তাৎপর্য্য নিরূপণে আচার্য্য যে প্রভেদ করিয়াছেন তাহার বীজ সূত্রটির প্রতি লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বে একটু ইতিহাস এখানে বলা আবশ্যক। বৈদিক ধর্ম্ম কেবল মাত্র পারিভাষিক পদ্ধতি বিশেষ না হওয়ায় এই ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব কি, এই সম্বন্ধে প্রাচীন কালেও উপনিষদের ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সকল উপনিষদ্ ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হওয়ায় তাহাতে যে সকল বহুবিধ বিচার আছে তাহার মধ্যে কিছু কিছু পরস্পরবিরুদ্ধ কথাও আছে। এই সকল বিরুদ্ধ কথা বাহির করিয়া দিয়া বাদরায়ণ আচার্য্য নিজ বেদান্ত সূত্রে সমস্ত উপনিষদেরই একবাক্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এবং এই জন্য বেদান্তসূত্রও উপনিষদ্‌কে এই বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। এই বেদান্তসূত্রের অন্য নামও আছে, যথা 'ব্রহ্মসূত্র', কিংবা 'শারীরক সূত্র'। তথাপি বৈদিক ধর্ম্মান্তর্গত তত্ত্বজ্ঞানের বিচার উহাতেই পূর্ণ হয় না। কারণ, উপনিষদের অন্তর্গত জ্ঞান প্রায়ই বৈরাগ্যপর অর্থাৎ নিবৃত্তিপর; এবং উপনিষদের একবাক্যতা সম্পাদন করিবার জন্যই বেদান্তসূত্র রচিত হওয়ায়, তাহাতে কোথাও তাত্ত্বিক ভাবে প্রবৃত্তিমার্গ সবিস্তারে প্রতিপাদিত হয় নাই। তাই, প্রবৃত্তিমার্গপ্রতিপাদক ভগবদ্‌গীতা, বৈদিক ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানের এই অভাব যখন প্রথম পূর্ণ করিলেন, তখন উপনিষদ ও বেদান্তসূত্রের অন্তর্গত ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতাসম্পাদক গ্রন্থ ভগবদ্‌গীতা এই হিসাবেই সর্ব্বমান্য ও প্রমাণভূত হইল; এবং পরিশেষে উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র ও ভগবদ্‌গীতা এই তিন গ্রন্থ "প্রস্থানত্রয়ী" এই নাম প্রাপ্ত হইল। "প্রস্থানত্রয়ী"—অর্থাৎ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মিলিয়া দুই মার্গেরই পদ্ধতিযুক্ত তাত্ত্বিক বিচারকারী বৈদিক ধর্ম্মের তিন মুখ্য আধারভূত গ্রন্থ বা স্তম্ভ হইল।

এইরূপে, প্রস্থানত্রয়ীতে ভগবদ্‌গীতার সমাবেশ হইয়া প্রস্থানত্রয়ীর সাম্রাজ্য একত্র স্থাপিত হইলে পর, যে ধর্ম্মমত বা সম্প্রদায় এই তিন গ্রন্থকে অবলম্বন করিত না, কিংবা এই তিনের মধ্যে যাহারা সমাবিষ্ট হইতে পারিত না সেই মত বা সম্প্রদায়কে বৈদিক ধর্ম্মের লোকেরা গৌণ মনে

করিতে লাগিল, অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। পরিশেষে ইহার পরিণাম এইরূপ হইল যে,—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, এবং তাহাদের সহিত যুক্ত সন্ন্যাস কিংবা ভক্তি প্রভৃতি বৈদিক ধর্ম্মের যে যে সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের হ্রাসের পর হিন্দুস্থানে প্রচলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্যেরা প্রস্থানত্রয়ীর তৃতীয় ভাগ ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন। এই সকল সম্প্রদায় বাহির হইবার পূর্ব্বেই, ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া এই যে তিন প্রামাণিক গ্রন্থ এই তিন গ্রন্থকে নিজের নিজের সম্প্রদায়ই সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, অপর সম্প্রদায় ঐ সকল গ্রন্থকে মানিতে সম্মত নহেন,—এইরূপ প্রমাণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কারণ, নিজ সম্প্রদায়ের অবলম্বিত মার্গ ব্যতীত অন্য মার্গও প্রমাণিক ধর্ম্মগ্রন্থে গ্রাহ্য হইয়াছে, এইরূপ স্বীকার করিলে নিজ সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্যের কতকটা লাঘব হয়; এবং এরূপ হওয়া কোন সম্প্রদায়েরই অভীষ্ট নহে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে প্রস্থানত্রয় সম্বন্ধে ভাষ্য লিখিবার এই প্রথা আরম্ভ হইবার পর, বিভিন্ন পণ্ডিত নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ভাষ্যের আধারেই নিজ নিজ টীকা লিখিয়া গীতার্থ প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সেই সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই সেই টীকাই অধিক মান্য হইয়া পড়িল। গীতা সম্বন্ধে এক্ষণে যে সরল ভাষ্য কিংবা টীকা পাওয়া যায় তাহা প্রায়ই এই প্রকারের অর্থাৎ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক আচার্য্য বা পণ্ডিতের রচিত। সেই জন্য মূল ভগবদ্‌গীতাতে একই অর্থ বিষদরূপে প্রতিপাদিত হইলেও, ঐ গীতাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমর্থনকারী, এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে।

এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অর্থাৎ অতিপ্রাচীন যে সম্প্রদায় তাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়, এবং তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে, ঐ সম্প্রদায়ই হিন্দুস্থানে বহুমান্য হইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ৭১০ শালিবাহন শকে জন্মগ্রহণ করেন ও ৩২ বৎসরে তিনি গৃহ প্রবেশ করেন (৭১০-৭৪২), * এইরূপ অধুনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আচার্য্য একজন অলৌকিক জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বকীয় দিব্য শক্তির দ্বারা সেই সময় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত জৈন ও বৌদ্ধ মতের খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমত স্থাপন করিলেন; এবং শ্রৌত স্মার্ত্ত বৈদিক ধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ ভারতবর্ষের চারিদিকে চারি মঠ দাঁড় করাইয়া নিবৃত্তিপর বৈদিক সন্ন্যাসধর্ম্ম কিংবা সম্প্রদায় তিনি কলিযুগে পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত করিলেন, একথা সর্ব্ববিশ্রুত। যে কোন সম্প্রদায়কেই ধর না কেন, স্বভাবতই তাহার দুই ভাগ আছে, প্রথম, তত্ত্বজ্ঞানের ভাগ; দ্বিতীয়, আচরণের ভাগ। প্রথম ভাগে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিচারের দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ কিরূপ নিষ্পন্ন হয় তাহা বলিয়া, মোক্ষ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-দৃষ্টির দ্বারা নির্ণয় করা হইয়া থাকে; এবং দ্বিতীয় ভাগে, ঐ মোক্ষলাভের সাধন কিংবা উপায় বলিয়া দিয়া, এই জগতে মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিবে, তাহার নিরূপণ করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখিলে, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথাটি এই—(১) আমি, তুমি, কিংবা মনুষ্যের চক্ষুগোচর দৃশ্যমান জগৎ—অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তর্গত নানা পদার্থ আসলে সত্য না হওয়ায়, একই শুদ্ধ ও নিত্য পরব্রহ্ম এই সমস্ত ভরিয়া আছেন, এবং তাঁহার মায়াতে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সমক্ষে নানাত্ব অবভাসিত হইয়া থাকে। সেইরূপ (২) মনুষ্যের আত্মাও মূলে পরব্রহ্মরূপই; এবং (৩) আত্মা ও পরব্রহ্মের একতারূপ পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবাত্মক উপলব্ধি না হইলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বলে। কারণ, একমাত্র শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন স্বতন্ত্র ও সত্য বস্তু নাই; যে নানাত্ব চোখে দেখা যায় তাহা মানবী দৃষ্টির বিভ্রম কিংবা মায়িক উপাধি-মূলক অবভাস মাত্র। মায়াও সত্য বস্তু বা স্বতন্ত্র বস্তু নহে; উহাও মিথ্যা। এই সিদ্ধান্তের এইরূপ তাৎপর্য্য। যখন কেবল তত্ত্বজ্ঞানের বিচার করা হয় তখন শঙ্করমতের ইহা অপেক্ষা অধিক আলোচনা করা আবশ্যক হয় না। কিন্তু শঙ্করসম্প্রদায়ের ইহাতেই পূর্ণতা হয় না। শঙ্করসম্প্রদায়ের নৈতিক আচরণের দৃষ্টিতে অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের সহিত এই আর এক সিদ্ধান্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে, চিত্তশুদ্ধি,

---

* আমাদের মতে, শঙ্করাচার্য্যের কাল আরও ১০০ বৎসর পিছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। পরিশিষ্ট ভাগে তাহার প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য।

হইলে পর, ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য, স্মৃতিগ্রন্থাদির বর্ণনানুসারে গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম সকল করা আবশ্যক হইলেও, এই সকল কর্ম্মে চিরকাল প্রবৃত্ত না থাকিয়া, পরিশেষে সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্ম ও জ্ঞান, আলোক অন্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরোধী হওয়া প্রযুক্ত, সমস্ত বাসনা ও কর্ম্ম পরিত্যাগ ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতাই হয় না। পরিশেষে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানেতেই মগ্ন থাকা হয় বলিয়া, এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিকে 'নিবৃত্তি মার্গ' বা 'জ্ঞান নিষ্ঠা' বলা হয়। উপনিষদ্‌ ও ব্রহ্মসূত্রে শুধু অদ্বৈতজ্ঞানই আছে এরূপ নহে, সন্ন্যাসমার্গও আছে অর্থাৎ শঙ্কর সম্প্রদায়ের মুখ্য দুই ভাগেরই উপদেশ আছে, মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে শঙ্কর ভাষ্যে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং ভগবদ্‌গীতারও তাৎপর্য্য তাহাই,—গীতার শঙ্কর-ভাষ্যে ইহা নিরূপিত হইয়াছে (গী. শাং. ভা. উপোদ্‌ঘাত ও ব্রহ্মসূ. শাং. ভা. ২·১-১৪ দেখ) ; এবং তাহাকে প্রমাণ বলিয়া "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে"—জ্ঞান রূপ অগ্নিতে সকল কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায় (গী. ৪. ৩৭), "সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"—জ্ঞানেতেই সর্ব্ব কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় (গী. ৪. ৩৩)—ইত্যাদি গীতার বাক্য সকল প্রদর্শিত হইয়াছে।

সার কথা, বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর, প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে এক বিশিষ্ট মার্গের স্থাপনা করিয়াছিলেন, গীতার তাৎপর্য্য তাহারই অনুকূলে ; এবং পূর্ব্ব টীকাকারদিগের কথাপ্রমাণে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় গীতার প্রতিপাদ্য নহে, প্রত্যুত কর্ম্মই জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন এই যে কথা, ইহা গৌণ হওয়ায় পরিশেষে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞানেতেই মোক্ষ লাভ হয়, শঙ্করসম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্তই গীতাতে ভগবান কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে উপদেশ করা হইয়াছে—ইহা দেখাইবার জন্যই শঙ্কর ভাষ্য লিখিয়াছেন। গীতা সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেকার কোন সন্ন্যাসপর টীকা ছিল কিন্তু তাহা এক্ষণে পাওয়া যায় না ; এইজন্য গীতার প্রবৃত্তিপর রূপটি উঠাইয়া দিয়া তাহাকে নিবৃত্তিপর সাম্প্রদায়িক রূপ প্রদান করা—উক্ত ভাষ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপ বলা যাইতে পারে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরে তাঁহার সম্প্রদায়ের অনুযায়ী, মধুসূদনাদি যে সকল অনেক টীকাকার হইয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়ে, মুখ্যতঃ আচার্য্যেরই অনুকরণ করিয়াছেন। তথাপি পরে, এইরূপ আরো একটি চমৎকার কল্পনা বাহির হইয়াছে যে, অদ্বৈতমতের মূলীভূত মহাবাক্যসমূহের মধ্যে "তত্ত্বমসি"—সেই (পরব্রহ্ম) তুমি (শ্বেতকেতু)—ছান্দোগ্যোপনিষদের এই যে মুখ্য মহাবাক্য—গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহারই বিবরণ আছে। কিন্তু মহাবাক্যের পদসকলের ক্রম বদলাইয়া প্রথমে "ত্বং" ও তাহার পর "তৎ" এবং "অসি" এই সকল পদ লইয়া এই নূতন ক্রম অনুসারে প্রত্যেককে, গীতার আরম্ভ হইতে ছয় ছয় অধ্যায়, ভগবান অপক্ষপাতে সমান সমান বাঁটিয়া দিয়াছেন। গীতা সম্বন্ধে পৈশাচ ভাষ্য কোন সম্প্রদায়েরই নহে, উহা স্বতন্ত্র এবং হনুমান অর্থাৎ মারুতি কর্ত্তৃক লিখিত, এইরূপ কাহারো কাহারো ধারণা। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। ভাগবতের টীকাকার হনুমান পণ্ডিত এই ভাষ্য রচনা করেন এবং উহা সন্ন্যাস মার্গের ; এবং তাহার কোন কোন স্থানে শঙ্কর ভাষ্যের অর্থ শব্দশ প্রদত্ত হইয়াছে। সেইরূপ, পূর্ব্বে ও অধুনা, মারাঠীতে গীতার যে ভাষান্তর কিংবা আলোচনাদি প্রকাশিত হইয়াছে সে সমস্ত প্রায়ই শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ী। অধ্যাপক মোক্ষমূলর কর্ত্তৃক প্রকাশিত "প্রাচ্য ধর্ম্ম পুস্তক মালায়" শ্রীকাশীনাথ পন্ত তেলঙ্গ কৃত ভগবদ্‌গীতার ইংরেজি ভাষান্তরেও অনেকটা শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর সম্প্রদায়ী টীকাকারদিগের অনুকরণ করা হইয়াছে,—এইরূপ মূল ভাষান্তরের সহিত সংযোজিত প্রস্তাবনার শেষে লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গে সঙ্গীতচর্চ্চার অভিব্যক্তি।

(অর্চ্চনা হইতে উদ্ধৃত)

(কস্যচিৎ সঙ্গীতানুরাগিণঃ।)

আমরা বাল্যকাল অবধি শুনিয়া আসিতেছি যে "গানাৎ পরতরং নহি" অর্থাৎ গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর

আর কিছুই নাই। গ্রীসের ইতিহাসে এক সময় গানের শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। একবার যখন গ্রীক সৈন্য শত্রুপক্ষের সম্মুখে জয়লাভে নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল, তখন কেবলমাত্র একটী সঙ্গীতের বলে উৎসাহিত হইয়া তাহারা শত্রুপক্ষ বিধ্বস্ত করত জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিল। এখনও সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিবার জন্য যন্ত্র-বাদ্যের সাহায্য লইতে হয়। সময়ে সময়ে সৈন্যগণ নিজেরাই মিলিত কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে গান করিয়া শ্রম দূর করে ও নিজেদের চিত্তবল বহুগুণে বর্দ্ধিত করে।

সঙ্গীতের এইরূপ শক্তির পরিচয় বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে প্রাপ্ত হইলেও গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই, এরূপ কথা অপর কোন দেশেই শোনা যায় না—একমাত্র ভারতবর্ষেই এই কথার উদ্ভব সম্ভব দেখি। যে দেশে দেবগণের পূজার্চ্চনাতেই গানের উৎপত্তি, যে দেশে আত্মসাধনায় গানের সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগ, সেই ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর কোন্ দেশে এমন সুন্দর কথার উৎপত্তি সম্ভব? পাশ্চাত্য দেশেও ধর্ম্মসঙ্গীত অনেক আছে বটে, কিন্তু গান হিসাবে সেগুলি অন্যান্য গান অপেক্ষা অনেক নিম্ন স্থান অধিকার করে—সঙ্গীতজ্ঞ কলাবিদেরা সেই গানগুলিকে বড়ই হেয় চক্ষে দেখেন।

আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত। ধর্ম্মসঙ্গীত আমাদের মাথার মণি—আমাদের দেশে সঙ্গীতরাজ্যে ধর্ম্মসঙ্গীতের আসন অনেক উচ্চে। ধর্ম্মসঙ্গীত আমাদের পূজা আকর্ষণ করে। আমাদের দেশে জগন্মান্য চতুর্ব্বেদের অন্যতম সামবেদে সঙ্গীত সর্ব্বপ্রথম অঙ্গাঙ্গীভাবে সংরক্ষিত দেখা যায়। বর্ত্তমানে সামবেদ বিশুদ্ধরূপে গান করিতে পারেন এরকম লোক ভারতে পাওয়া যায় কি না আমরা জানি না। কিন্তু আজ বহু বহুবৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পর যখন একবার কাশী গমন করেন, সেই সময়ে কাশীধামে তিনি কয়েকটী বালকের মুখে সামগান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে আমরা শুনিয়াছি যে পরে তিনি অনেক চেষ্টা করিলেও সেরূপ মধুর সামগান আর শুনিতে পান নাই।

সেই প্রাচীন বৈদিককালের পর দুরূহতা ও অন্যান্য নানা কারণে যখন বৈদিকগান জনসাধারণ্যে অপ্রচলিত হইয়া গেল, তখন অবধি অবশ্য ক্রমে অন্যান্য রাগরাগিণীর সাহায্যে গান করিবার রীতি প্রচলিত হইতে লাগিল। অনুমান হয় যে সেই সকল রাগরাগিণী-সম্বলিত গান অনেককাল পর্য্যন্ত দেবারাধনা কার্য্যেই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইত। নটনারায়ণ, কল্যাণ, শ্রী প্রভৃতি প্রাচীন রাগরাগিণীর নামেই আমাদের অনুমানের যুক্তিযুক্ততা সমর্থিত হয় বলিয়া বোধ হয়। কেবল তাহাই নহে—যাহা অপর কোন দেশেই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, তাহা আমাদের এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে সম্ভবপর হইল। বিভিন্ন রাগরাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী কল্পিত হইল।

মুসলমান রাজত্বের সময়ে সেই সকল রাগরাগিণী শুদ্ধভাবে ও মিশ্রিতভাবে গীত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহা আর মাত্র দেবারাধনাতে নিবদ্ধ থাকিল না। সেগুলি ধীরে ধীরে সম্রাট প্রভৃতির এবং তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তবিনোদনের উপায় হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়েই সম্ভবত পিলু, বারোয়াঁ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর রাগিণী এবং ঠুংরি, খেমটা প্রভৃতি সরল ও আশু চিত্তবিনোদক তালসমূহের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরিণামে সর্ব্বপ্রকার রাগরাগিণী বিলাসী ও বিলাসিনীদের উপভোগ্য বলিয়া পরিগৃহীত হওয়াতে তাহা আদিরসপ্রধান প্রেমসঙ্গীতে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই সকল গান দেশকে এতদূর ছাইয়া ফেলিয়াছিল যে, দুর্গাপূজা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সময় ব্যতীত দেশ হইতে ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিবার অভ্যাস বলিতে গেলে একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছিল। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে, কোনও বালক সঙ্গীতসর্চ্চায় মনোযোগ প্রদান করিলেই সে দুর্ব্বিনীত "বয়াটে" ছেলে এবং ভদ্রসমাজে মিশিবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

এ বিষয়ে জনসাধারণেরই বা দোষ দিই কি প্রকারে? বাস্তবিকই এমন এক কাল আসিয়াছিল যখন কোন বালক সঙ্গীত-শিক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলেই তাহাকে হয় অগম্যস্থানে যাইয়া অথবা সর্ব্বপ্রকার মাদকদ্রব্যে অভ্যস্ত ওস্তাদদিগের নিকট গিয়া শিখিতে হইত এবং গান শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে অপরিণত-বুদ্ধি বালকেরা নানা ঘৃণিত কর্ম্মে একে-

বারে ডুবিয়া যাইত। কাজেই জনসাধারণ বালকদিগের সঙ্গীতশিক্ষা একটা দোষের কাজ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। বৎসর কুড়ি পূর্ব্বেও আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে অগম্যস্থানে যাইয়া প্রেমসঙ্গীত শিক্ষা করিবার কারণে গর্ব্ব করিতে শুনিয়াছি। তখন তো ব্রহ্মসঙ্গীতের বহুল প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীত প্রচলনের পূর্ব্বে সঙ্গীতচর্চ্চার অবস্থা চিন্তা করিলে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত রাগরাগিণীতে সম্বন্ধ হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত সকল গীত হইবার প্রথা নিয়মিতরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। সাধারণ উপাসনার দিন স্থির হইবার পূর্ব্বে রামমোহন রায় সমাজে আসিয়া কখনও বা খৃষ্টান বালকগণকে ডাকাইয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক গান করাইতেন, আর কোন দিন বা বিষ্ণুর ওস্তাদ রহিম খাঁর মুখে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পারসী গান শুনিতেন। এইরূপ গান শুনিতে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন সঙ্গী প্রায় সর্ব্বদাই কাছাকাছি থাকিতেন। "যাঁহারা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো জানিতেন না যে কিসের জন্য তথায় আসিয়াছেন। তাঁহারা রামমোহন রায়ের সন্তোষের জন্য, তাঁহার অনুরোধ রক্ষার জন্যই যেন আসিতেন। একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয়। অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানাভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন—ও সব গান কেন, অলখ নিরঞ্জন গাও। সেই অবধি ব্রহ্মসঙ্গীত চলিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে এতটুকুও তখন কাহারো বুঝা হয় নাই যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত গাহিতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাহিতে হইবে।" আমাদের নিকট এখন ইহা উপকথার মত বোধ হইতে পারে, কিন্তু সে সময়ে সঙ্গীত সম্বন্ধে বাস্তবিকই দেশের এইরূপ দুরবস্থা আসিয়াছিল। রামমোহন রায় তাহা হইতে দেশকে উদ্ধার করিলেন, আবালবৃদ্ধবনিতার প্রকাশ্যে গান গাহিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও এ বিষয়ে দেশের অল্প উপকার করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার জীবদ্দশায় যে কোন গুণী কলাবিৎ লোক কলিকাতায় আসুন না কেন, তিনি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে নানাবিধ উপায়ে উৎসাহলাভ না করিয়া দেশে ফিরিতে পারিতেন না। ইহা ছাড়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে গান করিবার জন্য বিশুদ্ধচরিত্র বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্যতীত আরও দুই তিনটী গুণী গায়ক সর্ব্বদাই নিযুক্ত রাখিতেন। সেই সকল গায়কদিগের মধ্যে একটীর নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে—বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ যদুভট্ট। গুণীজনের উৎসাহদানে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ মুক্তহস্ত ছিলেন। একা যদুভট্টই তাঁহার গৃহে আহারাদি ব্যতীত মাসিক এক শত টাকা বেতন পাইতেন।

সেকালে বঙ্গদেশে সঙ্গীতের চর্চ্চা বিষয়ে উৎসাহদানে দেবেন্দ্রনাথের পরিবার অপেক্ষা অন্য কোন পরিবার অধিকতর অগ্রসর ছিলেন কি না জানি না। দেবেন্দ্রনাথ যেমন একদিকে গুণী গায়কদিগকে গান করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন, অপরদিকে তিনি নিজেও বাঙ্গালা ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া সেই গায়কদিগের প্রদত্ত সুরে বসাইয়া ব্রাহ্মসমাজে গান করাইতেন, এবং স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকেও সেই কার্য্যে উৎসাহ দিয়া সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে সিদ্ধহস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার ফলে সঙ্গীত বিষয়ে এবং সঙ্গীতের ভিতর দিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনকল্পে যে কি প্রকার মহান্ নীরব বিপ্লব সাধিত হইল, তাহা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া না দেখিলে আমরা সহজে বুঝিতে পারিব না। দ্বিজেন্দ্রনাথের সেই "জয় জয় পরব্রহ্ম" "কর তাঁর নাম গান", সত্যেন্দ্রনাথের "কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি", গণেন্দ্রনাথের "গাও হে তাঁহার নাম", হেমেন্দ্রনাথের "নাথ তুমি ব্রহ্ম তুমি বিষ্ণু", জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "ধন্য ধন্য ধন্য আজি"—এ সকল গান যাঁহারা একবার শুনিয়াছেন, তাঁহারা আর কি তাহা ভুলিতে পারেন? এই সকল গান প্রাণের ভিতর গিয়া কথা কহিতে থাকে। এই সকল পুরাতন ব্রহ্মসঙ্গীতের উল্লেখ করিলাম, কারণ স্যর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের বিষয় এখানে উল্লেখ করা বাহুল্য মনে করি—তাঁহার মধুস্রাবী গীত

সকল সমগ্র বঙ্গদেশ আজ নিত্যই উপভোগ করিতেছে এবং তাঁহার রচিত চিত্তবিমোহন গানের সংখ্যা এত অধিক যে তাহা হইতে উল্লেখযোগ্য বলিয়া দু-একটী গান নির্ব্বাচন করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবার একদিকে নানা উপায়ে দেশ-বিদেশের গুরু-গম্ভীর হইতে লঘুতম স্থরে এবং চৌতাল ধামার প্রভৃতি কঠিনতম তাল হইতে ঠুংরি প্রভৃতি অতি হালকা তালে ব্রহ্মসঙ্গীত বসাইয়া দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের গাহিবার উপযুক্ত গান সকল সঞ্চিত করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছিলেন, অপরদিকে পাথুরিয়াঘাটার পূজনীয় রাজা ৺ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বগৃহে গীতবাদ্যের রীতিমত একটী কেন্দ্র-স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে সঙ্গীতচর্চ্চার বিস্তৃতি বিষয়ে যে প্রকার সাহায্য করিয়াছেন তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, মির্জা কালীদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কলাবিৎগণের নিত্য মিলনস্থল শৌরীন্দ্রমোহনের গৃহ। তাঁহার নিযুক্ত ওস্তাদদিগের নিকটে অনেক ব্যক্তি নিয়মিতরূপে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করিয়া দেশবিদেশে সঙ্গীতচর্চ্চা প্রচারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শৌরীন্দ্রমোহনের গৃহে শিক্ষিত হইয়া অনেকে দেবেন্দ্রনাথের গৃহের মাঘোৎসবের গানে যোগ দিতেন। শৌরীন্দ্রমোহনের নিকট কিন্তু হিন্দুস্থানী ওস্তাদী গানেরই সমধিক আদর ছিল। গীতবাদ্যের কেন্দ্রস্থাপন ব্যতীত শৌরীন্দ্রমোহন সঙ্গীতদর্পণ প্রভৃতি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ক বিস্তর ভাল ভাল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক আলোচনার এবং ভারতীয় সঙ্গীতকে আন্তর্জাতিক করিয়া তুলিবার প্রথম সোপান রচনা করিয়া দেন। তাঁহার গৃহে, আমরা বলিতে পারি, সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের আদিমতম বীজ রোপিত হইয়াছিল। তাঁহার এ বিষয়ে এ প্রকার উৎসাহ ছিল যে, তিনি সংস্কৃত কলেজে সঙ্গীতবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ বিশেষভাবে পড়াইবার জন্য ও প্রাচীন সঙ্গীতবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী খুলাইয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ পারিতোষিক প্রদানেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারের শত চেষ্টা এবং শৌরীন্দ্রমোহনের শত চেষ্টা—বঙ্গদেশে জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা প্রসারিত করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইত, যদি না দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম পুত্র হেমেন্দ্রনাথ পুরাতন সঙ্কীর্ণ ভাবের সর্ব্ববিধ বাধা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগকে সঙ্গীতশিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। এই কার্য্যে তিনি কেবলমাত্র বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে প্রথমাবধিই নিযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। আদিব্রাহ্মসমাজের জন্য যখন যে কোন গুণী ব্যক্তি নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাকেই তিনি স্বীয় পুত্রকন্যাদিগেরও শিক্ষাদানের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করিতেন। বিষ্ণুচন্দ্রের ন্যায় যদুভট্ট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের নিকট হেমেন্দ্রনাথের সন্তানগণ বিশেষভাবে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র হিতেন্দ্রনাথ সঙ্গীতমূলক সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের পারদর্শিতার প্রধান একটী কারণ এই যে, হেমেন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রথমাবধিই সকলকেই গানের স্থর ও তাল উভয়েরই প্রতি সমান মনোযোগ দিতে বাধ্য করিতেন।

হেমেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাগণ যখন কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত সুচারুরূপে গান করিতে অভ্যস্ত হইলেন, তখন স্থির হইল যে তাঁহারা পরবর্ত্তী মাঘোৎসবে গান করিবেন। আমাদের বেশ স্মরণ হয় যে, যে বৎসর প্রতিভা দেবী-প্রমুখ হেমেন্দ্রনাথের সন্তানেরা উৎসবোচিত বেশে সুসজ্জিত হইয়া প্রাতঃকালের উৎসবে আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতবেদী হইতে এবং সায়ংকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়াছিলেন, সে বৎসর সমুপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও বিস্ময়ের তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছিল। হেমেন্দ্রনাথের সন্তানদিগের বয়সই বা তখন কত?—পাঁচ হইতে আট নয় বৎসর মাত্র। পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালকের মুখে ব্রহ্মসঙ্গীতের ন্যায় কালোয়াতী গান সকল যথাযুক্ত সুরলয়ে বিশুদ্ধভাবে বাহির হইতেছে, তখনকার দিনে ইহাই তো এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইবার কথা, তাহার উপর আট নয় বৎসরের এক

বালিকা। সেই কঠিন ব্রহ্মসঙ্গীত সকল সহজে গাহিয়া যাইতেছে—আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? সেই বিস্ময়জড়িত আনন্দের মধ্য দিয়াই কিন্তু জনসাধারণ বুঝিতে আরম্ভ করিল যে গৃহের বালকবালিকা-দিগকে ভাল বিষয়ের সঙ্গীতাদি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এবং শিক্ষা দিলে গৃহ এক আশ্চর্য্য মঙ্গলশ্রী ধারণ করে। ক্রমে ক্রমে—অতি ধীরে ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের ভিতরেও এখন সঙ্গীতশিক্ষা প্রবেশলাভ করিয়া ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার একটী অপরিহার্য্যপ্রায় অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে কেবল গান শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে নানাবিধ যন্ত্রবাদ্যও শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রতিভা দেবী ও হিতেন্দ্রনাথ একদিকে বিদ্যালয়ে পিয়ানো শিক্ষা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে গৃহে সেতার প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্রবাদ্যের শিক্ষায় নিযুক্ত থাকিতেন। এদেশে ভদ্রপরিবারের বালকবালিকাদের মধ্যে যন্ত্রবাদ্যশিক্ষার ইহাই প্রথম সূত্রপাত। এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে প্রতি বৎসর বিদ্বজ্জন-সমাগম হইত। ঐ সমাগমে কলিকাতার যত বিখ্যাত সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ আহূত হইতেন এবং তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য কোন না কোন প্রকার আমোদের অনুষ্ঠান হইত। বিদ্বজ্জনসমাগমের শেষাবস্থায় কালমৃগয়া, বাল্মীকি-প্রতিভা প্রভৃতি গীতিনাট্যের অভিনয় হইয়াছিল, কিন্তু উহার প্রথমাবস্থায় প্রতিভা দেবীর সেতার প্রভৃতি যন্ত্রবাদ্য ও গান শোনানো হইত। যে বৎসর তাঁহার সেতার বাদ্য প্রথম শোনানো হইয়াছিল, সে বৎসর বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। সঙ্গীতরসজ্ঞ আত্মীয়গণের নিকটে প্রতিভা দেবী বহুমূল্য তানপুরা প্রভৃতি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় অবধি সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, ভদ্রগৃহের বালিকাগণও নির্দ্দোষভাবে যেমন গান শিক্ষা করিতে পারেন, সেইরূপ যন্ত্রবাদ্যও শিখিতে পারেন—এরূপ শিক্ষার ফলে মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল আসিতে পারে না। ইহাতে গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং গৃহের বালক-বালিকাদের চরিত্র গঠনেও যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে। কোন শিক্ষিত পরিবারেই এখন আর সঙ্গীতশিক্ষা বা যন্ত্রবাদ্য শিক্ষা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না।

যে সকল ঘটনা বর্ত্তমানে সঙ্গীতচর্চ্চাকে জন-সাধারণের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া তুলিয়াছে, তন্মধ্যে স্বরলিপি প্রবর্ত্তন একটী প্রধান ঘটনা। যে সময়ে বিদ্বজ্জনসমাগমের সূত্রপাত হয়, সে সময়ে সঙ্গীতচর্চ্চার একটা সুবাতাস উঠিয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক যে, এই সঙ্গীতচর্চ্চার মধ্যে গানের সুর-গুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়া স্থায়িত্ব দিবার একটা চেষ্টা আসিবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই বিষয়ে চেষ্টা করিবার পথপ্রদর্শক বোধ হয় রাজা শৌরীন্দ্র-মোহনের বিদ্যালয়ের সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। কিন্তু তাঁহার স্বরলিপির সাহায্যে সুর-গুলি সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় কি না সন্দেহ। তাহা ছাড়া এই স্বরলিপির প্রণালী সুখবোধ্যরূপেও পরিব্যক্ত হয় নাই। তাই গোস্বামী মহাশয়ের স্বরলিপি এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সাহায্যে কতক পরিমাণে প্রচলিত হইলেও তাহা সাধারণের নিকট স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ক্ষেত্রমোহনের পর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গানগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বোধ হয় কুচবিহারের রাজগীতশিক্ষক কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি ইংরাজী স্বর-লিপির অনুকরণে এক স্বরলিপি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাও এদেশে নিতা-ন্তই অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। কুচবেহারের রাজার ছাপাখানায় তাঁহার ইংরাজী স্বরলিপি ছাপিবার সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু সে সময়ে বঙ্গদেশে উহা মুদ্রিত করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল না। শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের কতকগুলি রাগিণী সংগ্রহের ইং-রাজী স্বরলিপি সেকালের ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পা-নির প্রসিদ্ধ যন্ত্রালয় ষ্টানহোপ প্রেসে প্রস্তরলিপির সাহায্যে অনেক ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে শূন্যমাত্রিক এক স্বরলিপি আবিষ্কৃত হইল। এই স্বরলিপি ছাপিবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে

হয় নাই, কারণ ইহার বর্ণমালা বঙ্গভাষায় প্রচলিত অক্ষর ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সেই স্থূল স্বরলিপি অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বরলিপি অনেকটা সহজবোধ্য হইয়াছিল। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, এই স্বরলিপি সর্ব্বপ্রথম 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই স্বরলিপি প্রকাশিত হইবার পর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনে "বালক" নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে ইহাতে নানাবিধ অপ্রকাশিতপূর্ব্ব বিষয় সকল স্থান পাওয়াতে "বালক" অতি শীঘ্র সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সেই সকল নূতন বিষয়ের অন্যতর হইতেছে দ্বিজেন্দ্রনাথের সরল স্বরলিপিতে গান প্রকাশ করা। রাগরাগিণীর সুর স্বরলিপিতে প্রকাশ করা বড় কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু তাহার লয় বা তাল ঠিক করিয়া ধরা ও যথাযথ বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করাই অত্যন্ত কঠিন। এখন অবশ্য স্বরলিপিকারগণ স্বরলিপি কার্য্যের কাঠিন্য তত উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা স্বরলিপি প্রকাশের প্রথম অবস্থা জানেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, স্বরলিপিতে চৌতাল প্রভৃতি কঠিন তাল সকল যথাযথ প্রকাশ করিবার জন্য পথপ্রদর্শকদিগকে কি প্রকার পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তখন বলিতে গেলে একমাত্র হিতেন্দ্রসহায় প্রতিভা দেবী ব্যতীত অন্য কেহই একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত লোক ছিলেন না। বালকে প্রতিভা দেবী কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ "চতুরঙ্গ" গানের স্বরলিপি সঙ্গীতরাজ্যে এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছিল বলিতে হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের শূন্যমাত্রিক স্বরলিপি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও সহজ মুদ্রণযোগ্য হইলেও ইহাতে আরও অনেক উন্নতি করিবার অবসর ছিল। সেই স্বরলিপিকে সরলতর ও সম্পূর্ণতর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর তাহারই সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে আকারমাত্রিক এক নূতন স্বরলিপির উদ্ভাবন করিলেন। এই স্বরলিপি সরলতর ও পুষ্টতর হইবার কারণে মাসিকপত্রের রাজ্যের চারিদিক হইতে ইহার জন্য আবেদন পড়িতে লাগিল। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুও অক্লান্ত পরিশ্রমে নানাবিধ সঙ্গীত এই স্বরলিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া নানা মাসিকপত্রে প্রকাশ করাতে ইহা বহুল প্রচলিত হইয়া পড়িল। প্রকৃতপক্ষে স্বরলিপিযুগের স্থিতির সূত্রপাত হইয়াছে জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রকাশ হইতে। এই স্বরলিপির বহুল প্রচারে (তদানীন্তন লালবাজারের মোড়ে অবস্থিত) ডোয়ার্কিন এণ্ড সন কোম্পানী, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই স্বরলিপিতে লিপিবদ্ধ গীতপুস্তকাদির সাহায্যে আজ গৃহে গৃহে সঙ্গীতচর্চ্চা হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই স্বরলিপির যুগে স্বরলিপিকে সরলতম ও পূর্ণাবয়ব করিবার জন্য প্রতিভা দেবীর ভ্রাতা হিতেন্দ্র নাথও সাংখ্য স্বরলিপি নামে সংখ্যামাত্রিক আর একটি স্বরলিপির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। উক্ত স্বরলিপিতে লিপিবদ্ধ অনেক ভাল ভাল সঙ্গীত নানা মাসিকপত্রে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার অকালমৃত্যুতে ইহার সম্যক প্রচলন হইতে পারে নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর স্বরলিপির সাহায্যে যখন গৃহে গৃহে সঙ্গীতচর্চ্চা হইতে লাগিল, তখন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সঙ্গীতাদি শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা জাগরূক হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। প্রতিভা দেবীর মনে অনেক দিন অবধি এইরূপ একটি ইচ্ছা অস্ফুট আকারে জাগরূক হইতেছিল, কিন্তু এরূপ বিদ্যালয়ের ছাত্র পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। ক্রমে তিনি যখন তাঁহার স্থাপিত আনন্দ সভার বাৎসরিক অধিবেশনে সমাহূত এবং সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদ্য শ্রবণে পরিতৃপ্ত ভদ্রমণ্ডলীর নিকটেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গীতশিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয়ের অভাব অনুভবের আভাস পাইলেন, তখন তিনি ঐরূপ একটি বিদ্যালয় সংস্থাপনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অব্যক্ত ইচ্ছা ব্যক্ত আকার ধারণ করিয়া সঙ্গীতসঙ্ঘে পরিণত হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট দিবসে রাখি-পূর্ণিমা তিথিতে সঙ্গীতসংঘ প্রথম স্থাপিত হয়।

যে সকল মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া সংঘ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই সকল উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে সংঘই সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইয়াছে। হইতে পারে যে এখানে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় কেহ খুলিয়াছেন, অথবা ওখানে কেহ ভারতীয় গীতবিদ্যাবিষয়ক দু' একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সকল উদ্দেশ্যকে সম্বন্ধ করিয়া সম্বন্ধ ভাবে সকল উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা বিষয়ে সংঘই সর্ব্বপ্রথম।

সংঘের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে কয়েকটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার গীত ও যন্ত্রবাদ্য জাগ্রত করা ও সাধারণ্যে প্রচার করা, (২) ভারতীয় সঙ্গীতের একটী ইতিহাস প্রণয়ন, (৩) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, (৪) সর্ব্ববিধ ভারতীয় গীতবিদ্যার জন্য একটী সাধারণ স্বরলিপি নির্দ্দিষ্ট করা, এবং (৫) মধ্যে মধ্যে সাঙ্গীতিক সম্মিলনের ব্যবস্থা করা।

আমাদের স্মরণ হয় যে, প্রতিভা দেবীর সঙ্গীতজ্ঞ ভ্রাতা হিতেন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীত এবং তানসেন প্রভৃতি অনেকগুলি সঙ্গীতজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষের ইতিবৃত্ত নানা মাসিকপত্রে প্রকাশ করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রজ হিতেন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া "হিতগ্রন্থাবলী" নামে প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রতিভা দেবী অথবা ঋতেন্দ্রনাথ, ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কি সেই সকল ইতিবৃত্ত সংকলন করিয়া সংঘের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সংসাধনে সহায়তা করিবেন না? আমরা দেখিতেছি যে, সর্ব্ববিধ ভারতীয় গীতবিদ্যার জন্য একটী সাধারণ স্বরলিপি নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য একটী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। বরোদা নগরে সমাহূত "ভারতীয় মহাসঙ্গীত সভা" যে সকল উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, একটী সাধারণ স্বরলিপি নির্দ্দিষ্ট করা তাহাদিগের অন্যতর বলিয়া স্থির হইয়াছে। আমরা আশা করি যে সংঘ ও মহাসঙ্গীতসভা মিলিত হইয়া উভয়েরই স্থিরীকৃত এই উদ্দেশ্যটী সংসাধিত করিয়া ভারতবাসীর মহান উপকার করিবেন।

সংঘের মহত্তম উদ্দেশ্য হইতেছে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিভা দেবী যেরূপ অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, সত্য সত্যই তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এখানে পুরুষদিগের হইতে পৃথক দিনে মহিলাদিগের পরিদর্শনে মহিলাদিগকে গান ও যন্ত্রবাদ্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া সংঘের কর্ত্তৃপক্ষ বড়ই ভাল কাজ করিয়াছেন। অর্থের অভাবে বা অন্য কোন কারণে সংঘের পরিপুষ্টির অভাব হইলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। এই সংঘ হইতে সুভাব সঙ্গীত সকল দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া দেশের মানসিক, নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের কিরূপ সহায় হইবে, তাহা এখন আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

মিশ্র—ঝম্পক।

এই ত তোমার আলোক-ধেনু
 সূর্য্য তারা দলে দলে,
কোথায় বসে বাজাও বেণু,
 চরাও মহা গগন তলে॥
তৃণের সারি তুলচে মাথা
 তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা,
 ভিড় করেছে ফুলেফলে॥
সকালবেলা দূরে দূরে
 উড়িয়ে ধুলি কোথায় ছোটে।
আঁধার হলে সাঁজের সুরে
 ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত
 ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
 ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে?

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
[গমা সা সা] ‖
II সা মা মা। মা মা I মা মগা -পা। পা পা I পর্গা -া র্গা। র্রা র্সা I
এ ই ত তো মার আ লো॰ ক্ ধে নু সূ • র্য্য তা রা

১´ ২ ১ ২ ১´ ২
I র্সা র্সা -না। র্সধা না I র্সা র্সা -র্গা। র্রা র্সা। র্সা র্সনা র্সা। ধা পা I
দ লে • দ॰ লে কো থায় • ব সে বা জা ও বে ণু

১´ ২ ১´ ২
I পা র্সা -নর্সা। ধা পা I পক্ষা ধপা -মা। মা মা II
চ রা ও ম হা গ॰ গ ন ত লে

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I { পা ধা -পা। নধা না। র্সা -া র্সা। র্সা র্সা I র্সা র্সা -ধনা। র্সা র্রা I
তৃ ণে র্ সা॰ রি তুল্ • চে মা থা ত রু • র্ শা খে

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
[পা পা]
I র্সা র্সা -না। র্সা ধা। } পা পা -া। পা পা I পক্ষা ধপা -মা। মা মা I
শ্যা ম ল্ পা তা, আ লোয় • চ রা ধে • নু • এ রা

১´ ২ ১´ ২
I মা -না না। ধা পা I মা গা -মা। রা সা II
ভি ড়্ ক রে ছে ফু লে • ফ লে

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I সা মা -া। মা পা I না না -া। ধা পা I না না না। ধা পা I
স কাল্ • বে লা দূ রে • দূ রে উ ড়ি য়ে ধু লি

১ ২ ১´ ২ ১´ ২
I পক্ষা ধপা -মা। মা মা I মা মা -া। মা মা I মা মা -া। মা মা I
কো॰ থা য় ছো টে আঁ ধার • হ লে সাঁ ঝের • সু রে

১´ ১ ১´ ২ ১ ২
I মা পা পা। পক্ষা ধপা I মা গা মা। রা সা I { পা ধা -পা। নধা না I
ফি রি য়ে আ॰ ন আ প ন গো ঠে আ শা • তৃ॰ ষা

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
[ধা পা]
I সা র্সা -া। র্সা র্সা I র্সা র্সধা -না। সা র্রা I র্সা না -র্সা। র্সা ধা } I
আ মার • য ত ঘু রে॰ • বে ড়ায় কো থা য় ক ত,

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I পা -া পা। পা পা I পক্ষা ধপা -মা। মা মা I গমা -না না। ধা পা I
মোর • জী ব নের রা॰ খা ল্ ও গো ডা ক্ দে বে কি

১ ২
I মা -গা মা। রা সা II
স • ন্ধ্যা হ লে

———

বর্ষ শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩১শে চৈত্র শুক্রবার বর্ষ শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষ শেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

পরদিন ১লা বৈশাখ শনিবার নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।